প্রবাসী গল্পসম্ভার

প্রবাসী
গল্পসম্ভার

সম্পাদনা

শৈলেন চক্রবর্তী

পত্র ভারতী

৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ

PRABASI GALPASAMBHAR

Edited by

Sailen Chakraborty

ISBN No. 81-86986-24-3

প্রচ্ছদ

সমীর সরকার

অঙ্গসজ্জা

জুরান নাথ

মূল্য

১০০.০০

'পত্র ভারতী'র পক্ষে ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

প্রবাসীর জগৎ

বিংশ শতকের সূচনায় প্রকাশিত সাময়িক পত্রগুলির মধ্যে অন্যতম হল 'প্রবাসী'। সংবাদপত্র জগতের প্রবাদপুরুষ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত স্বনামধন্য অভিজাত ঈষৎ অহঙ্কারী ও সেকালে খ্যাততম প্রবাসী। এপ্রিল ১৯০১। এলাহাবাদে কায়স্থ পাঠশালার (কলেজ) অধ্যক্ষ রামানন্দ এলাহাবাদ থেকেই মালিক-সম্পাদকরূপে প্রকাশ করলেন নতুন বাংলা মাসিকপত্র 'প্রবাসী'। বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এ সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, যখন কম-বেশি দেড় দশকের মধ্যে বিদায় নিয়েছেন কেশবচন্দ্র সেন, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তখনও জীবিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর. গিরীশচন্দ্র ঘোষ, স্বামী বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ চিন্তানায়কেরা। এমন একটা সময়ে বাংলার বাইরে প্রবাস থেকে বাঙালিকে সাহিত্য-সংস্কৃতির বার্তা পাঠাল 'প্রবাসী'। প্রথম সংখ্যাতে লিখলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ সেন, যোগেশচন্দ্র রায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রমুখ। প্রথম সংখ্যাটিই এমন চিত্তাকর্ষক হল, যা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষিত হল, দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপতে হল। প্রকাশের পর থেকেই বাঙালির মনন ও সংস্কৃতি-চর্চায় 'প্রবাসী' দখল করে নিল তার নিজস্ব মর্যাদার জায়গা। পত্রিকার পঁচিশ বছর পূর্ণ হলে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যথার্থভাবেই বলেন, "জীবনের নানা দিকে বাঙালী গত পঁচিশ বছরের মধ্যে যতটুকু কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছে তার সবচেয়ে পূর্ণ পরিচয় এক 'প্রবাসী'ই দিতে পারে। বাঙালীর কালচর বা সর্ব্বাঙ্গীণ উৎকর্ষের পূর্ণ প্রতিচ্ছায়া প্রতিফলিত হয়ে আছে এক এই 'প্রবাসী'র দর্পণে।"

'প্রবাসী গল্পসম্ভার' প্রবাসীর দীর্ঘ ৭৬ বছর প্রকাশকালে প্রকাশিত গল্প-সম্ভারের মধ্যে থেকে মাত্র ৩৫টি গল্প চয়ন কবে একটি সংকলন। বাংলা ছোটগল্পের সার্থক সৃষ্টি ও পুষ্টি রবীন্দ্রনাথের হাতে হলেও ছোটগল্প নির্মাণে মনোনিবেশ করেছিলেন অসংখ্য লেখক-লেখিকা। একেবারে প্রথম দিকে প্রবাসীতে গল্প প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু তারপর যে গল্প প্রকাশিত হতে শুরু করল তার স্রোত বরাবর অব্যাহত ছিল। লেখক হিসাবে কে নেই সেই তালিকায়! একমাত্র শরৎচন্দ্রের গল্প ছাড়া তখনকার দিনে প্রায় সকলেরই গল্প প্রবাসীতে ঠাঁই পেয়েছে। যে কারণেই হোক শরৎচন্দ্রের সঙ্গে প্রবাসীর সম্পর্ক ভালো ছিল না। রামানন্দবাবুর স্বীকারোক্তি, 'আমি শরৎবাবুর লেখা পাইবার জন্য কখনও আগ্রহ প্রকাশ বা চেষ্টা করি নাই'। তবুও প্রবাসীর লেখক-তালিকা খুব দীর্ঘ। প্রবাসীর প্রথম চল্লিশ বছরে প্রায় সাড়ে তিনশো লেখক নিয়মিতভাবে প্রবাসীতে লিখেছেন। আর প্রকাশিত গল্পের. সংখ্যা প্রায় হাজার-খানিক।

প্রবাসীতে প্রকাশিত গল্পের বিষয়-বৈচিত্র্যের দিকে তাকিয়ে অবাক হতে হয়। তৎকালীন সমাজজীবন, রাজনীতি, সংস্কার, জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে শুরু করে মানুষের অন্তর্গত ভাঙন, প্রেম ও প্রেম-সম্পর্ক, ব্রাত্যজীবন—সব বিষয়েই বিচিত্র স্বাদের গল্প। গল্পের ফর্ম ভাঙার যে নানান রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তারও সূচনা প্রবাসীতেই। রবীন্দ্রনাথই তার পথ-প্রদর্শক। তাঁর 'নামঞ্জুর গল্প'-এ গল্পের মধ্যে গল্প। সম্পাদকমশায়ের ফরমায়েশে গল্পের কথক একটি গল্প লিখেছেন। কিন্তু সে-গল্প মঞ্জুর হয়নি। গল্প কি হতে হবে গল্পের মতোই! নাকি বাস্তব জীবনবেদই হয়ে উঠতে পারে গল্প—এই প্রশ্ন রেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কৈফিয়ৎ' গল্পে নন্দী, বিশ্বনাথ. নারদ—এঁরাই হয়ে ওঠে গল্পের চরিত্র। নন্দী আবার সাহিত্যিক হবার স্বপ্ন দেখে। তার সে স্বপ্ন আছাড় খায় কিভাবে তারই সরস উপস্থাপনা এই গল্পে।

আত্মমর্যাদাবোধ ও বলিষ্ঠ চরিত্রের প্রকাশ ঘটেছে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'খালাস' গল্পে।

ব্যারিস্টার নগেন্দ্রবাবু চাকরি করেন ব্রিটিশের অধীনে, কিন্তু চাকর হতে চাননি। মাথা নত না করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে শেখায় গল্পটি। চিরায়ত প্রেমকাহিনীর অনবদ্য গল্প চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুনর্মিলন'। মুর্শিদাবাদের মোতিঝিলে সিরাজউদ্দৌলার মোতিমহল। সেখানে নতুন বেগম সমরু। তার আসল স্বামী কিন্তু মসরু। সমরুর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর মসরু যে কোথায় গেল কে জানে। কিন্তু সমরুর বুকে জেগে থাকল মসরুর প্রতিচ্ছবি। মসরুর প্রেম বুকে নিয়েই শেষপর্যন্ত সমরুর আত্মহত্যা। একইভাবে বিষয়বৈচিত্র্যে ও উপস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য পরশুরামের 'ছেলেধরা', খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'উত্তরে', জগদীশ গুপ্তের 'অন্নপূর্ণার পুত্রবধূ', সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ', সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পচা' প্রভৃতি গল্প। অল্প পরিসরের গল্প, যাকে আমরা বলি অণুগল্প—বনফুলের হাতেই যার ব্যাপক প্রচার-প্রসার—তারও সূচনা কিন্তু প্রবাসীতেই। এই সংকলনে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পাষাণী', প্রমথনাথ বিশীর 'আরোগ্য-স্নান', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র 'নায়ক-নায়িকা' এমনই গল্প।

আর গল্পচর্চায় মহিলাদের আগ্রহ ইতোমধ্যে প্রকাশ পেলেও প্রবাসীর পৃষ্ঠায় লেখিকাদের গল্পের প্রকাশের হার আমাদের বিস্মিত করে। এত গল্প তাঁরা লিখেছেন যে প্রবাসীর লেখিকাদের গল্প নিয়েই একটি পৃথক সংকলন হতে পারে। বর্তমান সংকলনে নিরুপমা দেবী, শান্তা দেবী, জ্যোতির্ময়ী দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, কাঞ্চনমালা বন্দ্যোপাধ্যায়, সীতা দেবী প্রমুখের গল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

তখন অধিকাংশ গল্পই সাধুভাষায় লেখা হত। বাংলা গদ্যের ঐতিহ্যও প্রবাসীর গল্পগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে পূর্ণমাত্রায়। বিষয়-বৈচিত্র্যের সঙ্গে সমতা বজায় রেখেই বাংলা গদ্যের বিচিত্র ধারা উন্মোচিত হয়েছে এইসব গল্পে। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, সজনীকান্ত, শৈলজানন্দ, মানিকের অপূর্ব গল্প-ভাষায় আধুনিকতার প্রমাণ মেলে। প্রবাসীর গল্পগুলিতে ধরা পড়ে বাংলা ছোটগল্পের ধারাবাহিক রূপ। সেই নিরিখে শুধুমাত্র গল্প-রসিক নয়, বাংলা সাহিত্যের গবেষক-পাঠকের কাছেও প্রবাসীর এই গল্প সংকলন মূল্যবান আকরগ্রন্থের মর্যাদা পাবে।

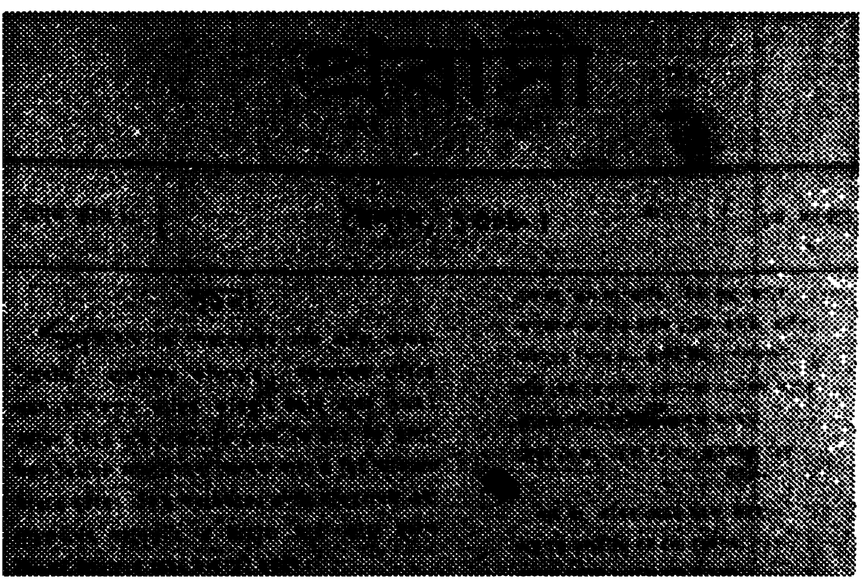
কয়েকশো গল্পের মধ্যে থেকে মাত্র ৩৫টি গল্প নির্বাচন যে কী সুকঠিন তা সহজেই অনুমেয়। আর একজন লেখকের যেখানে ২০-২৫টি গল্প সেখানেও থমকে দাঁড়াতে হয়। যেমন, কার্তিক ১৩৪০ থেকে কার্তিক ১৩৪৩—এই তিন বছরে তারাশঙ্করের ১০টি গল্প প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়েছে। একজন লেখকের মাত্র একটি গল্প নির্বাচনই যেখানে নিরিখ, এবং গল্পের মান, ভাষা, গঠনশৈলী ও বিষয়-বৈচিত্র্যের কথাও যেখানে মাথায় রাখতে হয় সেখানে গল্প নির্বাচন খুবই কঠিন ও দুঃসাহসিক কাজ। সবচেয়ে বড়ো কথা মনন বা চিন্তনের একটি ক্রমিকতাও মোটামুটি ধরা পড়ে সেভাবে গল্প সাজানোও একান্ত কাঙ্ক্ষিত। বলতে দ্বিধা নেই, সংকলক শৈলেন চক্রবর্তী এই দুরূহ কাজটিতে সফল হয়েছেন।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই সংকলনটি জনসমাদর পাবে এবং অনুরূপ আরও সংকলনকে স্বাগত জানাবে। এই সংকলনটি প্রকাশের জন্য পত্র ভারতীকে অভিনন্দন জানাই।

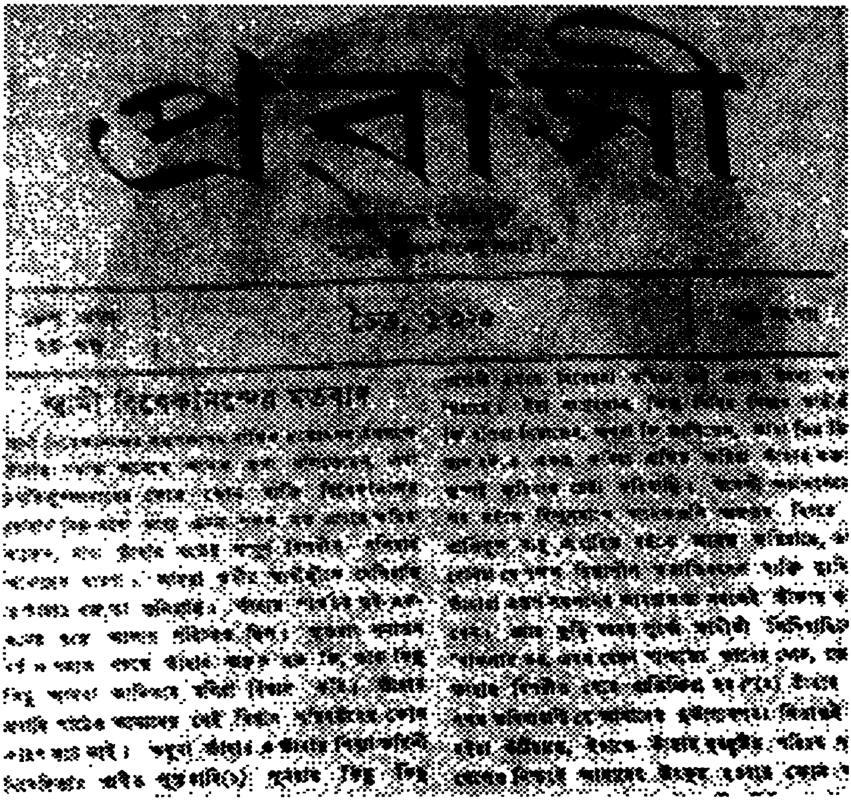
জ্যোতিভূষণ চাকী



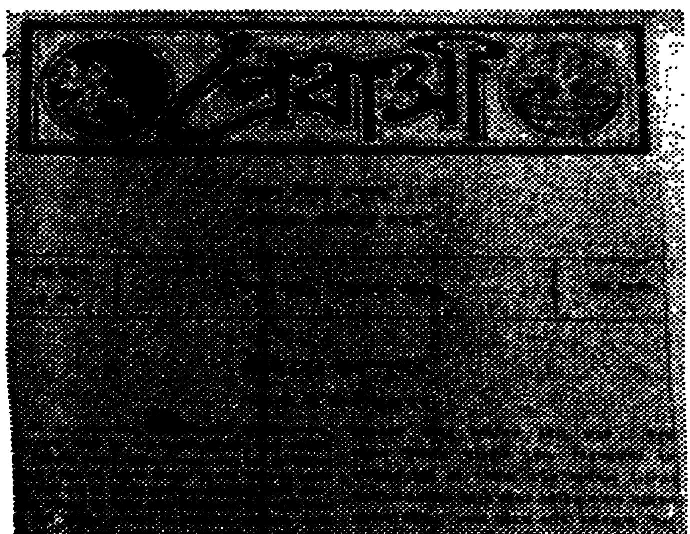
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়



প্রবাসী ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা বৈশাখ ১৩০৮


প্রবাসী

প্রবাসী চৈত্র ১৩২৫


প্রবাসী

প্রবাসী পৌষ ১৩৩২

সংকলন প্রসঙ্গে

বাংলা ছোটগল্পের ধারাবাহিকতার অনুসন্ধানেই পুরোনো সাময়িকপত্রের পাতা ওল্টানো শুরু করি। অন্যান্য পত্র-পত্রিকার সঙ্গে প্রবাসীও দেখি। প্রথমে মুগ্ধতা, ক্রমে নেশা ধরে গেল। এমন পরিপূর্ণ একটি সাময়িকপত্র! মনে হল, পাঠক হিসাবে অনেক পিছিয়ে আছি। গল্পের পাশাপাশি প্রবন্ধ, বিজ্ঞান-নিবন্ধ আর স্বয়ং রামানন্দবাবুর লেখা 'বিবিধ প্রসঙ্গ'-গুলি পড়ারও লোভ সামলানো গেল না। আর শুধু পাঠক নয়, হয়ে গেলাম দর্শকও। প্রবাসীর প্রতি সংখ্যায় এত সুন্দর সব ছবির প্রকাশ! ফলে গল্প-পাঠে ও গল্প-সংগ্রহে দেরি হতে লাগল।

ভালো কিছু পেলে যেমন প্রিয়জন-বন্ধুবান্ধবদের দেখাতে ইচ্ছে করে, প্রবাসী-পাঠের পরও সেই অনুভূতি। ইচ্ছে হল, গল্প পড়তে ভালোবাসেন যাঁরা, তাঁদের সকলকে ডেকে ডেকে গল্পগুলি পড়াই। সেই আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ থেকেই এই সংকলন।

প্রবাসীতে অসংখ্য গল্প প্রকাশিত হয়েছে। কী দীর্ঘ কী সমৃদ্ধ লেখক-তালিকা! আর কত বিচিত্র স্বাদের গল্প। বিষয়-ভাষা-বুননশৈলীতে অনেক গল্পই নতুন। অনেকক্ষেত্রে মনে হয়েছে, এই বিষয় নিয়ে গল্প তো আগে পড়িনি। প্রবাসীর দীর্ঘ প্রকাশকাল ধরে সময়ের সঙ্গে কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে বাংলা গল্পের স্রোতপথ, সেই ইতিহাসের সাক্ষী তো প্রবাসী নিজেই। গল্পগুলি সংকলিত করার সময় এই গল্প-মাধুর্য ও ধারাবাহিকতার বিষয়টিকে সচেতনভাবে প্রাধান্য দিতে চেয়েছি।

এ ধরনের সংকলন করতে গিয়ে দুটি বড়ো সমস্যা হল : লেখক নির্বাচন ও নির্বাচিত লেখকদের গল্প নির্বাচন। বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য লেখকের গল্পই প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে থেকে ৩৫ জন লেখক নির্বাচন—এ বড়ো দুরূহ কাজ। বাধ্য হয়ে প্রবাসীতে প্রকাশিত নতুন আঙ্গিকের গল্প আহরণ করতে চেয়েছি। সেক্ষেত্রেও দেখি, গল্পের সংখ্যা অনেক। পছন্দের সব গল্প বর্তমান সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করলে বইয়ের আকার হত অন্তত তিনগুণ। বইটির মূল্যও হয়ত চলে যেত সাধারণ পাঠকের নাগালের বাইরে। পাঠক-পাঠিকা আগ্রহী হলে ভালো-লাগা বাকি গল্পগুলি পরবর্তী সময়ে তাঁদের হাতে তুলে দেবার চেষ্টা করতে পারি।

প্রবাসী-পরবর্তী সময়ে বানান সংস্কারের ফলে বাংলা বানান-রীতির বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু প্রামাণ্য এই সংকলনের গুরুত্ব অনুযায়ী প্রবাসীতে মুদ্রিত বানানই অপরিবর্তিত রেখেছি।

গত কয়েকবছর ধরে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কাজ করেছি। বিশেষত, গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার লাইব্রেরি, ন্যাশনাল লাইব্রেরি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগারের কর্মীবন্ধুরা চাওয়ামাত্র হাতের কাছে বই এগিয়ে দিয়েছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সাহায্য ও সাহচর্য আমাকে প্রতিমুহূর্তে উৎসাহিত করেছে। এঁদের সকলের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

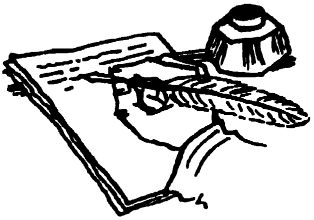
এই সংকলন তৈরির ইচ্ছে প্রকাশের পর থেকে সব বিষয়ে যাঁর পরামর্শ ও নির্দেশ

পেয়েছি,—প্রায় নিয়মমাফিকভাবে তাঁর ব্যস্তময় মুহূর্তে অনুপ্রবেশ করেও অভাবিত প্রশ্রয় পেয়েছি—তিনি জ্যোতিভূষণ চাকী। সংকলনের ভূমিকাও লিখেছেন তিনিই। তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক যে স্তরের, সেখানে ঋণ স্বীকার বা ধন্যবাদ সম্পূর্ণ মূল্যহীন। শুধু এই বই তাঁর মনের মতো হলেই আমি সুখী।

আর যিনি প্রথম এই সংকলন পরিকল্পনার বীজটি আমার মনের মধ্যে রোপন করেছিলেন, তিনি পত্র ভারতীর কর্ণধার ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সস্নেহ তাগাদায় বইটি কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত হল। বন্ধুজন পূর্ণেন্দু ঘোষ বইটির প্রুফ দেখে দিয়েছেন। রামানন্দবাবুর ছবি ও প্রবাসীর ফটোকপিগুলি সংগ্রহ করেছেন সুফল ভট্টাচার্য। এঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'না-মঞ্জুর গল্প' সংকলিত হয়েছে। অন্যান্য লেখক-লেখিকাদের আত্মীয়-পরিজনদের অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্য তাঁদের কাছে আমি

শৈলেন চক্রবর্তী



নামঞ্জুর গল্প

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের আসর জমেছিল পোলিটিক্যাল লঙ্কাকাণ্ডের পালায়। হাল আমলের উত্তরকাণ্ডে আমরা সম্পূর্ণ ছুটি পাইনি বটে, কিন্তু গলা ভেঙেচে; তা ছাড়া সেই অগ্নিদাহের খেলা বন্ধ।

বঙ্গভঙ্গের রঙ্গভূমিতে বিদ্রোহীর অভিনয় শুরু হ'ল। সবাই জানেন, এই নাট্যের পঞ্চম অঙ্কের দৃশ্য আলিপুর পেরিয়ে পৌঁছল আণ্ডামানের সমুদ্রকূলে। পারাণীর পাথেয় আমার যথেষ্ট ছিল, তবু গ্রহের গুণে এপারের হাজতেই আমার ভোগসমাপ্তি। সহযোগীদের মধ্যে ফাঁসিকাঠ পর্য্যন্ত যাদের সর্বোচ্চ প্রোমোশন হয়েছিল, তাদের প্রণাম ক'রে, আমি পশ্চিমের এক সহরের কোণে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় পসার জমিয়ে তুললেম।

তখনো আমার বাবা বেঁচে। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের এক বড়ো মহকুমার সরকারী উকীল। উপাধি ছিল রায় বাহাদুর। তিনি বিশেষ একটু ঘটা ক'রেই আমার বাড়ি বন্ধ ক'রে দিলেন। তাঁর হৃদয়ের সঙ্গে আমার যোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল কিনা অন্তর্যামী জানেন, কিন্তু হয়েছিল পকেটের সঙ্গে। মনি অর্ডারের সম্পর্ক পর্য্যন্ত ছিল না। যখন আমি হাজতে তখন মায়ের মৃত্যু হয়েছিল। আমার পাওনা শাস্তিটা গেল তাঁর উপর দিয়েই।

আমার পিসি ব'লে যিনি পরিচিত তিনি আমার স্বোপার্জ্জিত কিম্বা আমার পৈতৃক, তা নিয়ে কারো কারো মনে সংশয় আছে। তা'র কারণ আমি পশ্চিমে যাবার পূর্ব্বে তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ সম্পূর্ণই অব্যক্ত ছিল। তিনি আমার কে, তা নিয়ে সন্দেহ থাকে তো থাক, কিন্তু তাঁর স্নেহ না পেলে সেই আত্মীয়তার অরাজকতাকালে আমাকে বিষম দুঃখ পেতে হ'ত। তিনি আজন্ম পশ্চিমেই কাটিয়েচেন, সেইখানেই বিবাহ, সেইখানেই বৈধব্য। সেইখানেই স্বামীর বিষয়সম্পত্তি। বিধবা তাই নিয়েই বদ্ধ ছিলেন।

তাঁর আরো-একটি বন্ধন ছিল। বালিকা অমিয়া। কন্যাটি স্বামীর বটে, স্ত্রীর নয়। তার মা ছিল পিসিমার এক যুবতী দাসী, জাতিতে কাহার। স্বামীর মৃত্যুর পর মেয়েটিকে তিনি ঘরে এনে পালন করচেন—সে জানেও না যে, তিনি তা'র মা নন।

এমন অবস্থায় তাঁর আর-একটি বন্ধন বাড়ল, সে হচ্চে আমি স্বয়ং। যখন জেলখানার বাইরে আমার স্থান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, তখন এই বিধবাই আমাকে তাঁর ঘরে এবং হৃদয়ে আশ্রয় দিলেন। তা'র পরে বাবার দেহান্তে যখন জানা গেল উইলে তিনি আমাকে বিষয় থেকে বঞ্চিত করেননি, তখন সুখেদুঃখে আমার পিসির চোখে জল পড়ল। বুঝলেন, আমার পক্ষে তাঁর প্রয়োজন ঘুচল। তাই ব'লে স্নেহ তো ঘুচল না। তিনি বললেন, "বাবা, যেখানেই থাকো, আমার আশীর্ব্বাদ রইল।" আমি বললেম, "সে তো থাকবেই, সেই সঙ্গে তোমাকেও থাকতে হবে, নইলে আমার চলবে না। হাজৎ থেকে বেরিয়ে যে মাকে আর দেখতে পাইনি, তিনিই আমাকে পথ দেখিয়ে তোমার কাছে নিয়ে এসেছেন।" পিসিমা তাঁর এতকালের পশ্চিমের ঘর-সংসার তুলে দিয়ে আমার সঙ্গে কলকাতায় চ'লে এলেন। আমি হেসে বললেম, "তোমার স্নেহ-গঙ্গার ধারাকে পশ্চিম থেকে পূর্ব্বে বহন ক'রে এনেছি, আমি কলির ভগীরথ।"

পিসিমা হাসলেন, আর চোখের জল মুছলেন। তাঁর মনের মধ্যে কিছু দ্বিধাও হ'ল। বললেন, "অনেক দিন থেকে ইচ্ছে ছিল মেয়েটার কোন-একটা গতি ক'রে শেষ বয়সে তীর্থ ক'রে বেড়াবো—

কিন্তু বাবা, আজ যে তার উল্টো পথে টেনে নিয়ে চললি।" আমি বললুম, "পিসিমা, আমিই তোমার সচল তীর্থ। যে-কোনো ত্যাগের ক্ষেত্রেই তুমি আত্মদান করো না কেন, সেইখানেই তোমার দেবতা আপনি এসে তা গ্রহণ করবেন। তোমার যে পুণ্য আত্মা।"

সবচেয়ে একটা যুক্তি তাঁর মনে প্রবল হ'ল। তাঁর আশঙ্কা ছিল, স্বভাবতই আমার প্রবৃত্তির ঝোঁকটা আণ্ডামান-মুখো, অতএব কেউ আমাকে সামলাবার না থাকলে অবশেষে একদিন পুলিসের বাহুবন্ধনে বদ্ধ হবোই। তাঁর মৎলব ছিল, যে-কোমল বাহুবন্ধন তা'র চেয়ে অনেক বেশি কঠিন ও স্থায়ী আমার জন্য তা'রই ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে তবে তিনি তীর্থভ্রমণে বা'র হবেন। আমার বন্ধন নইলে তাঁর মুক্তি নেই।

আমার চরিত্র-সম্বন্ধে এইখানে ভুল হিসেব করেছিলেন। কুষ্ঠিতে আমার বধ-বন্ধনের গ্রহটি অন্তিমে আমাকে শকুনি-গৃধিনীর হাতে সঁপে দিতে নারাজ ছিলেন না, কিন্তু প্রজাপতির হাতে, নৈব নৈব চ। কন্যা-কর্ত্তারা ত্রুটি করে নি, তাঁদের সংখ্যাও অজস্র। আমার পৈতৃক সম্পত্তির বিপুল সচ্ছলতার কথা সকলেই জানত, অতএব ইচ্ছা করলে সম্ভবপর শ্বশুরকে দেউলে ক'রে দিয়ে কন্যার সঙ্গে সঙ্গে বিশপঁচিশ হাজার টাকা নহবতে সাহানা বাজিয়ে হাসতে হাসতে আদায় করতে পারতেম। করিনি। আমার ভাবী চরিতলেখক একথা যেন স্মরণ রাখেন যে, স্বদেশসেবার সঙ্কল্পের কাছে এককালীন আমার এই বিশপঁচিশ হাজার টাকার ত্যাগ। জমা-খরচের অঙ্কটা অদৃশ্য কালীতে লেখা আছে ব'লে যেন আমার প্রশংসার হিসাব থেকে বাদ না পড়ে। পিতামহ ভীষ্মের সঙ্গে আমার মহৎ চরিত্রের এইখানে মিল আছে।

পিসিমা শেষ পর্য্যন্ত আশা ছাড়েননি। এমন সময় ভারতের পোলিটিক্যাল আকাশে আমাদের সেই ক্ষাত্রযুগের পরবর্ত্তী যুগের হাওয়া বইল। পূর্ব্বেই বলেচি, এখনকার পালায় আমরা প্রধান নায়ক নই, তবু ফুট-লাইটের অনেক পিছনে মাঝে মাঝে নিস্তেজভাবে আমাদের আসা-যাওয়া চলচে। এত নিস্তেজ যে পিসিমা আমার সম্বন্ধে নিশ্চিন্তই ছিলেন। আমার জন্যে কালীঘাটে স্বস্ত্যয়ন করবার ইচ্ছে এককালে তাঁর ছিল, কিন্তু ইদানীং আমার ভাগ্য-আকাশে লালপাগড়ির রক্তমেঘ একেবারে অদৃশ্য থাকাতে তাঁর আর খেয়াল রইল না। এইটেই ভুল করলেন।

সেদিন পুজোর বাজারে ছিল খদ্দরের পিকেটিঙ। নিতান্ত কেবল দর্শকের মতন গিয়েছিলেম—আমার উৎসাহের তাপমাত্রা ৯৮ অঙ্কেরও নীচে ছিল, নাড়ীতে বেশি বেগ ছিল না। সেদিন যে আমার কোনো আশঙ্কার কারণ থাকতে পারে সে-খবর আমার কুষ্ঠির নক্ষত্র ছাড়া আর সবার কাছে ছিল অগোচর। এমন সময় খদ্দরপ্রচারকারিণী কোনো বাঙালী মহিলাকে পুলিশ সার্জ্জন দিলে ধাক্কা। মুহূর্ত্তের মধ্যেই আমার অহিংস অসহযোগের ভাবখানা প্রবল দুঃসহযোগে পরিণত হ'ল। সুতরাং অনতিবিলম্বে থানায় হ'ল আমার গতি। তা'র পরে যথানিয়মে হাজতের লালায়িত কবলের থেকে জেলখানার অন্ধকার জঠর-দেশে অবতরণ করা গেল। পিসিমাকে ব'লে গেলেম, "এইবার কিছুকালের জন্যে তোমার মুক্তি। আপাতত আমার উপযুক্ত অভিভাবকের অভাব রইল না, অতএব এই সুযোগে তুমি তীর্থভ্রমণ ক'রে নাওগে। অমিয়া থাকে কলেজের হস্টেলে। বাড়ীতেও দেখবার শোনবার লোক আছে, অতএব এখন তুমি দেবসেবায় ষোলো আনা মন দিলে দেবমানব কারো কোনো আপত্তির কথা থাকবে না।"

জেলখানাকে জেলখানা ব'লেই গণ্য ক'রে নিয়েছিলেম। সেখানে কোনরকম দাবীদাওয়া আবদার উৎপাত করিনি। সেখানে সুখ, সম্মান, সৌজন্য, সুহৃৎ ও সুখাদ্যের অভাবে অত্যন্ত বেশি বিস্মিত হইনি। কঠোর নিয়মগুলোকে কঠোরভাবেই মেনে নিয়েছিলেম। কোনোরকম আপত্তি করাটাই লজ্জার বিষয় ব'লে মনে করতেম।

মেয়াদ পুরো হবার কিছু পূর্ব্বেই ছুটি পাওয়া গেল। চারদিকে খুব হাততালি। মনে হ'ল যেন বাংলাদেশের হাওয়ায় বাজতে লাগল এনকোর, একসেলেন্ট্। মনটা খারাপ হ'ল। ভাবলেম, যে ভুগল সেই কেবল ভুগল। আর মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ, রস পেলে দশে মি'লে। সেও বেশিক্ষণ

নয়; নাট্যমঞ্চের পর্দা প'ড়ে যায়, আলো নেভে, তা'র পরে ভোলবার পালা। কেবল বেড়িহাতকড়ার দাগ যার হাড়ে গিয়ে লেগেছে তা'রই চিরদিন মনে থাকে।

পিসিমা এখনো তীর্থে। কোথায় তার ঠিকানাও জানিনে। ইতিমধ্যে পূজোর সময় কাছে এল। একদিন সকালবেলায় আমার সম্পাদক-বন্ধু এসে উপস্থিত। বললেন, "ওহে, পূজোর সংখ্যার জন্যে একটা লেখা চাই।" জিজ্ঞাসা করলেম, "কবিতা?"

"আরে না। তোমার জীবনবৃত্তান্ত।"

"সে তো তোমার একসংখ্যায় ধরবে না।"

"একসংখ্যায় কেন? ক্রমে ক্রমে বেরবে।"

"সতীর মৃতদেহ সুদর্শনচক্রে টুকরো টুকরো করে ছড়ানো হয়েছিল। আমার জীবনচরিত সম্পাদকী চক্রে তেমনি টুকরো টুকরো ক'রে সংখ্যায় সংখ্যায় ছড়িয়ে দেবে এটা আমার পছন্দসই নয়। জীবনী যদি লিখি গোটা আকারে বের ক'রে দেবো।"

"না হয় তোমার জীবনের কোনো-একটা বিশেষ ঘটনা লি'খে দাও না।"

"কি-রকম ঘটনা?"

"তোমার সবচেয়ে কঠোর অভিজ্ঞতা, খুব যাতে ঝাঁজ।"

"কি হবে লি'খে?"

"লোকে জানতে চায় হে।"

"এত কৌতূহল? আচ্ছা, বেশ, লিখব।"

"মনে থাকে যেন, সবচেয়ে যেটাতে তোমার কঠোর অভিজ্ঞতা।"

"অর্থাৎ সবচেয়ে যেটাতে দুঃখ পেয়েছি লোকের তা'তেই সবচেয়ে মজা। আচ্ছা বেশ। কিন্তু নামটামগুলো অনেকখানি বানাতে হবে।"

"তা তো হবেই। যেগুলো একেবারে মারাত্মক কথা, তা'র ইতিহাসের চিহ্ন বদল না করলে বিপদ আছে। আমি সেইরকম মরীয়াগোছের জিনিষই চাই। পেজ প্রতি তোমাকে—"

"আগে লেখাটা দেখ, তা'র পরে দরদস্তুর হবে।"

"কিন্তু আর কাউকে দিতে পারবে না ব'লে রাখছি। যিনি যত দর হাঁকুন আমি তার উপরে—"

"আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে।"

শেষকালটা উঠে যাবার সময় ব'লে গেলেন, "তোমাদের ইনি, বুঝতে পারচ? নাম করব না, ঐ যে তোমাদের সাহিত্যধুরন্ধর—মস্ত লেখক ব'লে বড়াই; কিন্তু যা বলো তোমার স্টাইলের কাছে তা'র স্টাইল, যেন ডসনের বুট আর তালতলার চটি।"

বুঝলেম আমাকে উপরে চড়িয়ে দেওয়াটা উপলক্ষ্যমাত্র, তুলনায় ধুরন্ধরকে নাবিয়ে দেওয়াটাই লক্ষ্য।

এই গেল আমার ভূমিকা। এইবার আমার কঠোর অভিজ্ঞতার কাহিনী।

* * *

সন্ধ্যা কাগজ যেদিন থেকে পড়তে শুরু, সেইদিন থেকেই আহারবিহার-সম্বন্ধে আমাব কড়া ভোগ। সেটাকে জেলযাত্রার রিহার্সাল বলা হ'ত। দেহের প্রতি অনাদরের অভ্যাস পাকা হ'য়ে উঠল। তাই প্রথমবার যখন ঠেললে হাজতে, প্রাণপুরুষ বিচলিত হয়নি। তা'র পর বেরিয়ে এসে নিজের পরে কারো সেবা-শুশ্রূষার হস্তক্ষেপমাত্র বরদাস্ত করিনি। পিসিমা দুঃখবোধ করতেন। তাঁকে বলতেম, "পিসিমা, স্নেহের মধ্যে মুক্তি, সেবার মধ্যে বন্ধন। তাছাড়া, একের শরীরে অন্য শরীরধারীর আইন খাটানোকে বলে ডাইয়ার্কি, দ্বৈরাজ্য, —সেইটের বিরুদ্ধে আমাদের অসহযোগ।" তিনি নিঃশ্বাস ছেড়ে বলতেন, "আচ্ছা বাবা, তোমাকে বিরক্ত করব না।" নির্ব্বোধ, মনে মনে ভাবতেম বিপদ কাটল।

ভুলেছিলেম, স্নেহ-সেবার একটা প্রচ্ছন্ন রূপ আছে। তা'র মায়া এড়ানো শক্ত। অকিঞ্চন

শিব যখন তাঁর ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে দারিদ্র্যগৌরবে মগ্ন তখন খবর পান না, যে লক্ষ্মী কোন্‌-একসময়ে সেটা নরম রেশম দিয়ে বু'নে রেখেছেন, তা'র সোনার সুতোর দামে সূর্য্যনক্ষত্র বিকিয়ে যায়। যখন ভিক্ষের অন্ন খাচ্ছি ব'লে সন্ন্যাসী নিশ্চিন্ত, তখন জানেন না যে, অন্নপূর্ণা এমন মসলায় বানিয়েছেন যে, দেবরাজ প্রসাদ পাবার জন্যে নন্দীর কানে কানে ফিস্‌ ফিস্‌ করতে থাকেন। আমার হ'ল এই দশা। শয়নে বসনে অশনে পিসিমার সেবার হস্ত গোপনে ইন্দ্রজাল বিস্তার করতে লাগল, সেটা দেশাত্মবোধীর অন্যমনস্ক চোখে পড়ল না। মনে মনে ঠিক দিয়ে ব'সে আছি, তপস্যা আছে অক্ষুন্ন। চমক ভাঙল, জেলখানায় গিয়ে। পিসিমা ও পুলিসের ব্যবস্থার মধ্যে যে একটা ভেদ আছে, কোনো-রকম অদ্বৈতবুদ্ধিদ্বারা তা'র সমন্বয় করতে পারা গেল না। মনে-মনে কেবলই গীতা আওড়াতে লাগলেম, "নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।" হায়রে তপস্বী, কখন যে পিসিমার নানাগুণ নানা উপকরণ-সংযোগে হৃদয়দেশ পেরিয়ে একেবারে পাকযন্ত্রে প্রবেশ করেছে, তা জানতেও পারিনি। জেলখানায় এসে সেই জায়গাটাতে বিপাক ঘটতে লাগল।

ফল হ'ল এই যে বজ্রাঘাতছাড়া আর কিছুতে যে শরীর কাবু হ'ত না, সে পড়ল অসুস্থ হ'য়ে। জেলের পেয়াদা যদি বা ছাড়লে, জেলের রোগগুলোর মেয়াদ আর ফুরোতে চায় না। কখনো মাথা ধরে, হজম প্রায় হয় না, বিকেল-বেলা জ্বর হ'তে থাকে। ক্রমে যখন মালাচন্দন হাততালি ফিকে হ'য়ে এসেছে, তখনো এ আপদগুলো টনটনে হ'য়ে রইল।

মনে মনে ভাবি, পিসিমা তো তীর্থ করতে গেছেন, তাই ব'লে অমিয়াটার কি ধর্ম্মজ্ঞান নেই? কিন্তু দোষ দেবো কা'কে? ইতিপূর্ব্বে অসুখে বিসুখে আমার সেবা করবার জন্যে পিসিমা তা'কে অনেকবার উৎসাহিত করেছেন—আমিই বাধা দিয়ে বলেছি, ভালো লাগে না। পিসিমা বলেছেন, "অমিয়ার শিক্ষার জন্যেই বলচি, তোর আরামের জন্যে নয়।" আমি বলেচি, হাঁসপাতালে নার্সিং করতে পাঠাও না।" পিসিমা রাগ ক'রে আর জবাব করেন নি।

আজ শুয়ে শুয়ে মনে মনে ভাবচি, "না হয় একসময়ে বাধাই দিয়েচি, তাই ব'লে কি সেই বাধাই মানতে হবে। গুরুজনের আদেশের পরে এত নিষ্ঠা এই কলিযুগে!"

সাধারণত নিকট সংসারের ছোটোবড়ো অনেক ব্যাপারই দেশাত্মবোধীর চোখ এড়িয়ে যায়। কিন্তু অসুখ ক'রে প'ড়ে আছি ব'লে আজকাল দৃষ্টি হয়েছে প্রখর। লক্ষ্য করলেম্‌ আমার অবর্ত্তমানে অমিয়ারও দেশাত্মবোধ পূর্ব্বের চেয়ে অনেক বেশি প্রবল হয়ে উঠেছে। ইতিপূর্ব্বে আমার দৃষ্টান্ত ও শিক্ষায় তা'র এত অভাবনীয় উন্নতি হয় নি। আজ অসহযোগের অসহ্য আবেগে সে কলেজত্যাগিনী; ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতেও তা'র হৃৎকম্প হয় না; অনাথাসদনের চাঁদার জন্যে অপরিচিত লোকের বাড়ীতে গিয়েও সে ঝুলি ফিরিয়ে বেড়ায়। এও লক্ষ্য ক'রে দেখলেম, অনিল তা'র এই কঠিন অধ্যবসায় দেখে তাকে দেবী ব'লে ভক্তি করে—ওর জন্মদিনে সেই ভাবেরই একটা ভাঙা ছন্দের স্তোত্র সে সোনার কালীতে চাপিয়ে ওকে উপহার দিয়েছিল।

আমাকেও ঐধরনের একটা কিছু বানাতে হবে, নইলে অসুবিধা হচ্চে। পিসিমার আমলে চাকরবাকরগুলো যথানিয়মে কাজ করত, হাতের কাছে কাউকে না কাউকে পাওয়া যেত। এখন একগ্লাস জলের দরকার হ'লে আমার মেদিনীপুরবাসিনী শ্রীমান্‌ জলধরের অকস্মাৎ অভ্যাগমের প্রত্যাশায় চাতকের মতো তাকিয়ে থাকি; সময় মিলিয়ে ওষুধ খাওয়া সম্বন্ধে নিজের ভোলা মনের পরেই একমাত্র ভরসা। আমার চিরদিনের নিয়মবিরুদ্ধ হ'লেও রোগশয্যায় হাজিরে দেওয়ার জন্যে অমিয়াকে দুই একবার ডাকিয়ে এনেচি। কিন্তু দেখতে পাই, পায়ের শব্দ শুনলেই সে দরজার দিকে চমকে তাকায়, কেবলি উসখুস করতে থাকে। মনে দয়া হয়, বলি, "অমিয়া আজ নিশ্চয় তোদের মীটিং আছে।" অমিয়া বলে, "তা হোক না দাদা, এখনো আর-কিছুক্ষণ"—আমি বলি, "না, না, সে কি হয়? কর্ত্তব্য সব আগে।" কিন্তু প্রায়ই দেখতে পাই, কর্ত্তব্যের অনেক আগেই অনিল এসে উপস্থিত হয়। তা'তে অমিয়ার কর্তব্য-উৎসাহের পালে যেন দমকা হাওয়া লাগে, আমাকে বড়ো বেশি-কিছু বলতে হয় না। শুধু অনিল নয়, বিদ্যালয়-বর্জ্জক আরো অনেক উৎসাহী যুবক আমার বাড়ির একতলায়

বিকেলে চা এবং ইন্‌স্পিরেশন গ্রহণ করতে একত্র হয়। তা'রা সকলেই অমিয়াকে যুগলক্ষ্মী ব'লে সম্ভাষণ করে। একরকম পদবী আছে, যেমন রায়-বাহাদুর, পাট করা চাদরের মতো, যাকেই দেওয়া যায় নির্ভাবনায় কাঁধে ঝুলিয়ে বেড়াতে পারে। আর-একরকম পদবী আছে যার ভাগ্যে জোটে সে বেচারা নিজেকে পদবীর সঙ্গে মাপসই করবার জন্যে অহরহ উৎকণ্ঠিত হ'য়ে থাকে। স্পষ্টই বুঝলেম, অমিয়ার সেই অবস্থা। সর্ব্বদাই অত্যন্ত বেশি উৎসাহপ্রদীপ্ত হ'য়ে না থাকলে তা'কে মানায় না। খেতে শুতে তা'র সময় না-পাওয়াটা বিশেষ সমারোহ ক'রেই ঘটে। এপাড়ায় ওপাড়ায় খবর পৌঁছয়। কেউ যখন বলে, এমন করলে শরীর টিঁকবে কি ক'রে, সে একটুখানি হাসে—আশ্চর্য্য সেই হাসি। ভক্তরা বলে, আপনি একটু বিশ্রাম করুনগে, একরকম করে কাজটা সেরে নেবো—সে তা'তে ক্ষুণ্ণ হয়, —ক্লান্তি থেকে বাঁচানোই কি বড়ো কথা? দুঃখগৌরব থেকে বঞ্চিত করা কি কম বিড়ম্বনা? তা'র ত্যাগ-স্বীকারের ফর্দ্দের মধ্যে আমিও প'ড়ে গেছি। আমি যে তা'র এতবড়ো জেল-খাটা দাদা, উল্লাসকর, কানাই, বারীন, উপেন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে এক জ্যোতিষ্কমণ্ডলীতে যার স্থান, গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পার হ'য়ে তার যে দাদা গীতার শেষ দিকের অধ্যায়ের মুখে অগ্রসর হয়েছে, তাকেও যথোপচিতপরিমাণে দেখবার সে সময় পায় না। এতবড়ো স্যাক্রিফাইস। যেদিন কোনো কারণে তা'র দলের লোকের অভাব হয়েছে সেদিন আমিও তা'র উৎসাহের মৌতাৎ জোগাবার জন্যে বলেছি, "অমিয়া, ব্যক্তিগত মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ তোর জন্যে নয়, তোর জন্যে বর্ত্তমান যুগ।" আমার কথাটা সে গম্ভীরমুখে নীরবে মেনে নিয়েছে। জেলে যাওয়ার পর থেকে আমার হাসি অন্তঃশীলা বইচে—যারা আমাকে চেনে না তা'রা বাইরে থেকে আমাকে খুব গম্ভীর বলেই মনে করে।

বিছানায় একলা প'ড়ে প'ড়ে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবচি, বিমুখা বান্ধবা যান্তি। হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল, সেদিন কোথা থেকে একটা ন্যাঙলা কুকুর আমার বারান্দার কোণে আশ্রয় খুঁজছিল। গায়ের রোঁওয়া উঠে গেছে, জীর্ণ চামড়ার তলায় কঙ্কালের আবরু নেই,—আধমরা তার অবস্থা। অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে তা'কে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছিলেম। আজ ভাবছিলেম এতটা বেশি ঝাঁজের সঙ্গে তা'কে তাড়ালেম কেন? বেগানা কুকুর ব'লে নয়, ওর সর্ব্বাঙ্গে মরণদশা দেখা দিয়েছে ব'লে। প্রাণের সঙ্গীতসভায় ওর অস্তিত্বটা বেসুরো, ওর রুগ্নতা বেয়াদবি। ওর সঙ্গে নিজের তুলনা মনে এল। চারদিকের চলমান প্রাণের ধারার মধ্যে আমার অস্বাস্থ্য একটা স্থাবর পদার্থ—স্রোতের বাধা। সে দাবী করে, শিয়রের কাছে চুপ ক'রে ব'সে থাকো; প্রাণের দাবী, দিকে বিদিকে চ'লে বেড়াও। রোগের বাঁধনে যে নিজে বদ্ধ, আরোগীকে সে বন্দী করতে চায়,—এটা একটা অপরাধ। অতএব জীবলোকের উপর সব দাবী একেবারে পরিত্যাগ করব মনে ক'রে গীতা খুলে বসলেম। প্রায় যখন স্থিতধীঃ অবস্থায় এসে পৌঁচেছি, মনটা রোগ অরোগের দ্বন্দ্ব ছাড়িয়ে গেছে, এমন সময় অনুভব করলেম কে আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে। গীতা থেকে চোখ নামিয়ে দেখি, পিসিমার পোষ্যমণ্ডলীভুক্ত একটি মেয়ে। এপর্য্যন্ত দূরের থেকেই সাধারণভাবেই তা'কে চিনি। বিশেষভাবে তা'র পরিচয় জানিনে—তা'র নাম পর্য্যন্ত আমার অবিদিত। মাথায় ঘোমটা টেনে ধীরে ধীরে সে আমার পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

তখন মনে পড়ল, মাঝে মাঝে সে আমার দরজার বাইরের কোণে ছায়ার মত এসে বারবার ফিরে ফিরে গেছে। বোধ করি সাহস ক'রে ঘরে ঢুকতে পারেনি। আমার অজ্ঞাতসারে আমার মাথাধরার, গায়ে ব্যথার ইতিবৃত্তান্ত সে আড়াল থেকে অনেকটা জেনে গিয়েছে। আজ সে লজ্জাভয় দূর করে ঘরের মধ্যে এসে প্রণাম ক'রে বসল। আমি যে একদিন একজন মেয়েকে অপমান থেকে বাঁচাবার জন্যে দুঃখ স্বীকারের অর্ঘ্য নারীকে দিয়েছি, সে হয়তো বা দেশের সমস্ত মেয়ের হ'য়ে আমার পায়ের কাছে তারি প্রাপ্তিস্বীকার করতে এসেছে। জেল থেকে বেরিয়ে অনেক সভায় অনেক মালা পেয়েছি, কিন্তু আজ ঘরের কোণে এই যে অখ্যাত হাতের মানটুকু পেলেম এ আমার হৃদয়ে এসে বাজল। নিস্ত্রৈগুণ্য হবার উমেদার এই জেলখাটা পুরুষের বহুকালের শুকনো চোখ ভিজে ওঠবার উপক্রম করলে। পূর্ব্বেই বলেছি, সেবায় আমার অভ্যেস নেই। কেউ পা টিপে দিতে এলে ভালোই

লাগত না, ধমকে তাড়িয়ে দিতেম। আজ এই সেবা প্রত্যাখান করবার স্পর্দ্ধা মনেও উদয় হ'ল না।

খুলনা জেলায় পিসিমার আদি শ্বশুরবাড়ি। সেখানকার গ্রামসম্পর্কের দুটি-চারটি মেয়েকে পিসিমা আনিয়ে রেখেছেন। পিসিমার কাজকর্ম্মে পূজা-অর্চনায় তা'রা ছিল তাঁর সহকারিণী। তাঁর নানারকম ক্রিয়াকর্ম্মে তাদের না হ'লে তাঁর চলত না। এ বাড়িতে আর সর্ব্বত্রই অমিয়ার অধিকার ছিল, কেবল পূজোর ঘরে না। অমিয়া তা'র কারণ জানত না, জানবার চেষ্টাও করত না। পিসিমার মনে ছিল, অমিয়া ভালোরকম লেখাপড়া শিখে এমন ঘরে বিয়ে করবে যেখানে আচার-বিচারের বাঁধাবাঁধি নেই, আর দেবদ্বিজ যেখান থেকে খাতির না পেয়ে শূন্যহাতে ফিরে আসেন। এটা আক্ষেপের কথা। কিন্তু এ ছাড়া ওর আর-কোনো গতি হ'তেই পারে না,—বাপের পাতক থেকে মেয়েকে সম্পূর্ণ বাঁচাবে কে? সেই কারণে অমিয়াকে তিনি ঢিলেমির ঢালুতট বেয়ে আধুনিক আচারহীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ হতে বাধা দেননি। ছেলেবেলা থেকে অঙ্কে আর ইংরেজিতে ক্লাসে সে হয়েছে ফার্স্ট্। বছরে বছরে মিশনারি ইস্কুল থেকে ফ্রক প'রে বেণী দুলিয়ে চারটে পাঁচটা ক'রে প্রাইজ নিয়ে এসেছে। যেবারে দৈবাৎ পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয়েছে সে বারে শোবার ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে; প্রায়োপবেশন করতে যায় আর কি। এমনি ক'রে পরীক্ষা-দেবতার কাছে সিদ্ধির মানৎ ক'রে সে তারি সাধনায় দীর্ঘকাল তন্ময় ছিল। অবশেষে অসহযোগের যোগিনীমন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে পরীক্ষা-দেবীর বর্জ্জন সাধনাতেও সে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হ'ল। পাশ গ্রহণেও যেমন, পাস ছেদনেও তেমনি, কিছুতেই সে কারো চেয়ে পিছিয়ে থাকবার মেয়ে নয়। পড়াশুনো ক'রে তা'র যে খ্যাতি, পড়াশুনো ছেড়ে তা'র চেয়ে খ্যাতি অনেক বেশি বেড়ে গেল। আজ যেসব প্রাইজ তা'র হাতের কাছে ফিরছে, তা'রা চলে, তা'রা বলে, তা'রা অশ্রুসলিলে গলে, তা'রা কবিতাও লেখে।

বলা বাহুল্য, পিসিমার পাড়াগেঁয়ে পোষ্য মেয়েগুলির পরে অমিয়ার একটুও শ্রদ্ধা ছিল না। অনাথাসদনে যে-সময়ে টাকার চেয়ে অনাথারই অভাব বেশি, সেই সময়ে এই মেয়েদের সেখানে পাঠাবার জন্যে পিসিমার কাছে অমিয়া অনেক আবেদন করেছে। পিসিমা বলেচেন, "সে কী কথা—এরা তো অনাথা নয়, আমি বেঁচে আছি কী করতে? অনাথ হোক্ সনাথ হোক্ মেয়েরা চায় ঘর, সদনের মধ্যে তাদের ছাপ মেরে বস্তাবন্দী ক'রে রাখা কেন? তোমার যদি এতই দয়া থাকে তোমার ঘর নেই নাকি?"

যা হোক, মেয়েটি যখন মাথা হেঁট ক'রে পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্চে, আমি সঙ্কুচিত অথচ বিগলিতচিত্তে একখানা খবরের কাগজ মুখের সামনে ধ'রে বিজ্ঞাপনের উপর চোখ বুলিয়ে যেতে লাগলেম। এমন সময় হঠাৎ অকালে অমিয়া ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত; নবযুগের উপযোগী ভাইফোঁটার একটা নূতন ব্যাখ্যা সে লিখেছে। সেইটে ইংরেজিতে সে প্রচার করতে চায়। আমার কাছে তা'রই সাহায্য আবশ্যক। এই লেখাটির ওরিজিন্যাল আইডিয়াতে ভক্তদল খুব বিচলিত—এই নিয়ে তা'রা একটা ধূমধাম করবে ব'লে কোমর বেঁধেছে।

ঘরে ঢুকেই সেবানিযুক্ত মেয়েটিকে দেখেই অমিয়ার মুখের ভাব অত্যন্ত শক্ত হ'য়ে উঠল। তা'র দেশ-বিশ্রুত দাদা যদি একটু ইসারামাত্র করত, তা হ'লে তা'র সেবা করবার লোকের কি অভাব ছিল? এত মানুষ থাকতে শেষকালে কি এই—

থাকতে পারলে না। বললে, "দাদা, হরিমতিকে কি তুমি—" প্রশ্নটা শেষ করতে না দিয়ে ফস্ ক'রে ব'লে ফেললেম "পায়ে বড়ো ব্যথা করছিল।"

পুলিস সার্জ্জনের হাতে একটি মেয়ের অপমান বাঁচাতে গিয়ে জেলখানায় গিয়েছিলাম। আজ এক মেয়ের আক্রোশ থেকে আর এক মেয়েকে আচ্ছাদন করবার জন্যে মিথ্যে কথা ব'লে ফেললেম। এবারেও শাস্তি শুরু হ'ল। অমিয়া আমার পায়ের কাছে বসল। হরিমতি তা'কে কুণ্ঠিত মৃদুকণ্ঠে কি-একটা বললে। সে ঈষৎ মুখ বাঁকিয়ে জবাবই করলে না। হরিমতি আস্তে আস্তে উঠে চ'লে গেল। তখন অমিয়া পড়ল আমার পা নিয়ে। বিপদ ঘটল আমার। কেমন ক'রে বলি, দরকার নেই, আমার

ভালোই লাগে না। এতদিন পর্য্যন্ত নিজের পায়ের সম্বন্ধে যে স্বায়ত্তশাসন সম্পূর্ণ বজায় রেখেছিলেম, সে আর টেঁকে না বুঝি!

ধড়ফড় ক'রে উঠে ব'সে বললেম, "অমিয়া, দে তোর লেখাটা, ওটা তর্জ্জমা করে ফেলি"

"এখন থাক না, দাদা। তোমার পা কামড়াচ্চে, একটু টিপে দিই না?"

"না, পা কেন কামড়াবে? হাঁ হাঁ, একটু কামড়াচ্চে বটে। তা দেখ অমি, তোর এই ভাইফোঁটার আইডিয়াটা ভারি চমৎকার। কী ক'রে তোর মাথায় এল, তাই ভাবি। ঐ যে লিখেছিস, "বর্ত্তমান যুগে ভাইয়ের ললাট অতি বিরাট্, সমস্ত বাংলা দেশে বিস্তৃত, কোনো একটিমাত্র ঘরে তা'র স্থান হয় না।" এটা খুব-একটা বড়ো কথা। দে, আমি লিখে ফেলি। With the advent of the present age, Brother's brow, waiting for its auspicious anointment from the sisters of Bengal, has grown immensely beyond the narrowness of domestic privacy, beyond the boundaries of the individual home. একটা আইডিয়ার মতো আইডিয়া পেলে কলম পাগল হ'য়ে ছোটে।"

অমিয়ার পা-টেপার ঝোঁক একেবারে থেমে গেল। মাথাটা ধ'রে ছিল, লিখতে একটুও গা লাগছিল না—তবু এস্পেরিনের বড়ি গিলে ব'সে গেলেম।

পরদিন দুপুর-বেলায় আমার জলধর যখন দিবানিদ্রায় রত, দেউড়িতে দারোয়ানজি তুলসীদাসের রামায়ণ পড়চে, গলির মোড় থেকে ভালুকনাচ-ওয়ালার ডুগডুগি শোনা যাচ্চে, বিশ্রামহারা অমিয়া যখন যুগলক্ষ্মীর কর্ত্তব্যপালনে বেরিয়েছে, এমন সময় দরজার বাইরে নির্জ্জন বারান্দায় একটি ভীরু ছায়া দেখা দিলে। শেষকালে দ্বিধা করতে করতে কখন হঠাৎ একসময়ে সেই মেয়েটি একটা হাতপাখা নিয়ে আমার মাথার কাছে ব'সে বাতাস করতে লাগল। বোঝা গেল, কাল অমিয়ার মুখের ভাবখানা দে'খে পায়ে হাত দিতে আজ আর সাহস হ'ল না। এতক্ষণে নববঙ্গের ভাইফোঁটা-প্রচারের মীটিং বসেছে। অমিয়া ব্যস্ত থাকবে। তাই ভাবছিলুম ভরসা ক'রে ব'লে ফেলি, পায়ে বড়ো ব্যথা করচে। ভাগ্যে বলিনি। —মিথ্যে কথাটা মনের মধ্যে যখন ইতস্ততঃ করচে, ঠিক সেই সময়ে অনাথাসদনের ত্রৈমাসিক রিপোর্ট হাতে অমিয়ার প্রবেশ। হরিমতির পাখা-দোলনের মধ্যে হঠাৎ চমক লাগল;—তা'র হৃৎপিণ্ডের চাঞ্চল্য ও মুখশ্রীর বিবর্ণতা আন্দাজ করা শক্ত হ'ল না। অনাথাসদনের এই সেক্রেটারির ভয়ে তা'র পাখার গতি খুব মন্থর হ'য়ে এল।

অমিয়া বিছানার একধারে ব'সে খুব শক্তসুরে বললে, "দেখ দাদা, আমাদের দেশে ঘরে ঘরে কত আশ্রয়হারা মেয়ে বড়ো বড়ো পরিবারে প্রতিপালিত হয়ে দিন কাটাচ্চে, অথচ সে সব ধনী ঘরে তাদের প্রয়োজন একটুও জরুরী নয়। গরীব মেয়ে, যারা খেটে খেতে বাধ্য, এরা তাদেরই অন্ন-অর্জ্জনে বাধা দেয় মাত্র। এরা যদি সাধারণের কাজে লাগে—যেমন আমাদের অনাথা-সদনের কাজ—তা হ'লে—"

বুঝলেম আমাকে উপলক্ষ্য ক'রে হরিমতির উপরে বক্তৃতার এই শিলাবৃষ্টি। আমি বললেম, "অর্থাৎ তুমি চলবে নিজের সখ অনুসারে, আর আশ্রয়হীনারা চলবে তোমার হুকুম অনুসারে। তুমি হবে অনাথাসদনের সেক্রেটারি, আর ওরা হবে অনাথাসদনের সেবাকারিণী। তা'র চেয়ে নিজেই লাগো সেবার কাজে, বুঝতে পারবে সেকাজ তোমার অসাধ্য। অনাথাদের অভিভূত করা সহজ, সেবা করা সহজ নয়। দাবী নিজের উপরে করো, অন্যের উপরে কোরো না।"

আমার ক্ষাত্রস্বভাব, মাঝে মাঝে ভু'লে যাই, অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধম্। ফল হ'ল এই যে অমিয়া পিসিমারই সদস্যদের মধ্য থেকে আর-একটি মেয়েকে এনে হাজির করলে,—তা'র নাম প্রসন্ন। তাকে আমার পায়ের কাছে বসিয়ে দিয়ে বললে, দাদার পায়ে ব্যথা করে, তুমি পা টিপে দাও।" সে যথোচিত অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমার পা টিপতে লাগল। এই হতভাগ্য দাদা এখন কোন্ মুখে বলে, যে, তা'র পায়ে কোনোরকম বিকার হয়নি? কেমন করে জানায় যে, এমনতরো টেপাটেপি ক'রে কেবলমাত্র তা'কে অপদস্থ করা হচ্চে। মনে মনে বুঝলেম, রোগশয্যায় রোগীর আর স্থান হবে

না। এর চেয়ে ভালো নববঙ্গের ভাইফোঁটা সমিতির সভাপতি হওয়া। পাখার হাওয়া আস্তে আস্তে থেমে গেল। হরিমতি স্পষ্ট অনুভব করলে অস্ত্রটা তারি উদ্দেশে। এ হচ্চে প্রসন্নকে দিয়ে হরিমতিকে উৎখাত করা। কণ্টকেনৈব কণ্টকম্। একটু পরে পাখাটা মাটিতে রেখে সে উঠে দাঁড়াল। আমার পায়ের কাছে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে আস্তে আস্তে দুই পায়ে হাত বুলিয়ে চলে গেল।

আবার আমাকে গীতা খুলতে হ'ল। তবুও শ্লোকের ফাঁকে ফাঁকে দরজার ফাঁকের দিকে চেয়ে দেখি—কিন্তু সেই একটুখানি ছায়া আর কোথাও দেখা গেল না। তার বদলে প্রসন্ন প্রায়ই আসে, প্রসন্নের দৃষ্টান্ত আরো দুইচারিটি মেয়ে অমিয়ার দেশবিশ্রুত দেশভক্ত দাদার সেবার করবার জন্যে জড়ো হ'ল। অমিয়া এমন ব্যবস্থা ক'রে দিলে, যাতে পালা ক'রে আমার নিত্যসেবা চলে। এদিকে শোনা গেল, হরিমতি একদিন কাউকে কিছু না ব'লে কলকাতা ছেড়ে তা'র পাড়াগাঁয়ের বাড়িতে চ'লে গেছে।

* * *

মাসের বারোই তারিখে সম্পাদক-বন্ধু এসে বললেন—"এ কী ব্যাপার? ঠাট্টা নাকি? এই কি তোমার কঠোর অভিজ্ঞতা?"

আমি হেসে বললেম, 'পূজোর বাজারে চলবে নাকি?'

"একেবারেই না। এটা তো অত্যন্তই হালকা-রকমের জিনিষ।"

সম্পাদকের দোষ নেই। জেলবাসের পর থেকে আমার অশ্রুজল অন্তঃশীলা বইচে। লোকে বাইরে থেকে আমাকে খুব হাল্‌কা-প্রকৃতির লোক মনে করে।

গল্পটা আমাকে ফেরৎ দিয়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে এল অনিল। বললে, "মুখে বলতে পারব না, এই চিঠিটা পড়ুন।"

চিঠিতে অমিয়াকে, তা'র দেবীকে, যুগলক্ষ্মীকে বিবাহ করবার ইচ্ছে জানিয়েছে, একথাও বলেছে, অমিয়ার অসম্মতি নেই।

তখন অমিয়ার জন্মবৃত্তান্ত তা'কে বলতে হ'ল। সহজে বলতেম না, কিন্তু জানতেম, হীনবর্ণের পরে অনিল শ্রদ্ধাপূর্ণ করুণা প্রকাশ ক'রে থাকে। আমি তা'কে বললেম পূর্ব্বপুরুষের কলঙ্ক জন্মের দ্বারাই ক্ষালিত হ'য়ে যায়, এ তো তোমরা অমিয়ার জীবনেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্চ। সে পদ্ম, তা'তে পঙ্কের চিহ্ন নেই।"

নববঙ্গের ভাইফোঁটার সভা তারপরে আর জমল না। ফোঁটা রয়েছে তৈরী, কপাল মেরেছে দৌড়। আর শুনেছি, অনিল কলকাতা ছেড়ে কুমিল্লায় স্বরাজপ্রচারের কী-একটা কাজ নিয়েচে।

অমিয়া কলেজে ভর্ত্তি হবার উদ্যোগে আছে। ইতিমধ্যে পিসিমা তীর্থ থেকে ফি'রে আসার পর শুশ্রূষার সাতপাক বেড়ি থেকে আমার পা-দুটো খালাস পেয়েছে।

২৫ বর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৩২



কৈফিয়ৎ

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (নন্দীশর্ম্মা)

নন্দী বেলগাছে উঠিয়া বিল্বপত্র সংগ্রহ করিতে করিতে দেখিল, আকাশে কি একটা সাঁ সাঁ করিয়া চলিয়াছে। ইতিপূর্ব্বেই কার্ত্তিকের কাছে এয়ারোপ্লেন হইতে বোমাবৃষ্টির কথা শুনিয়াছিল। ভয়ে মাথায় হাত দিয়া, সোজাসুজি এক লাফ দিয়া ভূতলে পতন, কারণ শোনা ছিল Straight line is the shortest distance—পরে ন্যাংচাইতে ন্যাংচাইতে, একটা কয়লা কুড়াইয়া কপালে ৭৪॥ লিখিয়া, গুঁড়ি মারিয়া গোয়ালঘরে প্রবেশ ও দুর্গানাম জপ।

এমন সময় ঢেঁকিসুদ্ধ নারদের অবতরণ ও বিশ্বনাথের মন্দিরে প্রবেশ এবং কিছুক্ষণ পরে বাহির হইয়া অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দিরে গমন।

বিশ্বনাথ নন্দীকে ডাকিয়া বলিলেন—পাজি ব্যাটা মরেচ?

নন্দী। তবে প্রণাম হই, পায়ের ধুলো দিন, মার সঙ্গে আর দেখা হ'ল না। গাঁজার ঝুলি ত্রিশূলের আগায় ঝোলানো আছে, আর কোল্‌কেটা ধুনির ধারে পাবেন। আমি এই সময় পায় পায় এগুই, এখনও চলতে পারচি—

বিশ্বনাথ। কোথায়?

নন্দী। মণিকর্ণিকায়।

বিশ্বনাথ! কেন—

নন্দী। আজ্ঞে—মারা যখন গিছি, এর পর বইবে কে?

বিশ্বনাথ। গাঁজার থলি সাবাড় করেচিস্ বুঝি? মরিচিস কে বললে?

নন্দী। আজ্ঞে এই ত বললেন—

বিশ্বনাথ। ওঃ তাই বল্, বেটা এখুনি নেশা ছুটিয়ে দিছলি। আমায় না মেরে কি আর তুই মরবি? তার জোগাড়ও ত করেচিস—বুড়ো বয়সে নাকি সাহিত্যচর্চ্চায় মন দিয়েচিস্? তাই ত বলি, ছিলিমের নম্বর কমচে কেন। ও রোগটি বড় সোজা নয়, মেয়েটা ঐতে গোল্লায় গেছে, ছত্রিশ জাতের ঘরে ঢুকে রয়েচে, গণশা ব্যাসের মুহুরি হয়ে আমার মাথা হেঁট করিয়েচে, এই কাগজের কসানের দিনে বাংলাদেশ উচ্ছন্ন যেতে বসেচে, আর তুমি বেটা কিনা তার ওপরে সাত্য ক্রপ্ করে ভিড় বাড়াতে গেছ? আজ সাত দিন সাঁপি নেই, হাতে শেষটান মেরে ফোস্কা পড়ে গেল, সে দিকে দৃষ্টি পর্য্যন্ত নেই।

নন্দী। আজ্ঞে, সেদিন যে মোক্ষম টান দিলেন—ছেঁদা হাউয়ের মত কোল্‌কের নীচে পর্য্যন্ত হল্‌কা এসে সাঁপি পর্য্যন্ত পুড়িয়ে দিলে। আপনার ত ন্যাংটা দরবার, বাঘছালে ত আর সাঁপি হবে না। হয়েচে—দেখি এখনো আছে কিনা।

এই বলিয়া নন্দী বাহিরে আসিয়া নারদের ঝুলিটার তলা সাবাড় করিয়া, সাঁপি করতঃ, ভাল করিয়া এক ছিলিম ঘাড়োয়ালী গপ্পা সাজিয়া দেওয়ায়, বিশ্বনাথ প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—"বেটা আমার সঙ্গে সহমরণে যাস, তা না ত মলেও বাঁচবো না। কিন্তু খবরদার—ফের যেন সাহিত্যের দায়িত্ব ঘাড়ে করে মুখ্যুমির খাঁটিত্ব (সতীত্ব) মাটি করিস নি।"

নন্দী বাহিরে আসিয়া দেখে নারদ মা'র বাড়ী হইতে ফিরিয়া ঢেঁকিতে জিন কসিতেছেন. নন্দীকে দেখিয়া বলিলেন—"মা ডেকেছেন, কি জরুরী কাজ আছে, শীগগির যাও!" —এই বলিয়া হুস্ করিয়া ঢেঁকি ছাড়িয়া দিলেন, ঝোলা হইতে মালা, গোপীচন্দন প্রভৃতি ঝুপঝাপ পড়িতে লাগিল, তিনি টেরও পাইলেন না। নন্দী হাসিতে হাসিতে প্রণাম করিল।

মায়ের মন্দিরে গিয়া প্রণাম করিতেই অন্নপূর্ণা বলিলেন—"তুই নাকি সাহিত্যিক হয়েচিস? লেখাপড়া শিখলি কবে?"

ন। মা—গো সেবা করলে কি না হয়, তোমাদের সংসারে গরু নিয়েই থাকি, সাধুসঙ্গে সবই সম্ভব—তাই কিছু কিছু এসে থাকবে।

অ। কিন্তু এমন নেমকহারাম হলি কি করে?

ন। কই মা, এ সংসারে ত নুনের কারবার নেই। বাবা গাঁজা খেয়েই থাকেন, তুমি রাবড়ী পেঁড়া পরমান্নেই জীবন ধারণ করচো, ষাঁড় আর গরুগুলো ফুল বিল্বপত্র খেয়েই আছে। বিরাটরাজা বাবার গর্ব্বেই বোধ হয় তাঁর গোধনগুলি ঝেড়ে দিয়ে স্বর্গলাভ করেন। ঘাস কিনে খাওয়াতে হলে কুবেরকে আর বেশীদিন চাকরি রাখতে হতো না—এ শহরে ছ'আনায় এক মোট ঘাস। তারা ত আর নন্দী নয় যে সেরেফ কলা খেয়ে জন্মটা কাটাবে। কাজেই মুখ বদলাবার জন্যে হাটে বাজারে দোকানে দিনে ডাকাতি করে বেড়াচ্চে। সেয়ানা কত—কিছুতে হাত দেয় না, কেবল মুখ দেয়। আর একবার যা মুখে নেয়—তার আর চিহ্নমাত্র রাখে না। বামাল পেলে কি রক্ষে ছিল, আদালতে আর অন্য মামলা নিতে হতো না। অনেকে অনেক চেষ্টা করেচে, কিন্তু এরা উদরস্থ করে বামালগুলিকে এমন আকার আর রঙ বদলে বার করে দেয়, বড় বড় বৈজ্ঞানিকে দু'হাতে ঘেঁটেও মালের হদিস পায় না। একেই বলে প্রতিভা। ঘাটে একজন সাধু কয়েকখানা পুঁথি মাথায় দিয়ে ঘুমুচ্ছিল একটি ষাঁড় ধীরে ধীরে এসে সেইগুলো টেনে নিয়ে কণ্ঠস্থ করতে আরম্ভ করলে। গিয়ে দেখি—গীতাখানির কর্ম্মযোগের বেবাক মর্ম্ম তখন উদরস্থ করে পাণিনির কর্ত্তা হয়ে অসমাপিকা ক্রিয়াটি সমাপ্ত করতে ব্যস্ত। 'অব্যয়ের' অপব্যয় ও 'প্রত্যয়ের' ব্যাঘাত অবশ্যম্ভাবী ভেবে, সাধুকে তুলে দিলাম। ষণ্ড মহোদয় মন্থরগতিতে কার্য্যান্তরে চলে গেলেন—শব্দমাত্র হ'ল না, যেন আধুনিক রবার টায়ার দিয়ে খুরগুলি বাঁধানো! সাধু অবশিষ্ট ছিন্নপত্রগুলো সংগ্রহ করে দেখলেন—শুদ্ধিপত্র ও কয়েকটি পারাবর্জ্জিত অমূল্য ঔষধের ও দাদের মলমের বিজ্ঞাপন মাত্র হাতে এলো। আর সব বেকাম হয়ে গেছে। তখন শুদ্ধিপত্রটি ফেলে দিয়ে বাকিগুলি সযত্নে পোঁটলায় পুরলেন। ইত্যবসরে একটি সহানুভূতিশীল জনতা জমে গিয়েছিল। একজন সহধর্ম্মী পণ্ডিত বললেন—"একেই বলে পূর্ব্ব সংস্কার নচেৎ পাণিনিতে এতটা স্পৃহা গোজাতির সম্ভবে না।" জনৈক নৈয়ায়িক প্রমাণের দাবি উপস্থিত করায়, পূর্ব্ববক্তা বললেন—"প্রহ্লাদের বিদ্যাশিক্ষায় হিরণ্যকশিপু ষণ্ডকেই যে আচার্য্য নিযুক্ত করেছিলেন, এ তো আমাদের চতুষ্পাঠীর তরুণী শ্যামা ঝি পর্য্যন্ত জানে।" চোস্ত অলস্টার গায়ে একগাছি ছিপ্‌ছিপে বাবু বললেন—"এর উপর আর কথা চলতে পারে না—আমাদের গৌহাটির মধ্য ইংরাজী ইস্কুলের গোবরধন মাষ্টার যদিও লোকসমাজে মানুষ বলে চলে গিয়েছিলেন—কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি বালকেরা তাঁর মুখ নাক চোখ এবং কণ্ঠস্বরে তাঁতে ষণ্ডেরই সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছিল। যদিও তাঁর শিং ছিল না, কিন্তু অন্তর্নিহিত স্বভাবের তাড়নায়, তর্জ্জনী দুটি সোজা করে বালকদের ঘুঁতানই তাঁর অন্যতম শাসনপ্রণালী ছিল। তদ্ভিন্ন কারও বাগানের বেড়া ভেঙে শাকসব্জী বা ফল অদৃশ্য হলে, তা যে গোবরধন মাষ্টারের কাজ সে বিষয়ে গৌহাটিতে কখনও দ্বিমত শোনা যায় নি। ফলকথা এই, সামান্য সামান্য পূর্ব্বসংস্কারগুলি উত্তরাধিকারস্বত্বে লাভ করে মানুষ যদি এতটা উন্নত হতে পারে এবং আমাদের জ্যোতিষ-শাস্ত্র থেকে latest পি-এম বাগচীর পত্রিকা পর্য্যন্ত যখন মানুষের বৃষরাশি সম্বন্ধে একমত, কেবল তাই নয়, বরং বৃষরাশিস্থ স্ত্রী পুরুষ মাত্রই বিদ্যা-বুদ্ধি ও সৌভাগ্যে উচ্চতর বলে প্রমাণিত—তখন সেই জাতির উন্নতিকল্পে আমাদের কি কোন কর্ত্তব্য নাই? এই সর্ব্ববিষয়িণী সভাসমিতির শিলা-বৃষ্টির দিনে, এই ধোপোন্নতি, হাড়ড়োন্নতির প্রচেষ্টার দিনে, ষণ্ডোন্নতির জন্য কেউ কি একটি অনডান University বা বৃষ-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব পেশ করে বৃষভ-বাহন বিশ্বনাথের আশীষ অর্জ্জন করবেন না? যে জাতির যৎসামান্য গুণলাভ করে আমরা অমানুষ বা অতিমানুষ হয়ে পড়ছি সামান্য চেষ্টায় তারা যে অচিরে ভারতের মুখোজ্জ্বল করতে পারবে কোন্ মূর্খ এ কথার প্রতিবাদ করতে পারে? বারাণসীর ন্যায় বলদবহুল স্থান হতেই এ প্রস্তাব হওয়া সর্ব্বাংশে সমীচীন।"

সকলে সাধু সাধু করে উঠলেন। একজন মারোয়াড়ী সাগ্রহে নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করায় বাবু অতি বিনয়ের সহিত বললেন—বৃষধ্বজ বাগচী, নিবাস গোবরডাঙ্গা, গোরক্ষপুরে বিদ্যা সমাপ্ত করে

গাইবাঁধায় দিনকতক খোঁড়রক্ষকের কাজ করেছিলেন এখন গোকর্ণপুরে মোক্তারী করছেন এবং মোক্তার বলেই কংগ্রেসে বা সাহিত্য সম্মেলনে যেতে পারেন নি, কাশীতেই লেগে পড়েছেন। আগামী বছরে ওকালতী পাস করে সে খেদ মেটাবেন। মারোয়াড়ীটি একটি বিড়ি উপহার দিলেন। বৃষধ্বজ বাবু ধরিয়ে অগ্নিবাণের মত সোজা, শিবালয়ের দিকে চলে গেলেন। সাধুটি আর গীতার দুর্গতি এবং পাণিনির প্রাণান্তজনিত শোকপ্রকাশের অবকাশ মাত্র পেলেন না। বলদ-বিশ্লেষণ তথা বৃষ-মহিমা কীর্ত্তন শুনেই তাঁকে খুশি হতে হ'ল, ইত্যবসরে অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য অপকারী জীবটি সাফ সরে পড়ে অন্যত্র বিদ্যাচর্চ্চার চেষ্টায় মনোনিবেশ করলে।

আরো দেখ—বিনায়ক, বৃহস্পতি, ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, বঙ্কিম এমন কি ব্যারিস্টার প্রভৃতি বাণীর বাছা বাছা পুত্রগুলি বেবাক ব'কারেই আরম্ভ, অতএব বৃষ বা বলদ বা বলীবর্দ্দ কোন প্রকারেই সে দাবি থেকে বঞ্চিত হতে পারে না। চিরকালটা সেই সৎসঙ্গেই কাটছে—এ ছাড়া ত আমার সাহিত্যিক হবার অন্য কোন দাবি দেখি না।

অ। কি রে নন্দী তুই এখনো বকে যাচ্ছিস? আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। তুই যে মোক্তারের চেয়েও বক্তার হলি! তোর সাহিত্যিক হবার মতি গজিয়েছে দেখে খুশি হয়েছি, পাপটা বেশী দিন বাড়তে পারে না, বোঝাটাও কম হবে—ভাষার, ভাবের আর ভারতের বেশী অনিষ্ট করবার সময় কুলুবে না। সে যা হোক, তুই কিন্তু বড় বেইমান ছেলে—শুনলুম তুই নাকি একখানা বই লিখে একা তোর বাবাকেই সেখানা উৎসর্গ করেছিস? সেই নিয়ে নারদ আমাকে খুব লজ্জা দিয়ে গেল, সে এখুনি গিয়ে গঙ্গার কাছে, শচীর কাছে আমার মুখ হেঁট করবে—

ন। মা, আমার তো কোন পুরুষে কেউ কখন বই লেখেনি, আমিই গ্রহদোষে স্বকৃতভঙ্গ হয়ে পড়েছি। উৎসর্গপত্রটাই যে ওর প্রধান 'আর্ট' সেটা বুঝতে পারিনি। পুরুষ দেবতাদের কাছে উৎসর্গ করতে হয়, আর মেয়ে-দেবতাদের কাছে উচ্ছুগ্‌গু করতে হয়, তাই মা, আমার খুবই ভরসা ছিল, বইখানা বস্তুতঃ তুমিই পাবে; কারণ আমার এ পিঁজরাপোলের পইটেয় বসে লেখা বইখানি, আমি লোকদেখানো হিসাবে বাবার নামে উৎসর্গ করলেও সমালোচক মহাশয়েরা যে তোমার কাছেই উচ্ছুগ্‌গু করে দেবেন, এ বিশ্বাস আমার সতেরো আনাই ছিল। এখন দেখছি—আমার সমালোচকগুলো পরম বৈষ্ণব—এঁরা পাতা খাওয়ান, কোপ্ মারেন না, আবার শিঙে সিঁদুর দিয়ে ছেড়ে দেন। এমনটা যে হবে তা জানতাম না।

অ। তা যা হোক বাছা—আমার কিন্তু তোর ব্যাপার দেখে বড় দুঃখু হয়েছে—

ন। তোমাদের মা একটুতেই দুঃখু হয়, আর হলেও তা সহ্য হয় না। আমাদের কিন্তু ঐটেই সম্বল, ঐটে আছে বলেই বেঁচে আছি। তা না তো যে কি নিয়ে থাকতুম তা ভাবতে পাই না। তাড়ির মালিস, তাড়ির দাওয়াই, তাড়ির সেবা করতে করতেই দুঃখের লম্বা দিনগুলো ঝাঁ করে কেটে যায়। একবার গালে হাত দে বসেছি কি—দেড় ঘণ্টা কাবার। এক একটা দীর্ঘনিশ্বাসে ৫।৭ মিনিট ফর্সা করে দি। বাবা বলেন—"বেটা কেবল গাঁজা পোড়াচ্চে!" গাঁজা পোড়াচ্চি, কি দুক্ষু ওড়াচ্চি সেটা মা বাপের একজনও ভাবেন না। এসব হিকমৎ না অভ্যেস থাকলে, যে কিসমৎ নিয়ে ঘর করি, তাতে কি আর একদিন বাঁচোয়া ছিল। এই সেদিন বুকের ওপর দে যে পাহাড়ে পেসন্‌টা গেল, ওটা কি সইতে পারতুম! কই, খোঁজ নিছলে কি মা?

অ। কি রে—কি হয়েছিল আবার?

ন। ঐ যে তোমার বুটে কাণ্ডটা—অন্নের আড়ত—মেঠাইয়ের মৈনাক, পেঁড়ার পিরামিড, প্রণামীর পাহাড়—টাকার ট্যাঁকশাল! কেবল অর্থহীন গরীবদের ক্ষুধাতুর গর্ত্তে প্রবেশ নিষেধ। বিদেশী ফ্যাশানের বিজ্ঞাপনের জোরে—বড়লোক ধরে তুমি ত মা ব্যবসাটা বেশ ফ্যালাও করে অন্নকূটের লিমিটেড কোম্পানী ফেঁদে নিলে, চিত্রকূটের পাটা বাঁদরে নিয়ে বসে আছে, বিলাতী বালকদের মুখের বিস্কুট ব্রাহ্মণেরা কেড়ে নিয়েছেন, গরীবদের কোন এক বিশেষ রোগের মহৌষধি ছিল তাম্রকূট, কপিপাতা শুকনো সিগারেট আর বিড়ি—তারে পাত্তাড়ি গুটোবার পরোয়ানা

দিয়েছে। শেষে আশা ভরসা ছিল অসহায়ের সহায়, নিরুপায়ের উপায়, জীবনমৃতের বন্ধু কালকূট, বাবা সেটুকু চেঁচে-পুঁছে সাবাড় করে বসে আছেন! আর গণেশদাদার ঘটার বে'তে যে ভূটানী গামছাখানা পেয়েছিলুম—সেইখানি চিরকুট নাম ধারণ করে ক্রোড়পত্র হিসাবে শর্ম্মার দোছোট হয়ে এতকাল বিরাজ করছিল; লাভের মধ্যে তোমার অন্নকূটের মহিলা মেলায় স্বাধীন জেনানার মান রাখতে সেখানি খুইয়ে এসেচি।

অ। কেন—কি হয়েছিল?

ন। কেবল ভূতেই বিরাজ মা, মানুষের খোঁজ রাখলে বা বর্ত্তমানে বিরাজ করলে, নারী-নিগ্রহটা দেখে চমকে যেতে। সেদিন দশ-বিশ হাজার সালঙ্কারা রাজকন্যে বন্যের মত অন্নকূটের কাঠগড়ায়, হাজার হাজার পুরুষের পাশাপাশি, ঘেঁষাঘেঁষি, ঠাসাঠাসির ঘূর্ণিপাকে পোড়ে, লজ্জা, মান সম্ভ্রম খুইয়ে তোমার পোষ্যপুত্রদের কৃপায় কি লাঞ্ছনাই না ভোগ করেছিল। গয়নায় ত আর লজ্জা নিবারণ হয় না, তখন গরীবের গামছাখানি আর আরও দু'একটি বাবুর চাদর, তাদের রক্ষা করে। মা—নিজের জাত বলেও কি তাদের দিকে একটু চাইতে নেই, পয়সাও খেলে ভরাও ডুবুলে! এই দেখে প্রসাদের পিত্তেস উড়ে গেল, গামছা গচ্চা দিয়েই সরে পড়লুম।

তাই বলছিলুম মা—আমরা যদি দুঃখুর ফর্দ্দ ফাঁদি—তাহলে দুনিয়া ভরাট হয়ে যায়—

অ। তাই ত বাবা—তোর দুঃখু শুনে যে বড় কষ্ট হচ্ছে, আহা তোর গামছাখানিও গেছে! তা আমার ত নিজের কিছু নেই বাবা—এ ঘুনির ভেতর যা এসে পড়ে সেটা সেতো আর সেবায়েতের। কেউ একখানা খাট দিলে, তার ছারপোকাটি পর্য্যন্ত ভাগ করে নেয়। এ যা দেখচিস—এ তো আমার যাত্রার সাজ, থিয়েটারের মা সেজে বসে আছি। আজ যদি দেশে নিরাকারের উপাসনা জারি হয়, তা হলে আমাকে গভীর রাত্রে নগ্নবেশে গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে হবে। তবে একেবারে যে কিছুই আমি পাই না তা বললে বেইমানী হয়—ঘড়া, ঘটি, গেলাস, অনন্ত, বালা এসব ফাঁপা জিনিস এলে তাদের ফাঁপটা আমারই থাকে, তখন ঐ ফাঁকটা আমিই পাই, নিরেটের মধ্যে তুমি আর তোমার বাবা ছাড়া আমার বলতে ত কিছু দেখি না। তা এক কাজ কর... মধ্যে আমার সব বড় বড় লক্ষপতি ভক্ত আছে, তাদের ঘরেই আমার প্রগাঢ় পসার-প্রতিপত্তি; কিন্তু তারা লাভ না খতিয়ে কাজ করে না, দু'পাঁচ হাজার পাবার অকাট্য আশা থাকলে দু'পাঁচ টাকা বার করতেও পারে। কিন্তু এখন সব ইংরিজী পড়েচে, স্বপ্নে কি বিশ্বাস করবে?

ন। কেন মা, এইত সব স্বপ্নাদ্য মাদুলী, ঔষধ বেশ চলচে, বিশ্বাস না করলে কি লোকে কেনে—

অ। সে কোন্ জাত কেনেরে পাগল! সে দরিদ্র ব্রাহ্মণ জাতই কেনে আর সরল স্বভাবের মূর্খ পাড়াগেঁয়েরাই কেনে। আমার ঐ সব ভক্ত জাতেরাই ত ঐ স্বপ্নগুলো পায়। যা হোক, আমি আমার এক ভক্তকে স্বপ্নে কিছু কবুল করাচ্চি, তুই তার কাছে যা দেখি, বোধ হয় গামছার বদলে শালও পেতে পারিস।

ন। তোমায় অত কষ্ট করতে হবে না মা, বড়লোকের কাছে গরীবরা চিরকালই ওটা না চেয়েই পায়। ওটা আমার কোন পুরুষে অভ্যেস নেই—সহ্যও হবে না। এইবার নারদ এলে তার নামাবলী থেকে খানিকটে পাচার করে নেব, তা হলেই আমার চলে যাবে।

অ। আ যা করিস তা করিস, কিন্তু অমন কাজটি করিস নি, শেষে যেন মার্কামারা মহাপুরুষ সাজিস নি। ওটা এখন দেখছি মেয়েরাও শুরু করেচে।

ন। তবে মা, আমার কিছুই কাজ নেই, আমি বেশ আছি, তোমাকে আর ভাবতে হবে না। এখন আমাকে কেন ডেকেচ তা বল; বাবার দু'ছিলিমের ওক্তো উখড়ে গেল, দেরি হয়ে যাচ্চে—

অ। ঐ দেরি করবার উপায়ই ত আমি খুঁজচি। তোর সাহিত্যচর্চ্চার কথা শুনে আমি বড় খুশি হয়েচি; শুনেছি এ নেশা ধরলে পরিবারও পর হয়ে যায়। আর কিছুতে জ্ঞান থাকে না। জ্ঞান যে ছিল যদিও এমন বদনাম তোর কখনও শুনিনি; তবে তোর বাবাকে সময়মত গাঁজা খাওয়ানোয়

কখন ভুল হতে দেখি নি, ঐটুকু ফরসা হয়ে গেলে—কতকটা ভরসা হয়। কোন দিন কি দম আটকে গে—আমার মাথাটা খাবে।

ন। তুমি মিছে ভয় করচ মা, বাবা ত মৃত্যুঞ্জয়—

অ। তা ত জানি—তাই এত চিন্তা; এখন বয়েস হয়েচে—যদি পথ আটকে গে, না ইদিক না উদিক হয়ে কাট হয়ে থাকেন, সে কি বিভ্রাট্ বল দিকি! তার চেয়ে যে—

ন। ওঃ ব্বাবা,—উঃ সে কি বিটকেল ব্যাপার। ফ্যালাও দায়, ঘরে রাখাও দায়। ও অবস্থায় শাস্ত্রেও কোন ব্যবস্থা নেই, না আছে মন্ত্র না আছে শ্রাদ্ধ—

অ। বল্ দিকি বাবা—তুই ত এখন পণ্ডিত হয়েছিস, সবই জানিস বুঝিস। তাই বলছিলুম—তুই সাহিত্যচর্চ্চা বজায় রাখলে, ব্যাধিটা ক্রমে কমে আসবে, তোর আর ঘন ঘন যোগান দেবার সময় হবে না।

ন। কিন্তু মা—আমার যা কিঞ্চিৎ ছিল তা ত ফুরিয়ে ফেলেচি।

অ। সে কথা আমি শুনচি না; গঙ্গা যে গাল কাত করে হাসবে, শচী মুখ টিপে টিপে ঠোকর মারবে, সে আমার বড় লাগবে, তোকে একটা কিছু লিখে আমার নামে উৎসর্গ করতেই হবে। তাতে তোর বাপ-মা দু'জনেরই উপকার আছে।

ন। তোমার ত উপকার আছে, ঐ সঙ্গে আমারও ত দেনদার হওয়া আছে। কাগজের দর এখন অন্নের পাঁচ গুণ, তার উপর ছাপাই আছে। আর হাল ফ্যাশানের মলাটের হাটে আমার মত মাতব্বরকে চাট খেয়েই ফিরে আসতে হয়।

অ। সে জন্যে ভাবিস নি।

ন। তোমার ত মা—স্বপ্নই পুঁজি।

অ। তুই তখন দেখিস্ না।

ন। সেটা আমাকেই যেন দিয়ে বসো না।

অ। তুই আমাকে বিশ্বাস করেই দেখ্ না—

নন্দী ভাবিল—এ প্রমাণের যুগে বিশ্বাসের কথা যে শিক্ষিত সমাজে উপহাসের কথা, আমার সেকেলে মা'র তা খেয়ালই নেই। কিন্তু আর কথা চলিল না, নন্দীকে নীরবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া, মনে মনে নারদের মুণ্ডপাত করিতে করিতে চলিয়া আসিতে হইল।

বর্ষ. আষাঢ় ১৩৫৭



খালাস

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বড়দিনের ছুটী হইয়াছে, নগেন্দ্রবাবু কলিকাতায় শ্বশুরালয়ে আসিয়াছেন।

নগেন্দ্রবাবু একজন পূর্ব্ববঙ্গের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি সম্প্রতি ফরিদসিংহ জেলার সদরে বদলি হইয়াছেন। পূর্ব্ব স্থান হইতে বদলি হইবার সময় স্বীয় স্ত্রী-পুত্রকে কলিকাতায় রাখিয়া যান; বড়দিনের ছুটীতে তাঁহাদিগকে লইতে আসিয়াছেন।

এবার কলিকাতায় বড় ধূম। জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন। শিল্পপ্রদর্শনী তো পূর্ব্বাবধিই খুলিয়াছে।

নগেন্দ্রবাবুর শ্বশুরালয় ভবানীপুরে। তাঁহার শ্বশুরমহাশয় পেনসনপ্রাপ্ত সবজজ। তাঁহার তিনটী শ্যালক আছেন। একজন হাইকোর্টের উকিল। একজন গভর্ণমেণ্ট আপিসে কেরাণীগিরি করেন। অপরটি তাদৃশ কিছু করেন না—সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করিয়া বেড়ান।

নগেন্দ্রবাবুর বয়ঃক্রম সাতাইশ বৎসর। এই পাঁচ বৎসর ডেপুটী হইয়াছেন। ইনি এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছিলেন, বিদ্যা বুদ্ধি যথেষ্টই আছে, সেইজন্য ইঁহার শালী-শালাজগণ ইঁহাকে নিঃসঙ্কোচে 'ঘটীরাম' বলিয়া ডাকেন। মূর্খ ডেপুটীর নামই দীনবন্ধু "ঘটিরাম" রাখিয়াছিলেন। খোঁড়াকে খোঁড়া, কানাকে কানা বলিলেই তাহাদের রাগের বা দুঃখের কারণ হয়। পদ্মচক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তি তাহা পরিহাস বলিয়াই গণ্য করে। নগেন্দ্রবাবুও ঘটীরাম সম্ভাষিত হইলে রাগ করিতেন না।

কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্ব্বদিন। ডেপুটিবাবু চা পান করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার ছোট শ্যালক ও শ্যালিকাগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া গল্প করিতেছে।

গিরীন্দ্রনাথ বলিল—"ফরিদসিংহে এখন আর কোন হাঙ্গামা আছে না কি?"

"হাঙ্গামা হুজুৎ এখন আর কিছু নেই।"

ইন্দুমতী বলিল—"স্বদেশী কেমন চলছে?"

"মন্দ চলচে না। তবে ফরিদসিংহ যাবার আগে কাগজে যে রকমটা পড়তাম তেমন ত কৈ দেখি নে।"

সত্যেন্দ্র বলিল—"তা-তো হবারই কথা। বরাবর সমান তেজটা থাকে না। এই কলকাতাতেই প্রথমে যে রকম দেখেছিলাম—"

ডেপুটি বাবু বলিলেন—"তোমাদের কলকাতার চেয়ে ফরিদসিংহে স্বদেশী ঢের বেশী জোরে চলছে। প্রকাশ্যভাবে সেখানে একখানি বিলিতি কাপড় কেনে কার সাধ্য! এক এক লাঠি কাঁধে ছেলেরা রাস্তায় পাহারা দিয়ে বেড়াচ্চে।"

ছোট শ্যালক বলিল—"জাতীয় বিদ্যালয়ের ছেলেরা?"

"অধিকাংশই তাই। অন্য ইস্কুলের ছেলেরাও আছে।"

"মাষ্টারেরা কিছুই বলে না?"

"হাল ছেড়ে দিয়েছে।"

"পুলিস?"

"পুলিসকে তারা থোড়াই কেয়ার করে। বৈকালে বাজারে বেড়াতে বেড়াতে দেখেছি, পুলিস ঘুরছে আর ছেলেরা বলচে—'এজি এজি সিপাহী, দেখো হাম পিকেট করতা হায়'—আর পিকেটিং করছে।"

ইহা শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিলেন। সত্যেন্দ্র বলিল—"আচ্ছা নগেন্দ্রবাবু, আপনি ফরিদসিংহে গিয়ে এবার খোকাকে জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি ক'রে দেবেন?"

নগেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন—"আরে সর্ব্বনাশ। চাকরী যাবে।"

'চাকরী না গেলে আপনি দিতেন?"

"নিশ্চয়ই। তার আর কথা আছে?"

গিরীন্দ্র বলিল—"এমন চাকরী করেন কেন?"

"খাব কি?"

"কেন আপনার ত ল লেকচার কমপ্লিট রয়েছে। ওকালতিটা শেষ করে দিব্যি বড়দাদার সঙ্গে হাইকোর্টে বেরুতে আরম্ভ করুন।"

"আর কি বুড়ো বয়সে এগজামিন পাশ করা পোষায় ভাই?"

ইন্দুমতী বলিল—'ফিরিঙ্গীর চাকরী ছাড়বেন না তাই বলুন। আচ্ছা আপনি বলুন ত আপনি স্বদেশীর স্বপক্ষে না বিপক্ষে?"

"স্বপক্ষে। এই দেখ না পঞ্চাশ টাকার দেশী কাপড়-চোপড় কিনে এনেছি নিয়ে যাব বলে।"

"কেন, সেখানে দেশী কাপড় পাওয়া যায় না নাকি?"

সত্যেন্দ্র হাসিয়া বলিল—"বুঝতে পারিস্ নে ইন্দু, সেখানে কিন্‌লে পাছে সাহেবরা জানতে পারে, এই ভয়ে এখান থেকে কিনে নিয়ে যাচ্ছেন।"

নগেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন—"তাতেই বা ক্ষতি কি। লুকিয়ে কর্ম্ম করাতে কি কোন হানি আছে?"

"তা নেই। তবে প্রকাশ্যে যেন পাপ করবেন না।"

এই সময় বাহিরে সমবেতকণ্ঠে সঙ্গীতধ্বনি শুনা গেল। সকলে বলিল—"ঐ মাতৃপূজক সমিতি কংগ্রেসের জন্যে ভিক্ষা ক'রতে এসেচে।"

সকলে বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন প্রায় পঞ্চাশ জন শিশু ও বালক, মাথায় পীতবর্ণ পাগড়ী, কেহ বা খোল বাজাইতেছে, কেহ বা পঞ্চম বাজাইতেছে, কাহারও হস্তে বন্দে মাতরম্ অঙ্কিত, একজনের হস্তে একটি বৃহৎ থালা, তাহাতে অনেক টাকা রহিয়াছে, সকলে সমস্বরে গান করিতেছে—

কে কোথা আছিস জনম ভূমির
ভকত সন্তান,
মায়ের পূজা হবে, আয় নিয়ে আয়
কে কি করিবি দান।
কার আছে সোনা, কার আছে রূপা,
অঞ্জলি ভরিয়া আন,
ও ভাই, এমন সুদিন কবে আর পাবি,
দিয়ে নে ভরিয়ে প্রাণ।
যার বেশী নাই দিক সে কিঞ্চিৎ,
ছেড়ে লাজ অপমান।
যার কিছু নাই, সে দিক কেবল
ব্যথিত হৃদয় খান।।

বাটীর সকলেই কেহ টাকা, কেহ আধুলি, কেহ সিকি, থালার উপর দিতে লাগিলেন। নগেন্দ্রবাবু একখানি দশ টাকার নোট থালার উপর রাখিয়া দিলেন।

নোটখানি দেখিয়া খাতা পেন্সিলধারী একজন যুবক আসিয়া বলিল—'মহাশয়ের নাম?"

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন—"নাম দরকার কি?"

"পাঁচ টাকার বেশী হলে নাম লিখে নেওয়ার নিয়ম আছে।"

তবে লিখুন "জনৈক বন্ধু।"

সত্যেন্দ্র বলিল—“ওহে লেখ জনৈক ডেপুটী। ইনি পূর্ব্ববঙ্গের একটি ডেপুটী।”

গিরীন্দ্রবাবু বলিলেন—“না-না। জনৈক বন্ধু বলেই লিখে নাও।”

যুবকগণ তাহাই লিখিয়া লইয়া গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা হইয়াছে। ফরিদসিংহ বাজারের রাস্তায় কতিপয় বিদ্যালয়ের বালক পদচারণা করিয়া বেড়াইতেছিল। দেখিল, একটি সওদাগরের দোকান হইতে এক ব্যক্তি এক টিন বিস্কুট হাতে করিয়া বাহির হইল।

দেখিবামাত্র ছেলেরা তাহার সঙ্গ লইল। একজন বলিল, “ওহে, কি রকম বিস্কুট কিন্‌লে দেখি?”

লোকটি বিস্কুটের বাক্স দেখাইল।

ছেলেরা বলিল—“ছি ছি, এ যে বিলাতী।”

“কাহে বাবু, বিলাতী তো আচ্ছা হ্যায়।”

“তুমি হিন্দু না মুসলমান?”

“মুসলমান।”

একজন ছেলে বলিল—“বিলাতী চিজ্ হারাম হ্যায়।”

লোকটি বলিল—“তোবা, তোবা। ঐসা বাৎ মৎ বলিয়ে বাবু।”

“কত দাম নিলে?”

“দেড় রূপিয়া।”

“অ্যাঁ, দেড় টাকা? এর চেয়ে ভাল, তাজা দেশী বিস্কুটের টিন এক টাকায় পাওয়া যায়”

লোকটা সাহেবের চাপরাশি। তাহার মনিব একজন চা-কর, সম্প্রতি আসাম হইতে আসিয়া ডাকবাঙ্গলায় অবস্থান করিতেছেন। সে ভাবিল, সাহেব ত আমায় বিস্কুটের জন্য দেড় টাকাই দিয়াছে, এক টাকায় যদি ইহার অপেক্ষা ভাল বিস্কুট পাওয়া যায়, আমার আট গণ্ডা পয়সা লাভ। মন্দ কি? তাই জিজ্ঞাসা করিল—“সচ্ বাত বাবু?”

ছেলেরা একটু উৎসাহিত হইয়া বলিল—“হাঁ, সত্য বৈ কি। চল তোমাকে দেশী বিস্কুটের টিন দেখাই। এস, এ টিনটা ফিরিয়ে দেবে এস।”

চারি পাঁচজন বালক সে চাপরাশিকে লইয়া সওদাগরের দোকানে গেল। কিন্তু সওদাগর টিন ফিরিয়া লইতে কিছুতেই রাজী হইল না। সে বলিল—“একে স্বদেশীর জ্বালায় বিলাতী টিন আর বিক্রয় হয় না। মাল পড়িয়া পচিতেছে। একটা যদি বিক্রয় করিয়াছি ত উহা আর কোন ক্রমেই ফিরিয়া লইব না।”

তখন বালকেরা দোকানের বাহিরে আসিয়া নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, তাহারা নিজে ব্যয়ে এক টিন বিস্কুট কিনিয়া দিবে। চাপরাশিকে বলিল—“দেখ, তোমার ও টিন আমাদের দাও। আমরা এক টিন দেশী বিস্কুট তোমাকে কিনিয়া দিতেছি।”

চাপরাশিকে স্বদেশী দোকানে লইয়া গিয়া বালকেরা তাহাকে এক টিন দেশী বিস্কুট কিনিয়া দিল।

চাপরাশি বলিল—“বাবু ইস্কাতো দাম এক রূপিয়া। হামারা বাকী আট আনা পয়সা?”

ছাত্রেরা দোকানে বলিল—“আট আনা পয়সা দিন ত। দেড় টাকাই আমাদের নামে লিখে রাখুন, কাল দিয়ে যাব।” আট আনা লইয়া চাপরাশিকে দিল।

চাপরাশি পয়সাগুলি রাখিয়া বলিল—“বাবু, আচ্ছা বিস্কুট তো?”

“বহুৎ আচ্ছা। খাকে দেখো। আউর কভি বিলাতী বিস্কুট মৎ খাও। হারাম হায়।”

‘তোবা তোবা’ বলিয়া চাপরাশি ডাকবাঙ্গলা অভিমুখে রওনা হইল।

ছেলেরা বলিল—"ভাই এ টিনটাকে 'বন্দেমাতরম' করা যাক এস।" বলিয়া টিন খুলিয়া বিস্কুটগুলা রাজপথে ছড়াইয়া দিল। তখন সকলে 'বন্দেমাতরম' এবং 'বিদেশী বাণিজ্যে কর পদাঘাত' এই গান করিতে করিতে বিস্কুটের উপর নৃত্য করিতে লাগিল। দুই এক মিনিটেই সমস্ত বিস্কুট চূর্ণ হইয়া রাজপথের সেই অংশ শুভ্র করিয়া ফেলিল। একজন খালি টিনটাকে পদাঘাতে তালতোবড়া করিয়া, এক লাথিতে রাস্তার পার্শ্বস্থিত ড্রেনে ফেলিয়া দিল। তখন সকলে আপন আপন গৃহে প্রস্থান করিল। চাপরাশি অল্প দূর হইতে এ সমস্ত ব্যাপারই দেখিল। আসাম হইতে নূতন আসিয়াছিল, কিছুই বুঝিতে পারিল না। পথচারী একজনকে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবুলোগ পাগলা হুয়া না ক্যা?"

সে বলিল—"বন্দেমাতরম হইয়া অবধি লেড়কা লোক কাহাকেও বিলাতী জিনিষ কিনিতে দেয় না।"

"কেয়া বোলতা হায়? বন্দুক মারম?"

"নেই নেই, বন্দেমাতরম্।"

"উ ক্যা হায়?"

"ক্যা জানে ভাই। একঠো গালি হোগা। সাহেব লোগকো দেখনে সে আজকাল লেড়কা লোক ঐ বাৎ বোলতা হায়।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নগদ আট আনা পয়সা লভ্য করিয়া চাপরাশি প্রফুল্লমনে ডাকবাঙ্গলায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। দেখিল সাহেব বারান্দায় পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছেন।

চাপরাশিকে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেঁও এত্ত দেরী কিয়া?" বলিয়া বিস্কুটের টিনটি হাতে করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। "হিন্দু বিস্কুট" দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ সেই টিন চাপরাশির মস্তক লক্ষ্য করিয়া সজোরে ছুঁড়িয়া মারিলেন। চাপরাশি বারান্দার প্রান্তে দাঁড়াইয়াছিল, মার খাইয়া নিম্নে পড়িয়া গেল। টিনের আঘাতে কপাল ফাটিয়া রক্তপাত হইল।

সাহেব পতনে দৃক্‌পাত না করিয়া বলিলেন—"ড্যাম শূয়ার কা বাচ্চা—ইয়া দেশী বিস্কিট কাহে লায়া?"

চাপরাশি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া বারান্দায় আসিল। "হুজুর—হম বিলাতী বিস্কুট পহিলে লিয়া থা। লেকিন—"

"ক্যা হুয়া?"

"লেকিন ইস্কুলকে লেড়কা লোক—চাপরাশি আট আনা পয়সার মায়া ত্যাগ করিয়া বলিয়া যাইতেছিল যে, বালকগণের প্ররোচনায় দেশীয় বিস্কুটই ভাল শুনিয়া তাহাই লইয়াছে। কিন্তু সাহেব অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বাধা দিয়া বলিলেন—"ইস্কুলকে লেড়কা লোক? বন্দেমাতরম্? ছিন্ লিয়া?"

এতক্ষণে চাপরাশিপুঙ্গব অকূল সমুদ্রে কূল পাইল। বলিল—"হাঁ হুজুর, ছিন্ লিয়া।"

"কাহেকো দিয়া?"

"হুজুর, উনলোগ বিশ পঁচাশ আদমি—হাম একেলা, কেয়া করে?"

সাহেব বুঝিলেন, সংবাদপত্রে যাহা পাঠ করিয়া থাকেন, হুবহু তাহাই ঘটিয়াছে। বলিলেন—"ইউ ড্যাম কাউয়ার্ড, পুলিসকো কাহে নেই বোলায়া?"

চাপরাশি বলিল—"হাম পুলিস্ পুলিস্ বোলকে বহুৎ চিল্লায়া হুজুর। লেকিন কোই কনেটিবিল নেহি আয়া। লেড়কা লোক বিস্কুট তোড়কে রাস্তামে ছিটায় দিয়া, আউর 'বন্দুক মারো' না ক্যা বোলকে সব বিস্কুট পায়েরসে চুরচুর কর দিয়া। হাম ক্যা করে। হুজুরকা চা ঠাণ্ডা হো যাতা হ্যায়, হামারা পাশ আপনা এক রূপিয়া থা, তো ঐ একঠো দেশী বকস্ লে লিয়া। এক রূপিয়া সে মে বিলাতী টিন দেতা নেই গরীব পরবর।"

সাহেব বলিলেন—"আচ্ছা, হাম ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকা পাশ আভি যাতা। লেড়কা লোককো হাম জেহেল মে ভেজেগা।" বলিয়া টুপী লইয়া ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে চা-কর সাহেব ক্লব অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট্ সাহেব, জজ সাহেব, পুলিস সাহেব প্রভৃতি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কয়েকজন মেম সাহেবও ছিলেন। জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বিলিয়ার্ড খেলিতেছিলেন। জয়েণ্ট সাহেব, পুলিস সাহেব ও তাহাদের মেমদ্বয় তাস খেলিতেছিলেন। সাহেবরা হুইস্কি পেগ এবং মেম সাহেবরা ভার্মুথ পান করিতেছিলেন।

চা-কর সাহেব নিজ কার্ড ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে পাঠাইয়া দেওয়া মাত্র তাঁহার আহ্বান হইল। তিনি প্রবেশ করিয়াই বলিলেন—"Very Sorry to intrude—" তাহার পর সকল কথা খুলিয়া বলিলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব শুনিয়া আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিলেন। পুলিস সাহেবকে বলিলেন—'I say—this is serious."

পুলিস সাহেব বলিলেন—"আমি এখনই যাইতেছি।" বলিয়া তাসের হাত ডাক্তার সাহেবকে দিয়া বাহির হইলেন। আর্দ্দালিকে বলিলেন—"কোতোয়ালী দারোগাকো আভি ডাকবাংলামে জানে কহো।"

সাহেবদ্বয় তখন ডাকবাঙ্গলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চা-কর বলিলেন—"Tis really very good of you to take much trouble."

পুলিস সাহেব বলিলেন, 'দিন দিন বন্দেমাতরম' অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইহা নিশ্চয়ই জাতীয় বিদ্যালয়ের ছেলেদের কাজ।"

চা-সাহেব বলিলেন—"While we wait for your Daroga, may I offer you a peg?"

"Thanks, I don't mind."

বোতল গেলাস ও সোডা ওয়াটার বাহির হইল। হাভানা চুরুট বাহির হইল। দুই জনে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা, বাঙ্গালীর বেয়াদবী, গভর্ণমেণ্টের শিথিলতা, বিলাতে 'শ্বেতবাবু'দের স্বদেশদ্রোহিতা সম্বন্ধে আলাপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে দারোগা কসিমুল্লা আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

পুলিস সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"দারোগা আজ বাজারমে দাঙ্গা হুয়া জানতা?"

"হাঁ হুজুর, আভি খবর মিলা।"

"ক্যা action লিয়া?"

"হুজুর, ফরিয়াদীকা তল্লাসমে জমাদার মোতায়েন কিয়া।"

"ফরিয়াদী ইহাঁ হ্যায়, ইতালা লিখ লেও।"

"যো হুকুম হুজুর"—বলিয়া দারোগা চাপরাশিকে লইয়া বারান্দায় গেল। আলোকাদি সংগ্রহ করিয়া এজাহার লিখিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, মনিবকে যেমন বলিয়াছিল, চাপরাশি দারোগাকেও সেইরূপ বলিল। লিখিতে লিখিতে দারোগা বলিল—"কোথাও জখম আছে?"

চাপরাশি সাহেবের প্রহারে তাহার কপালে যে জখম হইয়াছিল, তাহাই দেখাইয়া দিল।

চা-কর সাহেব ইহা দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া ভাবিল—"ড্যাম নেটিভগণ এইরূপ মিথ্যাবাদীই বটে।" দারোগা লিখিয়া লইল—"বাদী কপালে জখম ও কাপড়ে রক্তের দাগ দেখাইল।"

এত্তেলা গ্রহণ হইলে—পুলিস সাহেব হুকুম দিলেন—"আজ রাত্রেই যেমন করিয়া পার আসামী গ্রেপ্তার করিতে হইবে। রাত্রে জামিন চাহিলে জামিন দিবে না।" হুকুম দিয়া চা-করকে শুভরাত্রি ইচ্ছা করিয়া পুলিস সাহেব প্রস্থান করিলেন।

দারোগা চা-কর সাহেবকে বলিল—"হুজুর আপনার এই চাপরাশিকে আসামী সনাক্ত করিবার জন্য একটু ছুটী দিতে হইবে।"

"All right, চাপরাশি যাও। দারোগা সাথ আসামী দেখলাও।'

চাপরাশি বলিল—"হুজুর অনেক ছেলে, তাহাতে রাত্রি হইয়াছিল। চিনিতে পারিব কি?"

সাহেব রাগিয়া বলিলেন—শূয়ার, নেহি পচানে সকো, হাম তুমকো ডিস্‌মিস্ করেগা।"

"বহুৎ খুব হুজুর"—বলিয়া চাপরাশি প্রস্থান করিল। দারোগা তাহার সহিত আর কোন অনুসন্ধান না করিয়া একবারে জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে গিয়া উপস্থিত হইল। শিক্ষকেরা তখন কেহ ছিলেন না। ছাত্রেরাও অনেকে অনুপস্থিত ছিল। একটি ঘরে চারি পাঁচটি ছেলে প্রদীপ জ্বালিয়া পাঠ মুখস্থ করিতেছিল, তাহাদেরই মধ্যে তিনজনকে চাপরাশি অম্লানবদনে সনাক্ত করিয়া দিল। দারোগা তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিল। বলা বাহুল্য এই বালকগণের মধ্যে কেহ কিছুই জানিত না। বালকত্রয় বলিল—"দারোগা সাহেব, আমাদের কেন গ্রেপ্তার করিতেছ? আমরা কি করিয়াছি?"

দারোগা বলিল—"কি করিয়াছ তাহা আদালতেই মালুম হইবে।" বলিয়া দারোগা তিনজন কনষ্টেবলের জিম্মায় তাহাদিগকে থানায় পাঠাইয়া দিল।

তাহার পর দারোগা চাপরাশিকে হাসপাতালে লইয়া গিয়া সরকারী ডাক্তারের দ্বারায় তাহার জখম পরীক্ষা করাইয়া সার্টিফিকেট লেখাইয়া লইল। শেষে বলিল—"থানায় চল।"

"কেন?"

"আসামী চিনিবার জন্য।"

"আসামী ত চিনিয়া দিলাম।"

"আরে না না। ছেলেদের ভাল করিয়া চিনিয়া রাখিবে এস। কাল কোন ডেপুটীবাবু আসিলে অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে তাহাদের মিশাইয়া দাঁড় করাইয়া দিবে। তখন তোমায় আসামী চিনিয়া বাহির করিতে হইবে। না পারিলে মোকর্দ্দমা ফাঁসিয়া যাইবে, সমাধান হইবে না। থানায় এস, ভাল করিয়া সেই তিনজনাকে চিনিয়া রাখ।"

"দেরী হইলে সাহেব গোসা হইবে যে।"

"যাও সাহেবের কাছে ছুটী লইয়া আইস।"

চাপরাশি গিয়া সাহেবের কাছে সকল কথা বলিয়া ছুটী চাহিল। সাহেব ছুটী দিলেন এবং মনে মনে বলিলেন—ড্যাম নেটিভ পুলিস, এই রকম dishonestই বটে।"

দারোগা তখন বাজার ও অন্যত্র হইতে আরও তিন চারিজন লোক এবং সওদাগরকে সাক্ষী-স্বরূপ ডাকাইয়া আনিল। পুলিসের শাসনে তাহারা যাহা দেখিয়াছে তাহা এবং যাহা দেখে নাই তাহাও সাক্ষী দিতে স্বীকৃত হইল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত থানায় বসিয়া বালকত্রয়কে চিনিয়াও লইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এই মোকর্দ্দমার বিচারভার পড়িল ডেপুটী নগেন্দ্রবাবুর উপর।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। ডেপুটীবাবু কাছারী হইতে ফিরিয়া জলযোগাদি অন্তে, অন্তঃপুরের বারান্দায় বসিয়া আরাম করিতেছেন।

নগেন্দ্রবাবুর গৃহিণী বিংশতিবর্ষীয়া যুবতী। তাঁহার নাম চারুশীলা। চারুশীলা আসিয়া পতির পার্শ্বে উপবেশন করিলেন; বলিলেন—"আজ মনটা এমন ভার ভার দেখছি কেন?"

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "না—এমন কিছু নয়।"

গৃহিণী কিন্তু শুনিলেন না। পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। শেষে ডেপুটীবাবু বলিলেন—"ছেলেদের মামলাটা, এত লোক থাকতে আমার ঘাড়েই চাপিয়েছে।"

চারুশীলা বলিলেন—"তোমার কাছে হবে? সে ত ভালই হ'ল। আমার বরং ভাবনা ছিল।"

"কি ভাবনা?"

"যে কার কাছে বা মোকর্দ্দমাটা পড়ে, হয়ত সাহেবদের খুসী করবার জন্যে অবিচার করে ছেলে তিনটেকে জেলেই পাঠাবে। তোমার কাছে হ'ল, আমি নিশ্চিন্ত হলাম।"

তাঁহার স্বাধীনচিত্ততায় স্ত্রীর এই সরল বিশ্বাসে ডেপুটীবাবু মনে মনে হাসিলেন। বলিলেন—"যদি প্রমাণ হয়, তা হলে ত ছেলেদের সাজা দিতে হবে। আমি ত আর অবিচার করে তাদের খালাস দিতে পারব না।"

চারুশীলা বলিলেন—"ছি! অবিচার কেন করবে। যদি বাস্তবিক প্রমাণ হয়,—ওরা আমার আপনার ছেলে হলেও আমি খালাস দিতে বল্‌তাম না। কিন্তু আমি যে রকম শুনলাম, ছেলেদের ত কিছু দোষ নেই।"

"কোথায় শুনলে?"

"এই সেদিন মুন্সেফবাবুর বাড়ীতে বউভাতে নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। সেখানে অনেকে বল্লেন যে ছেলেরা চাপরাশিকে রাজি করিয়ে তার কাছ থেকে বিলিতি বিস্কুটের টিন কিনে নিয়েচে; নিয়ে ভেঙ্গেচে। কেড়েও নেয়নি, মারেও নি। তাছাড়া যে তিনজন ছেলেকে পুলিস ধরেছে তারা মোটে সেখানে ছিলও না, কিছুই জানে না।'

ডেপুটীবাবু একটু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"এ সকল প্রমাণ হয় তবে না।"

"খুব প্রমাণ হবে। কত লোকে দেখেছে, কত লোক জানে।"

"আর যদি প্রমাণ না-ই হয়, তবে না হয় কিছু জরিমানা করে ছেড়ে দিও। আহা ছেলেমানুষ, না বুঝে যদি একটা অন্যায় কাজ করেই থাকে, তবে কি তাদের জেলে দেবে, যেমন অন্য কয়েক জায়গায় হয়েছে?"

কিন্তু ডেপুটীবাবুর মনের বিষণ্নতা দূর হইল না। এই সময় আর্দ্দালি আসিয়া একখানি পত্র দিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব লিখিয়াছেন কল্য প্রাতে ৮টার সময় ডেপুটীবাবু যেন গিয়া সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

পরদিন যথাসময়ে পোষাক পরিয়া নগেন্দ্রবাবু সাহেব ভবনে উপস্থিত হইলেন। আরও কয়েকজন ব্যক্তি দর্শনার্থী হইয়া বাহিরে বারান্দায় একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। নগেন্দ্রবাবু কার্ড পাঠাইয়া দিলেন। এক মিনিট পরে চাপরাশি আসিয়া তাঁহাকে অফিস কক্ষে লইয়া গিয়া বসাইল ও বলিল—"সাহেব ছোট হাজরী খাইতেছেন, এখনই আসিবেন।"

সাহেব আসিয়া করমর্দ্দন করিয়া নগেন্দ্রবাবুকে বসাইলেন, বলিলেন—"এখন টাউনের অবস্থা কিরূপ?"

"এখন স্বাভাবিক অবস্থাই ত দেখা যায়।"

"স্বদেশীওয়ালাদের মধ্যে বিশেষ কোনও উত্তেজনা নাই?"

"কৈ তেমন ত কিছু দেখি না।"

"This Swadeshi is a dammed rot;—নগেন্দ্রবাবু আপনি স্বদেশী সম্বন্ধে কি মনে করেন?"

"যথার্থ স্বদেশী—অর্থাৎ দেশের শিল্পোন্নতির যথার্থ চেষ্টা, সে খুব ভাল। তাহার প্রতি আমাদের সকলেরই সহানুভূতি আছে। কিন্তু এই হাঙ্গা,—কাপড় পোড়ান, এ সব কি?"

নগেন্দ্রবাবু অপরাধীদের মত বলিলেন—"ওগুলো ভাল নয়।"

"By the way—সেই বিস্কিটের মোকর্দ্দমাটা আপনার ফাইলে আছে না?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"উঃ—ছেলেদের কি স্পর্দ্ধা! গরীব চাপরাশিকে মারিয়া কপাল ফাটাইয়া দিয়াছে। বিস্কিটগুলা রাস্তায় ছড়াইয়া তাহার উপর পৈশাচিক নৃত্য করিয়াছে। এসব ছেলে এখন যদি কঠিন শিক্ষাপ্রাপ্ত না হয় তবে বড় হইলে ইহারা চোর ডাকাত হইয়া উঠিবে। ইহাদের বিশেষ শিক্ষা হওয়া আবশ্যক।"

নগেন্দ্রবাবু মেঝের কার্পেটের উপর দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া নীরব রহিলেন।

সাহেব বলিলেন—"নগেন্দ্রবাবু, ফরিদসিং কিরূপ স্থান মনে হইতেছে? আমি ত দেখিতেছি এখানে সমস্তই বড় দুর্ম্মূল্য।"

কথোপকথনের বিষয় পরিবর্ত্তনে নগেন্দ্রবাবু খুসী হইয়া বলিলেন—"হাঁ মহাশয়, সব জিনিষই এখানে বড় দুর্ম্মূল্য। দুধ চারি আনা করিয়া সের।"

"আমি যখন ভাগলপুরে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলাম, সেখানে টাকায় ছয়টা করিয়া বড় বড় মুর্গী পাওয়া যাইত। এখানে এক টাকায় আড়াইটা তিনটার বেশি পাওয়া যায় না। সেখানে আট টাকায় বাবুর্চ্চি, বেয়ারা প্রভৃতি পাইতাম। এখানে পনেরো টাকা দিতে হয়।"

"হাঁ সাহেব। চাকর-বাকরও এখানে বড় মহার্ঘ। আমাদের অল্প বেতন, কিছুতেই সঙ্কুলান করতে পারি না।"

"আপনি এখন কোন্ গ্রেডে আছেন?"

"আড়াই শত।"

"কত দিন?"

"প্রায় তিন বৎসর।"

"তি—ন—বৎ—স—র! Shame! Tis a downright shame! আমি আপনার Service Book দেখিয়া তিনশত টাকার গ্রেডে উন্নতির জন্য শীঘ্রই কমিশনার সাহেবকে লিখিব।"

নগেন্দ্রবাবু অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইয়া সাহেবকে ধন্যবাদ দিলেন। ক্রমে সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"Well Nagendra Babu, I won't detain you longer"—বলিয়া স্বীয় হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন।

যাইবার সময় বলিলেন—"স্বদেশী সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ পাইলেই আমাকে আসিয়া জানাইবেন। This Swadeshi must be stamped out at any cost."

বেতনবৃদ্ধির সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়া নগেন্দ্রবাবু বলিলেন—'হাঁ হুজুর। আমার যথা সাধ্য আমি তাহা করিব।"

বাহিরে যাহারা পূর্ব্বাবধি দর্শনার্থী হইয়া বসিয়াছিল, তাহাদের প্রতি গর্ব্বিত দৃষ্টিপাত করিয়া নগেন্দ্রবাবু গাড়ীতে উঠিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ধার্য্য দিনে বালকত্রয়ের বিচার আরম্ভ হইল। যেদিন তাহারা গ্রেপ্তার হয়, তাহার পরদিন কয়েকটি প্রধান উকীল বাবু জামীন লইয়া তাহাদিগকে ছাড়াইয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারাই নিজ অর্থাদি নিজ বহুমূল্য সময় নষ্ট করিয়া মোকর্দ্দমার তদ্বির ও পরিচালন করিতেছেন।

চাপরাশি পূর্ব্ব উক্তিই বজায় রাখিল। জেরায় তাহাকে আদালত উকিল জিজ্ঞাসা করিলেন সাহেব তাহাকে বিস্কুটের টিন ছুঁড়িয়া মারিয়া কপালে রক্তপাত করিয়াছে কি না। সে অস্বীকার করিয়া বলিল, কীল চড় দ্বারায় ছেলেরাই ও জখম উৎপন্ন করিয়াছে।

চা-কর সাহেবও, ড্যাম-নেটিভের পদানুসরণ করিয়া, বিস্কুটের টিন ছুঁড়িয়া মারা সাফ্ অস্বীকার করিলেন।

বাজারের কয়েকজন লোক, পথে বিস্কুট ভাঙ্গা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিল, কিন্তু আসামীকে সনাক্ত করিতে পারিল না। ভাঙ্গা বিস্কুটের টিনটা এবং ধূলিমিশ্রিত বিস্কুটের গুঁড়া কাগজে মুড়িয়া পুলিস কর্ত্তৃক 'এগজিবিট' হইল।

সওদাগর আসামীত্রয়কে সনাক্ত করিয়া বলিল, ইহারা এবং অপর কয়েকজন চাপরাশিসহ বিস্কুটের টিন ফিরাইয়া দিতে আসিয়া ছিল। বাবুরা বাহির হইয়া গেলে, কিঞ্চিৎ পরে দূর হইতে মুহুর্মুহু 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি শুনিয়াছিল। জেরায় বলিল, ইস্কুলের ছেলেরা তাহার দোকানের নিকট

পিকেট করিয়া তাহার অনেক ক্ষতি করিয়াছে বটে, কিন্তু তজ্জন্য ছেলেদের উপর তাহার কোনও রাগ বা শত্রুতা নাই।

হাঁসপাতালের ডাক্তার বলিলেন—"কপালের জখম কোন শাণিত কঠিন বস্তুর দ্বারা হইয়াছে।" জেরায় বলিলেন—"চড় মারিয়া ওরূপ জখম হওয়া অসম্ভব।"

বাদীর সাক্ষী শেষ হইলে সাফাই সাক্ষীর দিন ধার্য্য হইল।

স্বদেশী দোকানের কর্ম্মচারী আসিয়া প্রকৃত ঘটনা বলিল, আর বলিল, যে ছাত্রগণ দোকানে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এখন কেহ নাই।

একজন ডাক্তার বলিলেন, তিনি পথ দিয়া যাইতেছিলেন। চাপরাশি স্বেচ্ছায় বিস্কুটের টিন ছেলেদের দিয়াছে দেখিয়াছেন। দেশী বিস্কুট কিনিবার জন্য ছাত্রদের সঙ্গে সে স্বদেশী দোকানে গিয়াছে তাহাও দেখিয়াছেন। পুলিসের জেরায় ডাক্তারবাবু স্বীকার করিলেন যে স্বদেশী দোকানে তাঁহার দুই শত টাকার শেয়ার আছে এবং তিনি নিজে একজন পাকা স্বদেশী।

ডাকবাঙ্গলার খানসামা আসিয়া সাক্ষ্য দিল। চা-কর সাহেব যে চাপরাশিকে টিন ছুঁড়িয়া মারিয়াছেন তাহা সে বলিল। সেই টিন কপালে কাটিয়া জখম হইয়াছে; বাজার হইতে যখন আসে তখন জখম ছিল না। পুলিসের জেরায় খানসামা স্বীকার করিল যে বাবুগণ মাঝে মাঝে তাহার নিকট ভৃত্য পাঠাইয়া মুর্গীর রোষ্ট, কাটলেট প্রভৃতি ফরমাইস দেন। সন্ধ্যার পর একটু গা-ঢাকা হইলে ভৃত্য আসিয়া সে সব খাদ্য লইয়া যায়। তাহাতে মাসে মাসে তাহার কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন হইয়া থাকে।

মোকর্দ্দমা শেষ হইল। হুকুম হইল, সপ্তাহ পরে রায় বাহির হইবে।

ইতিমধ্যে দেখা গেল ডেপুটীবাবু দুই তিন দিন ধড়াচূড়া পরিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সেলাম করিতে গেলেন। লোকে কানাঘুসা করিতে লাগিল।

রায়ের দিনে আদালতগৃহে লোকে লোকারণ্য। বিস্তর ইস্কুলের বালক আসিয়াছে। অন্যান্য লোকও আসিয়াছে।

রায় বাহির হইল। আসামীগণ সকলে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছে। প্রত্যেকের তিনমাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড এবং পঞ্চাশ টাকা করিয়া জরিমানা।

রায় শুনিয়া ছেলের দল বন্দেমাতরম বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। পুলিস অনেক কষ্টে গোল থামাইয়া বালকগণকে আদালত হইতে অপসৃত করিয়া দিল।

আসামী পক্ষের প্রধান উকীল কালীকান্তবাবু রায় চাহিয়া পাঠ করিলেন। বিচারক লিখিয়াছেন, বাদীর সাক্ষীগণের উক্তিতে অনেকস্থলে অনৈক্য দেখা যায় বটে, কিন্তু সে সকল minor deicrepancies—উহাতে বরং এই প্রমাণ হয় যে সাক্ষীরা শিখানো নহে। সত্য বটে কোন কোন সাক্ষী বলিয়াছে হাঙ্গামার সময় পনেরো কুড়িজন ছেলে ছিল। আবার কেহ কেহ বলিয়াছে পঞ্চাশ ষাট জন ছিল, কিন্তু কেহই গণনা করিয়া দেখে নাই অনুমানে ভুল হওয়া আশ্চর্য্য নহে। বাদী বলিয়াছে বালকেরা চড়-চাপড় মারিয়া তাহার কপাল ক্ষত করিয়াছে। কিন্তু ডাক্তার বলিতেছেন কোন কঠিন শাণিত দ্রব্যে ঐ ক্ষত হইয়াছে, চড়-চাপড়ে হইতে পারে না, ইহার উপর আসামীর উকীল বিশেষ জোর দিয়া বলিতেছেন যে ঘটনা মিথ্যা। কিন্তু আমার বিবেচনায় ঐ সময়ে বাদী এত ভীত ও বিমূঢ় হইয়াছিল যে বালকেরা তাহাকে ঠিক কি প্রকারে প্রহার করিয়াছে তাহা স্মরণ রাখা তাহার পক্ষে অসম্ভব। সাফাই সাক্ষীগণের যে সমস্ত কথাই মিথ্যা তাহার কোন সংশয় নাই। সকলেই কথিত স্বদেশীর দল। উকীল বলিয়াছেন ডাকবাঙ্গলার খানসামা নিরপেক্ষ সাক্ষী, উহার কথা মিথ্যা হইতে পারে না। কিন্তু জেরায় বুঝা যাইতেছে খানসামা উকীল বাবুগণের বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তি। সে বারমাসের খরিদ্দারকে চটাইয়া আসাম হইতে আগত সাহেবের পক্ষাবলম্বন করিয়া সত্য বলিতে পারে না। ইত্যাদি।

উকীলবাবু রায়ের নকল বাহির করিয়া জজ সাহেবের নিকট আপিল দায়ের করিয়া জামিনের হুকুম লইলেন।

. . .

এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র বালকগণ ভীষণরবে বন্দেমাতরম ধ্বনি দিয়া উঠিল। কোথা হইতে একখানা গাড়ী আনিয়া তাহাতে বালকত্রয়কে বসাইয়া, ঘোড়া খুলিয়া নিজেরা গাড়ী টানিয়া সহরময় বেড়াইল এবং সমস্বরে গাহিতে লাগিল—

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে—
মোদের বাঁধন টুটবে ততই।...

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সেদিন ডেপুটীবাবু ক্ষুণ্ণ মনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। চোর যেন চুরি করিয়া ফিরিল। খুনী যেন খুন করিয়া আসিয়াছে। ডেপুটীবাবুর চক্ষু অবনত, মুখ কালিমাময়।

গৃহে আসিয়া দেখিলেন, চারুশীলা মুখখানি বিমর্ষ করিয়া চুপ করিয়া বারান্দার কোণে বসিয়া আছেন। ডেপুটিবাবু বুঝিলেন এ বিমর্ষতার কারণ কি।

বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া স্ত্রীর নিকট অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি গো, অমন করে বসে কেন?"

চারুশীলা নিরুত্তর।

"কি হয়েছে?"

"মাথাটা ধরেছে।"

"মাথা ধরেছে? কখন ধরল? এস দেখি রুমালে একটু ওডিকোলন দিয়ে মাথায় বেঁধে দিই। এখনি সেরে যাবে।

চারুশীলা স্বামীর দিকে না চাহিয়া বলিলেন—"থাক্ দরকার নেই।"

ভাবগতিক দেখে নরেন্দ্রবাবু সরিয়া গেলেন।

দাসী তাঁহার চা ও জলখাবার আনিয়া দিল। অন্যদিন গৃহিণী এসময় উপস্থিত থাকিতেন, আজ তিনি অনুপস্থিত। নগেনবাবু জলখাবার খাইতে গেলেন, কিন্তু গলা দিয়া যেন নামিতে চাহে না। বুকের ভিতরটা কে যেন পাথর বোঝাই করিয়া দিয়াছে। জলখাবার ফেলিয়া রাখিয়া কেবল চা-টুকু পান করিলেন।

তাহার পর অনেকক্ষণ ধূমপান করিলেন। শেষে উঠিয়া অপরাধীর মত আবার স্ত্রীর নিকট গেলেন। তিনি তখনও সেইরূপ ভাবেই বসিয়া আছেন।

ধীরে ধীরে বলিলেন—"মাথাটা একটু সারল?"

চারুশীলা সঙ্কেতে জানাইল, সারে নাই।

নগেনবাবু তাহার হাতটি ধরিয়া বলিলেন—"এস এস উঠে এস। আজ একটা ভাল খবর আছে, ব'লব মনে করে কত আমোদ ক'রে এলাম, আর তুমি রাগ করে বসে রইলে।"

স্বামীর আগ্রহাতিশয্যে চারুশীলা উঠিয়া আসিলেন। নগেনবাবু বলিলেন—"আজ সাহেব আমার ৫০্ বেতন বৃদ্ধির জন্যে কমিশনার সাহেবকে অনুরোধ-পত্র লিখেছেন।"

একথা শুনিয়া চারুশীলার চক্ষুযুগল দিয়া প্রবলবেগে অশ্রু বহিল।

নগেনবাবু বলিলেন—"ওকি, চোখের জল ফেল কেন?" বলিয়া একহাতে স্ত্রীর হাতটি ধরিয়া, অন্যহাতে চোখের জল মুছাইতে চেষ্টা করিলেন।

চারুশীলা হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিলেন—"ওগো আজ আমায় মাপ কর। আজ আমার কাছে এস না, কোন কথা বলো না।" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

নগেন্দ্রবাবু বাহিরে বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। আর একবার তামাকের হুকুম করিলেন। ধূমপান করিতে করিতে তাঁহার মানসিক অশান্তি আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। মনে হইল, যেদিন কর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেদিন কি ছিলেন, আর আজ কি হইয়াছেন। আজ চারুশীলা তাঁহাকে

কাছে আসিতে কথা কহিতে বারণ করিয়াছে। আজ তিনি পতিত, কলঙ্কিত। পবিত্র বিচারাসনে বসিয়া, জানিয়া শুনিয়া, আজ তিনি অবিচার করিয়া আসিয়াছেন। আজই কি প্রথম? কিসের জন্য? কেবল দগ্ধোদরের জন্য। বহুবর্ষব্যাপী শিক্ষা সাধনার ফল, ধর্ম্মবুদ্ধি, বিবেক, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা,... শুধু দগ্ধোদরের জন্য ভাসাইয়া দিয়াছেন। ছি! ছি! পূর্ব্বকালে অর্দ্ধশিক্ষিত অশিক্ষিত ডেপুটীরা ঘুষ লইত। তাহাদের মার্জ্জনা ছিল। সুশিক্ষাভিমানী নগেন্দ্রবাবু গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে পদবৃদ্ধিস্বরূপ ঘুষ লইয়া বিচারাসন কলঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার কি মার্জ্জনা আছে?

ডেপুটীবাবু এই সকল কথা মনে মনে চিন্তা করিয়া অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। শেষে অস্থির হইয়া উঠিলেন। চাদর লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। অন্ধকার অন্ধকার পথ খুঁজিয়া সেই পথগুলিতে অনেকক্ষণ বেড়াইলেন।

সারারাত্রি ভাল নিদ্রা হইল না।

পরদিন কাছারী বন্ধ ছিল। প্রভাতে উঠিয়া ভৃত্যকে বলিলেন—"আজ মফস্বল যাইব।" সকালে আহারাদি করিয়া প্রস্তুত হইলেন।

ইহা শুনিয়া চারুশীলা আসিলেন। স্বামীর মুখপানে চাহিয়া তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া সতীর মন করুণায় দ্রবীভূত হইল। কাছে আসিয়া বলিলেন "কবে ফিরবে?"

"কাল সকালেই ফিরব।"

"দেরী কোরো না।"

"কেন দেরী হ'লে তোমার দুঃখ কি?"

স্বামীর এই অভিমানবাক্যে চারুশীলার কোমল হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন—"ওকি—ওকি—শান্ত হও। এখনি কেউ এসে পড়বে।"

কিন্তু চারুশীলার দুঃখ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল।

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন—"তোমার এ দুঃখ আমি আর দেখতে পারি নে। যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন কি করলে তুমি সুখী হও বল।"

চারুশীলা স্বামীবক্ষ হইতে মুখ অপসৃত করিয়া বলিলেন—'আমায় একটি ভিক্ষা দেবে?"

"কি বল।"

"এ চাকরী ছাড়। যে চাকরী বজায় রাখবার জন্যে অধর্ম্ম করতে হয় সে চাকরীতে কাজ কি? আমি তোমার তিনশো টাকা চাইনে। আমি এ ধনদৌলত সোনারূপো চাইনে। তুমি যদি মাস্টারী করেও আমায় মাসে ৫০৲ টাকা এনে দাও, আমি তাইতেই সংসার চালিয়ে নেব।"

একথা শুনিয়া ডেপুটীবাবু এক মুহূর্ত্ত ভাবিলেন। ভাবিয়া বলিলেন—"তাই হবে।"

বাহিরে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ট্রেনের সময় সন্নিকট। ডেপুটীবাবু বলিলেন—"তাই হবে। তুমি কেঁদ না।" বলিয়া পত্নীকে সস্নেহে চুম্বন করিয়া বাহিরে আসিলেন।

* * *

পরদিন প্রভাতে চাপরাশি ডাক লইয়া আসিল। ডেপুটীবাবু তখনও মফস্বল হইতে ফেরেন নাই। চারুশীলা দেখিলেন কয়েকখানি চিঠির সঙ্গে এক বোঝা সংবাদপত্র। এত সংবাদপত্র কোনদিন আসে না। একখানি খুলিয়া দেখিলেন "সন্ধ্যা" পত্রিকা। "ফরিদসিংহে ঘটীরাম-লীলা" নামক একটি প্রবন্ধ রহিয়াছে—তাহার চারিপার্শ্বে লাল কালীর রেখাঙ্কিত। ছাত্রদের মোকর্দ্দমার উল্লেখ করিয়া "সন্ধ্যা" তাহার নিজস্ব অপভাষায় নগেন্দ্রবাবুকে ভয়ঙ্কর গালি দিয়াছে। সমস্ত প্রবন্ধ পাঠ করিবার ধৈর্য্য চারুশীলার রহিল না। অপর একখানি পত্রিকা খুলিয়া দেখিলেন, তাহাও ঐ তারিখের "সন্ধ্যা"—ঐ প্রবন্ধ লাল পেন্সিলদ্বারা রেখাঙ্কিত। এইরূপ গণিয়া দেখিলেন, ভিন্ন ভিন্ন প্যাকেটে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি সেই তারিখের সতেরখানা "সন্ধ্যা" কলিকাতা হইতে সকৌতুকে নগেন্দ্রবাবুর নামে পাঠাইয়া দিয়াছে।

পাছে স্বামীর দৃষ্টিপথে পতিত হয়, এই আশঙ্কায় সমস্ত "সন্ধ্যা"গুলি চারুশীলা লইয়া জ্বলন্ত চুলীমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন।

বেলা ৯টার সময় ডেপুটীবাবু ফিরিলেন এবং তাড়াতাড়ি আহারাদি করিয়া কাছারী গেলেন।

চারুশীলা পুত্রকে বলিলেন—"আজ ইস্কুল গেলি নে?

"না আজ যাব না।"

"কেন, ছুটী আছে নাকি?"

"না।"

"তবে?"

'ইস্কুল গেলে ছেলেরা আমায়"—বলিয়া বালক আর বলিতে পারিল না। তাহার চক্ষু দিয়া টস টস করিয়া জল পড়িতে লাগিল। ইতিমধ্যেই পথেঘাটে অন্যান্য বালকেরা তাহাকে অপমান করিয়াছে।

চারুশীলা বুঝিলেন। বলিলেন—"আচ্ছা তবে থাক্। আমাদের একটু কাজ আছে।"

দ্বিপ্রহরে গাড়ী ডাকিয়া পুত্রকে সঙ্গে লইয়া তিনি বাহির হইলেন। কালীকান্তবাবু উকীলের বাড়ী গিয়া তাঁহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

সেদিন সেখানে আরও দুই তিনটি উকীলের স্ত্রী সমবেত হইয়াছিলেন। চারুশীলাকে দেখিয়া অন্যান্য মহিলারা কোন কথা বলিলেন না। মুখভার করিয়া রহিলেন। কালীকান্তবাবুর স্ত্রী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। কিন্তু সে অভ্যর্থনা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত সাদর নহে।

চারুশীলা বসিয়া, অন্যান্য কথার পর ছেলেদের মোকর্দ্দমার কথা তুলিলেন।

একটি মহিলা বলিলেন—"ওটা বড়ই দুঃখের বিষয় হয়েছে।"

কালীকান্তবাবুর স্ত্রী বলিলেন—"আপিলে বোধ হয় টিকবে না। ওঁরা বলছিলেন।"

একজন বলিলেন—"তবে যদি স্বদেশী মোকর্দ্দমা বলে সাহেবেরা অবিচার করে।"

চারুশীলা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপিলের দিন কবে হয়েছে জানেন?"

"কবে ঠিক বলতে পারি নে। শীঘ্রই হবে।"

"ছেলেরা কলকাতা থেকে কোন ভাল ব্যারিষ্টার নিয়ে আসুক।"

"সে অনেক টাকা খরচ। ছেলেরা কোথায় পাবে? এঁরাই ক'রবেন এখন।"

চারুশীলা অবনত মস্তকে বলিল—"টাকা আমি দেব।"

এ কথায় সকলে একটু বিস্মিত হইলেন। কালীকান্তবাবুর স্ত্রী বলিলেন—"আপনি দেবেন কেন?"

চারুশীলার মনে যাহা ছিল, মুখে তাহা ব্যক্ত করিলেন না। করিলে তাহা পতিনিন্দার মত শুনায়। কিন্তু তাঁহার চক্ষু দুইটি জলপূর্ণ হইয়া আসিল। বলিলেন—"আপনারা এই মোকর্দ্দমায় ছেলেদের সাহায্যের জন্য কত টাকা ব্যয়, কত ত্যাগ স্বীকার করছেন। আমি কি এর জন্য কিছু ত্যাগ স্বীকার করার অধিকারী নই? আমি এই এক জোড়া বালা এক জোড়া অনন্ত এনেছি। এ বেচলে হাজার টাকার উপর হবে। এই টাকা দিয়ে কলকাতা থেকে ছেলেদের আপিলের দিন কোন ভাল ব্যারিষ্টার আনাবার ব্যবস্থা করুন। আমার মনে একটু শান্তি যাতে পাই, তার উপায় করুন।" ইহা বলিতে বলিতে চারুশীলার গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিল।

কালীকান্তবাবুর স্ত্রী গহনাগুলি লইলেন। বলিলেন—"আচ্ছা, উনি বাড়ী আসুন, ওঁকে বলবো"

এই ঘটনায় অন্যান্য মহিলাগণের মনও দ্রবীভূত হইল। তাঁহারা তখন চারুশীলার সঙ্গে হাসিমুখে আলাপ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে চারুশীলা বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বভবনে ফিরিয়া আসিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ছেলেদের আপিল শেষ হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে বড় ব্যারিষ্টার আনা হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। জজ সাহেব আপিল ডিসমিস করিলেন। ছেলেরা জেলে গিয়াছে। হাইকোর্টে মোশানের বন্দোবস্ত হইতেছে।

এদিকে নগেন্দ্রবাবুর স্ত্রী যে গহনা বিক্রয় করিয়া ছেলেদের সাহায্য করিয়াছেন, তাহা সহরময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কানেও একথা উঠিয়াছে। শুনিয়া অবধি তিনি নগেন্দ্রবাবুর উপর বড় কঠোর আচরণ করিতেছেন। ইতিমধ্যে একদিন কার্য্যোপলক্ষে সাহেব খাসকামরায় নগেন্দ্রবাবুকে তলব করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করেন নাই। আমলার মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া এবার সাহেবকে কাজ বুঝাইয়া দিতে হইয়াছিল।

কয়েকদিন পরে নগেন্দ্রবাবুর একটা রায়, জজ সাহেব উল্টাইয়া দিলেন। এই উপলক্ষে নগেন্দ্রবাবুর দোষ না থাকিলেও, কার্য্যে ভুল বলিয়া সাহেব আমলাগণের সমক্ষেই নগেন্দ্রবাবুকে অভদ্রভাবে কটূক্তি করিলেন।

নগেন্দ্রবাবু কর্ম্মত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুতই হইয়াছেন। কলিকাতায় গিয়া আইন পরীক্ষা দিয়া, ওকালতী করিবেন, মাঝে মাঝে স্বামী স্ত্রীতে এ বিষয়ে জল্পনা কল্পনা হইয়া থাকে। মাসখানেকের মধ্যেই কর্ম্ম ত্যাগ করিবেন ইহাই আপাততঃ স্থির হইয়াছে।

জজ সাহেব কর্ত্তৃক ছেলেদের আপিল ডিসমিসের দুই এক দিন পর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাকে কুঠিতে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। পূর্ব্বে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মাঝে মাঝে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সেলাম করিতে যাইতেন, ইদানীং আর যান নাই।

সেদিন প্রভাতে পোষাক পরিয়া, গাড়ী করিয়া, নগেন্দ্রবাবু সাহেবের কুঠিতে উপস্থিত হইলেন। নিজ কার্ড পাঠাইয়া দিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের রীতি ছিল, হাকিম কিম্বা বড় জমিদার আসিলে আপিস কামরায় তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করাইতেন। চুনাপুঁটীদের ডাক আসিলে তাহাদিগকে বারান্দার বেঞ্চে বসিয়া থাকিতে হইত। তার চাপরাশি ফিরিয়া তাঁহাকে আপিস কামরায় না লইয়া গিয়া সেই বেঞ্চিতে বসিতে অনুরোধ করিল।

সেখানে কয়েকজন চুনাপুঁটী পূর্ব্ব হইতেই বসিয়াছিল। তাহাদের সঙ্গে একাসনে না বসিয়া নগেন্দ্রবাবু পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বুঝিলেন, সাহেব তাঁহাকে ইচ্ছা করিয়া অপমান করিতেছে।

কিয়ৎক্ষণ বেড়াইবার পর ভিতর হইতে একজন চাপরাশি বাহির হইয়া বলিল—"বাবু, জুতাকা আওয়াজ মত করিয়ে, সাহেব গোস্‌সা হোতা হায়। বেঞ্চপর বৈঠিয়ে।"

দন্তে ওষ্ঠ দংশন করিয়া নগেন্দ্রবাবু বেঞ্চে উপবেশন করিলেন। চুনাপুঁটীগণ তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে একটু সরিয়া বসিল।

ইতিমধ্যে আরও দুইজন সেলামার্থী আসিয়া বেঞ্চে বসিল। নগেন্দ্রবাবু রুমাল বাহির করিয়া মুহুর্ম্মুহু কপালের ঘাম মুছিতে লাগিলেন। তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল।

ক্রমে সাহেব ছোট হাজরী সারিয়া আপিস কামরায় আসিলেন। প্রথম ডাকিয়া পাঠাইলেন নগেন্দ্রবাবুকে নয়। যাঁহারা নগেন্দ্রবাবুর পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের একে একে ডাক পড়িল। যাঁহারা পরে আসিয়াছিলেন তাঁহাদেরও ডাক পড়িল। শেষে নগেন্দ্রবাবু একা বেঞ্চে অধিষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

এই সময়টা তাঁহার যে কিভাবে কাটিয়াছিল তাহা তিনিই জানেন এবং তাঁহার ইষ্টদেবতাই জানেন। এই সময়ের মধ্যে নগেন্দ্রবাবু দন্তে দন্তে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, কর্ম্মত্যাগ করিবেন এক মাস পরে নহে অদ্যই।

অবশেষে নগেন্দ্রবাবুর ডাক পড়িল। তিনি ক্রোধে মাতালের মত টলিতে টলিতে কামরায় প্রবেশ করিলেন।

অন্য দিনের মত সাহেব আজ উঠিয়া দাঁড়াইয়া করমর্দ্দন করিলেন না।

"গুড মর্ণিং সার।"

"গুড মর্ণিং বাবু।"

বাবু!—অন্যদিন হইলে সাহেব বলিতেন—নগেন্দ্রবাবু। সাহেব বিলক্ষণ জানিতেন, শুধু "বাবু" বলিয়া সম্ভাষিত হইলে পদস্থ বাঙালী অপমান বোধ করে।

নগেন্দ্রবাবু ইহাও লক্ষ্য করিলেন। কিন্তু তাঁহার মন কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইয়াছিল, এই আঘাতে কোনও নূতন বেদনা অনুভব করিলেন না।

সাহেব চুরুট মুখে করিয়া বলিলেন—"সহরে এখন স্বদেশীর অবস্থা কিরূপ?"

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন—"ভালই।"

"শুনিয়া সুখী হইলাম। ইহা বিস্কিট মোকর্দ্দমার কঠিন শাস্তির সুফল।"

নগেন্দ্রবাবু মনে মনে একটু হাসিয়া বলিলেন—"আপনি বোধ হয় আমার কথাটা ভুল বুঝিয়াছেন। ভালই—অর্থাৎ স্বদেশীর পক্ষে ভালই, গভর্ণমেণ্টের পক্ষে নয়। সেই মোকর্দ্দমার পর হইতে লোকের স্বদেশী পণ দৃঢ়তর হইয়াছে।"

সাহেব যেন একটু আশ্চর্য্য হইয়া নগেন্দ্রবাবুর মুখপানে চাহিলেন। বলিলেন—"তবে ভালই কেন বলিলেন? আপনিও একজন স্বদেশী নাকি?"

নগেন্দ্রবাবু গর্ব্বিতভাবে বলিলেন—"স্বদেশী আন্দোলন হইয়া অবধি এক পয়সার বিলাতী জিনিষ আমার গৃহে আসে নাই।"

সাহেবের মুখ ও কর্ণ ক্রোধে লাল হইয়া উঠিল। তিনি জানিতেন, অনেক সরকারী কর্মচারী লুকাইয়া লুকাইয়া স্বদেশীয়তা রক্ষা করে, কিন্তু সাহেবের সাক্ষাতে এমন করিয়া দর্প তো কেহ করে না। তিনি বুঝিলেন এই ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া, নগেন্দ্রবাবু সদ্যপ্রাপ্ত অপমানের প্রতিশোধ লইতেছেন। সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে এই নীতির অনুসরণ করিয়া সাহেব বলিলেন—'হাঁ আমি শুনিয়াছি, বাঙ্গালী মহিলারা স্বদেশী বিষয়ে পুরুষগণের অপেক্ষাও দৃঢ়তর।" বলিয়া সাহেব একটু হাসির ভাণ করিলেন। একটু পরেই বলিলেন—By the way—শুনিলাম নাকি আপনার স্ত্রী ঐ মোকর্দ্দমার আপিলে হাজার টাকা দিয়া ছেলেদের সাহায্য করিয়াছেন? ইহা সত্য না কি?"

"সত্য। হাইকোর্টে মোশেন হইবে, তাহার খরচও বহন করিতে আমার স্ত্রী প্রস্তুত হইয়াছেন।"

সাহেব নিজ স্থৈর্য্য আর রক্ষা করিতে পারিলেন না। আবার তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। বলিলেন—"এটা কি গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচারণ নয়?"

নগেন্দ্রবাবু অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"সম্ভবতঃ, কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার স্ত্রী গভর্ণমেণ্টের চাকর নহেন।"

ক্রোধের সহিত বিস্ময় ভাবও সাহেবের মনে আধিপত্য করিতে লাগিল। তিনি এতদিন চাকরী করিতেছেন, এ প্রকার তেজের কথা তো বাঙালীর মুখে অদ্যাবধি শুনেন নাই। সাহেব বুঝিলেন, আজ নগেন্দ্রবাবু তাঁহাকে অপমান করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আচ্ছা তাহার অমোঘ ঔষধও সাহেবের কাছে আছে। তাহা প্রয়োগ করিলে চাকরিগতপ্রাণ বাঙ্গালী এখনি নতজানু হইয়া সাহেবের ক্ষমা ভিক্ষা করিবে।

এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন—"যে কথা যাউক। আজ যে জন্য আপনাকে ডাকিয়াছি তাহা বলি। সম্প্রতি আপনার কাজকর্ম্মে অত্যন্ত শিথিলতা দেখা যাইতেছে। আপনি যদি এখনই সাবধান না হন, তবে আপনার বেতনবৃদ্ধির অনুরোধ-পত্র আমাকে ত প্রত্যাহার করিতে হইবেই, হয়ত বা আপনাকে ডিগ্রেড্ করিতেও বাধ্য হইতে পারি।"

এই কথা বলিয়া সাহেব নগেন্দ্রবাবুর মুখের পানে সাগ্রহে দৃষ্টিপাত করিলেন—ঔষধ ধরিল

কি না। বাবুর মুখ নিশ্চয়ই ভয়ে বিবর্ণ হইয়া যাইবে এবং তিনি ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য আকুল হইয়া উঠিবেন।

কিন্তু তাহা হইল না। নগেন্দ্রবাবুর মুখে, অল্পে অল্পে, একটু ঘৃণামিশ্রিত হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—"তাহা স্বচ্ছন্দে আপনি করিতে পারেন। কারণ উহাতে আমার কোনই ক্ষতি হইবে না।"

সাহেব অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"তাহার অর্থ কি?"

"আমি স্থির করিয়াছি, কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিব। অদ্যই আপিসে আমার কর্ম্মত্যাগপত্র আপনার হস্তগত হইবে। আমাকে মাসান্তে যাহাতে বিদায় দিতে পারেন, বিলম্ব না হয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক সে চেষ্টা করিলে অত্যন্ত বাধিত হইব।"

শুনিয়া সাহেব যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। বাঙ্গালী হইয়া, এত বড় চাকরীটা এক কথায় ছাড়িতে উদ্যত হইয়াছে।

নগেন্দ্রবাবু পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন। দেখিয়া দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—"আমি আর আপনার সময় নষ্ট করিব না। গুড মর্ণিং।"

সাহেব অন্যমনস্ক হইয়া, দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—"গুড মর্ণিং।"

*　　　　*　　　　*

এক মাস কাটিল। আজ নগেন্দ্রবাবুর চাকরীর শেষ দিন। বৈকাল বেলা দেখা গেল, তাঁহার এজলাসের বাহিরে বহুসংখ্যক স্কুলের বালক সমবেত হইয়াছে। অনেকের হাতে বন্দেমাতরম্ ধ্বজা।

তিনি বাহির হইবামাত্র বালকেরা তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিল। একখানা ফিটন গাড়ী আনিয়াছিল। তাহাতে নগেন্দ্রবাবুকে আরোহণ করিতে অনুরোধ করিল।

কিন্তু নগেন্দ্রবাবু সম্মত হইলেন না।

বালকেরা জিদ করিতে লাগিল। বলিল ঘোড়া খুলিয়া দিয়া তাঁহাকে তাঁহারা টানিয়া লইয়া যাইবে।

পথ দিয়া একজন গ্রাম্য ও একজন নাগরিক নিরক্ষর লোক যাইতেছিল। ব্যাপারখানা বুঝিতে না পারিয়া গ্রাম্য ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল—"একি, বাহে? বাবুর সাদি না কি?"

নাগরিক ব্যক্তি উত্তর করিল—"আমার পছন্দ হয়। বাবুর সাজা হয়েছিল, আজ খালাস হইছে।"

এদিকে, বালকেরা নগেন্দ্রবাবুকে টানিবার জন্য বিস্তর পীড়াপীড়ি করিল, কিন্তু নগেন্দ্রবাবু কিছুতেই রাজি হইলেন না; অন্য দিনের মতই পদব্রজে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দুই মাস ব্যাপী বিচ্ছেদের পরে আজ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পুনর্ম্মিলন সংঘটিত হইল।

১ম বর্ষ, ভাদ্র ১৩০৮



দেওয়ানার কবর

সরোজকুমারী দেবী

সে আজ অনেক দিনের কথা। প্রয়াগে সূর্য্যকুণ্ডের কাছে এখন যেখানে "ইঙ্গবঙ্গ বিদ্যালয়" স্থাপিত হয়েছে তারি কাছে খুব বড় একটা মাঠ ছিল। সেই মাঠের পাশ দিয়ে একটা সরু নির্জ্জন রাস্তা অনেকদূর পর্য্যন্ত চলে গেছে, সেই রাস্তার ওপরে একটি শিবমন্দির। যে যা কামনা করে' তাঁর কাছে যায় প্রায় তা বিফল হয় না. এই ধারণায় সেখানকার অধিবাসীরা তাঁকে "কামনেশ্বর মহাদেব" বলে। ছোটবেলার যে দাই আমাকে ও আমার ছোট ভাইবোনদের মানুষ করেছিল, তাকে আমরা "মোতিয়ার মা" বলে ডাকতাম। এই স্থানটির ওপরে তার বিশেষ ভক্তি থাকায় সে প্রায়ই বিকালে বেড়াতে যাবার সময় আমাদেব এইখানে নিয়ে আসত। তখন একটি সুন্দর কবর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। সেখানে আর কোন বিশেষ দর্শনীয় বস্তু না থাকায় এই কবরটির ওপর আমাদের বড় স্নেহ হয়েছিল। সন্ধ্যার পর মন্দিরে দেবতার আরতি হয়ে গেলে আমরা বাড়ী ফিরতাম, তখন দেখতাম কে সেই সমাধিটি ফুলে ও মালায় সাজিয়ে একটি আলো জ্বালিয়ে রেখে গেছে। সেই নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় জনমানবহীন প্রান্তবে সেই একমাত্র আলোকটি দেখে আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ে কি এক কৌতূহলমিশ্রিত ভয়ের ভাব জেগে উঠত। কার এ সমাধি? কে প্রতিদিন সন্ধ্যায় এই সমাধিতে আলো জ্বালিয়ে কার স্মৃতি জাগিয়ে রাখে?

তার পরে কতদিন কেটে গেছে। ছোটবেলার সব খেলাধুলা সাঙ্গ করে নূতন সংসারে প্রবেশ করেছি। নূতনের আনন্দে নূতন উত্তেজনায় ছেলেবেলাকার সব ছোটখাট স্মৃতি কোথায় ডুবে গেছে। বহুদিন পরে আর-একবার এলাহাবাদে গিয়েছিলাম। সেই সময় একদিন হঠাৎ সেই বাল্যের চির-পরিচিত প্রিয়স্থানগুলি দেখবার জন্যে মনে আকুল আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। বুড়ী দাই "মোতিয়ার মা" তখনও আমাদের বাড়ী আসত। তার সঙ্গে অনেক জায়গায় বেড়িয়ে যেদিন "কামনেশ্বর মহাদেব" দেখতে গেলাম, তখন পথে বহুদিনের পর আবার সেই সমাধিটি দেখে মনে অনেক কথা জেগে উঠল। দাইকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম সেটি কোনো দেওয়ানার কবর। সে দিন রাত্রে বাড়ী ফিরে এসে মোতিয়ার মার কাছে সেই দেওয়ানার কাহিনী সবিস্তারে শুনলাম।

(২)

নাম ছিল তার আমীর। সঙ্গতিপন্ন ঘরেই তার জন্ম হয়েছিল, কিন্তু সে-বংশের খ্যাতি রাখবার মত প্রকৃতি তার মোটেই ছিল না। জ্ঞানের উদয় অবধি সে কোনও বিশেষ নিয়ম বা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারত না। যে সময় তার অন্য ভাইরা লেখাপড়া করত, সে তখন মুক্ত আকাশের নীচে মাঠে মাঠে নদীর ধারে খোলা প্রাণে গান গেয়ে বেড়াতে ভালবাসত। যে তাকে দেখত সেই তাকে ভালবাসত। এই সুন্দর আত্মভোলা ছেলেটিকে দেখে পল্লীনারীরা তাকে কত আদর যত্ন করত, তাদের ঘবে সামান্য যা খাবার থাকত তাকে খাইয়ে তারা কত আনন্দ পেত; সেও খুব আনন্দে তাদের আতিথ্য স্বীকাব করে তাদের সঙ্গে কত গল্প করত, গান শোনাত। ক্রমে যত তার বয়স বাড়তে লাগল ততই এইরূপ খেয়াল বাড়তে লাগল। মা বাপে বিস্তর চেষ্টা করেও তাকে লেখাপড়ায় মনোযোগ দেওয়াতে বা কোনও কাজকর্ম্মে নিযুক্ত করতে পারলেন না।

একদিন বিকালে আমীর একলা যমুনাতীবে বসেছিল। অস্তগামী সূর্য্যের লাল আভা আকাশে প্রতিফলিত হয়ে বিবিধ বিচিত্র বর্ণের মেঘের সৃষ্টি করেছে। সান্ধ্যসমীরণ সেবন করতে কত লোক নদীতীরে বেড়াতে এসেছে ও পরস্পর গল্প করতে করতে হেসে উঠেছে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা চারদিকে ছুটোছুটি করে খেলা করে বেড়াচ্ছে। আমীর নিস্তব্ধ হয়ে বসে এই সব দেখছিল। হঠাৎ পিছন থেকে কে এসে তার দুচোখ টিপে ধরলে। আমীর বল্লে, "আর কে, নিশ্চয়ই জামীর। ছাড়,

চোখ খোল।" জামীর তখন উচ্চহাস্য করে তাকে সজোরে এক ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে, আমীরও দ্রুত উঠে তার গলা টিপে দু-চারিটি ঘুসি উপহার দিলে। পরে দুজনেই হাসতে হাসতে এক জায়গায় বসে পড়ল। জামীর বল্লে "তোমায় যে এতক্ষণ কত খুঁজেছি তা বলতে পারি নে, কোন দিকে না পেয়ে শেষ এদিকে এলাম।" আমীর এর উত্তরে কিছু না বলে হাসতে লাগল।

তখন তার বন্ধু রাগ করে বল্লে "হাসলে যে বড়? কি দরকার সেটা একবার জিজ্ঞাসা করা হ'ল না?"

আমীর বল্লে "ওর আর কি জিজ্ঞাসা করব, তোমাকে ত আমার জানা আছে।"

জামীর বল্লে "না না তা নয়। সত্য সত্য আজ তোমার বাবা আমায় সকালে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি বল্লেন তোমার বয়স হল, লেখাপড়াও ভাল করে শিখলে না, কাজকর্ম্মেও মন দেবে না, খালি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে আর যত অনাসৃষ্টি রকম পাগলামি করবে। তা এরকম আর কতদিন চলবে?

আমীর বল্লে "আমি কি পাগল? আর পাগলামি বা আমি কি করে থাকি? ওসব কথা তো পুরোনো হয়ে গেছে, ওর আর কি উত্তর আছে? আমি ত কতদিন বলেছি যে ওসবে আমার মন বসে না তাই আমি কিছু করতে পাল্লুম না। বাবাকে বোলো দাদারা ত সব মানুষ হয়েছে, তা হলেই হল। আমার দ্বারা যা হবে না তার জন্যে কেন তিনি কষ্ট পান?"

জামীর বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বললে "তুমি ত জলের মত এ কথা বলে দিলে, তাঁর প্রাণ কি তা বোঝে? তুমি যখন শিশু, তোমার মা মারা গেলেন, তখন থেকে কত যত্নে কত স্নেহে তিনি তোমায় মানুষ করেছেন তা ত জান? তুমি এমন করে সংসারে উদাসীন হয়ে ঘুরে বেড়াও এতে তাঁর কষ্ট হয়। আজ তিনি আমায় ডেকে বল্লেন 'দেখ জামীর, আমার এই মাথা-পাগলা ছেলেটিকে তুমি বুঝিয়ে সংসারী করবার চেষ্টা কর, ও ত তোমার কথা শোনে, তোমাকে খুব ভালবাসে, হয়ত তোমার কথা রাখতে পারে। তাকে বোলো যে তাকে তো খেটে খেতে হবে না; কাজকর্ম্ম না করে, না করবে। তবে বিবাহ করুক সংসারী হোক এইটেই আমার শেষ জীবনের একমাত্র কামনা!' আর আমিও বলি বয়স ত তোমার কম হল না, এমন করে আর কতদিন কাটাবে? বিবাহ করে সংসারী হও, বাপকে সুখী কর। আমরা সকলেই তা হলে খুসী হব।"

আমীর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে গম্ভীরভাবে বল্লে, "বিয়ে করতে আমার কোন আপত্তি নেই, তবে এখন নয়, যখন সে ইচ্ছা হবে আর যাকে আমার প্রাণ চায় তাকে যখন পাব তখন বিয়ের কথা বিবেচনা করা যাবে।"

জামীর তখন বিস্মিত হয়ে বল্লে "প্রাণ আবার তোমার কাকে চায়? একথা কই এতদিন ত শুনিনি।"

আমীর তখন গুনগুন করে গাইলে—

"মন ভায়ো রে সামালিয়া, মন ভায়োরে বাঁকেয়া,
সাঁওলি সূরত মোহিনী মুরত
হাদো বীচো মে সামায়া
হাদো বীচো-মে সামায়া রে বাঁকেয়া।"

তখন জামীর হাসিয়া বলিল, "প্রেমিকবর! এ মোহিনীমুরতখানি কার?

আমীর স্বর উচ্চে তুলিয়া গাহিল—

"জল-মে স্থল-মে তনু-মে মন্-মে
আপয় রে সামায়া রে বাঁকেয়া।"

তখন তার উচ্চমধুর কণ্ঠে আকৃষ্ট হয়ে অনেকে এসে তাকে ঘিরে ফেললে। প্রয়াগের ইতর ভদ্র সব শ্রেণীর লোকেরই সে বিশেষ পরিচিত ছিল। সকলের সঙ্গে সে নির্বিবাদে মিশতে পারত, আর তার সদানন্দ প্রকৃতির গুণে সে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার স্নেহের পাত্র ছিল, সবাই এসে তাকে

ঘিরে দাঁড়াল। একজন বল্লে, "আজ এই যমুনাতীরেই আমাদের সান্ধ্যসমিতি বসুক। এইখানেই আজ আমরা আমীরের গান শুনব।"

তখন আমীরের সব চেষ্টা বিফল হল। সে তার বক্তব্যবিষয় বলবার আর সময় পেলে না, বন্ধুরা এক-একজনে আমীরকে এক-এক রকম গান গাইতে অনুরোধ করতে লাগল। সঙ্গীতপ্রিয় আমীর বন্ধুদের এরূপ অনুরোধ ও আব্দারে অভ্যস্ত ছিল, সে সকলের কথা মেনে নিয়ে করুণ-প্রণয়ের গান গাইতে লাগল। গানের ছত্রে ছত্রে কি আকুলতা কি নিরাশা কি অতৃপ্তি বাজতে লাগল, সকলের অন্তর যেন কোন অজ্ঞাত দুঃখে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ল, যেন সে স্থানের আকাশে বাতাসে জলে স্থলে সর্ব্বত্র সেই নিরাশ প্রণয়ের করুণ বিলাপ ভাসতে লাগল! গান শেষ হয়ে গেলেও কতক্ষণ পর্য্যন্ত সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মত নীরবে বসে রইল। আমীরের মধুর কণ্ঠে সেই-সব মধুরতর প্রেমের গান তার সহচরবৃন্দের তরুণ হৃদয়ে নানা ভাবের তরঙ্গ তুলে শত আশা আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তারা তাকে আর বেশীক্ষণ থামবার অবসর দিচ্ছিল না। একটার পর একটা গান হতে হতে ক্রমশ যে রাত্রি গভীর হয়ে যাচ্ছিল তা তাদের চৈতন্য ছিল না। অবশেষে যখন গীর্জ্জার ঘড়িতে বারটার ঘণ্টা বেজে উঠল তখন সেদিনকার মত তাদের নৈশসভা ভঙ্গ হল।

দিনের পর দিন কাটতে লাগল। আমীরের কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। সহরের প্রত্যেক পল্লীতেই সে পরিচিত ছিল। দিনের অধিকাংশ সময়ই সে প্রায় বন্ধুবান্ধবদের গৃহেই কাটিয়ে দিত। সন্ধ্যার পর কখন যমুনাতটে, কখন বা লক্ষ্যহীন ভাবে পথে পথে ঘুরে তার প্রিয় গানগুলি উচ্চকণ্ঠে গেয়ে বেড়াত। দ্বিপ্রহর রাতে যখন প্রত্যেক পল্লীর নরনারী ঘুমিয়ে পড়েছে, নিস্তব্ধ পথ জ্যোৎস্নার সুধাধারায় প্লাবিত, পথে ঘাটে জনমানবের চিহ্নমাত্রও নেই, তখন হয়ত সেই নিঝুম রাতে সে একা পথে পথে মনের আনন্দে গেয়ে বেড়াচ্ছে "মন ভায়োরে বাঁকেয়া।" কতদিন তার কত বন্ধুবান্ধবেরা অর্দ্ধেক রাতে তন্দ্রাঘোরে তার গান শুনতে পেত

"জলমে স্থলমে তনমে মনমে আপয় রে সামায়া।"

কাকে সে খুঁজে বেড়ায়? কার মোহিনী প্রতিমা তাকে পাগল করে তুলেছিল, যার সুন্দররূপ সে অনুক্ষণ জলে, স্থলে, শূন্যে, নিজের অন্তরে চারিদিকে বিরাজিত দেখতে পেত? কে সে তার মানসী সুন্দরী?

আবার কতদিন হয়ত বর্ষার সময় যখন ভয়ানক বৃষ্টি পড়ছে, আকাশে গভীর কালো মেঘের স্তর চারিদিক অন্ধকারে ছেয়ে ফেলেছে, থেকে থেকে সেই অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর কড়কড় করে মেঘ ডাকছে, সেই মেঘ ঝড় বৃষ্টির মধ্যে এক-একবার তার স্বর বাতাসে ভেসে আসত—

"বর্ষণ লাগি বুঁদনওয়া।"

কেউ যদি তার কণ্ঠস্বর শুনে জানালা খুলে দেখত তা হলে হয়ত দেখতে পেত সে পথের পাশে কোন গাছতলায় বা কারও বাড়ীর নীচে একটু স্থান করে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর মনের আনন্দে গান করছে। হয়ত তখন তার মাথা বেয়ে গা বেয়ে জল পড়ছে, কোঁকড়া কোঁকড়া কালো চুলগুলি কালো কালো সাপের ছানার মত থেকে থেকে ফণা তুলে নেচে নেচে উঠছে, তার চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ছে, তার সেসবদিকে দৃকপাত নেই। প্রকৃতির এই রুদ্রমূর্ত্তি দেখে তার প্রাণ তখন অপার আনন্দে উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে। তার কোন বন্ধুবান্ধব তাকে সে অবস্থায় দেখতে পেলে টেনে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গিয়ে তার গা মাথা মুছিয়ে দিত। প্রকৃতিদেবীর এই প্রিয় সন্তানটিকে সকলেই পাগল বলে স্নেহ যত্ন করত। সে যেন একটি শিশু, সকলের আদর যেন তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যেই উৎসুক হয়ে থাকে।

(৩)

কার্ত্তিক মাস, এ মাসটিতে যমুনাতীরে বড় জাঁকজমক। মাসভোর যমুনার ঘাটে মেলা বসে। এ মাসে প্রত্যহ যমুনায় স্নান করা মহা পুণ্যের কাজ, তাই স্নানার্থী নরনারীর ভীড় হয় খুবই। স্নাতদের

কপালে, বুকে, বাহুতে, সর্ব্বাঙ্গে নানা চিত্রবিচিত্র চন্দনের ছাপ এঁকে দেবার জন্যে ঘাটিয়াল ঠাকুররা মহা আড়ম্বরে স্নানের ঘাটে জেঁকে বসেছেন। এ মাসটি তাঁদের বেশ লাভজনক।

স্নানার্থীদের মধ্যে নর অপেক্ষা নারীর সংখ্যাই বেশী। সুন্দরীরা স্নানে নেবে নানারঙ্গে কিছুক্ষণ জলে ডুবে থেকে সিক্ত বস্ত্রে ঘাটে উঠছে, তার পর গা মাথা মুছে শুষ্ক বস্ত্র পরে ঘাটিয়াল ঠাকুরদের কাছে সিঁদুর ও চন্দনে সুশোভিতা হয়ে তাঁদের দক্ষিণাদানে সন্তুষ্ট করে ঘাট থেকে ফিরে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে হাসি গল্পেরও বিশ্রাম নেই। একদল যাচ্ছে, আর-একদল আসছে। জনতার বিরাম নেই। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের চেঁচামেচি, রমণীদের হাস্যকৌতুক, ফেরীওয়ালাদের হাঁকাহাঁকি, আর অসংখ্য ভিক্ষার্থীদের অবিশ্রান্ত কলরবে মেলাস্থল সর্ব্বক্ষণ সরগরম হয়ে আছে।

একদিন যমুনাতীরে মেলা দেখবার জন্যে আমীর ও জামীর দুই বন্ধুতে গিয়েছিল। তারা উভয়ে নানাস্থানে ঘুরে ঘুরে অনেক দৃশ্য দেখে বেড়াচ্ছিল আর আপনারা হাস্য-পরিহাস করছিল। ক্রমশ যখন বেলা বেশী হল তখন তারা স্নানের ঘাট থেকে অনেক দূরে যেয়ে নদীর তীর থেকে সশব্দে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল আর দুজনে মিলে সাঁতার দিয়ে জলের ভিতর লাফালাফি করে জল তোলপাড় করে তুললে। কখনও যদি তাদের গায়ের জল পার্শ্বস্থিত কোন স্ত্রীলোকের গায়ে লাগছিল তখন সে বিরক্ত হয়ে তাদের গালাগালি দিলে তাদের উচ্চহাস্য আরও উচ্চতর হয়ে উঠছিল। প্রায় দুঘণ্টাকাল এই রকমে কাটিয়ে অবশেষে তারা উঠল। আমীর গলা ছেড়ে গান ধরে' মুগ্ধ মেলার জনতা ঠেলে বাড়ী ফিরছিল, হঠাৎ আমীরের উচ্চকণ্ঠের মধুরসঙ্গীত থেমে গেল। সে চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল আর নিস্পন্দভাবে ঘাটের দিকে চেয়ে রইল। জামীর তার এই ভাবান্তরের কারণ না বুঝতে পেরে তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলে যেখানে ঘাটিয়াল ঠাকুররা রমণীদের ললাটে নানাছাঁদে চন্দন-রেখা অঙ্কিত করছেন সেখানে অপূর্ব্ব দৃশ্য! একটি চম্পকবর্ণা গৌরী ষোড়শী স্নান শেষ করে দাঁড়িয়ে আছে আর তার বর্ষীয়সী সঙ্গিনী দুজন তখন পাণ্ডাঠাকুরদের সাহায্যে অলকা তিলকা কাটছে। কিশোরীর নিরুপম সৌন্দর্য্য আমীরের হৃদয়ে অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করে তুলেছিল। তার সেই এলোচুলের রাশ পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে, একখানি আশমানী রং-এর শাড়ী সেই সুগৌর কোমল তনুখানি বেষ্টন করে তার স্বাভাবিক শোভা যেন আরও বাড়িয়ে তুলেছে। সে অন্যমনস্কভাবে যমুনার কালো জলের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আমীর সেই দিকে চেয়ে চেয়ে আর দৃষ্টি ফেরাতে পারলে না। তার মনে কি ভাবের উদয় হচ্ছিল, কি সে দেখছিল তার কিছুই জ্ঞানচৈতন্য ছিল না। শুধু সে মন্ত্রমুগ্ধের মত তার দিকে চেয়ে ছিল, আর তখন তার মনের ভিতর থেকে কে যেন ডেকে ডেকে বলছিল, "তুমি যাকে খুঁজে বেড়াতে সে এই! সে এই! সে এই!" যুগ যুগান্তর পূর্ব্ব হতে তার প্রাণ যাকে চাচ্ছিল আজ এই কিশোরীকে দেখবামাত্রই যেন তার মনে হল এই সেই মানসী সুন্দরী! আজ তার অজ্ঞাতে তার যৌবন জেগে উঠেছে! হৃদয়ের মধ্যে যে প্রেম এতদিন সুপ্তভাবে ছিল আজ কোন্ সোনার কাঠির স্পর্শে তা সহসা জেগে উঠেছে! হৃদয়ের এই অপূর্ব্ব নবভাবের পুলকে স্পন্দনে উত্তেজনায় আমীর তখন বিভোর। জামীর তার বন্ধুর এই নিস্পন্দভাব দেখে তাকে জোর করে টেনে নিয়ে পথের উপর এল। ইতিমধ্যে কিশোরীর সঙ্গিনীদের প্রসাধনক্রিয়া সম্পন্ন হল; তখন তারাও তিনজনে এগিয়ে এল। পথের উপর একখানি সুসজ্জিত গাড়ী অপেক্ষা করছিল, আর দুইজন দারোয়ান গাড়ীর কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। স্ত্রীলোকেরা নিকটে আসায় দ্বারবান সসম্ভ্রমে গাড়ীর দ্বার খুলে দিলে। তারা আরোহণ করলে গাড়ী বিদ্যুৎগতিতে অদৃশ্য হয়ে গেল। জামীর ও আমীর পথের উপর দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখলে। যখন গাড়ী আর দেখা গেল না তখন গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আমীর জামীরের হাত ছাড়িয়ে সেইখানে বসে পড়ল।

জামীর তখন বল্লে "তোমার কি হয়েছে? এমন করছ কেন?" আমীর কিছুই বলতে পারলে না। জামীর তখন ভীত হয়ে তাকে বার বার জিজ্ঞাসা করাতে অবশেষে গেয়ে উঠল—

"জলমে স্থলমে তনমে মনমে
আপয় রে সামায়া রে বাঁকেয়া!

সাঁওলি সূরত মোহিনী মুরত,
হৃদো বীচো মে সমায়া
হৃদো বীচো মে সমায়া রে বাঁকেয়া,
মন ভয়ো রে সামলিয়া, মন ভায়োরে বাঁকেয়া!

জামীর বল্লে "সর্ব্বনাশ! ও যে এখানকার বিখ্যাত কুঠিয়াল মাধোপ্রসাদ শেঠের মেয়ে!" জামীর তার অবস্থা দেখে প্রমাদ গণলে। তার বন্ধুর প্রকৃতি সে বেশ ভাল রকমই জানত। তার সেই সবল সুগঠিত দীর্ঘ দেহটির ভিতর যে একখানি অতি কোমল প্রেমপ্রবণ হৃদয় ছিল তা সে বিশেষ ভাবে জানত বলেই আজ বন্ধুর এই ভাবান্তর তাকে বড়ই ভাবিয়ে তুলেছিল।

তার পরে আর এক সপ্তাহ কেটে গেছে। এ কয়দিনে আমীরের ঘোর পরিবর্ত্তন হয়েছে। সে আর তার বন্ধুদের সঙ্গে মিশতে পারে না, গল্প করতে পারে না, কিছুই তার ভাল লাগে না। কথায় কথায় তার প্রাণখোলা উচ্চহাসি আর সেই প্রাণমাতান গান সব নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। মুখ শুষ্ক, দৃষ্টি উদাস, লক্ষ্যহীন, কি সে চায় কি তার অভাব কেউ জিজ্ঞাসা করে কিছু উত্তর পায় না। তার দৃষ্টি সদাই চঞ্চল হয়ে চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়, কি যেন তার পরম প্রিয়ধন হারিয়েছে! তার মুখ দেখলে তার বন্ধুদের বুক ফেটে কান্না আসে। তারা ভাবে নিশ্চয় ওর কি রোগ হয়েছে। তারা তাকে হাকিমের কাছে নিয়ে যেতে চায়, ওঝা গুণী দেখাতে চায়, ঝাড় ফুঁক করাতে চায়, কিন্তু সে কথা সে কানেও তোলে না! শুধু জামীর সব বোঝে, আর এর পরিণাম যে কি শোচনীয় হবে তা ভেবে ভেবে গুমরে গুমরে বুকফাটা কান্না কাঁদে। যখন অবসর পায় তখন সে আমীরকে কত বোঝায়, যে, এ দুরাশা মনে স্থান দিও না, কারণ এ আশা কখন সফল হবে না। সে হিন্দুকন্যা, বিবাহিতা, মুসলমান যুবকের এ দুরাকাঙ্ক্ষা কেন? আমীর তার কোন উত্তর দেয় না, কিন্তু তার মুখ দেখলে সে বুঝতে পারে যে তার কোন কথা আমীরের অন্তরে প্রবেশ করে নি। কি করলে তার বন্ধুর এ মনের বিকার কাটবে তা সে ভেবে পায় না। একদিন সকালে আমীর তাদের বাড়ীতে একলা বসে আছে। মনে আর অন্য কোনও চিন্তা নেই, কেবল সেই তরুণীর মুখখানি হৃদয়ে জাগছে। এ একসপ্তাহ সে অনেক ভেবেছে, অনেক উপায় স্থির করতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু তার কোনটাই ফলবতী হয় নি। যাকে সে ভালবেসেছে তাকে যে পাবার কোন আশাই নেই তা সে বুঝেছে, কিন্তু তার নিজের মনও আর তার বশে নেই, অনিশ্চিত আশা ছেড়ে আবার আগের মত সদানন্দভাব ফিরে পাবার কোন সম্ভাবনা নেই, তাও সে বেশ বুঝেছে। তবে এখন আর উপায় কি হবে? কি করে তার সারাজীবন কাটবে? গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আমীর একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলে কি সুন্দর এই পৃথিবী। এই পত্রপুষ্পে শোভিতা হাস্যময়ী বসুন্ধরা, মাথার উপরে এই সুনীল আকাশমণ্ডল, চারিদিকের এই আনন্দস্রোত, সবই কি সুন্দর! কিন্তু হায়! তার প্রাণ কেঁদে কেঁদে বলে উঠল— *এসব সুন্দর নয় সুন্দর নয়! সুন্দর যে তাকে একটিবার দেখতে পাবারও কোনো সম্ভাবনা নেই, কোনো উপায় নেই!* ঝর ঝর করে তার চোখের জল ঝরে পড়তে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে সে শান্ত হয়ে ভাবলে আমি যদি তাকে দূর থেকে এক একবার দেখতে পাই তাহলে আর কিছু চাই না। নাই বা তাকে কাছে পেলাম। আমি নিজের সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাকে ভালবাসব আর যদি দূর থেকে দিনান্তে এক একবার দেখতে পাই তবেই আমার সব দুঃখের উপশম হবে। এই কথা মনে হবামাত্র আর সে স্থির থাকতে পারলে না! একবার সেই তরুণীর মুখখানি দেখবার জন্যে তার হৃদয় আকুল হয়ে উঠল। সে শেঠজীর বাড়ীর দিকে চলল।

আমীর শেঠজীর বাড়ীর চার পাশে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে কোথাও কারও দেখা পেলে না। তখন তার মন আরও ভেঙ্গে পড়ল। বাড়ীর সামনে একটা বড় অশ্বত্থ গাছ ছিল। শ্রান্ত অবসন্ন দেহে সেই গাছতলায় বসে পড়ল, তার অন্তরের আকুল বেদনা তার আর্ত্ত কাতরকণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল—

—"তেরে আশক মে প্যারে! মেরা বালপন টুটা।"

সে তার সমস্ত অন্তর দিয়ে এই গানটি গাইছিল। তার হৃদয়ের দারুণ বিষাদ ও নিরাশা তার গানের ভিতর হতে ব্যক্ত হচ্ছিল। পথিক দু-চার জন পথ চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে তার গান শুনে যাচ্ছিল। হঠাৎ শেঠের বাড়ীর দোতলার একটি জানালা খুলে গেল। পথে কে এমন মধুর কণ্ঠে গান গায় দেখবার জন্যে শেঠজীর কন্যা ললিতা জানালার ধারে এসে দাঁড়াল। আমীরের আশা পূর্ণ হল। তার পিপাসিত নেত্রের সম্মুখে উপাসকের আরাধ্যা দেবী প্রতিমার মত যখন ললিতা এসে দাঁড়াল তখন আনন্দে তার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। স্নানের ঘাটে বিদ্যুৎচমকের মত একবার যাকে দেখে সে হৃদয় হারিয়েছিল, আজ এক সপ্তাহ শয়নে স্বপনে জাগরণে যার চিন্তায় সে তন্ময় হয়ে ছিল, হঠাৎ তাকে সামনে দেখে অপূর্ব্ব আনন্দে সে আত্মহারা হয়ে গেল। তার কণ্ঠের গান থেমে গেল, সে শুধু নিষ্পলক নেত্রে সেই জানালার দিকে চেয়ে রইল। ললিতাও অবাক হয়ে গাছতলায় এই অপূর্ব্বদর্শন যুবককে দেখছিল। তার সেই নিরুপম সুন্দররূপ ও পরিষ্কার বেশভূষায় তাকে সাধারণ ভিখারী মনে করতে পারা যায় না, আবার ভদ্রলোক কে এমন করে ধূলায় বসে গান করে? সে কিছুই বুঝতে পারেনি, আর বোঝবার চেষ্টাও করে নি; তার মধুর গানে তাকে একেবারে নিস্পন্দ করে দিয়েছিল। কিছুক্ষণ তারা দুজনেই দুজনের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। পরে অপরিচিত পুরুষ একদৃষ্টে চেয়ে দেখছে দেখে ললিতা জানালা বন্ধ করে চলে গেল। আমীরের অন্তর এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দে ভরে গেল। শুধু এই উপায়ে সে তার প্রিয়তমাকে দেখতে পাবে তা বেশ বুঝতে পারলে।

সেই দিন থেকে সে তার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গ ছাড়লে। বাড়ীতে কিংবা যে-সব প্রিয়স্থানে তার গতিবিধি ছিল সে-সব জায়গায় আর তাকে দেখা যেত না। দিনের অধিকাংশ সময় তাকে সেই গাছতলায় দেখতে পাওয়া যেত। কখন বা সেই জানলার দিকে চেয়ে গাছতলায় পড়ে থাকত, কখনও বা সেখানে বসে আপনার মনে গান করত—

শাহাজাদে আলম তেরে লিয়ে
জঙ্গল সাহারা বিয়াবান ফিরে
তন্ খাক মলে পহিনে কপনি
সব যোগনকা সামাল কিয়ে!

দিন দিন তার চিত্তবিকার বাড়তে লাগল। কারো সঙ্গে কথা কওয়া মেশা সব সে ছেড়ে দিয়েছিল। স্নান আহারেরও তার কোন নিয়ম ছিল না। কত দিন হয়ত বাড়ীতে মোটে যেতই না। তার বাপের মৃত্যু হয়েছিল। ভাইরা তাকে ভালভাবে রাখবার জন্যে অনেক চেষ্টা করলে, কিছুতেই তাকে বশে আনতে পারলে না। দেখতে দেখতে চারিদিকে রটে গেল বিখ্যাত ধনী লতিফ খাঁর ছোট ছেলে উন্মাদ পাগল হয়ে গেছে। এ সংবাদে প্রয়াগের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মনে আঘাত লাগল। সেই যে প্রিয়দর্শন যুবকটি সর্ব্বদা আমোদে আহ্লাদে নাচে গানে সমস্ত সহর গুলজার করে রাখত, সহসা কেন যে সে এমন পাগল হয়ে গেল কেউ তা বুঝতে পারলে না। ললিতাও এ খবর শুনেছিল। যখনি গাছতলায় দেওয়ানার গানের সুর বেজে উঠত, অমনি সে যন্ত্রচালিতের মত জানালায় গিয়ে দাঁড়াত। দেওয়ানার অনিন্দ্য সুন্দর রূপ আর তার এমন উন্মত্ততা দেখে তার মনের মধ্যে কেমন করে উঠত, জানালায় দাঁড়িয়ে সে নিশ্বাস ফেলে ভাবত এমন ধনীর সন্তান এর ত কোন দুঃখ কোন অভাব ছিল না, কেন এর এত কষ্ট কিসের, কিসের জন্যে এ এমন পাগল? আর যখন সে তার গান শুনত তখন সেই করুণ সুরে তার মনে কি দুঃখের ভাব জেগে উঠত, কি এক বুকফাটা কান্নায় তার প্রাণ আকুল হয়ে উঠত, তা সে নিজেই বুঝতে পারত না। পাগলকে দেখে আর তার লজ্জা হত না। গভীর দুঃখে ও সহানুভূতিতে তার হৃদয় কাতর হত, কখনও মনে হত ডেকে জিজ্ঞাসা করি কি ওর দুঃখ? আমীরের প্রাণে আর কোন বেদনা ছিল না। যাকে তার প্রাণ চায় তাকে সে প্রতিদিনই দেখতে পায়, আর তার অন্তরের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা গানের ভিতর দিয়ে তার চরণে নিবেদন করতে পায়, সেই তার পক্ষে যথেষ্ট। আর শুধু দেখতে পাওয়া নয়, সে প্রায়ই দেখত জানালায়

দাঁড়িয়ে গভীর স্নেহময় দৃষ্টিতে ললিতা তার দিকে চেয়ে আছে—সে দৃষ্টিতে কি কোমলতা। কি মধুর প্রাণস্পর্শী করুণা! সেই স্নিগ্ধ-করুণ দৃষ্টিতে আমীরের তাপিত অন্তরের সব জ্বালা যে জুড়িয়ে যায়! কত সময় সে দেখত তার দুঃখময় গান শুনে ললিতার আয়ত নয়নদুটি অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠত। তখন তার মনে কি আনন্দ! তার এই অনন্তদুঃখ ললিতার কোমল হৃদয় স্পর্শ করেছে এই তার আনন্দের কারণ। সে ভাবে আমার এই ভালো—ওগো আমার এইটুকুই ভালো! তোমাকে আমি প্রাণভরে দেখতে পেয়েছি, তুমি আমার দুঃখে কাতর হয়েছ, এইই আমার যথেষ্ট হয়েছে, আমি আর কিছু চাই না, আমি এমনি দূর থেকে তোমায় পূজা করব, তুমি এ দীনের পূজা এইভাবেই গ্রহণ কোরো, তা হলেই আমি কৃতার্থ হব। ললিতার স্বাভাবিক কোমল স্নেহপ্রবণ মনটি এই অবোধ পাগলের দুঃখে একান্ত কাতর হয়েছিল, যেদিন আমীর তাকে কোনমতেই খাওয়াবার জন্যে বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারত না সেদিন সে তাকে অনাহারে পড়ে থাকতে দেখে দাসীকে দিয়ে কত ভালো ভালো খাবার পাঠিয়ে দিত। আমীর তখন অসীম আগ্রহে ও আনন্দে দুহাত মেলে সেগুলি গ্রহণ করত।

এমনি করে কতদিন কেটে গেল। অবশেষে ললিতার "গৌণা" অর্থাৎ দ্বিরাগমনের দিন এল। যেদিন সে বাপের বাড়ীর সকলের কাছে বিদায় নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে গাড়ীতে উঠল, তখন গাছতলার দিকে চেয়ে সেই অসহায় পাগলের জন্যেও তার হৃদয়ের একাংশ হাহাকার করে উঠল—আহা বেচারা অসহায় পাগল! সে কিছুই জানে না, কিছুই বোঝে না, তাকে যত্ন করবার কেউ নেই। সে তবু তাকে কতকটা স্নেহ যত্ন করত। পাগল তখন গাছতলায় ছিল না। সেই শূন্য গাছতলার দিকে চেয়ে চেয়ে ললিতা অশ্রুপাত করে চলে গেল। পাগল এ খবর জানতেও পারলে না। সে তখন আর কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

সমস্ত দিন পরে বিকালে যখন সে তার স্থানটিতে এসে বসল তখন প্রতিদিনের মত জানালাটি খোলা দেখতে পেলে না। কতক্ষণ সেইদিকে চেয়ে চেয়ে সে বসে রইল, ক্রমে সূর্য্য অস্ত গেল, সন্ধ্যা হল, তবু সে জানালাটি কেউ খুললে না। রাত্রি হল, একটি একটি করে তারা ফুটে উঠল, চাঁদের আলোয় চারিদিক হাসতে লাগল, কিন্তু আজ কেউ সে জানালাটি খুললে না। সে তখন অধৈর্য হয়ে উঠতে লাগল—কি হল? কি হয়েছে আজ, ললিতা কেন এদিকে আসছে না? এমন ত কোন দিন হয় না। সে তখন জানত তার গান শুনলে ললিতা যেখানে থাক জানালায় এসে দাঁড়াবে, আর সে স্থির থাকতে না পেরে উচ্চস্বরে গান ধরলে—

তেরে নয়নওয়া যাদু ভরে,
হম চিতওরত তুমে ভুলত নাহি,
তড়পত হুঁ জইসে জলকি মছরিয়া—যাদু ভরে
ময় তড়পত হুঁ দিন রয়ন সঁইয়া,
অব তো গলেমে লগালে
তড়প তড়প জিয়া যায়, বিন পিয়া কছু না সোহায়
অব তো গলেমে লগালে সঁইয়া
আপন পাশ বোলা লে!

কিন্তু আজ সবই বিফল হল। বার বার সে কত গান গাইলে, যে-সব গান ললিতার প্রিয় ছিল ফিরিয়ে ফিরিয়ে কতবার সেই গানগুলি গাইলে, কিন্তু আজ আর কেউ জানালায় তার গান শুনতে দাঁড়াল না। পাগলের মন আকুল হয়ে উঠল—তবে কি তার কোন অমঙ্গল ঘটেছে? কিছু অসুখ করেছে কি তার? তাই সম্ভব। সে কোথায় জ্বরের ঘোরে অচেতন হয়ে পড়ে আছে, তার গানের সুর হয়ত তার কানেও যাচ্ছে না। পাগল অস্থির হয়ে শেঠের বাড়ীর চারদিক প্রদক্ষিণ করে গান গেয়ে গেয়ে বেড়াতে লাগল। কই! কোথাও কিছু শব্দ শোনা যায় না ত? বিষম উৎকণ্ঠায় কাতর হয়ে সে গাছতলায় পড়ে রাত কাটালে। ভাবতে লাগল সকালে নিশ্চয় কোন খবর পাওয়া যাবে। সকাল হল, প্রতিদিনের মত যে যার নিয়মিত কাজ আরম্ভ করলে, সে সতৃষ্ণ নয়নে বাড়ীটির দিকে

চেয়ে বসে রইল। বেলা হল, শেঠজীর বাড়ীতে প্রতিদিনের মত কাজকর্ম্ম চলতে লাগল। কিন্তু পাগল যে আর মন শান্ত রাখতে পারে না। সে রাস্তার চারধারে বাড়ীর চারধারে ছুটে বেড়াতে লাগল, কোথায় ললিতার দেখা পাবে। কার কাছে তার খবর পাবে? সমস্ত রাত্রি জাগরণ, উপবাস ও মনের বিষম উদ্বেগে তাকে কাতর করে তুললে। এই ভাবে সেদিনও কেটে গেল। আবার সন্ধ্যা এল, শেঠজী গদি থেকে বাড়ী ফিরলেন, তাঁর বৈঠকে বন্ধুরা সব প্রতিদিনের মত এক এক করে জুটতে লাগলেন, তাঁদের উচ্চহাসি ও গল্প প্রতিদিনের মতই সমভাবে চলতে লাগল। নিরানন্দ পাগল কেবল নিস্তব্ধ হয়ে বসে। সংসার যেমন চলছিল তেমনই চলছে, কোন বিষয়ে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নি, কেবল তার কাছেই আজ সব শূন্যময়। আজ দু-দিন হয়ে গেল সেই জানালাটি কেউ খোলেনি, আজ দুদিন সে ললিতাকে একবারও দেখতে পায়নি, কি হল তার সে খবরটি পর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি, তবে আর সে কি আশায় মন বাঁধবে? মন কতকটা স্থির করবার জন্যে সে গাইতে চেষ্টা করলে, কিন্তু আজ তার কণ্ঠ থেকে কোন সুর বেরোতে চাইল না। বহুচেষ্টার পর যদিও সে গান ধরলে—

"মেরা দিল তো দেওয়ানা জান তেরে লিয়ে"—

কিন্তু সে গান তার যন্ত্রণাকাতর হৃদয়ের আর্ত্তনাদের মত শোনাতে লাগল। সে তখন ঘোর অবসন্ন হয়ে গাছতলায় পড়ে রইল। কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল "কোথায়? আমার জীবনের আরাধনার ধন! আজ তুমি কোথায়? আজ দুদিন তোমার দেখা না পেয়ে আমার প্রাণ আকুল হয়ে উঠেছে। আমি ত কিছুই চাই না, কেবল দিনান্তে দূর থেকে তোমায় দেখেই আমি পরম আনন্দে ছিলাম, আমায় সেটুকু-থেকেও বঞ্চিত করলে?" এইভাবে সে রাত-ও তার সেই গাছতলায় কেটে গেল।

এদিকে দুদিন ধরে তাকে বাড়ীতে দেখতে না পেয়ে জামীর ভোরের বেলায় তাকে খুঁজতে এল। গাছতলায় ধূলার উপরে আমীরকে নিস্পন্দভাবে পড়ে থাকতে দেখে জামীরেব চোখ ফেটে জল এল, সে গভীর স্নেহভরে তার গায়ে হাত দিয়ে ডাকতে লাগল "আমীর! আমীর! ভাই আমীর!" কিন্তু আমীবের আর কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। আমীরের সকল গানের অবসান হয়েছে।

দেখতে দেখতে এই হৃদয়বিদারক সংবাদ সহরময় ছড়িয়ে পড়ল। যে একথা শুনলে সেই তাকে মনে করে অশ্রুপাত করতে লাগল। জামীর আর আত্মীয়েরা এসে শবদেহ তুলে নিয়ে পূর্ব্বোক্ত প্রান্তরে কবর দিলে। জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছিল, এখন এই নির্জ্জন শান্তিময় স্থানে সে মনের শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে। প্রতি সন্ধ্যায় বন্ধুগতপ্রাণ জামীর সেই সমাধিটি ফুলের মালায় সাজিয়ে আলো জ্বালিযে বন্ধুর উদ্দেশে অশ্রুবর্ষণ করত। দেওয়ানার এই শোকপূর্ণকাহিনী এলাহাবাদের অধিবাসীদের মনে বহুদিন জাগরূক ছিল।

১৭ [illegible] ১৩২১



পুনর্মিলন

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুর্শিদাবাদের মোতিঝিলের পাড়ের উপর মোতিমহল। সিরাজ নবাবের বিলাসের জন্য একটি নূতন বেগম আমদানি হইয়াছে। সে থাকে সেই মোতিমহলের এক অংশে। তাহার নাম সমরু। সে শিরাজী। শিরাজ থেকে তাহার স্বামী মসরুরের সঙ্গে সে এদেশে আসিয়াছিল। মসরুর দুনিয়ার দৌলতখানা হিন্দুস্থানে নিজের দরিদ্রভাগ্য যাচাই করিতে আসিয়া একটিমাত্র যে রত্ন তাহাও হারাইয়া ফেলিয়াছে। সে যখন বোরকা-ঢাকা সমরুকে সঙ্গে লইয়া মুর্শিদাবাদের নবাব-দরবারে উপার্জ্জন করিতে আসিল, তখনই তাহার সর্ব্বস্বধন খোয়া গেল। সমরু গেল মোতিমহলে, আর মসরুর কোথায় গেল কে বা তাহার খোঁজ রাখে।

সমরু এখনো পোষ মানে নাই। নবাব সিরাজ তাহাকে পোষ মানাইবার জন্য চার চারজন অভিজ্ঞ বাঁদি নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু সমরু বড় বেয়াড়া মেয়ে। সমস্তদিন সে বাঁদিদের বকবকানি নীরবে সহ্য করে কিন্তু সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইয়া আসিলে সে আর কাহারো নয়। সে সকলকে তাড়াইয়া দিয়া নিজের মহলে কপাট দেয়; কেহ যাইতে অস্বীকার করিলে উদ্ধত ফণিনীর মত উদ্যত হইয়া উঠে।

মোতিঝিলের এক পাড়ে মোতিমহল, আর এক পাড়ে ধানের ক্ষেত। ভাদ্রমাসের শেষাশেষি। বর্ষা বিদায় লইয়াছে; শরতের তীক্ষ্ণোজ্জ্বল হাসিতে ভুবন ভরিয়া তুলিয়াছে। সমরু মোতিমহলের খোলা জানালার ধারে ম্লান দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিত, ধানে ধানে ক্ষেতগুলি একটানা সবুজে ভরিয়া উঠিয়াছে, যতদূর চোখ চলে শুধু সবুজ আর সবুজ। কোথাওকার রং টিয়াপাখীর গায়ের মতো, কোথাও বা পান্নার মতো, কোথাও বা গাঢ়, কোথাও তরল,—একই সবুজের বিচিত্র বিকাশ। ধানগাছের তলে তলে কোথাও থিতানো স্বচ্ছ জল তক তক করিতেছে, ধানগাছগুলি মাথা নুয়াইয়া ঘাড় নাড়িয়া ফিরিয়া ঘুরিয়া যেন আয়নায় মুখ দেখিতেছে। থাকিয়া থাকিয়া দমকা হাওয়া ফিরোজা রঙের ওড়নাখানির আঁচলের মতো ধানের ক্ষেতটাকে ঢেউ খেলাইয়া চলিয়া যাইতেছে। এই ধূ ধূ মাঠের মধ্যে যতদূর চোখ যায় কোথাও একটি গাছ নাই; কোথাও একটি জনপ্রাণী নাই। শুধু ক্ষেতের মাঝে মাঝে খুব উঁচু উঁচু টং বাঁধিয়া টোকামাথায় চাষারা বসিয়া ধানের শত্রু পাখী তাড়াইতেছে।

মোতিঝিলের ঠিক ওপাড়ে মোতিমহলের ঠিক সামনে একটা যে টং সেটা একটু বেশি উঁচু। সেই টঙের আগলদার টোকা মাথায় দিয়া মোতিমহলের জানালার দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া বসিয়া থাকিত। সমরু দেখিত। কিন্তু সেই চাষাটার দৃষ্টি এড়াইয়া সরিয়া যাইত না।

জানালার দিকে চাহিয়া চাহিয়া আগলদারের সমস্ত দিন কাটিয়া যাইত। সন্ধ্যা হইলে সে রেড়ির তেলে একটি মিটমিটে চেরাগ জ্বালিয়া একটা লম্বা বাঁশের খোঁটায় টাঙাইয়া দিত। আর সমরুও শামাদানের আলোটাকে জানালার উপর তুলিয়া রাখিত। দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে যখন চোখের আলো নিভিয়া আসিত, তখন দুটি আলো তাহাদের অনিমেষ দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে চাহিয়া হৃদয়ের সকল স্নেহ জ্বালাইয়া পুড়াইয়া সমস্ত বিভাবরী জাগিয়া কাটাইত।

সন্ধ্যার সময় যখন দেউড়িতে নহবৎ বাজিয়া উঠিত; যখন মসজিদে মসজিদে আজান দিয়া ডাকাডাকি পড়িত; তখন টঙের উপর থেকে চাষার বাঁশি সাহানার কাঁদুনি সুরে কি এক অব্যক্ত হৃদয়বেদনায় সমস্ত ক্ষেতটাকে ভরিয়া তুলিত; আর সমরুও অমনি নিজের এসরাজটিতে তার বাঁধিয়া সেই সুরের সঙ্গে সুর মিলাইত।

এমনি করিয়া দিন যায় রাত আসে, রাত যায় দিন হয়। হঠাৎ একদিন সমরু বেগমের ঘুড়ি উড়াইবার সখ হইল। বেগমের সাধ, তাহাতে আবার নূতন বেগম,—রংবেরঙের হররকমের ঘুড়ি লাটাই তাহার পায়ের তলায় আসিয়া হাজির। বেগম সাহেবার পাতলা কাগজের হাল্কা ঘুড়ি বেগম

সাহেবার হৃদয়তলের রক্ততালে নাচিয়া নাচিয়া ফর ফর করিয়া সেই চাষার টঙের দিকে ভাসিয়া গেল। ইহা দেখিয়া চাষারও ঘুড়ি উড়াইবার সখ হইল। অনেক সময় গোঁত্তা খাইয়া চাষার ঘুড়ি সমরুর বুকের উপর চুম্বন করিয়া ফরফর করিয়া উড়িয়া পলাইত; কখনো বা সমরুর ঘুড়ি চাষার ঘুড়িকে শতপাক আলিঙ্গন করিয়া পেঁচ লড়িত। একদিন সমরু চাষার একখানা ঘুড়ি কাটিয়া লুটিয়া লইল। সেই ঘুড়ির গায়ে দিব্য গোল গোল ছাঁদে তুলি দিয়া লেখা আছে—

সবর্ কুন হাফেজ বসখ্‌তি রোজ ও শব।
আকবাত রোজি বেয়াবি কাম রা।
(হাফেজ সবুর কর দিন রাত কর।
বাসনা সফল হবে সৌভাগ্য উদয়।)

ঘুড়ির বুকে লেখা কবিতাটি পড়িতে পড়িতে সমরুর চোখে কি পড়িল, সে ওড়না দিয়া বড় ঘন ঘন চোখ মুছিতে লাগিল।

এমনি করিয়া দিনে ভাবিয়া রাতে জাগিয়া সমরুর পুষ্পপেলব দেহখানি দিনে দিনে শুকাইয়া যাইতে লাগিল। এদিকে ধানক্ষেতের আগলদারও রৌদ্রবর্ষা মাথা পাতিয়া সহিতে সহিতে রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। একদিন জলা ভুঁয়ের স্যাঁতা মাটি হইতে জ্বর উঠিয়া চাষাকে হিম হাতে জড়াইয়া ধরিয়া খুব করিয়া নাড়িয়া দিল, দগ্ধকরা ফুৎকার দিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বালাইয়া দিতে লাগিল।

সেদিনও চাষা অনেক কষ্টে তাহার ঘুড়িখানা উড়াইল বটে কিন্তু আকাশে থাকিল না, ধানক্ষেতের কাদার মাঝে লুটাইয়া পড়িল। সন্ধ্যার আকাশে নক্ষত্রমালা জ্বলিয়া উঠিল, মোতিমহলের বাতায়নে শামাদান জ্বলিল, কিন্তু চাষার টঙে সেদিন আর আলো জ্বলিল না। সমরু বাতিদান দুলাইয়া দুলাইয়া কত ডাকিল, টং হইতে কেহ তাহার জবাব দিল না। সমরুর এসরাজ গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া সেই ধানক্ষেতের আগলদারকে বার বার ডাকিল; টঙের উপর আগলদার বাঁশিতে ফুঁ দিল কিন্তু আজ সে ফুঁ বাজিল না। সমরু বাতায়নে আসিয়া দাঁড়াইল; তাহার প্রবহমান অশ্রুধারা মুছিতে মুছিতে টঙের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। শরতের পূর্ণিমা। সোনার ধানের উপর সোনার জ্যোৎস্নার প্লাবন চলিয়াছে। টং প্রেতের মতো স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সমরু আর থাকিতে পারিল না—"মসরুর মসরুর তুমি কোথায় গেলে, তোমার কি হল" বলিয়া মেঝে মোড়া চার-আঙুল-পুরু পারস্যের গালিচার উপর লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মসরুর টঙের উপর পড়িয়া পড়িয়া মনে করিতে লাগিল সে যেন পরী। চাঁদের আলোর মত জরদা রঙের দুখানা ঘুড়ির ডানা মেলিয়া সে যেন নীল আকাশে পাড়ি দিয়াছে। তাহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া সমরুর কণ্ঠমিশ্রিত এসরাজের সুর নাচিতেছে, আর হেনা বকুলের মিশ্রগন্ধ সেই সুরে তাল দিতেছে। আকাশের বুকের উপর পূর্ণিমার গোল চাঁদখানা তর তর করিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া যেন তাহারই দিকে আসিল। সেটা যেন চাঁদ নয়, সেখানি সমরুর মুখ! নিকটে, নিকটে, আরো নিকটে সমরুর চাঁদমুখ-খানি সরিয়া আসিল। সমরুর কালো কালো সুর্মা-আঁকা চোখ দুটির দীর্ঘ পক্ষ্মরাজির পেলবস্পর্শ সে নিজের কপোলের উপর অনুভব করিল। সে প্রাণপণ শক্তিতে নিজের হাত দুখানি তুলিয়া সমরুর মুখখানি বুকের উপর চাপিয়া ধরিল।

পরদিন প্রভাতে চাষারা দেখিল একটা সূতো বরাবর মসরুরের টং হইতে মোতিমহল পর্য্যন্ত ঝুলিয়া রহিয়াছে। ভয়ে ভয়ে চাষারা নবাব-দরবারে খবর দিল। নবাব সিরাজ টঙে গিয়া দেখিলেন একটা শিরাজী একখানা জরদা রঙের ঘুড়ি দুই হাতে বুকে চাপিয়া ধরিয়া মরিয়া পড়িয়া আছে, আর সেই ঘুড়িতে নূতন বেগমের মুখ আঁকা।

নবাব হুকুম দিলেন যার মুখ বুকে করে' মরেছে তাকে সঙ্গে দিয়ে এর কবর দেও।

১০ বর্ষ, আষাঢ় ১৩১৭



ছেলেধরা

পরশুরাম

শহরে আবার ছেলেধরার উপদ্রব শুরু হইয়াছে। অজ্ঞলোকে রটাইতেছে—বালি ব্রিজের বনিয়াদ পোক্ত করিবার জন্য দশ হাজার ছেলে পুঁতিবে। বিজ্ঞলোক বলিতেছেন—ছেলেরা এখানকার কর্ত্তব্য শেষ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতেছে। গরম দলের মুখপত্র দৈনিক ধূমকেতু ভ্রূকুটিকুটিল অক্ষরে প্রশ্ন করিয়াছে—কোন্ দুরাত্মা স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশমাতৃকাকে সন্তানহারা করিতেছে? দেশদ্রোহী চুনকালি পত্রিকা ছোট্ট অক্ষরে জবাব দিয়াছে—তৎ ত্বমসি ধূমকেতো।

বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানায় এই সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল। তাঁর ছোট ছেলে ঘেণ্টু বলিল—'বাবা, ছেলেধরা বাবা ধরে? বল না বাবা।'

উকিল বিনোদনবাবু বলিলেন—'তেমন-তেমন বাবা হলে ধরে বই কি। কিন্তু তুমি ভেবো না খোকা, আমরা রক্ষা ক'রব।'

বংশলোচনের শালা নগেন বলিল—'চাটুয্যে মশায়, আপনি সাবধানে চলা-ফেরা করবেন।'

বংশলোচন বলিলেন—'উনি ত প্রবীণ লোক, ওঁকে ধরবে কেন?'

নগেন বলিল—'মনেও ভাববেন না তা। হনুমানের আরক খাইয়ে তরুণ বানাবে, তারপর চালান দেবে।'

বংশলোচনের ভাগনে উদয় সভয়ে বলিল—'তরুণদেরই ধরচে বুঝি?'

কেদার চাটুয্যে হুঁকা রাখিয়া কহিলেন—'উদো, তুই কি রকম লেখাপড়া শিখেছিস দেখি। জোয়ান, যুবক আর তরুণ—এদের মধ্যে তফাৎ কি বল তো।'

উদয় বলিল—'জোয়ান হচ্ছে যার গায়ে খুব জোর। যুবক মানে যুবা। তরুণ হ'ল গিয়ে মানে অর্থাৎ যাকে বলে—থামুন, অভিধান দেখে বলচি।—

চাটুয্যে কহিলেন—'অভিধানে পাবি না, আজকাল মানে বদলে গেছে। আমি অনেক ভেবেচিন্তে যা বুঝেছি বলি শোন্।—যাঁর দাড়ি গোঁফ দু-ই আছে তিনি হলেন জোয়ান, যেমন রবিঠাকুর, পি. সি. রায়। যাঁর দাড়ি নেই কিন্তু গোঁফ আছে তিনি যুবক, যেমন মহাত্মা গান্ধী, আশু মুখুয্যে। আর যাঁর দাড়িও নেই, গোঁফও নেই তিনি তরুণ, যথা—বঙ্কিম চাটুয্যে, শরৎ চাটুয্যে আর এই কেদার চাটুয্যে।'

উদয় বলিল—'আর আমি? নগেন মামা?'

চাটুয্যে কহিলেন—'তোরা হলি ওই তিনের বার, যাকে বলে অপোগণ্ড। ধরতে হয় তোদেরই ধরবে।'

উদয় চিন্তা করিয়া বলিল—'আমি দাড়ি রাখতুম, কিন্তু বউ বলে—'

নগেন ধমক দিল—'খবরদার উদো।'

চাটুয্যে মশায় বলিলেন—'এবার যে ছেলেধরার উপদ্রব হয়েচে সেটা কিছুই নয়। হয়েছিল বটে পাঁচ বছর আগে, যেবার আমাদের মজিলপুরের চরণ ঘোষের ছেলে নিরুদ্দেশ হয়।'

বিনোদবাবু বলিলেন—'কি হয়েছিল বলুন না চাটুয্যে মশায়!'

চাটুয্যে মশায় বলিতে লাগিলেন।

কার্ত্তিক ছেলেটি শিশুকাল থেকেই বেশ চৌকস। যখন দশ বছর বয়েস, তখন সে তার বান্ধবীদের বলত—মেয়েগুনো আবার মানুষ! মাথায় একগাদা চুল, আবার ফিতে-বাঁধা, আবার শুধু-শুধু দাঁত বার করে হাসে। মারতে হয় এক ঘুঁষি। তারপর চোদ্দ বছর বয়সে সে তার পরম বন্ধুকে লিখলে—নারীর প্রেম? কখনই নয়। ভাই বাঁটলু, এ জগতে কারো থাকবার দরকার নেই, শুধু তুমি

আর আমি। কিন্তু দু বছর যেতে না যেতে তার যৌবন-নিকুঞ্জের পাখী কা কা ক'রে উঠল। কার্ত্তিক তার কবিতার খাতায় লিখলে—নারী, বুঝিতে না পারি কবে, একান্ত আমারি তুমি হবে, কত দিনে ওগো কত দিনে, পারচি নে আর পারচি নে।

ছেলের বয়স হু হু ক'রে বেড়ে চলল, কিন্তু বাপের আক্কেল হ'ল না। চরণ ঘোষ অন্য বিষয়ে সেকেলে হলেও ছেলের বিয়ে দেবার বেলায় একেলে। ব'লত ভাল করে লেখাপড়া শিখুক, রোজগার করুক, তারপর। কার্ত্তিক বেচারা কি আর করে, লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাব্য উপন্যাস পড়ে, বন্ধুদের সঙ্গে প্রেমতত্ত্ব চর্চ্চা করে, থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখে। এমন সময় শহরে ছেলেধরার উপদ্রব শুরু হ'ল।

সে এক হুলস্থূল কাণ্ড। আজ পঞ্চাশটা ছেলে হারিয়েচে, কাল পঁচাত্তরটা; কিন্তু আশ্চর্য্য এই, যারা নিরুদ্দেশ হচ্চে, তাদের নাম-ধাম কেউ টের পায় না। এদিকে লোকে ক্ষেপে উঠেচে, মোটর গাড়ি পোড়াচ্চে, রাস্তায় মানুষকে ধরে ধরে ঠেঙাচ্চে। কার্ত্তিকের কলেজ বন্ধ, চরণ ঘোষ তাকে দেশে এনে রেখেচে। একদিন কার্ত্তিক বললে—'হিস্ট্রির খান-দুই বই বাঁটলোর কাছে রয়েচে, কলকাতায় গিয়ে নিয়ে আসি।' চরণ বললে—'যাবি আর আসবি, দুপুরের গাড়িতে ফিরে আসা চাই।'

বেলা শেষ হয়ে এল, কিন্তু কার্ত্তিকের দেখা নেই। তার মা কান্নাকাটি আরম্ভ করলেন, কারণ আগের দিন নাকি তেষট্টিটা ছেলে চুরি গেছে। অগত্যা কার্ত্তিকের খোঁজ ক'রতে চরণ ঘোষ আর আমি কলকাতায় চ'লে এলুম। বাঁটলোর ছোট ভাই সাঁটলো বললে, তার দাদা আর কার্ত্তিক ক'জন বন্ধুর সঙ্গে ওভারটুন হলে বক্তৃতা শুনতে গেছে। কিন্তু বাঁটলোর বোন তুবড়ি বললে—'শোনেন কেন, সব মিথ্যে কথা, বাবুরা অ্যাংলো-মোগলাই হোটেলে খেতে গেছেন, তারপর যাবেন বায়োস্কোপে, তারপর অনেক রাত্রি বাড়ি এসে দরজায় ধাক্কা লাগাবেন।' সারা পথ কার্ত্তিকের বাপান্ত করতে করতে চরণ ঘোষ আমার সঙ্গে হোটেলের খোঁজে চলল।

হোটেলটি বড় রাস্তার ওপর, আলোয় গন্ধে কলরবে ভরপূর। সায়েবদের আমরা বলি গোস্তখোর। খোর কাকে বলে বাঙালীর হোটেলে গিয়ে দেখে এস। খোপে খোপে ছেলে বুড়োর দল টেবিলে ব'সে পেটে মাংস ঠুসছে। বেচারাদের অপরাধ নেই, হাজার বছর ধরে শুনে এসেছে—এটা খেও না, ওটা খেও না। এখন যখন ভগবান সুবুদ্ধি আর সুবিধে দিয়েচেন তখন জন্ম-জন্মান্তরের অতৃপ্তি চটপট মিটিয়ে নিতে হবে। মনে মনে আশীর্ব্বাদ করলুম—আহা এদের ভোজন সার্থক হোক। এই যে এরা বাঘের মতন গব্‌গব্ ক'রে খাচ্চে, সেই সঙ্গে যেন বাঘের সদ্‌গুণও কিছু পায়। এদের গায়ে গত্তি লাগুক, মনে সাহস হোক, খোঁচা দিলে এরা যেন খ্যাঁক ক'রে নির্ভয়ে তেড়ে যেতে পারে।

ঘরের শেষে একটা খাটো পরদার আড়ালে আমাদের শ্রীমানরা খাচ্চেন আর নানাপ্রকার তত্ত্বকথার আলোচনা করচেন। আমাদের দেখতে পান নি। চরণ ঘোষ তখন সবে গোঁসাই-মহারাজের কাছে মন্তর নিয়ে কণ্ঠি ধারণ করেচে, মাংসের গন্ধে কানে আঙুল দেয়। হোটেলের খোশবায় শুঁখে তার খুন চ'ড়ে গেল, ছেলেকে মারে আর কি। আমি তাকে জোর ক'রে থামিয়ে বললুম—'কর কি চরণ, নিজের ছেলেবেলার কীর্ত্তিকলাপ সব ভুলে গেলে? সেই যে কাবাবের ঠোঙা নিয়ে গাব গাছে চ'ড়ে খেতে আর কোকিল ডাকতে তা কি মনে নেই? ছেলের খাওয়া শেষ হোক, তারপর একটু আধটু ধমক দিও। আপাতত এদিকে চুপটি ক'রে বোসো, একটু ঘোলের সরবৎ খেয়ে ঠাণ্ডা হও, আর শ্রীমানরা কি আলোচনা করছেন তাই আড়ি পেতে শোনো। যদি কিছু অশ্রাব্য অলৌকিক কথা কর্ণগোচর হয়, তখন না হয় গলা খাঁকার দিয়ে আত্মপ্রকাশ করা যাবে।'

ছেলেরা যে-ভাষায় আলাপ করছিল তার চার আনা বাংলা, আট আনা ইংরিজী, আর চার আনা বোধ হয় ফ্রেঞ্চ, কারণ চন্দ্রবিন্দুর রেশ প্রায়ই কানে আসছিল। আন্দাজে বুঝলুম, আলোচ্য বিষয়টি হচ্চে কার কি রকম প্রণয়িনী পছন্দ। শেষটায় কার্ত্তিক টেবিল চাপড়ে বললে—'থিওরি টিওরি আমার নেই, আমি চাই এমন নারী যে বল্লরী বাঁড়ুয্যের মতন রূপসী, মিসেস চৌবের মতন সাহসী, জিগীষা দেবীর মতন লেখিকা, মেজদির ননদের মতন রসিকা, লোটি রায়ের মতন গাইয়ে, ফাখ্‌তা খাঁর মতন নাচিয়ে।'

চরণ ঘোষের চোদ্দপুরুষ এমন তিলোত্তমা দেখেনি। চুপি চুপি বললুম—'চরণ, আর কথাটি নয়, বাবাজীকে এই আসছে অঘ্রাণেই ঝুলিয়ে দাও, নইলে বেচারা বাড়ি-বাড়ি হ্যাংলা-দিষ্টি দিয়ে বেড়াবে।' চরণ লাফিয়ে উঠে বললে—'দাঁড়াও, হ্যাংলাপনা ঘুচচ্চি।'

তারপর মশায় চরণ ঘোষ হাত-নেড়ে এমন চীৎকার আরম্ভ করলে যে, হোটেলসুদ্ধ লোক হকচকিয়ে গেল। নিজের ছেলে, তার বন্ধুর দল, হোটেলওয়ালা, ইউনিভার্সিটি, আধুনিক সভ্যতা, কাকেও বাদ দিলে না। কার্ত্তিক ঘাড় হেঁট করে গালাগাল হজম ক'রতে লাগল, কিন্তু অন্য ছেলেরা রুখে উঠল, হোটেলের ম্যানেজারও আস্তিন গুটিয়ে লড়তে এল।

বাঁটলো ছেলেটি অতি মিষ্টভাষী আর বিনয়ী। সে খুব মোলায়েম ক'রে বললে—'দেখুন চরণবাবু, নিজের ছেলেকে আপনি যা খুশী বলতে পারেন, কিন্তু আমরা কি করি না-করি আপনার পিতার তাতে কি?'

ম্যানেজার বললে—'জানেন আপনাকে পুলিসে দিতে পারি?'

চরণ মুখ ভেংচে বললে—'দাও না দেখি।'

ম্যানেজার বললে—'জানেন, এটা অ্যাংলো-মোগলাই কেফ?'

বাঁটলো বললে—'কেফ নয়, কাফে।'

ম্যানেজার বললে—'ওই হ'ল। জানেন, এটা একটা রেস্‌পেক্‌টেব্‌ল রেষ্টাউর‍্যান্ট?'

বাঁটলো বললে—'রেস্তোরাঁ।'

ম্যানেজার বললে—'এক-ই কথা। জানেন, এটা হচ্ছে শিক্ষিত লোকের রেগুেজভৌস?'

বাঁটলো বললে—'রাঁদেভূ।'

বারবার বাধা পেয়ে ম্যানেজার বিরক্ত হয়ে উঠল। বললে—'আরে থামো ডেঁপো ছোকরা। ডেভিল মামলেট দেরাই বেচে বুড়িয়ে গেলুম, এখন ইনি এলেন উরুশ্চারণ শেখাতে!'

বাঁটলো গর্জ্জন করে বললে—'খদ্দেরকে অপমান? টেক্ কেয়াব, তোমার হোটেল বয়কট ক'রব, কেবল কুকুরের ঠ্যাং আর সাপের চর্ব্বি চালাচ্চ!'

আমার পাশের টেবিলে একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসেছিলেন। ইনি একজন নীরব কর্ম্মী, দু-প্লেট কোর্মা চুপচাপ শেষ ক'রে রাইসরষে আর নেবুর রস দিয়ে কাঁচা টোমাটো খাচ্ছিলেন। ইনি চমকে উঠে বললেন—'কী ভয়ানক! সেজন্যেই ত আমি ওসব খাওয়া ছেড়ে দিয়েচি।' কেবল জোচ্চুরি, ভাইটামিনের নামগন্ধ নেই।'

আমি বললুম—'ভাইটামিন যদি চান, তবে কাঁটাল খান।'

বাল্যে দুগ্ধ, যৌবনে লুচি-পাঁটা, বার্দ্ধক্যে একটু নিমঝোল আর প্রচুর হরিনাম—এই হ'ল মানুষের স্বাভাবিক পথ্য। কিন্তু আজকাল বৃদ্ধরা শিখেচেন যে ভাইটামিনই হচ্চে ভবনদীতে ভাসবার ভেলা। হোটেলের সমস্ত প্রবীণ খদ্দের চোপ্ চোপ্ করে ধমক দিয়ে বাঁটলো, ম্যানেজার আর চরণ ঘোষকে থামিয়ে দিলেন। তারপর আমার চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে উৎসুক হয়ে বললেন—'হাঁ, তারপর মশায়, কাঁটালের কথা কি বলছিলেন?'

আমি একটি ছোট্ট বক্তৃতা দিলুম। —ফলের শ্রেষ্ঠ হচ্ছে কাঁটাল, আবার কাঁটালের রাজা হচ্চে ওতোরপাড়ার বঞ্জুলবাবুদের গাছের রস-খাজা। এক-একটি কোয়া এক-এক পো, কাঁচা সোনার বর্ণ, ভাইটামিনে টইটম্বুর। গালে দিয়ে বার-পাঁচেক এদিক ওদিক চলাচল করুন, তারপর চক্ষু বুঁজে একটু চাপ দিন, অবলীলাক্রমে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাবে। কোথায় লাগে সন্দেশ পানতুয়া রসগোল্লা।

টোমাটো-ভোজী বাবুটি বললেন—'কোন্ ক্লাসের ভাইটামিন মশায়—এ, বি না সি?'

বললুম—'এ-বি-সি-ডি, বি-এল-এ-ব্লে, স্নাই-ফক্স-মেট-এ-হেন, যা বলেন। হেন বস্তু নেই যা কাঁটালে পাবেন না। গুঁড়ি চিরুন, তক্তা হবে। পাতা পাকিয়ে নিন, তামাক খাবার উত্তম নল হবে। আর ফলের ত কথাই নেই। কাঁচার কালিয়া খান, যেন পাঁটা। বিচি পুড়িয়ে খান, যেন কাবুলী মেওয়া। পাকা কোয়ার রস গ্রহণ করে ছিবড়েটা চরকায় চড়িয়ে সুতো কাটুন, বেরুবে সিল্ক।'

ভদ্রলোক মুখ বেঁকিয়ে বললেন—'ননসেন্স।'

আমি বললুম—'বিশ্বাস হ'ল না? তবে মরুন কাঁচা টোমাটো খেয়ে। আমরা চললুম, নমস্কার।'

ম্যানেজার তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল—'ও মশায়, দুটো ঘোলের দাম দিলেন না?'

আরে মোলো, আবার দাম চায়। এত-বড় একটা কুরুক্ষেত্র থামিয়ে দিলুম সেটা কিছু নয়? আচ্ছা বাবা, নাও এই সিকি। দাম চুকিয়ে কাত্তিককে চুপি চুপি কিছু সদুপদেশ দিয়ে চরণকে বললুম—'তুমি এবার সেয়ালদ যেতে পার, ন'টার ট্রেন এখনো পাবে। আমি আর কার্ত্তিক আজ রাত্রে বাঁটলোদের বাড়িই থাকব। দুদিন পরে বাবাজীর রাগ পড়লে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাব এখন।'

চরণ ঘোষ চলে যাবার পর আমি, কার্ত্তিক আর তার চার বন্ধু বাঁটলো কেলো গোপলা ঘনেন হোটেল থেকে একসঙ্গে বেরিয়ে এলুম। পথে যেতে যেতে কেলো বললে—'এ অপমান কখনই সহ্য করা যায় না, আমরা বানের জলে ভেসে এসেছি না-কি? কার্ত্তিক, তোর বাপকে এক্ষুনি উকিলের চিঠি দে, পাঁচশো টাকা ড্যামেজ। মকদ্দমায় আমরা সাক্ষী হব।'

গোপলা বললে—'বাপের নামে নালিশ দেখায় খারাপ। বরং খবরের কাগজে ছাপিয়ে দে, সমস্ত ছেলের দল খেপে উঠবে।'

ঘনেন বললে—'উঁহু, তার চেয়ে জিগীষা দেবীর কাছে চল্, তাঁকে বলে কয়ে আমরা একটা আশ্রম খুলব। কাগজে ছাপাব—এস কে কোথায় আছ বাংলার ছেলেরা—নির্য্যাতিত উৎপীড়িত অসহায় বুভুক্ষু—'

কেলো বললে—'ঐ সঙ্গে একটা মেয়েদের বিভাগও খোলা উচিত।'

কার্ত্তিকের এসব পরামর্শ পছন্দ হ'ল না। বললে—'বাঁটলো, হাইড্রোসায়ানিন এসিডের দাম কত রে?'

বাঁটলো বললে—'অনেক দাম। তার চেয়ে কেরোসিন তেল ঢের সস্তা। দশ পয়সায় কাজ সাবাড়।'

কার্ত্তিক বললে—'কিন্তু বড্ডো জ্বালা ক'রবে যে?'

বাঁটলো আশ্বাস দিলে—'সে কতক্ষণ? একবার মরতে পারলে মোটেই টের পাবি না।'

আমি বললুম—'ছি, বাবা কাত্তিক, দুঃখু কোরো না। একে বাপ তায় বয়সে বড়, বললেই বা একটু কড়া কথা। বাপের সুপত্তুর হ'লে সব দেবতা খুশী হন। এই দেখ, রামচন্দ্র পিতৃ-আজ্ঞায় বনে গিয়েছিলেন।

ঘনেন বললে—'জব্দও হয়েছিলেন তেমনি। মাথায় জটা, গায়ে জামা নেই, পায়ে জুতো নেই, চোদ্দ বছর ভ্যাগাবণ্ড, বউ গেল চুরি। চল্ রে বাঁটলো, আমরা একবার জিগীষা দেবীর বাড়ি গিয়ে তাঁর বাণী নিয়ে আসি।'

ছেলেদের বললুম—'এত রাতে কেন আর তাঁকে বিরক্ত করা, এখন নিজের নিজের বাড়ি গিয়ে ঘুমও গে।' কিন্তু তারা বাণী না নিয়ে ফিরবে না, অগত্যা আমিও সঙ্গে সঙ্গে চললুম। বুড়োদের রাজত্ব শেষ হয়েছে, এখন ছোকরাদের পেছু-পেছু দৌড়নোই বুদ্ধিমানের কাজ।

করলাবাগান ফার্স্ট লেনে জিগীষা দেবীর বাসা। রাত প্রায় ন'টা, কিন্তু বাড়ির দরজা তখনো খোলা রয়েচে। ঘনেন দু-বার ব্যায়রা ব্যায়রা বলে চেঁচাতেই নাকে ঝুমকো পরা একটা নেপালী ঝি বেরিয়ে এল। বাঁটলো বললে—'চাটুয্যে মশায়, আপনিই আমাদের দলের সর্দ্দার, দিন আপনার কার্ড পাঠিয়ে।'

কার্ড-ফার্ড আমার কোনো কালে ছিল না। ঝিকে বললুম —'মাইজীকে গিয়ে খবর দাও কেদার চাটুয্যে আর পাঁচ ছোকরা মোলাকাৎ করনে মাংতা।'

ঘনেন বললে—'ছোকরা নয়, বলুন তরুণ।'

—'হাঁ হাঁ, বোলো পাঁচঠো তরুণ আর একঠো বুডঢা মাইজীর সাথ দেখা করেগা।'

ঝি চোখ কুঁচকে বললে—'মাইজী?'

বললুম—'হাঁ রে বাপু, জিঘাংসা দেবী।'

ঘনেন ধমকে উঠে বললে—'জিগীষা দেবী। চাটুয্যে মশায়, আপনার ভীমরতি ধরেছে, ভদ্রমহিলার কাছে গিয়ে অসভ্যতা করবেন দেখচি।'

আমার বড় রাগ হ'ল। নাম বলতে একটু ভুল করেচি তাতে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়েচে? বললুম —'দেখ্‌ ঘনা, তুই আর আমার কাছে সভ্যতার বড়াই করিস না। ক'টা মহিলা দেখেচিস তুই? জানিস, আমার তিন খুড়শাশুড়ী, চার শালাজ, সাত শালী, আর গিন্নী তো আছেনই—এই চল্লিশ বৎসর তাঁদের সঙ্গে কারবার ক'রে আসচি।'

ঝি ফিরে এসে আমাদের নিয়ে গেল দোতলার একটি ছোট ঘরে। জিগীষা দেবী টেবিলের কাছে ব'সে খানকতক মোটা মোটা হিসেবের খাতা উলটচ্চেন। বললেন—'আমাকে এখনি একটা মীটিং-এ যেতে হবে, আপনারা একটু তাড়াতাড়ি বক্তব্য শেষ করলে বাধিত হব।'

জিগীষা দেবী বেশ দশাসই মহিলা, জবরদস্ত চেহারা, পরিপাটি সাজগোজ। পাউডারের স্তর ভেদ ক'রে সুগোল মুখের নিবিড় শ্যামকান্তি উঁকি মারছে, কালিদাস যদি দেখতেন ত লিখতেন—যেন খড়িপড়া ছুঁচিকুমড়ো। আমি একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলুম, কারণ এরকম ডেপুটেশনে আসা আমার অভ্যেস নেই। কিন্তু ছেলেরা যখন আমাকেই মুখপাত্র স্থির করেছে তখন কথা কইতেই হবে। বললুম—'মা লক্ষ্মী, এই যে দেখচেন পাঁচজন ছোকরা, এরা হচ্চে পাঁচটি তরুণ। এটির নাম কাত্তিক, চমৎকার ছেলে, কিন্তু এর বাপ চরণ ঘোষ একে বলেচে শুয়োর কা বাচ্চা, তাতে বাবাজীরা সকলেই বড় মর্ম্মাহত হয়েচেন। আমরা ছেলেবেলায় বাপ-জ্যাঠার গালাগাল বিস্তর খেয়েচি, সোনা-পারা মুখ ক'রে সমস্ত সয়েচি। কিন্তু সেদিন আর নেই মশায়। তখন এই কলকাতায় ঘোড়ার ট্রাম চলত, ছেলেরা গোঁফ রাখত, কোটের ওপর উড়ুনি ওড়াত, মেয়েরা নোলক পরত আর নাইবার ঘরে লুকিয়ে গান গাইত, গভর্ন্মেণ্টকে লোকে তখন বলত সদাশয় সরকার বাহাদুর।'

জিগীষা দেবী বাধা দিয়ে বললেন—'তরুণদের দলে আপনি কেন?'

শক্ত সমস্যা। কিন্তু কেদার চাটুয্যে ঠকবার ছেলে নয়, বললুম—'আজ্ঞে আমি একজন প্রবীণ তরুণ।'

বাঁটলো এক্সপ্লেন ক'রে দিলে—'ওঁর বয়েস হয়েচে বটে, কিন্তু মনটি একদম কাঁচা।'

জিগীষা দেবী কিন্তু খুশি হলেন না। আমি উপমা দিয়ে বুঝোবার চেষ্টা করলুম—'কি রকম জানেন? এই গুজরাটী ডাব আর কি, ওপরে ঝুনো ভেতরে নেয়াপাতি।'

ঘনেন তখন রেগে কাঁই হয়েচে। আমাকে ধম্‌কে বললে—'চুপ করুন চাটুয্যে মশায়, কেবল আবোল তাবোল বকচেন। কেলো, তুই বল্‌।'

কেলো তখন হোটেলের সমস্ত কাণ্ড বর্ণনা করে বললে—'দেখুন, আমরা বড়ই অপমানিত উৎপীড়িত নির্য্যাতিত হয়েচি। বাড়িতে অধীনতার আবেষ্টনে আর থাকতে চাই না, নিজেদের একটা স্বাধীন আশ্রয় বানাতে চাই। পিঁজরে-ভাঙা চন্দনা চায় পাখ্‌না মেলে বাঁচতে রে, অরুণ-রাঙা মুক্তাকাশের তপ্তাপোষে নাচতে রে। আপনি যদি একটু চেষ্টা করেন তবে অনায়াসে একটা আশ্রম গড়ে উঠবে। এখন এ সম্বন্ধে একটি বাণী আমরা আপনার কাছে প্রার্থনা করি।'

জিগীষা দেবী কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন। তারপর শিস দিয়ে ডাকলেন—'সুষ্, সুষ্—'

একটি ছোট্ট প্রাণী গুট্‌গুট্‌ ক'রে ঘরে এল। কুকুর নয়। ইনি সুষেণবাবু, জিগীষা দেবীর স্বামী। রোগা, বেঁটে, চোখে চশমা, মাথায় টাক, কিন্তু গোঁফজোড়াটি বেশ বড় আর মোম দিয়ে পাকানো। সতীসাধ্বী যেমন সর্ব্বহারা হয়েও এয়োতের লক্ষণ শাঁখাজোড়াটি শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করে, বেচারা সুষেণবাবুও তেমনি সমস্ত অধিকার খুইয়ে পুরুষত্বের চিহ্নস্বরূপ এই গোঁফজোড়াটি সযত্নে বজায় রেখেচেন। ঘরে এসে ঘাড় নীচু করে সবিনয়ে বললেন—'ডেকেচ?'

জিগীষা দেবী ছেলেদের দেখিয়ে বললেন—'এরা বাণী নিতে এসেছেন।'

সুষেণবাবু চোখ কপালে তুলে বললেন —'বানি? এই যে সেদিন ননী স্যাকরা বেয়াল্লিশ টাকা নিয়ে গেল?

জিগীষা দেবী ভ্রূকুটি ক'রে বললেন—ইডিয়ট! স্যাকরার বানি নয়, আমার মুখের বাণী। যাও, সবুজ ফাউনটেন পেনটা আর এক শিট কাগজ নিয়ে এস।'

সুষেণবাবু কাগজ কলম আনলেন, জিগীষা দেবী খচ্‌খচ্‌ করে দু-পাতা বাণী লিখলেন। ভাষাটা ঠিক মনে নেই, তবে তাতে অনেক উঁচুদরের কথা ছিল, ''যথা—প্রবীণের রক্ত, তরুণের খুন, ধনিকের রুধির, শ্রমিকের লোহু। শেষটা হচ্চে—আশ্রম গ'ড়ে তোলা অতি সহজ কাজ; হে ছেলেরা, তোমরা লাখ টাকা জোগাড় কর; আপাতত আমাকে হাজার দশেক এনে দাও, তাতেই কাজ আরম্ভ হতে পারবে।

আমরা বাণী পেয়ে কৃতার্থ হয়ে নীচে নেমে এলুম। হঠাৎ সুষেণবাবু পিছন থেকে চুপি চুপি ডাকলেন—'ও মশায়, বলি শুনচেন? একবার আমার ঘরে আসুন।'

ইনিও একটা বাণী দিতে চান না-কি? গেলুম সঙ্গে সঙ্গে। সুষেণবাবুর খাস কামরাটি নীচের তলায়। ছোট্ট কুঠুরি, আসবাব বেশি নেই, দেওয়ালে কতকগুলো বাঘ-সিঙ্গির ছবি, ইংরিজী পত্রিকা থেকে কাটা। তক্তাপোষের ওপর ময়লা বিছানা পাতা, তার ওপর একটা জরাজীর্ণ বন্দুক, এক শিশি তেল, আর খানিকটা সুরকির গুঁড়ো। সুষেণবাবু বোধ হয় বন্দুকটার মরচে তুলছিলেন।

বললুম—'এটি আপনার বৈঠকখানা? বাঃ, খাসা বন্দুকটি ত। আপনি বুঝি রোজ ওতে তেল লাগান?'

সুষেণবাবু খুশী হ'য়ে বললেন—'লাগাতেই হবে, নইলে দরকারের সময় আটকে যাবে যে। বলছিলুম কি—আপনারা কানাই ঘোষালকে চেনেন?—যে ছোকরা নাগাড় পঁচাত্তরটা ঘণ্টা লালদিঘিতে সাঁতার দিয়েছিল? সে আমার খুড়তুতো ভাই হয়।'

আমি বললুম—'বটে।'

সুষেণবাবু সগর্ব্বে বললেন—হাঁ। বলাই বাঁড়ুয্যেকে চেনেন? যে ছোকরা সেদিন গড়ের মাঠে তিনটে গোরাকে ছাতা-পেটা করেছিল? আমার আপন মাসতুতো ভাই।'

বললুম—'বলেন কি! আপনারা দেখচি বীরের বংশ। বড় সুখী হলুম। আপনার আর কিছু বাণী নেই ত? আচ্ছা, বসুন তা হ'লে, নমস্কার।'

সুষেণবাবু হঠাৎ মুখখানি করুণ-পানা ক'রে বললেন—'পাঁচটা টাকা হবে কি? মাসকাবার হ'লেই শোধ ক'রে দেব।'

বাঁটলো একটা আধুলি ফেলে দিলে। আমরা রাস্তায় বেরিয়ে এলুম।

ছেলেদের বললুম—'আর ভাবনা কি, কেল্লা মার দিয়া। এখন চট্‌পট্‌ লাখ টাকা তুলে ফেল, নিদেনে দশ হাজার।'

কেউ উত্তর দিলে না, চুপচাপ একে একে নিজের নিজের ঘরমুখো হ'ল। কাত্তিক আর আমি বাঁটলোর সঙ্গে তার বাড়ি এলুম। বাঁটলোর বাপ নেই, নিজেই কত্তা, আর তার মা আমাকে খুব শ্রদ্ধা করেন। বাড়িতে অন্নছত্র লেগেই আছে, যতদিন খুশি থাকো, আদরযত্নের ত্রুটি হবে না।

বাঁটলোর পেটে কথা থাকে না, এসেই তার বোন তুবড়িকে সমস্ত ব্যাপার জানালে। মেয়েটা বিষম ফাজিল। তার ছোট থুবড়িও ফেলা যায় না, একটি খুদে পিঁপড়ে বিশেষ।

সকালবেলা তুবড়ি বললে—'চাটুয্যে মশায়, ছেলেধরারা আপনাদের ছেড়ে দিলে যে বড়?'

বললুম—'ছেড়ে আর দিয়েচে কই, বাড়ি না পৌঁছলে ভরসা পাচ্চি না।'

থুবড়ি কার্ত্তিকের সামনে হাত নেড়ে বললে—'চিনি দেবে থাবা থাবা, থলির ভেতর পুরবে বাবা—'

তুবড়ি বললে—'যা যা এখন বিরক্ত করিস না, বেচারা আগে তেল মেখে ঠাণ্ডা হোক। কাত্তিকদা, তা হলে কেরোসিন আর দেশলাই এনে দি?'

কার্ত্তিক মুখখানা হাঁড়ি ক'রে ব'সে রইল।

তুবড়ি একটা পয়সা বার ক'রে বললে—'কার্ত্তিকদা, এই লাখ টাকা ভরতি ক'রে দিলুম, জিগীষা দেবীকে আমার চাঁদাটা পাঠিও।'

থুবড়ি বললে—'ও কাত্তিকদা, তোমার বাবা তোমায় কি বলেছিলেন বল না?'

আমি বললুম, —'কি আবার বলবেন, বলছিলেন, খবরদার কার্ত্তিক, তুবড়ি থুবড়িকে বে করিস নি, তোর টুকটুকে বউ এনে দেব।'

তুবড়ি বললে—'লোটি রায়ের মতন গাইয়ে, ফাখতা খাঁর মতন নাচিয়ে। আচ্ছা কাত্তিক-দা, তুমি আমাদের ক্লাসের থাকোমণিকে বে করলেই ত পার, ঠিক যেমনটি চাও। ব'লব তাকে?'

কার্ত্তিক তেড়ে উঠে বললে—'দেখ তুবড়ি, আমায় রাগিও না বলচি।'

তুবড়ি তিন হাত পেছিয়ে বললে—'বাস রে! তরুণের খুন আগুন হয়েচে।'

এই রকম সারাদিন তুবড়ি আর থুবড়ির আক্রমণ চলল। বিকেলে কাত্তিক অতিষ্ঠ হয়ে বললে—'চাটুয্যে মশায়, এর চেয়ে বাবার গালাগাল ভাল, বাড়ি চলুন।'

যাবার সময় তুবড়ি বললে—'কাত্তিক-দা, রাগ করলে?' কার্ত্তিক ভীষণ অবজ্ঞার ভঙ্গী ক'রে মুখ বাঁকালে। তুবড়ি একটু জিব বার ক'রে ভেংচালে।

চরণ ঘোষের মনে অনুতাপ হয়েছিল। আমায় বললে,—'চাটুয্যে, কাত্তিককে জিজ্ঞেস কর ও কি চায়, দেড়শ টাকা অবধি খরচ করতে রাজী আছি। বাইসিকেল, সোনার হাতঘড়ি, এক সেট বই—যা ওর পছন্দ।'

কার্ত্তিককে জিজ্ঞাসা করলুম। একটু ভেবে বললে—'দেড়শ টাকায় মিটবে না চাটুয্যে মশায়।'

'বেশ তো, তোর কি জিনিষ পছন্দ বল্ না।'

'জিনিষ চাই না, মানুষ চাই।'

'কাকে চাস রে?'

'তুবড়ি।'

'কিন্তু বল্লরী বাঁড়ুয্যে, লোটি রায়, ফাখ্তা খাঁ এরা সব গেল কোথা?'

কার্ত্তিক আমায় বুঝিয়ে দিলে যে তুবড়িই একমাত্র নারী। জিজ্ঞাসা করলুম—'কি দেখে ভুল্লি রে কার্ত্তিক?'

'সেই যে, চ'লে আসবার সময় ভেংচেছিল, দেখেন নি?

চরণ ঘোষ বিচক্ষণ লোক, আপত্তি করলে না। অঘ্রাণ মাসেই কার্ত্তিকের বিয়ে হয়ে গেল। শুভকর্ম্ম চুকে গেলে রাত দশটার সময় থুবড়ী আমাকে আড়ালে ডেকে বললে—'চাটুয্যে মশায়, হি হি হি!'

'কি হয়েচে রে?'

'এই—দিদি—হি হি হি!'

'আরে গেল যা, হেসেই অস্থির! দিদির কি হয়েচে?'

'এই—দিদি শুভদৃষ্টির সময় আবার জামাইবাবুকে—হি হি হি!'

'কি করেচে?'

'ভেংচেচে।'

৩০ বর্ষ, আশ্বিন ১৩৩৭



উত্তরে

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

বর্ষা তখন শেষ হইয়া আসিয়াছে। কলিকাতার মিঃ এন-গস্ ষ্টক্-ব্রোকার, সপরিবারে হঠাৎ দেশে আসিলেন। সঙ্গে খানসামা, বাবুর্চ্চি, বেয়ারা, দ্বারবান্, কুকুর, মোটর প্রভৃতি চেতন-অচেতন বিস্তর সামগ্রী। বাড়িখানি শহরের প্রান্তভাগে—সুদৃশ্য ও নাতিবৃহৎ। মিঃ গস্ দশ বৎসর পূর্ব্বে এখানি নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু এতকাল একরূপ খালি পড়িয়া ছিল। মফঃস্বল শহরের নানা অসুবিধা হেতু ছেলেরা ত কেহ আসিতই না, মিঃ গস্‌ও ইচ্ছা সত্ত্বেও কাজের ভীড় ঠেলিয়া আসিয়া উঠিতে পারিতেন না; এবং যখন অবসর ঘটিত তখন পশ্চিম বা উত্তর ভারতের অরণ্য ও শৈলমালাবেষ্টিত কোন স্বাস্থ্যকর স্থানেই সপরিবারে যাত্রা করিতেন। কিন্তু এবার কি মনে হইল, তিনি দেশে আসিলেন। নিরালা পল্লীটাও এক বেলার মধ্যে জম্ জম্ করিতে লাগিল।

মিঃ গসের বাড়ির নীচেই প্রকাণ্ড নদী। নদীটা সে সময় কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়া কূল ভাঙিয়া, গ্রাম ভাসাইয়া, ক্ষেতের উপর দিয়া, মাঠ ডুবাইয়া বহিয়া যাইতেছে। তাহার পার স্পষ্ট চোখে পড়ে না। রাত্রিদিন তাহার বিরামহীন মৃদুগম্ভীর জলোচ্ছ্বাসধ্বনি তীরবাসীদের অন্তরে একটা আতঙ্ক জাগাইয়া রাখিয়াছে। সেইদিনই বিকালের দিকে পাইপ টানিতে টানিতে একটা প্রকাণ্ড কুকুর সঙ্গে লইয়া মিঃ গস্ পল্লীটা একবার ঘুরিয়া আসিলেন। শৈশব-সঙ্গীরা কেহ বড় একটা নাই; দুই একজন যাহারা আছে, সকলের সহিত আলাপ করা সম্ভব নয়। তাঁহাদের মাঝের ব্যবধানটা কেবল বিশ বৎসরের নহে—পরিবর্ত্তিত আচার, জীবিকা ও কথঞ্চিৎ প্রকৃতিরও। মিঃ গস্ সেদিন আর কোথাও গেলেন না, নদীর চাতালে ইজি-চেয়ারে বসিয়া পাইপ টানিতে লাগিলেন। কুকুরটাও তাঁহার পায়ের কাছে শুইয়া নদীর দিকে সোৎসুকে তাকাইয়া রহিল।

জেলেরা তখন মাছ ধরিতেছিল। হলদে, নীল, শ্বেত, গৈরিক নানা রঙের ছোট ছোট পাল তুলিয়া প্রায় সত্তর আশীখানি ডিঙি সারি বাঁধিয়া উজানে দূরে চলিয়া যাইতেছে, আবার পাল নামাইয়া স্রোতের টানে ধীরে ফিরিয়া আসিতেছে। মিঃ গসের ইচ্ছা হইল দৃশ্যটা ছেলে-মেয়েদের ডাকিয়া দেখান। কিন্তু খানসামার মুখে শুনিলেন, মেমসাহেব ও মিসিবাবা—তাঁহার বড় মেয়ে খুকী ছাড়া আর সকলে মোটর লইয়া বড় রাস্তা ধরিয়া কোথায় যেন হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছে। মিঃ গস্ একটু মনঃক্ষুন্ন হইলেন। কিন্তু বাড়ির দিকে মুখ ফিরাইতেই দেখিলেন, তাঁহার বড় মেয়ে খুকী দ্বিতলের জানালার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইয়া ডিঙিগুলির দিকেই এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে।

তিনি হাসিয়া উঁচু গলায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিরে খুকী, কেমন লাগছে?"

খুকী হাসিয়া উত্তর করিল—"খুব সুন্দর। আর তোমরা এখানে আসতে চাও না বাবা—"

মিঃ গস্ এ অনুযোগের উত্তরে হাসিতে লাগিলেন। তারপর নদীর দিকে আবার চোখ ফিরাইয়া ধীরে স্মৃতির মাঝে তলাইয়া গেলেন...

ঐ ত ডবিন্ সাহেবের আকমাড়াই কলের কারখানার কেরাণী ভবতারণ ঘোষের বাড়ি। মাত্র খান-দুই খড়ের চালা। কিন্তু বাড়িটার সম্মুখে ও পিছনে অনেকটা জমি। বড় বড় গোটা কয়েক আম, জাম, সজিনা ও নোনার গাছ—মনে পড়িতেছে বেড়ার এক কোণে একটা কুলের গাছও যেন ছিল। বৎসরে বৎসরে সে-গুলি পুষ্পিত ও ফলবান্ হইয়া উঠিত, এখনও উঠে। ভবতারণ যখন মারা যান, ছেলে নিবারণের বিবাহ হইয়াছে। সেও ঐ কারখানায় বিশ টাকা মাহিনায় কেরাণীগিরি করিতেছিল। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর চাকরীটি টিকিল না। নূতন সাহেব আসিয়াই পুরাতন চাল উল্টাইয়া দিলেন। খুকী তখন ছয়মাসেরটি। নিবারণ একবার ভাবিল, মুহুরীগিরি করিবে। নতুবা খাইবে কি করিয়া? আর এই গ্রামতুল্য জঙ্গলাকীর্ণ শহরে তাহাকে চাকরীই বা দিবে কে? পৈতৃক বিত্ত তাহার কিছু নাই;

দেশ ও জমি-জায়গা বলিতে শহরপ্রান্তে ঐ ঠাঁইটুকু। তবে পিতার মুখে একবার শুনিয়াছিল, শহরের পাশেই একখানি গ্রামে তাহাদেরই বাড়ি-ঘর, বাগান-পুকুর, ক্ষেত-খোলা, বড় বড় মরাই প্রভৃতি ছিল। বাড়িতে দুর্গোৎসব হইত। তিনখানি গ্রামের লোক তিন দিন ধরিয়া খাইয়া-লইয়াও তাঁহাদের ভাঁড়ার শূন্য করিতে পারিত না। এত বড় ঘর তাঁহারা! অবশ্য এ-সব নিবারণের পিতাও চোখে দেখেন নাই, তাঁহার পিতামহীর মুখে শুনিয়াছিলেন। তখন কোথায় বা ছিল এই শহর, কোথায় ছিল ঐ রেল-পথ। কিন্তু এখন সে অতীত গৌরব স্মরণ করিয়া লাভ কি? পৃথিবীতে বাঁচিতে হইলে সবলের মতই বাঁচিতে ও জয়ী হইতে হইবে।

নিবারণের চেহারাটি ছিল পুরুষোচিত। ডবিন্ সাহেবের এক বন্ধু একবার কারখানায় বেড়াইতে আসেন। মানুষটি ভাল। তিনি নিবারণকে দেখিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বঙ্গভাষায় জিজ্ঞাসা করেন—"যুবক, টুমি কি বাঙালী?"

"হাঁ স্যার।"

"Strange. ঠিক জান?"

"হাঁ স্যার।"

অতঃপর সাহেব আর কিছু বলিলেন না। নিবারণও—সে মাসে কতগুলি আকমাড়াই কল বিলি হইয়াছিল খাতার উপর ঝুঁকিয়া পূর্ব্ববৎ হিসাব করিতে লাগিল।

কথাটা আজ সহসা নিবারণের মনে পড়িয়া গেল। সেই সাহেবের সহিত দেখা হইলেও হয়ত তাহার কোন সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু তিনি কোথায় থাকেন এবং এখনও এ-দেশে আছেন কিনা তাহা ত সে জানে না। সে স্থির করিল, কলিকাতায় যাইবে। কিছুদিন সাহেব অঞ্চলে ও নানা আপিসে ঘোরাঘুরি করিবে। তাহার ফলে সাহেব অথবা যে কোন একটা চাকরী মিলিবারই সম্ভাবনা। না মিলিলে—না মিলিলে? তাহার পর কি হইবে সে কল্পনায় আনিতে পারিল না। তাহার সমস্ত চিত্ত জুড়িয়া দাঁড়াইল খুকুকে কোলে লইয়া স্মিতমুখী লীলা ও তাহাদের পশ্চাতে স্নেহময়ী স্থবিরা পিতামহী।

লীলার কাছে কথাটি ব্যক্ত করিলে সে বলিল—"এ ছাড়া আর উপায় কি?" যাইবার দিনও সে মুখে কিছু বলিল না; কিন্তু তাহার মনের কথাটি ফুটিয়া উঠিল সজল চোখদুটিতে। খুকুও বিচ্ছেদ বুঝিল না, দুর্দ্দিনও জানিল না। তাহার মাতাকে সারাদিন অকারণ কান্নায় ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখিল। তাহাদের অভিভাবক হইলেন ভবতারণের বন্ধু পাশের বাড়ির রায়খুড়ো। খুড়ো আজ জীবিত থাকিলে কত খুশী হইতেন!

এক মাসের মাহিনা নিবারণ আগাম পাইয়াছিল। টাকা কয়টি তখনও খরচ হয় নাই। অর্দ্ধেক টাকা লীলার হাতে দিয়া বাকী অর্দ্ধেক লইয়া সে কলিকাতায় রওনা হইল। তারপর পূরা দুই বৎসর সে যে গভীর সংগ্রাম করিয়াছে তাহা সে ও লীলা ছাড়া আর কেহ জানে না। সে রন্ধ্রহীন দুঃখ আজ মনে করিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। ঐ সময়ের মধ্যে একবার সে বাড়ি আসিয়াছিল। পিতামহী তখন স্বর্গগতা হইয়াছেন। লীলা ও খুকুর সে দারিদ্র্যক্লিষ্ট শীর্ণ ছবি আজও সে ভুলিতে পারিল না।

কলিকাতায় ফিরিয়া নিবারণ যখন একদিন সন্ধ্যার কাছাকাছি নিতান্ত হতাশ মনে চৌরঙ্গী দিয়া ফিরিতেছিল, দেখিল ডবিন্ সাহেবের সেই বন্ধুটি মোটর হইতে নামিতেছেন। সাহেব যাইতেছিলেন হোটেলে। নিবারণের অন্তর পুলকে নৃত্য করিতে লাগিল। সে ছুটিয়া গিয়া সেলাম করিয়া সাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইলে সাহেব কিন্তু তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"টুমি কি চাও?" বলিতে বলিতে পকেট হইতে 'পার্স'টি বাহির করিলেন।

নিবারণ দমিয়া গেল। তবুও আত্মপরিচয় দিয়া সংক্ষেপে অবস্থাটা বর্ণনা করিতেই সাহেব পার্সটি পুনরায় পকেটে রাখিতে রাখিতে বলিয়া উঠিলেন, —"Now I See, শুনিয়া ডুঃখিট্ হইলাম। কাল আমার সহিট্ ডেখা করিও—" বলিয়া একখানি কার্ড বাহির করিয়া নিবারণের হাতে গুঁজিয়া দিয়াই হন্ হন্ করিয়া হোটেলে চলিয়া গেলেন।

নিবারণের ইচ্ছা হইল তখনই ছুটিয়া গিয়া লীলাকে সংবাদটি দেয়। কিন্তু তাহা সম্ভব নয়

দেখিয়া মনের আনন্দে পথ দিয়া একরূপ ছুটিয়া চলিল। সেদিনটিও নিবারণের জীবনে আর একটি স্মরণীয় দিন। তাহার পর হইতেই দালালী করিয়া নিবারণের ভাগ্য দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। তাহার অল্পকাল পরেই সে লীলা ও খুকুকে কলিকাতায় লইয়া যায়। সেই হইতে দেশের সহিতও আর সম্পর্ক থাকে না। বাড়ি ঘর ভাঙিয়া-চুরিয়া ভিটা জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া উঠে। এমন কি, কিছুকাল ধরিয়া জায়গাটা পল্লীবাসী ও পথিকের একটা ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

মিঃ গস্ কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না আয়ের কোন্ পথ ধরিয়া তাঁহার চাল বদলাইতে সুরু করিল। তিনি সাহেব-পাড়ায় বাড়ি করিলেন, গাড়ি কিনিলেন, বয়, খানসামা, কুকুর রাখিয়া, ধুতি-চাদর-হুঁকা ছাড়িয়া, আহার-পদ্ধতি ফিরাইয়া সাহেব হইয়া গেলেন। এমন কি, লীলারও পরিবর্ত্তন হইতে খুব বিলম্ব ঘটিল না। চাল দুরস্ত করিতে নিবারণ ঘোষ একবার বিলাত গেলেন এবং ফিরিয়া আসিয়াই হইলেন 'মিঃ গস্'! এখন তাঁহার বন্ধু-বান্ধবরাও কেবল সাহেব ও সাহেবী ভাবাপন্ন দেশী লোক। ছেলেরা, এমন কি, ছোট মেয়েটাও ঐ মেজাজ পাইয়াছে। কিন্তু গোল বাধাইয়াছে ঐ খুকী। এতদিন ধরিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা দিয়াও কোন ফল হইল না। মেয়েটা তাহা সম্পূর্ণ পরিপাক ত করিলই, এখন আবার ঐ-সব চালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ভাইদের সে 'সাহেব' বলিয়া ডাকে। তাহাকে পরিজনবর্গ 'দিদিমণি' না বলিয়া ডাকিলে রাগিয়া আগুন! মিঃ গস্ মেয়ের পাগলামীতে মনে মনে হাস্য করিলেন। তাহার প্রতি স্নেহে তাঁহার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

সেই সঙ্গে একটা দুশ্চিন্তাও দেখা দিল। মেয়েটা কিছুতেই বিবাহ করিবে না। বিলাত-ফেরৎ কত ভাল ভাল ছেলের সহিত তাহার সম্বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের কাহাকেও সে পছন্দ করিল না। তাহার পছন্দ হইয়াছে মিঃ রে'র এক আত্মীয় সেই গ্রাম্য গ্র্যাজুয়েটটিকে। কিন্তু তাঁহার মেয়ের উপযুক্ত পাত্র সে হইতেই পারে না। অবশ্য ছেলেটি যে নিতান্ত খারাপ তাহা বলা যায় না, বরং ভালই; স্বাস্থ্যবান, শিক্ষিত, দেশে প্রচুর জমিজায়গা। ঘরও লেখাপড়া জানা, কিন্তু কলিকাতায় বাড়ি নাই। ছেলেটি থাকে গ্রামে চাষ-বাসের কাজ লইয়া। বিবাহ হইলে খুকীকে চিরজীবন থাকিতে হইবে গ্রামে। কথাটা ভাবিলেই মন দমিয়া যায়। কিন্তু ও যা মেয়ে—স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে। এই ত এখানে আসিয়া অবধি ওর আনন্দ ধরে না।

মিঃ গস্ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া সেখানে পায়চারি করিতে লাগিলেন। এই জীবন-যাত্রার প্রতি কেমন একটা বিতৃষ্ণা দেখা দিল। জানালার দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, খুকী নাই। পাইপটা বহুক্ষণ নিভিয়া গিয়াছে। আবার তাহাতে আগুন দিয়া পেণ্টুলুনের দুই পকেটে হাত পুরিয়া নদীর দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। নদীর চঞ্চল ও তরঙ্গময় গৈরিকধারায় সোনা ঢালিয়া পশ্চিমে কোমল কৃষ্ণ মেঘান্তরালে তখন সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। ডিঙিগুলি পাল গুটাইয়া জাল ডুবাইয়া মাছ ধরিতে ধরিতে স্রোতের টানে ভাসিয়া চলিতেছিল। এই সময়টা ইলিশ মাছ উঠে প্রচুর।

মিঃ গসের সম্মুখে আসিয়া একখানা ডিঙি জাল উঠাইতেই তাহার মধ্যে এক জোড়া ইলিশ ধড়্ফড়্ করিয়া উঠিল যেন জীবন্ত রূপা। মিঃ গস্ প্রায় ছুটিয়া ঘাটে নামিলেন। সেখান হইতে হাঁক দিলেন—"মাঝি ও মাঝি—"

মাঝি ফিরিয়া দেখিল সাহেব। মিঃ গসের হাঁক শুনিয়া একজন খানসামা ছুটিয়া আসিল। সেও হাঁকিতে লাগিল—"এ মান্‌ঝি—"

মাঝি প্রথমে বলিল—"মাছ বিক্রীর নয়"—কিন্তু হাঁকডাকের প্রাবল্য দেখিয়া ঘাটে আসিয়া নৌকা ভিড়াইল।

মিঃ গস্ মাছ দুইটি কিনিতে রীতিমত দরদস্তুর সুরু করিলেন এবং মাঝিকে প্রাদেশিক ভাষায় কথা কহিয়া বুঝাইয়া দিলেন, তিনি সেখানকারই লোক, কোন পুরুষেই সাহেব নহেন। অনেক দরাদরির পর মাঝি মাছ দুইটি খানসামার হাতে তুলিয়া দিবার উপক্রম করিতে মিঃ গস্ হাত বাড়াইয়া দুই আঙুলে দুটিকে ঝুলাইয়া লইলেন। চলিতে চলিতে তাঁহার সাদা পেণ্টুলুনের গায়ে মাছের কাঁচা রক্তের ছাপ লাগিয়া গেল। সে-দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। খানসামা কি ভাবিতেছে আজ তাহাও চিন্তা করিলেন

না, মহানন্দে অন্দরে প্রবেশ করিয়াই মিঃ গস্‌ ডাকিলেন,—"কৈ গো? কোথায় গেলে?"

গস্‌-পত্নী তখন গৃহাভ্যন্তরে কি এক কর্ম্মে রত ছিলেন, এ কারণেও বটে—সুদীর্ঘ কাল এমন ডাক শুনেন নাই বলিয়াও—প্রথমটা বিস্মিত হইলেন। সেই ভাবেই বাহিরে আসিয়া দেখেন, মিঃ গস্‌ সহাস্যমুখে উঠানে দাঁড়াইয়া, হাতে দুটি মাছ।

গস্‌-পত্নীর মধ্য হইতে সহসা যেন বাঙালী গৃহলক্ষ্মী লীলা স্মিতমুখে বাহির হইয়া আসিল। তিনি স্বামীর মুখের দিকে এক ঝলক তাকাইয়া মাছ দুটি তাঁহার হাত হইতে লইলেন।

খুকীও নামিয়া আসিয়াছিল। ভৃত্য বঁটি আনিলে সে বলিল,—"তুমি রাখ মা, আমি কুটব।"

বহুকাল যাহা করেন নাই, একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিলেন, সেই গৃহকর্ম্মটিতে কি আনন্দ ছিল জানি না গস্‌-পত্নী—"না, তুই পারবি না। সর্‌ সর্‌—অত বড় মাছ নষ্ট হয়ে যাবে—" বলিতে বলিতে কন্যাকে সরাইয়া দিয়া বঁটি পাতিয়া সেখানে বসিয়া গেলেন।

তারপর মাছ দুটি কাটিয়া-কুটিয়া পাকশালায় গিয়া নিজেই তাহা হইতে নানারূপ ব্যঞ্জন করিতে লাগিলেন। রন্ধনে মা ও মেয়ের তেমন উৎসাহ পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। কিন্তু রন্ধন সারিয়া যখন বাহির হইয়া আসিলেন, অগ্নি-তাপে ও শ্রমে গস্‌-পত্নীর মুখ চোখ লাল ও ঘর্ম্মাক্ত। ইতিমধ্যে ছেলেরাও হাওয়া খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাহারা দেখিল মা ও দিদি রান্না করিতেছে। দেখিয়া পরম কৌতুক অনুভব করিল।

মিঃ গস্‌ পত্নীকে কহিলেন—"আজ আর টেবিলে খেতে ইচ্ছে করছে না, মাটিতে—"

অঞ্চলে মুখের ঘাম মুছিতে মুছিতে লীলা বলিল—"সে আমি জানি।"

সকলের আহারের ঠাঁই হইল প্রকাণ্ড দালানে—পিঁড়ি ও আসনাভাবে একখানি বড় সতরঞ্চি লম্বালম্বি ভাঁজ করিয়া পাতিয়া দেওয়া হইল। মিঃ গস্‌ তখনও কাংস্যপাত্র সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। গস্‌-পত্নী কন্যার সাহায্যে স্বহস্তে ভাত বাড়িলেন, ব্যঞ্জন সাজাইলেন। তারপর মিঃ গস্‌কে ডাকিতে গেলেন—"এস গো, খেতে দিয়েছি।"

মিঃ গস্‌ তখন পেণ্টুলেন ছাড়িয়া ধুতি পরিতেছিলেন। ত্যক্ত পরিধেয়টিকে হাত দিয়া ঠেলিয়া দিতে দিতে বলিলেন,—"যাই, এই খোলসটা আগে বিদায় করি—"

ছেলেরা সকলেই তাঁহার সহিত খাইতে আসিল। কিন্তু বড় ছেলের ঘোর আপত্তি—সে পা মুড়িয়া বসিয়া খাইবে না। এ ভাবে বসিয়া লোকে কি করিয়া খায় তাহা বুঝা তাহার বুদ্ধির অতীত। মিঃ গস্‌ তাহাকে এক ধমকে থামাইয়া বলিলেন—"এবার থেকে সকলকে এই ভাবে খেতে হবে—" তারপর মেয়ের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"কৈ তোরা বস্‌লি না?"

মেয়ে বলিল—"তোমরা খাও। মা আর আমি একসঙ্গে খাব।"

মিঃ গস্‌ হাসিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। একটু ব্যঞ্জন মুখে দিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"বাঃ চমৎকার! কতকাল যে এমন রান্না খাইনি—"

মেয়ে বলিল,—"ওটা মা রেঁধেছে—"

মিঃ গস্‌ অপাঙ্গে একবার পত্নীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন, লাল হইয়া উঠিয়াছে।

আহার যখন অর্দ্ধেক হইয়াছে, মিঃ গস্‌ বলিলেন—"দেখ, ভেবে দেখলুম মিঃ রে'র আত্মীয় সেই ছেলেটি সত্যিই ভাল। ওর সঙ্গেই খুকীর বিয়ে দেব। তাছাড়া খুকীরও যখন পছন্দ—"

কন্যাকে লইয়া গস্‌-পত্নী তখন পরিবেশন করিতেছিলেন। বলিলেন—"ভালই তো। ওরে খুকী, ছেলেদের ভাত দিতে দিতে চলে গেলি কেন?"

মিঃ গসের কনিষ্ঠ পুত্র বলিল—"দিদির লজ্জা হয়েছে—"

নিবারণ দেখিলেন স্ত্রীর মুখ প্রসন্ন নয়। তখন আর কিছু বলিলেন না। আহারান্তে পুনরায় স্ত্রীর দেখা পাইলে কহিলেন, "স্ত্রী-চরিত্র সত্যিই দুর্জ্ঞেয়—"

স্ত্রী কহিলেন—"পুরুষদের চেয়ে নয়—"

"তাই প্রথমে ঐ ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়ে এখন খুসী হতে পারছ না—"

"আর তুমিও প্রথমে আপত্তি করে এখন রাজী হ'য়ে পড়েছ—" তারপর ক্ষণিক নীরব থাকিয়া—"মেয়ে যাতে সুখী হয় আমি তাই চাই। কিন্তু সে-ছেলে কি আজও বিয়ে না ক'রে বসে আছে?"

"কি বলছ তুমি? আমার মেয়ের জন্য চিরকাল বসে থাকবে—"

"বেশ তবে শীগগির দেখ—"

ইহারই মাস দুই পরে একদিন ঐ গৃহখানি মঙ্গলঘট ও আম্র-পল্লবে সুসজ্জিত হইয়া সানাইয়ের সুরে ভোরের কোমল আলোকোদ্ভাসিত প্রশান্ত আকাশে সেই শুভ বার্ত্তাটি উড়াইয়া ছড়াইয়া দিতে লাগিল। সারা-গৃহ আনন্দে কলস্বরে মুখর।

দ্বিপ্রহরে বৈঠকখানার ঢালা ফরাসে বসিয়া নিমন্ত্রণ-যোগ্য ব্যক্তিদের ফর্দ্দ প্রস্তুত হইতেছিল। পাড়ার গণ্যমান্য প্রায় সকলেই উপস্থিত। অম্বুরী তামাকের ধূম, খোস-গল্প ও হাসি-ঠাট্টায় ঘরখানি মশ্‌গুল।

মিঃ গসের হাত হইতে গড়গড়ার নলটি লইতে লইতে ভূজঙ্গ দত্ত বলিলেন—"নিবারণ, তুমি দেশে আস কেবল আমাদের মনে দুঃখ দিতে—"

"কেন? কেন?"

"এ আনন্দের হাট ভেঙে দিয়ে আবার ত দু-দিন বাদে চলে যাবে।"

"না দাদা আর যাব না। যে-কটা দিন বাঁচি এখানেই কাটাব। জায়গাটা ভারি মিষ্টি—" বলিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল ঐ জলভারাতুর নদী, শস্যক্ষেত, গ্রাম, এ-সবার ঊর্দ্ধে নীলাকাশ ব্যাপিয়া যে মাধুর্য্য ও শ্রী ফুটিয়া আছে তাহার তুলনা আর কোথাও মিলিবে না। ইহা কেবল তাঁহার এই জন্মভূমির—বাংলার।

৩৩ বর্ষ, মাঘ ১৩৪০



সতীন

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

তিন দিন হয় পূজার ছুটিতে শরৎ বাড়ী আসিয়াছে।

সুকুমারী এতদিন পথ চাহিয়া বসিয়া ছিল। সে যতটুকু চাহিয়াছিল স্বামীর কাছে আজ তার চেয়ে ঢের বেশী আদর পাইয়াছে—তাই তাহার রমণীহৃদয়খানি অকুণ্ঠিত তৃপ্তির মধ্যে গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছে।

হাতে নির্দিষ্ট কোনও কাজ ছিলনা; সকালে ডাক আসে, শরৎ পোষ্ট আফিসে চিঠি আনিতে যায়—দুপুর বেলাটা খুঁটিনাটী লইয়া কাটায়; কোনও দিন বা একখানা নভেল লইয়া একটু পড়ে। বৈকালে পাড়ার এবাড়ী ওবাড়ী বেড়ায়।

সমস্ত দিনটাই রাত্রির অপেক্ষায় কাটিয়া যায়—রাত্রি যখন আসে, তখন তাহার জন্য প্রীতি ও তৃপ্তি লইয়াই আসে। ষোড়শী সুকুমারী সে প্রীতির উৎস—তাহার অকুণ্ঠ প্রেমই সে তৃপ্তির মূল।

দুপুর। হাতে কোনও কাজ নাই—নভেল পড়া শেষ হইয়া গিয়াছে। হাতের কাছে শরৎ সুকুমারীর ক্যাশ্‌বাক্‌সের চাবিটা পাইল—বাক্‌স খুলিবা মাত্র একটা সুমিষ্ট গন্ধে সমস্ত ঘরটা পরিপূর্ণ হইয়া গেল; যেন সুকুমারীর অমূর্ত্ত প্রেমটুকু গায়ে এসেন্স মাখিয়া শরতের চারিপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ছোট বাক্‌সটি; ঢের জিনিষ তার মধ্যে। একটা ছোট শ্বেতপাথরের বাক্‌স—কয়েকটা সুদৃশ্য কড়ি—একছড়া শুকনো বকুলফুলের মালা, একটা গন্ধরাজ ফুল, কুর্শির কাঁটা, আরো কত কি।—আর কতকগুলি চিঠি। সবগুলি কেমন সুন্দর সাজানো—গুছানো।

শরৎ সুকুমারীকে কলিকাতা থাকিতে যে চিঠিগুলি লিখিয়াছে সেগুলি একটা সবুজ রেশমী ফিতা দিয়া বাঁধা—প্রত্যেকখানিতে নম্বর দেওয়া; আষাঢ় হইতে পূজার ছুটি পর্য্যন্ত, ৪৭ খানি;—শরৎ গণিয়া দেখিল। একখানি টানিয়া লইয়া একটু পড়িল।

অন্য একভাগে আর কতকগুলি চিঠি। একখানির উপর সুকুমারীর হাতের মোটা উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা "মা, তোমাদের জন্য আমার মন কেমন করে। আমাকে কবে নিয়ে যাবে?"

শরৎ পড়িয়া ভাবিল, সুকুমারীকে সঙ্গে করিয়া ছুটিতে একবার শ্বশুরবাড়ী বেড়াইয়া আসিবে।

পাশে আর কতকগুলি চিঠি, সেগুলি ভালো করিয়া গুছানো নয়। শরৎ টানিয়া লইয়া একখানি চিঠি পড়িল—আর একখানা পড়িল—তারপর আর একখানা। চিঠি পড়িয়া তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল—দৃষ্টির সম্মুখে একখানি কালো যবনিকা কে যেন টানিয়া দিল। সমস্ত ঘরটা, খাট চেয়ার টেবিলগুলি, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া তাহারি চারিপার্শ্বে ঘুরিতে লাগিল।

একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া শরৎ চিঠির তাড়ার মধ্য হইতে ৮/৯ খানি চিঠি বাহির করিয়া লইয়া বাক্‌স চাবিবন্ধ করিল।

শুনা যায় মাটি খুঁড়িতে যাইয়া সাপ বাহির হইয়া অনেককে কামড়াইয়াছে। তুচ্ছ খুঁটিনাটী করিতে যাইয়া শরৎ এমনি একটা দুষ্ট সর্প বাহির করিয়া বসিল, যাহা তাহাকে দংশন করিয়া তীব্র হলাহল ঢালিয়া দিল।

যাতনার তীব্রতায় শরৎ ভাবিল, সমস্ত বিশ্বসংসারটা বুঝি দানবের সৃষ্টি। এখানে একনিষ্ঠ প্রেম নাই, বিশ্বাস নাই; আছে শুধু প্রতারণা, আর বিশ্বাসঘাতকতা। বিশ্বাস করিয়া যে শাখা ধরিবে তাহাই ভাঙ্গিয়া যাইবে; মানুষগুলি সবাই মুখোস্ পরিয়া আছে, কাহাকেও চেনা যায়না।

শরৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। সমস্ত প্রকৃতি আজ তাহার চক্ষে অসুন্দর, অকরুণ!

সুকুমারীর বিড়ালটা লেজ উঁচু করিয়া তাহার পায়ে গা' ঘসিয়া ঘুরিতে লাগিল—শরৎ বিরক্ত হইল; বিড়ালটার কোমলস্পর্শও যেন তাহার গায়ে কাঁটার মত বিঁধিল। সেটাকে এক লাথিতে দূর

করিয়া শরৎ চলিয়া গেল। বিড়ালটা 'মিউ মিউ' রবে মানুষেব নিষ্ঠুরতাকে ধিক্কার দিয়া, রান্নাঘরের দিকে ভর্জ্জিত মৎস্যের সন্ধানে প্রস্থান করিল।

সেই রাত্রের গাড়ীতেই শরৎ কলিকাতার উদ্দেশে রওনা হইল। মাকে বুঝাইল, আইন পরীক্ষা দিতে হইবে—কলিকাতায় পড়ার সুবিধা হইবে। সুকুমারীকে কিছুই বলিল না! সুকুমারী বুঝিল, রাগ তাহার উপরেই। অপরাধ যখন খুঁজিয়া পাইল না—তখন সে আর কি করিবে। —খুব খানিকটা কাঁদিল; কাঁদিয়া বুকের ভার কমিল না—কাজেই তাহার কান্নাও থামিল না।

(২)

মেসের ঘরে ঢুকিয়া শরৎ ডাকিল "নীরদ!"—নীরদ শরতের বন্ধু। পড়িবে বলিয়া ছুটিতে বাড়ী যায় নাই। সে স্টোভে চা'য়ের জল গরম করিতেছিল।

নীরদ আশ্চর্য হইয়া বলিল "কিরে, তুই যে ফিরে এলি?"

শরৎ দরজা বন্ধ করিতেছিল, ফিরিলে নীরদ দেখিল, তাহার চেহারা বিবর্ণ, রুক্ষ, পাগলের মত।

শরৎ নীরদের হাত ধরিয়া সজোরে টানিয়া বিছানার উপর বসাইল—বলিল—"শোন্"—

গাড়ীর মধ্যে সমস্ত রাত্রি ভাবিয়া শরৎ স্থির করিয়াছিল নীরদকে সব বলিবে: নীরদকে লুকাইবার তাহার কিছুই ছিল না।

"বৌ'র উপর রাগ করেছিস্ বুঝি?—রাখ্ আমার চা'টা"—

"রাখ্ তোর চা"—উগ্র কণ্ঠে শরৎ বলিল।

নীরদ বুঝিল, ব্যাপার গুরুতর; ভাবপ্রবণ শরৎ অত্যন্ত আঘাতই পাইয়া আসিয়াছে।

শরৎ সব বলিল; তারপর চিঠিগুলি নীরদের হাতে দিয়া অস্থিরভাবে দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িল। হায়! পত্নীর বিশ্বাসঘাতকতা আজ এমন করিয়াও তাহাকে প্রকাশ করিতে হইল!

নীরদ একে একে সবগুলি চিঠি পড়িল। চিঠির প্রত্যেকখানিতেই একটা আকুল প্রেমের অভিব্যক্তি। প্রেমিক যেন তাহার প্রিয়তমার বিরহে অস্থির, আকুল। বিরহবেলার কল্পনাকে মিলনবাসবে তাহারা কেমন করিয়া সার্থক করিবে—এমনি কত আশা আনন্দের কথা তাহাতে। প্রেমাধিষ্ঠিতাকে ঘিরিয়া একটা সুমধুর প্রেমগুঞ্জনগীতিই মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এতটুকু মলিনতা, অপবিত্রতা তাহার কোথায়ও নাই।

নীরদের মুখে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিতেছিল। "তুই একটা মস্ত গাধা"—বলিয়া সে চিঠিগুলি শরতের গায়ের উপর ফেলিয়া দিল।

"কি রকম?" বিস্মিত শরৎ বলিল।

নীরদ গম্ভীরভাবে চা তৈয়ারী করিতে করিতে বলিল "কি রকম? চা খেয়ে নে, বল্‌ছি।" নীরদ শরতের হাতে চায়ের পেয়ালা দিল।

শরৎ চা'য়ের পেয়ালা টেবিলের উপর রাখিয়া দিল।

"পাপিষ্ঠ, চা' খাবিনে? —আত্মহত্যা করবি? না, দেশত্যাগ হয়ে সন্ন্যাসী করবি, আর তার পরদিন ইংলিশম্যান বড় বড় অক্ষরে সংবাদ দেবে A GRADUATE SANNYASI IN THE PUNJAB MAIL! ওরে গাধা, বৌ যে চিন্তিত হবেন।"

শরৎ এ হাসি তামাসার কোনও অর্থ বুঝিতে পারিল না। চুপ করিয়া নীরদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"দ্যাখ, তোর বৌয়ের lover নলিনী লোকটা কে জানিস্?"—

শরতের মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল।

"নলিনী—নলিনীকে জানিস্‌নে?" —নীরদ বলিল।

শরৎ কাঠের মত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল; তাহার মুখ কাগজের মত সাদা হইয়া গিয়াছে।

দেখিয়া নীরদ বলিল, "আমার ছোট বোন্ নলি'কে চিনিস্‌নে? তোদের পাশের বাড়ীর হেমের স্ত্রী; —দেখছিস্‌নে সব চিঠিগুলিতেই রাঁচীর মোহর রয়েছে—হেম রাঁচিতে উকীল জানিস্ তো?"

শরৎ অন্ধকারে আলোক দেখিল। যে সংশয়ের কালো মেঘ হৃদয় আবৃত করিয়া সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা একটা দমকা বাতাস আসিয়া উড়াইয়া দিল।

"ব্যাপার কি?"—নীরদের হাত চাপিয়া ধরিয়া শরৎ বলিল।

"ছাড় লাগে; —এর মধ্যে একটা রহস্য আছে। তুই বাড়ী গিয়ে তোর বৌকে জিজ্ঞাসা কর্‌গে।"

"তোর বোনের হাতের লেখা কি করে বুঝলি?"

"লিখতে শিখিয়েছি আমি তাকে, আর আমিই তার হাতের লেখাটা চিনিনে। আর এ যে মেয়ে-হাতের লেখা, তা তুই ছাড়া যে কোন মূর্খও বুঝতে পারে।"

অবিশ্বাস ও সন্দেহ তাহার বিচারক্ষমতা নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। রাগের মাথায় সে মেয়েলি লেখাটাও চিনিতে পারে নাই; এমনি মূর্খ সে।

সাড়ে আট্‌টা; ন'টায় গাড়ী। শরৎ উঠিল। পথে একটা দোকান হইতে নীরদ কিছু খাবার কিনিয়া দিল।

আবার গাড়ী ছুটিয়াছে—শরৎ ভাবিল, বড় আস্তে চলিয়াছে। ষ্টেশনে দু'মিনিট দেরী করিলে, শরতের মনে হয়, দু'ঘণ্টা। সুকুমারীর জন্য একটা আশঙ্কা ও উদ্বেগে তাহার বক্ষ ভরিয়া উঠিতেছে।

অস্তগামী সূর্য্যের শেষরশ্মি, পশ্চিম আকাশের ক্ষুদ্র খণ্ডমেঘগুলিকে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত করিয়া দিয়া, এক অপূর্ব্ব স্বপ্নলোকের সৃষ্টি করিতেছে।

শরৎ তাহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, মেজের উপর আঁচল বিছাইয়া সুকুমারী শুইয়া রহিয়াছে।

কম্পিত কণ্ঠে শরৎ ডাকিল, "সুকু,"—

সুকুমারী শরতের মুখের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিল—তারপর তাহার অশ্রুসিক্ত দুই চক্ষু, শরতের কাছে, মৌন ভাষায় হৃদয়ের সমস্ত বেদনা নিবেদন করিয়া দিল। অপরাধী শরৎ, সান্ত্বনা দিতে আসিয়া, ভাষা খুঁজিয়া পাইল না—এমনি নিরুপায় সে!

কিন্তু উভয় পক্ষের আকাঙ্ক্ষিত মিলন, ভাষার দীনতার জন্য বাধিয়া থাকেনা। সুতরাং শরতের কুণ্ঠা ও ভাষার অপটুতা সত্ত্বেও সঞ্চিত মেঘরাশি, সুকুমারীর অশ্রুসজল হাস্যদীপ্তিতে, গলিয়া ভাসিয়া বিলীন হইয়া গেল।

কথাবার্ত্তার মধ্যে কৌশলে শরৎ কহিল—"নলিনীর চিঠি পেয়ে থাক সু?"—

সুকুমারীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, হাসিতে হাসিতে সে বলিল—"সে এক ভারি মজা! নলিনী যে তোমার 'সতীন'!"

একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া শরৎ বলিল, "কি রকম?" শরতের ভুল তাহাকে বৃশ্চিকের ন্যায় দংশন করিতেছিল।

"তা' বুঝি জান না। সে যে আমার 'প্রিয়তম,' আর আমি তা'র 'প্রিয়তমা'! সেই সম্পর্কই পাতিয়েছি আমরা। —সে যে চিঠি লেখে আমার কাছে, তা দেখলে তুমি বল্‌বে যে—আমার আর একটি প্রেমিক জুটেছে!"—

তারপর হাস্য ও কৌতুকের মধ্যে শরৎ তাহার 'সতীনের' অনেকগুলি 'প্রেমপত্র' পড়িয়া ফেলিল।

যে দুষ্ট সর্প শরৎকে দংশন করিয়া বিকৃতরূপ ও তীব্র যাতনা দিয়াছিল, আজ সে-ই তাহাকে দিব্যকান্তি ও প্রীতি প্রদান করিয়া, নলরাজার ন্যায় অভিনন্দন করিল।

১১ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮



অর্থমনর্থম

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ডাক্তারীর শেষ পরীক্ষার ফল জানিয়া দেশে ফিরিলাম। মেডিকাল কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া কতকটা কৃপণের বাড়ী ভোজ দেওয়ার মত। আচমন করিবার পূর্ব্বে তাহা কোন মতেই প্রত্যয় করা চলে না। তাই কলেজের নোটিসবোর্ডে ছাপার অক্ষরে যেদিন আমার নাম দেখা গেল তাহার পরদিন দীর্ঘ ছয় বৎসরের বাসার সহিত সবরকম দেনাপাওনা মিটাইয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

পরীক্ষার পর, বিশেষতঃ পরীক্ষা পাশ করার পর, দেশে যাওয়া ছাত্র-জীবনের চিরাগত প্রথা—তাহার মধ্যে কিছুই অপূর্ব্ব ছিল না। কিন্তু আমার দেশে যাওয়ার মধ্যে সে সহজ চিরন্তন কারণ ছাড়া গুরুতর কারণও বিদ্যমান ছিল। কিছুদিন হইতে দেশে যাইবার জন্য একটু বিশেষভাবে আমার ডাক পড়িয়াছিল, এবং সে ডাকের মধ্যে যে বিশেষ উদ্দেশ্যটি নিহিত ছিল তাহার রহস্যোদ্ভেদ করিবার পক্ষে যতটুকু বুদ্ধি এবং অনুমান-শক্তির প্রয়োজন তাহার অভাব আমার ঘটে নাই। আমি বুঝিয়াছিলাম বিবাহের জন্য আমার ডাক পড়িয়াছে। যাঁহারা আমাকে ডাকিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রতি অথবা তাঁহাদের ডাকার উদ্দেশ্যের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা ছিল না। কারণ মেডিকাল কলেজের ছয় বৎসরের অনবসরের মধ্যে বিবাহ করিব না, এইরূপ একটা লোমহর্ষণকারী কাব্য আমার চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করিবার সুবিধা খুঁজিয়া পায় নাই। শৈশব হইতে নিতান্ত সাদাসিধাভাবেই মানুষ হইতেছিলাম। লেখাপড়া শেষ করিয়া বিবাহ করিব এবং তাহার পর যথানিয়মে পিতা হইতে পিতামহ হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিব,—এইরূপ একটা নিতান্ত সহজ এবং সাধারণ ধরণের জীবনকল্পনা আপনা-আপনিই আমার মনের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাই প্রথম যেদিন মেডিকাল কলেজের ছাড়-পত্র পাইলাম, বিলম্ব না করিয়া তাহার পরদিনই তল্পিতল্পা লইয়া দেশে রওয়ানা হইলাম।

দেশে আসিয়া দেখিলাম আমার অনুমান ভুল হয় নাই। বিবাহই বটে। তবে শুধু বিবাহ বলিলে সবটুকু বলা হয় না। তাহার সহিত আরও একটি বৃহত্তর এবং মহত্তর উদ্দেশ্য সফল হইবার অপেক্ষায় ছিল। আমার পিতা দরিদ্রই ছিলেন, এবং আমার ডাক্তারী পড়ার অমিত ব্যয়ভার বহন করিয়া সে দারিদ্র্য হ্রাস পায় নাই, তাহাও সত্য। সেই বহুকষ্ট-অর্জ্জিত ডাক্তারী-শিক্ষাকে প্রথম হইতে সার্থক করিবার উদ্দেশ্যে পিতা আমার দ্বারা আমাদের সংসারকে দারিদ্র্য-রোগ হইতে নিরাময় করিয়া লইবার জন্য একটি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। একটি মানুষের পরিবর্ত্তে একটি পরিবারের চিকিৎসার ভার আমার উপর সর্ব্ব প্রথম পড়িয়াছিল।

আমাদের গ্রামের যিনি জমিদার তাঁহার অবিবাহিতা কিন্তু বিবাহযোগ্যা একটি কন্যা ছিল। সেই কন্যাটি তাঁহার একমাত্র কন্যা, যদিও একমাত্র সন্তান নহে। শুনিলাম সেই কন্যাটির সহিত আমার বিবাহ স্থির হইয়াছে, এবং রূপে ও গুণে কন্যাটি লক্ষ্মীস্বরূপা। রূপে-লক্ষ্মী সেকথা আমার শুনিয়াই বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু গুণে যে লক্ষ্মী সে বিষয়ে সংশয়ের কোন কারণ ছিল না, কেননা কথা হইয়াছিল দশ হাজার টাকা নগদ এবং পাঁচ হাজার টাকার অলঙ্কার লইয়া আমাদের গৃহলক্ষ্মী আমাদের গৃহে শুভাগমন করিবেন, এবং তাঁহার পিতা, অর্থাৎ আমার ভাবী শ্বশুর, কলিকাতায় থাকিয়া ডাক্তারী ব্যবসায় চালাইবার মত আমার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। এমন কথাও নাকি তিনি বলিয়াছিলেন যে যতদিন আমি স্বাবলম্বী না হইব ততদিন তিনি আমাকে মাসহারা দিবেন। আমার প্রতি এই বিপুল কৃপাবর্ষণ করিবার কারণ এই যে তাহা হইলে তাঁহার কন্যাটি পরের হাতে পড়িয়াও পর হইবে না, এবং যাহার হাতে পড়িবে তাহার মত দ্বিতীয় পাত্র আমাদের অঞ্চলে বাহির করা যে অসম্ভব তাহা শত্রুপক্ষেরও অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না। তখন অকাল চলিতেছিল, তাই দিন পনের পরে কন্যাপক্ষ আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইবেন কথা ছিল, এবং তাহার দশ পনেরো দিন পরেই বিবাহ।

বাঙ্গলাদেশে পুরুষমানুষের বিবাহ কঠিন ব্যাপার নহে, বিশেষতঃ সেই সকল পাত্রের পক্ষে যাহাদের কপালে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শেষ ছাপ পড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হওয়ার মধ্যে আনন্দের কথা থাকিলেও বিস্ময়ের কথা কিছু ছিল না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোত্তম পাত্রের জন্যও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ যতটা করিয়া যাইতে পারেন নাই, আমার জন্য পিতা তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাই, যে কিশোরীটির আমাদের অন্তঃপুরে এবং আমার হৃদয়পুরে আসিয়া প্রবেশ করিবার কথা, তাহার প্রবেশের জন্য আমরা ততটা ব্যগ্র হই নাই, যতটা হইয়াছিলাম সেই সকল সামগ্রীগুলির জন্য যাহাদের লোহার সিন্দুকে আসিয়া প্রবেশ করিবার কথা ছিল। অর্থাৎ হৃদয়ের কবাট যথাকালে মুক্ত হইবার অপেক্ষায় ছিল, কিন্তু সিন্দুকের কবাট আমরা পূর্বাহ্নেই খুলিয়া রাখিয়াছিলাম।

নগদ দশহাজার টাকার মধ্যে পছন্দর কোন কথা ছিল না। আমাদের সংসারের ইতিহাসে এমন কোনও বড়লোক জন্মগ্রহণ করেন নাই যিনি তাহা পছন্দ না করিতেন। তাই টাকা এবং অলঙ্কারের সহিত রক্তমাংসের যে পদার্থটির আসিবার কথা ছিল, সংসারের লাভের খাতে তাহাকে স্থান দেওয়া হয় নাই; সকলেই সোনা এবং রূপার স্বপ্ন দেখিত। এমন কি আমারও কানে মলের রুনুঝুনু অপেক্ষা টাকার ঝন্‌ঝনানিটাই বেশী বাজিত এবং নিরালা গৃহকোণে নোলকপরা একটি ঢলঢলে মুখ অপেক্ষা জমিদার শ্বশুর মহাশয়ের পুষ্ট গুম্ফের চিত্র বেশী মনে পড়িত।

আমাদের সংসারে সকলের মনের অবস্থা যখন ঠিক এইরূপ, তখন ঘটনাস্রোত ধীরে-ধীরে অন্যদিকে ফিরিবার উপক্রম করিল। সুবিধার পূর্ণিমায় আমাদের শীর্ণ সংসারে যে রূপার বান ডাকিবার কথা ছিল, দিনের পর দিন পলি পড়িয়া তাহার পথ বন্ধ হইয়া গেল। কেমন করিয়া এইবার সেই কথা বলিব।

ডাক-টিকিট কিনিবার জন্য সেদিন গ্রামের ডাকঘরে গিয়াছিলাম। দেখিলাম ঘরের মধ্যস্থলে বসিয়া গৌরবর্ণ প্রৌঢ় একটি ভদ্রলোক সম্মুখে টাকা পয়সা সাজাইয়া নিবিষ্ট মনে হিসাব মিলাইতেছেন। বুঝিলাম তিনি পোষ্টমাষ্টার এবং নূতন আসিয়াছেন। পাঁচটা বাজিতে তখন বেশী বিলম্ব ছিল না। আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "কি চাই আপনার?"

আমি কহিলাম, "চারখানা দু পয়সার টিকিট।"

গণনার মধ্যে ফরমাইস করিয়া ভদ্রলোককে একটু বিব্রত করিয়াছি তাহা বুঝিতে পারিলাম। তিনি একবার উঠিবার চেষ্টা করিলেন, একবার হিসাব এবং টাকা পয়সার দিকে চাহিয়া একটু চিন্তা করিলেন, তাহার পর ঘরের এক দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "মনুমা, এই চারখানা টিকিট বাবুকে দাও ত।"

একটি তের চৌদ্দ বছরের মেয়ে পোষ্টমাষ্টারের নিকট হইতে চারখানি টিকিট লইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। সহসা একটি প্রাপ্তবয়স্কা বালিকার সম্মুখীন হইয়া পড়ায় আমি হয়ত একটু থতমত খাইয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার লজ্জা বা সঙ্কোচের কোন লক্ষণ দেখিতে পাইলাম না। সে আমার হাতে টিকিট কয়েকখানি দিয়া তাহার বড় বড় চক্ষু দুটির গভীর দৃষ্টি আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া মূল্যের অপেক্ষায় চাহিয়া রহিল; এবং আমার নিকট হইতে মূল্য পাইবামাত্র মুহূর্তের মধ্যে পিতার টেবিলে তাহা স্থাপন করিয়া ঘরের কোণে মিশাইয়া গেল। দুইখানা পোষ্টকার্ড কিনিবারও প্রয়োজন ছিল, কিন্তু পুনরায় চাহিতে পারিলাম না, একটু সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। টিকিট লইয়া বাড়ি ফিরিলাম।

দুইদিন পরে পুনরায় টিকিট কিনিবার জন্য ডাকঘরে উপস্থিত হইলাম। সেদিন পোষ্টমাষ্টার ব্যাপৃত ছিলেন না, তিনি স্বয়ং টিকিট দিলেন। খামে টিকিট মারিয়া বাক্সর ভিতর ফেলিয়া দিয়া গৃহে ফিরিব এমন সময় বৃষ্টি আসিয়া পড়িল। সেই স্বল্প-পরিসর ডাকঘরের বারাণ্ডায় অপেক্ষা করিব, না গাত্রবস্ত্র মাথায় দিয়া গৃহে ফিরিব, ইতস্ততঃ করিতেছি, এমন সময় পাশের ঘরের দ্বার খুলিয়া পোষ্টমাষ্টার আহ্বান করিলেন।

"আসুন, ভিতরে বসবেন আসুন। বৃষ্টি থামলে যাবেন।"

আমি কহিলাম. "আপনি ব্যস্ত আছেন, আপনার সময় নষ্ট করব না।"

পোষ্টমাষ্টার মৃদুহাস্য করিয়া কহিলেন, "সময় নষ্ট হবে না। আপনি দু মিনিট বসুন, আমি মেল রওয়ানা করে দিয়েই আসছি। তারপর আমার ছুটি।"

তখন বাহিরে বৃষ্টি একটু জোরেই আসিয়াছিল, আতিথ্যগ্রহণ ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না। ঘরের ভিতরে গিয়া একটা চেয়ারে স্থান গ্রহণ করিলাম। পোষ্টমাষ্টার আমার সম্মুখে একখানা খবরের কাগজ আগাইয়া দিয়া একটু উচ্চস্বরে কহিলেন, "মনু, এখানে পান দিয়ে যাও ত মা!" বলিয়া তিনি মেল রওয়ানা করিতে চলিয়া গেলেন।

কিছু পরে পূর্ব্বদিনের পরিচিত সেই মেয়েটি একটি ডিবায় কতকগুলি পান আমার সম্মুখে রাখিয়া দিয়া চলিয়া গেল। তাহার আসা ও যাওয়ার মধ্যে কোন প্রকার সঙ্কোচ বা চঞ্চলতার লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। যেমন সহজ, তেমনি ধীর। গঠনটি ছিপছিপে, বর্ণটি অরুণাভ, এবং যতুটুক দেখিতে পাইয়াছিলাম মুখখানি ফুটন্ত ফুলের মত ঢলঢলে। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া সহজ ঋজু ভঙ্গীখানি। খুব যে সুন্দরী তাহা নহে, কিন্তু দেখিলে তখনি যে আবার দেখিতে ইচ্ছা করে।

একটা পান মুখে পুরিয়া খবরের কাগজ পড়িবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় পোষ্টমাষ্টাব মেল রওয়ানা করিয়া আসিয়া বসিলেন।

শিষ্টাচার এবং আপ্যায়নের উদ্দেশ্যে আমি কপট বিনয়ের ভঙ্গীতে কহিলাম. "আপনাকে নিতান্ত বিব্রত করেছি।"

পোষ্টমাষ্টার সহাস্যে কহিলেন. "তার চেয়েও বিব্রত আপনাকে করতাম যদি এই বৃষ্টিতে আপনাকে ছেড়ে দিতাম। কিন্তু এই বৃষ্টি মাথায় করে গিয়েও যদি আপনার বিশেষ কোন সুবিধা বা উপকার হত তা হলে বলতে হবে আমিই আপনাকে বিব্রত করেছি।" বলিয়া তিনি উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিলেন।

যখন দেখা গেল কেহ কাহাকেও বিব্রত কবি নাই, তখন পোষ্টমাষ্টার বেশ জমাইয়া গল্প আরম্ভ করিলেন। বাহিরে বৃষ্টিও বেশ জমিয়া আসিয়াছিল।

পোষ্টমাষ্টার এবং স্কুলমাষ্টার সম্বন্ধে আমার প্রায় অভিন্ন সংস্কার ছিল। উভযের কথা মনে হইলেই নিরীহ অথচ রুক্ষ স্বভাবের প্রাণীর কথা আমার মনে হইত। ইহার সহিত অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তার পরই কিন্তু বুঝিতে পারিলাম ইনি দলছাড়া লোক। রুক্ষ তো নিশ্চয়ই নহেন. বাক্যে এবং ব্যবহারে ইহার মত মসৃণ ব্যক্তি আমি দ্বিতীয় দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না; এবং নিরীহ শব্দ যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছি তাহাও ইঁহার উপর প্রয়োগ করা কোন মতে চলে না।

বাহিরে বৃষ্টি বোধ হয় থামিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আমার সেদিকে মন ছিল না। আমি তন্ময় হইয়া পোষ্টমাষ্টারের গল্প শুনিতেছিলাম। নিত্যকার সংসারের তুচ্ছ সুখদুঃখের সাধারণ গল্প তিনি করিতেছিলেন, কিন্তু তাহাতেই আমার মন এমন বসিয়া গিয়াছিল যে আমাদের কথাবার্ত্তার মধ্যে কোন্ সময়ে পোষ্টমাষ্টারের কন্যাটি ঘরে প্রবেশ করিয়া এক কোণে টেবিলের সম্মুখে একখানি বই লইয়া বসিয়াছে তাহা আমি লক্ষ্যই করিতে পারি নাই। পাশ হইতে তাহার মুখের একটা দিক্ দেখা যাইতেছিল, এবং কেরোসিন ল্যাম্পের উজ্জ্বল প্রভায় সেই আধখানি দেখা মুখ একটি কমনীয় শ্রীতে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল।

এই মেয়েটি আমার নিকটে একটি রহস্যের মত হইয়া উঠিতেছিল। সে যে পোষ্টমাষ্টাবের কন্যা তাহা অনুমান করিয়া লইয়াছিলাম, কিন্তু শুধু সেই পরিচয়েই নিবৃত্ত হইতে পারিতেছিলাম না। ইচ্ছা হইতেছিল পোষ্টমাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার সকল সংবাদ অবগত হই। কিন্তু কোন মতেই তাহা পারিয়া উঠিতেছিলাম না। আমার নিজের বিবাহের বয়স উপস্থিত হইয়া রহিয়াছে এবং অবিবাহিত জীবনের সীমা অতিক্রম না করায় এখনও নাবালকের শ্রেণীভুক্ত হইয়া রহিয়াছি এরূপ একটা অপরাধের জ্ঞান মনের মধ্যে সজাগ থাকায় একটি প্রাপ্তবয়স্কা এবং সুন্দর বালিকার কথা

উত্থাপন করিতে বাধ-বাধ ঠেকিতেছিল। মনে হইতেছিল তাহা হইলে তখনই বিশ্বসংসার মনে মনে নিশ্চয় আমাকে সন্দেহ করিয়া বসিবে।

কিন্তু কিছু পরে পোষ্টমাষ্টার স্বয়ং কন্যার কথা তুলিলেন। সেইটিই তাঁহার একমাত্র দুহিতা এবং একমাত্র সন্তান। মাতৃহীনা হওয়ার পর হইতে তাঁহাকে পিতা এবং মাতা উভয়ের স্থান গ্রহণ করিতে হইয়াছে, কিন্তু মেয়েটি যেমন ক্রমশঃ বড় হইয়া উঠিতেছে ততই যেন তাঁহাদের মধ্যে সম্পর্কটা বিপরীত হইয়া দাঁড়াইতেছে। তাই তিনি মা ভিন্ন অপর সম্বোধন আর বড় ব্যবহার করেন না। বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

একজন অপরিচিত ব্যক্তির সম্মুখে নিজের বিষয়ে এরূপ অবাধ আলোচনা আরম্ভ হইল দেখিয়া 'মনু' (পরে জানিয়াছিলাম মনোরমা) একটু যেন বিব্রত হইয়া উঠিল, এবং দুই একবার একটু নড়িয়া চড়িয়া ইতস্ততঃ করিয়া পালাইয়া বাঁচিল।

প্রসঙ্গ উঠায় আমি সাহস করিয়া বলিলাম, "এ মেয়েটি যখন বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ি যাবে তখন দেখচি আপনার দিন কাটান ভার হবে!"

পোষ্টমাষ্টার আমার কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন; কহিলেন, "সে দুঃখ ত পরের কথা। তার জন্যে তত ভাবনা হয় না। সেই দুঃখ ভোগ করবার অবস্থায় কি উপায়ে উপস্থিত হব তাই হয়েচে এখনকার ভাবনার কথা। আহার করলে বদহজম হবার ভয় ত আছেই, কিন্তু সেই আহার্য্য সংগ্রহ করিবার জন্য দুশ্চিন্তা তার চেয়ে কম প্রবল নয়!"

আমি কহিলাম, "কিন্তু আপনার এ মেয়েটির পক্ষে সে ভাবনার কোন কারণ নেই বলে আমার মনে হয়। আপনার মেয়েকে দেখে কেউ অপছন্দ করবে না।"

পোষ্টমাষ্টার কহিলেন, "আপনি যে কথা বলছেন সে কথা বাঙ্গালাদেশের পক্ষে খাটে না। টাকা দিয়ে যে দেশে জামাই কেনবার প্রথা চলেছে সেখানে টাকার উপরই সব নির্ভর করে। আমার এ কথার প্রমাণস্বরূপ আপনাদের গ্রামেরই একটা নজীর দেখাতে পারি। এই গ্রামের কোন ভদ্রলোকের ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ে মনোরমার বিবাহের কথা পাকা হয়ে গিয়েছিল। পাত্রের দামও স্থির হয়েছিল তিন হাজার টাকা। ছেলেটি তখন ডাক্তারী পরীক্ষা দেবার জন্য কলিকাতায় ছিল বলে আমি আমার একজন বন্ধুকে চিঠি লিখে দিই। সে মেসে গিয়ে ছেলে দেখে এসে আমাকে জানায় যে পাত্রটি ভাল, দরে বিকোবার যোগ্য। কাজেই আমার মত লোককে তিন হাজার টাকাতেও রাজি হতে হয়েছিল। সমস্তই ঠিক হয়ে রইল, শুধু পাত্র এলে উভয় পক্ষে আশীর্ব্বাদ হয়ে যাবে। এমন সময় গ্রামের জমিদার সেই পাত্রের উপর দশ হাজার বিশ হাজার কি একটা মস্ত দর হাঁকলেন। কথার মূল্যের চেয়ে চাঁদির মূল্য ঢের বেশী। কাজেই কথা যা ছিল তা বদলে যেতে কিছুমাত্র বিলম্ব হল না। পাত্রের পিতা আমাকে লিখলেন তিনি দুঃখিত কিন্তু অক্ষম। দুঃখিত কথাটা একেবারে মিথ্যা, কিন্তু তিনি যে অক্ষম সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না!" বলিয়া পোষ্টমাষ্টার উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিলেন।

আমি জানি না কেমন করিয়া আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল "অন্যায়, ভয়ানক অন্যায়!" এবং একটা অপমান ও হীনতার বেদনায় আমার সমস্ত দেহ ভরিয়া উঠিল।

পোষ্টমাষ্টার কহিলেন, "ন্যায় অন্যায়ের বিচার ছেড়ে দিলেও অবস্থা ত এই! এতে আপনি কি করে বলেন যে মেয়ের বিবাহ সম্বন্ধে আমার কোন ভাববার কারণ নেই?"

পোষ্টমাষ্টারের কথা ভাল করিয়া আমার কানে প্রবেশ করিতেছিল না। বিরক্তি ক্রোধ ও লজ্জায় আমার সমস্ত মন আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। এ আচরণ যে সামান্য সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে হইলেও লজ্জাজনক হইত। ভদ্রলোকের কথা এবং ভদ্রলোকের কন্যা কি এমনই তুচ্ছ জিনিষ যে তাহা লইয়া যেমন ইচ্ছা খেলা করা চলে! সে সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব, কোন সম্ভ্রমের প্রয়োজন হয় না! পিতার এই ব্যবহার স্মরণ করিয়া যতই মর্ম্মাহত হইতে লাগিলাম, মনোরমার সকরুণ মূর্ত্তিখানি ততই আমার মর্ম্মের মধ্যে অধিকার স্থাপন করিতে লাগিল। এই মনোরমা, যে আমার মনের অগোচরে এই দুইদিনে আমার হৃদয়ের মধ্যে এমন প্রবলভাবে অধিকার স্থাপন করিয়াছে, এই মনোরমা তাহার

সমস্ত সম্পদ এবং সমস্ত মাধুর্য্য লইয়া আমার আশ্রয়ে উপনীত হইয়াছিল। কিন্তু অর্থের লালসা তাহাকে ঘৃণিতভাবে ফিরাইয়া দিয়াছে!

তখনও বৃষ্টি পড়িতেছিল। কিন্তু আর অপেক্ষা করিব না স্থির করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। বিশেষতঃ পোষ্টমাষ্টারের নিকটে পাছে আত্ম-পরিচয় দিতে হয় সেই ভয় হইতেছিল।

পোষ্টমাষ্টার কহিলেন, "বৃষ্টি এখনও থামেনি, এখনই কেন উঠছেন?"

আমি কহিলাম, "এ বৃষ্টি থামতে বিলম্ব আছে, আর দেরী করব না।"

পোষ্টমাষ্টার কহিলেন, "নিতান্ত যদি যাবেন তা হলে একটা ছাতি নিয়ে যান। কাল পাঠিয়ে দেবেন।" বলিয়া আমার আপত্তি সত্ত্বেও উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "মনু,—আমার ছাতিটা দিয়ে যাও ত মা!"

মনোরমা একটি ছাতি লইয়া উপস্থিত হইল এবং সেটা আমার সম্মুখে রাখিয়া তাহার পড়িবার স্থানে গিয়া বসিল।

কিন্তু মনে মনে যাহা ভয় করিতেছিলাম তাহাই ঘটিল। পোষ্টমাষ্টার কহিলেন, "আপনার সঙ্গে এতক্ষণ আলাপ করলাম, কিন্তু নামটি জানা হয় নি ত?"

কি করিব প্রথমটা ঠিক করিতে পারিলাম না। কিন্তু তখনই সামলাইয়া লইয়া বলিলাম, "আমার নাম বিনয়ভূষণ মিত্র।"

পোষ্টমাষ্টার যেন একটু চমকিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "আপনার পিতার নাম?"

"শ্রীযুক্ত পরেশনাথ মিত্র।"

পোষ্টমাষ্টার অল্পক্ষণ বিস্ময় বিহ্বল দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর সহসা উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন, "তাই বুঝি? তবে তো বেশ হয়েছে দেখচি! কিন্তু কিছু মনে করবেন না, আমি একটি কথাও অযথা বলিনি।"

দেখিলাম মনোরমা ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, এবং মনে হইল তাহারও মুখে যেন কৌতুকের একটি ক্ষীণ হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আমি কহিলাম, "আপনি অযথা কিছুই বলেন নি। এ বিষয়ে আমার যা বক্তব্য তা পরে জানাব।" বলিয়া প্রস্থান করিলাম।

বিপিন আমার খুড়তুতো ভাই। আমরা প্রায় সমবয়স্ক, তাই উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক অনেকটা বন্ধুর মত দাঁড়াইয়াছিল। বাড়ী গিয়া বিপিনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখানকার পোষ্টমাষ্টারের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হয়েছিল?"

বিপিন কহিল, "তা তুমি জান না? কথা হয়েছিল কেন, স্থিরই ত হয়ে গিয়েছিল।"

"তবে ভাঙ্গল কেন?"

বিপিন কহিল, "আরও ভাল জুটে গেল বলে ভাঙ্গল।"

"আরও ভাল কিসে?"

"টাকায়।"

"তা হলে এখন যদি রাজার মেয়ে জুটে যায় তা হলে এ সম্বন্ধও ভেঙ্গে যাবে?"

বিপিন একটু চিন্তা করিয়া কহিল, "তা যেতে পারে।"

আমার সর্ব্ব শরীর জ্বলিতেছিল। পোষ্টমাষ্টার যে বলিয়াছিলেন কথার চেয়ে চাঁদির মূল্য ঢের বেশী তাহা আমার কানে তখনও বাজিতেছিল। কহিলাম, "তা যদি যেতে পারে তো তাই যাক, আমি জমিদারের মেয়েকে বিয়ে করব না।"

বিপিন হাসিয়া কহিল, "কেন? রাজার মেয়ে জুটেচে না কি?"

আমি কহিলাম, "হাঁ জুটেছে। রাজা আমাদের গ্রামের পোষ্টমাষ্টার, আমি তাঁর মেয়েকেই বিয়ে করব।"

বিপিন কহিল, "তা হলে শুধু টাকায় নয়, সবদিকেই তুমি ঠক্‌বে।"

আমি কহিলাম, "তা হলে মান বজায় থাকবে। টাকার চেয়ে যে ভদ্রলোকের কথার মূল্য কম সেটা প্রমাণ হবে না।"

বিপিন কহিল, "সে যা হোক, এসব কথা তুমি শুনলে কার কাছে?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া দেখিলাম গোপন করিবার কোন কারণই নাই। কহিলাম, "স্বয়ং পোষ্টমাষ্টারের কাছে, আমি তাঁর বাড়ী আজ প্রায় দুঘণ্টা ছিলাম।"

বিপিনের মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "পোষ্টমাষ্টারের মেয়েকে দেখেচ?"

"দেখেচি।"

"ওঃ তাই বল! পোষ্টমাষ্টারের মেয়েকে দেখে তোমার মনে প্রেম হয়েছে, তাই তোমার মাথার মধ্যে ন্যায়ের সেপাইগুলো হঠাৎ দাপাদাপি লাগিয়ে দিয়েছে। জমিদারের মেয়েকে যদি প্রথমে দেখতে তাহলে এরকমটা হত না।"

বিপিনের সহিত শুধু নয়, গৃহের আরও কয়েক জনের সহিত এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইল। পিতার কর্ণেও যে কথাটা পঁহুছিল তাহার প্রমাণ পাইলাম স্বয়ং পোষ্টমাষ্টারের নিকট হইতে দিন দুই তিন পরে।

পোষ্টাফিসে নিয়মিত চিঠি ফেলিবার অছিলায় বৈকালে বেড়াইতে গিয়াছিলাম।

পোষ্টমাষ্টার, সাক্ষাৎ হইতেই কহিলেন, "আপনি এদিকে আসা বন্ধ করুন, এখানে ছেলেধরার ভয় হয়েছে!" বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

এ কথার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া কহিলাম, "কি রকম?"

পোষ্টমাষ্টার সহাস্যে কহিলেন, "আজ সকালে আপনার পিতার সহিত পথে সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁর মুখে শুনলাম আমি নাকি ছেলেধরা হয়েছি, আর আপনাকে ধরবার চেষ্টায় ব্যস্ত আছি। তাঁর মন থেকে এ অমূলক আশঙ্কা দূর করবার অভিপ্রায়ে তাঁকে জানিয়েছি যে আমার ডাকঘরে দুশো পাঁচশো টাকা ধরবার মতন থলেই আছে, তার মধ্যে এমবি-পাশকরা বলিষ্ঠ ছেলেকে ধরা সম্ভব নয়। জমিদারবাড়ী বিশহাজার পঁচিশহাজারের থলে আছে, সেখানে সে ব্যাপারটা খুব সম্ভব।" বলিয়া পোষ্টমাষ্টার উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিলেন।

পাশের ঘর হইতে চাপা হাসির শব্দ শুনা গেল না বটে, কিন্তু চুড়ি বালার ঠুংঠাং মৃদুমধুর শব্দের মধ্যে একটি কৌতুকস্মিত মুখ আমার চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল।

পোষ্টমাষ্টার কহিলেন, "কিন্তু আর-একদিক থেকে দেখলে এটা খুব স্বাভাবিকও বটে। আমি ঠকেছি বলে ওঁদের মনে মনে এটা আশঙ্কা আছে পাছে আমিও ঠকাই।"

তিনদিন পরে পোষ্টমাষ্টার কহিলেন, "আজ আবার এক নূতন ঘটনা ঘটেছে। সকাল বেলা জমিদারের এক গোমস্তা এসে হাজির। তাকে দিয়ে জমিদার মশায় বলে পাঠিয়েছেন যে আমি যদি বেশী চালাকি করি তা হলে গ্রামে বাস করা আমার দায় হবে। চালাকিটা কি জিজ্ঞাসা করায় বল্‌লে, আমি নাকি আপনাকে ক্ষেপাচ্ছি। তার উত্তরে আমি বলে পাঠিয়েছি যে জমি মাত্রেই জমিদার বলে একপ্রকার জীব থাকে তা আমি এ গ্রামে এসে নতুন দেখ্‌ছিনে এবং সে সম্বন্ধে আমার বিভীষিকাও তেমন নেই, সুতরাং ও কথা বলে ভয় দেখিয়ে কোন ফল হবে না। তার চেয়ে জমিতে আর একপ্রকার জীব চলে বেড়ায় তার শিং দেখলে অনেক সময় বাস্তবিক ভয় হয়। ক্ষ্যাপানর কথায় বলেছি যে জমিদার যাঁর কথা বলে পাঠিয়েছেন তাঁর কথা বলতে পারিনে, কিন্তু জমিদার মশায় স্বয়ং যে ক্ষেপেছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।"

আমি কহিলাম, "এ কথা বলে আপনি জমিদারকে ক্ষমা করেছেন মাত্র। তার ঔদ্ধত্যের কোন দণ্ডই দেওয়া হয় নি। আমি যদি সে সময়ে উপস্থিত থাকতাম তা হলে গোমস্তাকে অত সহজে নিষ্কৃতি দিতাম না।"

পাশের ঘরে চুড়িবালার ঠুংঠাং শব্দ আজও বাজিয়া উঠিল, এবং আমার মনে হইল যেন তাহা অত্যন্ত প্রসন্ন সুরে।

পোষ্টমাষ্টার কহিলেন, "রামচন্দ্রঃ! ঝগড়া করে কি হবে। ও-একটা পরিহাসের মত করে জবাব দেওয়া গেল। আপনার বিবাহের রাত্রে সেখানে গিয়ে দুখানা লুচি চিবতে হবে তার পথটাও রাখা চাই ত?" বলিয়া পোষ্টমাষ্টার তাঁহার স্বভাবানুরূপ উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিলেন।

উৎসাহে এবং আত্মসম্ভ্রমের তাড়নায় আমার মনের মধ্যে একটা প্রবল ঝোঁক আসিয়াছিল। মনে হইল এমন চমৎকার করিয়া একটা কিছু বলি যাহাতে পাশের ঘরে চুড়ি ও বালা আর একবার মুখর না হইয়া থাকিতে পারিবে না। কিন্তু তেমন কিছু যোগাইয়া উঠিল না। কহিলাম, "এখনও ওপরিবারে আমার বিয়ে করবার প্রবৃত্তি আছে আমাকে এতটা নীচ মনে করে আমার প্রতি অবিচার করছেন!"

পোষ্টমাষ্টার আমার কথা শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কহিলেন, "না, না, ও কথা বলবেন না, তা হলে আমার নামে যে-সব দুর্নাম রটেছে সেগুলোর ভিত্তি বেঁধে যাবে। এতে আর জমিদার মশায়ের বিশেষ দোষ কি আছে? সকলেই যাতে নিজের অনিষ্ট বা ক্ষতি না হয় সে বিষয়ে সচেষ্ট হয়।"

কিন্তু পাঁচদিন পরে পোষ্টমাষ্টারের মুখে যে কথা শুনিলাম তাহাতে ধৈর্য্য রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিল। সেদিন সন্ধ্যার পর পোষ্টাফিসে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। পোষ্টমাষ্টার টেবিলের সম্মুখে বসিয়া পত্র লিখিতেছিলেন এবং মনোরমা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পত্রের দিকে চাহিয়াছিল। পোষ্টমাষ্টার তাঁহার অভ্যাসানুযায়ী একবার হাসিবার চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু বর্ষাদিনের রৌদ্রের মত সে ফিকা হাসি নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী হইল; এবং বেদনার মূর্ত্তিই তাহার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

আমার মুখের ভাবে পোষ্টমাষ্টার বোধহয় আমার মনের কথা বুঝিতে পারিলেন। কহিলেন, "বিনয়বাবু, আপনাদের জমিদার আমাকে শুধু গ্রামছাড়া করেই নিশ্চিন্ত হতে পাচ্ছেন না, সরকারের অতিথিশালায় যাতে আমার একটা স্থান হয় তার বন্দোবস্তও তিনি করে দিচ্ছেন!"

আমি ব্যগ্রভাবে কহিলাম, "আবার কি হয়েছে?"

পোষ্টমাষ্টার তাঁহার তীক্ষ্ণ চক্ষুদ্বয় আমার মুখের উপর স্থাপন করিয়া কহিলেন, "আমি জমিদারের দুশ টাকা চুরি করেছি! মাস খানেক হল জমিদারের নামে দুশ টাকা টাকার একটি মনিঅর্ডার আসে। আমি সেটা পিয়ন দিয়ে জমিদারবাড়ী পাঠিয়ে দিই। পিয়ন সেদিন আমাকে এসে বলে যে জমিদার তেল মাখছিলেন, তাঁর আদেশ মত তাঁর একজন আত্মীয় জমিদারের নামে দস্তখত করে টাকা নিয়েছে। এখন জমিদার এই বলে রিপোর্ট করেছেন যে টাকা তিনি পাননি, যিনি টাকা পাঠিয়েছিলেন তাঁর কাছ থেকে তিনি জানতে পেরেছেন যে তাঁর নাম জাল করে কে টাকা নিয়েছে। এই ব্যাপার তদন্তের জন্য তিন দিন পরে পোষ্টাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আসবেন। এখন আমার যে প্রধান সাক্ষী পিয়ন জমিদারমশায় নিশ্চয় তাকে পয়সার পথ দেখিয়ে থাকবেন। সে যে জমিদারবাড়ী গিয়ে টাকা দিয়ে এসেছে সে কথা সে আমারই কাছে অস্বীকার করেছে। কাজে কাজেই দাঁড়াচ্ছে যে আমি কাউকে দিয়ে সই করিয়ে টাকাটা নিয়েছি। এখন মনিঅর্ডারে যে দস্তখত করেছিল তাকে খুঁজে বার করতে না পারলে আমার কি অবস্থা হবে বুঝতেই পাচ্ছেন!"

ক্রোধে এবং ঘৃণায় আমার মুখে বাক্য সরিতেছিল না। দেখিলাম মনোরমা আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আমার বক্তব্যের অপেক্ষায় রহিয়াছে। তাহার পিতার এই আসন্ন বিপদের মধ্যে তাহার লজ্জা বা সঙ্কোচ করিবার অবকাশ ছিল না। তাই আজ আমি আসাতেও সে এক পা না নড়িয়া যেখানে দাঁড়াইয়াছিল ঠিক সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

আমি কহিলাম, "জমিদার বলে সে কি মনে ভেবেছে যা ইচ্ছে তাই সে করতে পারে? আচ্ছা তা হলে একবার ভাল করে দেখা যাক আমরাও তাকে বিপদে ফেলতে পারি কি না!"

আমার কথা শুনিয়া পোষ্টমাষ্টার হাসিতে লাগিলেন। কহিলেন, "তা পারা যাবে না। মানুষকে পেষণ করবার সর্বোত্তম অস্ত্র হচ্ছে টাকা, যেটা আমার হাতে নেই। তবে আপনার দ্বারা আমার এ বিপদে কতকটা সাহায্য পাওয়া সম্ভব বটে।"

আমি ব্যগ্রভাবে কহিলাম, "বলুন কি করে। যদি অসম্ভব হয় তাহলে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব।"

পোষ্টমাষ্টার কহিলেন, "যদি কিছু মনে না করেন তা হলে বলি।"

আমি কহিলাম, "না বললেই মনে করব যে এখনও আমাকে পর মনে কচ্ছেন।"

পোষ্টমাষ্টার কহিলেন, "আমার মনে হয় আপনি জমিদারের মেয়েকে বিবাহ করতে অমত জানিয়ে থাকবেন, তাই আমার উপর এসব উৎপীড়ন আরম্ভ হয়েছে। আপনি যদি সেখানে বিয়ে করতে স্বীকৃত হন এবং যতদিন বিয়ে না হয় শুধু ততদিন যদি আমাদের সম্পর্ক ত্যাগ করেন তা হলে বোধহয় কোপটা অনেক কমে যায়। আপনাকে আমাদেব নিতান্ত আত্মীয় বলে মনে করি বলেই এ কথা অকপটে বলতে সাহস করলাম।"

পোষ্টমাষ্টার এ অনুরোধ করিবেন জানিলে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতাম না। কিন্তু তাঁহার অনুমানে কোন ভুল ছিল না—প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে আমিই যে তাঁহার সমস্ত বিপদের মূলে ছিলাম সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু অপরকে বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য নিজেকে এতটা বঞ্চিত করিবার মত শক্তি এবং আগ্রহ আমার ছিল না। কহিলাম, "আপনাদের সম্পর্ক ত্যাগ করলে যদি আপনাদের সুবিধার কোন সম্ভাবনা থাকে আমি এখনই তাতে রাজি আছি। কিন্তু জমিদারের মেয়েকে বিয়ে করব না তা আমি স্থির করেছি। সুতরাং সে প্রকারে আপনার উপকারে আসতে পারলাম না বলে আমাকে ক্ষমা করবেন।"

পোষ্টমাষ্টাব কহিলেন, "আপনার ইচ্ছাব বিরুদ্ধে কোন কাজ করিয়ে নিয়ে নিজের সুবিধা কবে নেব এতটা অবুঝ আমি নই। তবে এ কথাও আমি আপনাকে অকপটে জানাচ্ছি যে আমি নিপীড়িত হচ্ছি বলেই যে আপনাকে ক্ষতিগ্রস্থ হতে হবে তার কোন কারণ নেই। জমিদারবাড়ীতে বিয়ে করলেও আপনাকে এই গ্রামের মধ্যে আমাদের একমাত্র হিতৈষী বন্ধু বলে জানব।"

আমি কহিলাম, "আমি যে আপনাদের হিতৈষী আপনাদের সঙ্গে জমিদারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েই আমাকে তার পরিচয় দিতে দিন। জমিদারেব মেয়েকে বিয়ে করে আমি সে পরিচয় দিতে চাইনে! সেজনা আপনাদের সঙ্গে আমি সমস্ত নির্যাতন সহ্য করতে প্রস্তুত আছি।"

পোষ্টমাষ্টার কহিলেন, "শুধু আপনি হলে আমাব কোন সঙ্কোচ থাকত না, কারণ আপনার পবিচয় প্রথম দিনেই পেয়েছি। কিন্তু ও বিষয়ে আপনাদের সমস্ত পরিবারের স্বার্থ জড়িত। আমি যদি কোনপ্রকারে আপনাদেব সংসারের ক্ষতির কারণ হই তাহলে আমি নিতান্তই দুঃখিত হব। তাছাড়া আমাব নিজের স্বার্থও এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে। জমিদারের মেয়েকে আপনি বিয়ে করলে হয়ত আমাদের উপর জমিদারের আক্রোশ কমে যাবে। আমার জন্য আমি একটুও ভাবিনে। কষ্ট পাবার ভয়ে দুর্বৃত্তের কাছে নত হব এত দুর্ব্বল আমি নই। আমি ভাবি শুধু মনুমার জন্যে। ধরুন আমার যদি জেল হয় মনু কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে?"

চাহিয়া দেখিলাম মনোরমার চক্ষুদুটি সজল হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহার সকরুণ মুখে একটা ভাষাহীন মর্ম্মান্তিক বেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। মনে হইল তাহার আকুল-দৃষ্টি যেন বাহুর মত আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতেছে, "ওগো আমাদের বাঁচাও, বাঁচাও! এ বিপদে তুমিই আমাদের একমাত্র বন্ধু!"

সহানুভূতির তীব্র উত্তেজনা আমার মনকে যেন একটা নেশার মত চাপিয়া ধরিল। মাতালের মত লজ্জা সঙ্কোচ দ্বিধা কিছুই রহিল না। অসংলগ্ন ভাষায় অসম্বন্ধভাবে কতকগুলা কি বকিয়া যখন চুপ করিলাম, দেখিলাম মনোরমার দুঃখ-পাংশু মুখখানি লজ্জায় গোলাপফুলের মত টক্‌টকে হইয়া উঠিয়াছে এবং পোষ্টমাষ্টার সকৃতজ্ঞ-আনন্দে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিতেছেন, "তাহলে জেলে গেলেও আমার কোন দুঃখু থাকবে না।"

সেদিন গৃহে ফিরিতে রাত্রি অনেক হইয়া গেল। বাড়ী আসিয়া বিপিনকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম।

বিপিন সমস্ত শুনিয়া কহিল, "আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। কিন্তু আমার দ্বারা তুমি কি কাজ নেবে বলছ?"

আমি কহিলাম, "তুমি পিয়নকে ঠিক করবে। সে যাতে মিথ্যা কথা না বলে তার ব্যবস্থা করবে। এর জন্য যদি হাজার টাকা খরচ করতে হয় তাও করা যাবে। তাকে বলতে হবে সে জমিদারবাড়ী গিয়ে টাকা দিয়ে এসেছে, এবং যে সই করে টাকা নিয়েছে তার নাম আমাদের বলে দেবে, কিম্বা তাকে দেখিয়ে দেবে।"

বিপিন কহিল, "আচ্ছা সে চেষ্টা আমি সাধ্যমত করব। কিন্তু অত টাকা তুমি পাবে কোথায়?"

আমি কহিলাম, "সে টাকা পোষ্টমাষ্টার দেবেন। আমি তাঁকে বলেছি যে, যে টাকা পিয়নের জন্য খরচ করতে হবে শুধু সেই টাকাটাই আমি বিবাহের যৌতুক বলে গ্রহণ করব।"

বিপিনের মুখে দুষ্টামির হাসি দেখা দিল। আমি কহিলাম, "হাসছ যে?"

বিপিন কহিল, একটা গান মনে পড়ছে—'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে।' জমিদারবাড়ীতে ধরা না পড়ে পোষ্টাফিসে তুমি ধরা পড়বে তা কে জানত বল? কিন্তু আমাদের যে দশ পনের হাজার টাকা লাভের পথ তুমি বন্ধ করলে সে ক্ষতি পূরণ কি রকম করে করবে শুনি?"

আমি কহিলাম, "তোমাদের ইজ্জত নষ্ট না হতে দিয়ে।"

পরদিন প্রাতে পিতা আমাকে ডাকাইয়া কহিলেন, "আজ বৈকালে তুমি কোথাও বেরিয়ো না—জমিদারমশায় তোমাকে আশীর্ব্বাদ করতে আসবেন।

এতদিন পিতার সহিত প্রত্যক্ষভাবে ও বিষয়ে আমার কথাবার্ত্তা হয় নাই। কিন্তু একদিন যে হইবে তাহা আমি জানিতাম এবং সেজন্য প্রস্তুতও ছিলাম। আমার যাহা বক্তব্য তাহা সংক্ষেপে এবং সবিনয়ে নিবেদন করিলাম। আমার নির্লজ্জতা শুধু পিতাকে নহে আমাকেও বিস্মিত করিয়াছিল। বাল্যকাল হইতে গুরুজনকে যে ভক্তির দশগুণ ভয় করিয়া আসিয়াছে সহসা তাহার পক্ষে এতটা স্বাধীন হইয়া উঠা কম বিস্ময়ের কথা নহে!

আমার কথা শুনিয়া পিতা ধীরভাবে কহিলেন, "তুমি ত বলছ জমিদার অত্যাচারী লোক, তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত নয়। কিন্তু সেই অত্যাচারী লোক যদি হঠাৎ পোষ্টমাষ্টারকে ছেড়ে তোমার বাপের বিরুদ্ধে লাগে তখন তুমি তোমার বাপকে জেলে যেতে দেখে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে ত?

আমি কহিলাম, "অত্যাচারী লোক কখন অত্যাচার করবে সেই ভয়ে তাকে ঘৃণা না করা দুর্ব্বলতা।"

পিতা কহিলেন, "তোমার সঙ্গে তর্ক করবার প্রবৃত্তি আমার নেই। তোমাকে পাঁচদিন সময় দিলাম। তুমি সমস্ত বিবেচনা করে তোমার মত আমাকে জানিয়ো। তারপর আমিও আমার কর্ত্তব্য ভেবে দেখব। আজ আমি তাদের মানা করে পাঠাচ্ছি।"

পিতার নিকট হইতে কতকটা সহজে পরিত্রাণ পাইলাম বটে, কিন্তু গৃহের অপরাপর আত্মীয়বর্গের অত্যাচারে অস্থির হইয়া উঠিলাম। রাজার চেয়ে পেয়াদার জুলুমটাই বেশি হয়—বিশেষতঃ যখন তাহা রাজ-ইঙ্গিতের অধীন হইয়া চলে। রোগের কঠিন অবস্থায় যেমন মুরগীর ঝোল হইতে আরম্ভ করিয়া চরণামৃত পর্য্যন্ত নির্ব্বিচারে একসঙ্গে চলিতে থাকে, তেমনি আমার উপর স্তুতি এবং নিন্দা, অনুরোধ এবং অনুযোগ যুগপৎ চলিতে লাগিল। কেহ রাজ্যের প্রলোভন দেখাইল, কে বা রাজকন্যার কথা বলিল। কেহ দেখাইল রাজা তুষ্ট হইলে কত সুবিধা হইবে, এবং কেহ বুঝাইল রাজা রুষ্ট হইলে ভয়ানক বিপদ। কিন্তু বিকার আমাকে এমনই প্রগাঢ়ভাবে পাইয়া বসিয়াছিল যে কোন উপায়েই আমার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল না।

পাঁচদিনের মধ্যে যেদিন দুইদিন বাকি সেদিন দ্বিপ্রহরে ডাকঘরের একজন পিয়ন আমার নামে

একটা চিঠি লইয়া আসিল। খুলিয়া দেখিলাম পোষ্টমাষ্টার লিখিয়াছেন "আমার ভয়ানক বিপদ। দয়া করিয়া পত্রপাঠ একবার আসিবেন।"

ডাকঘরে যখন উপস্থিত হইলাম তখন পোষ্টমাষ্টার অফিসঘরে ব্যস্ত ছিলেন। আমি আসিয়াছি শুনিয়া তিনি আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিলেন।

আমি কহিলাম, "কি হয়েছে?"

পোষ্টমাষ্টার কহিলেন, "আজ সকালে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এসেছে। তার সঙ্গে দু-তিন দিন ধরে বোঝাপড়া চলছে। আমার ত একমুহূর্ত্ত সময় নেই। এর মধ্যে বিপদের উপর বিপদ! কাল থেকে মনুর খুব জ্বর হয়েচে। বুকে এত বেদনা যে কথা কইতেও তার লাগছে। আজ সকালে বেণীডাক্তারকে আনতে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলে পাঠিয়েছিলেন যে বাবুদের বাড়ী হয়ে বেলা ১১টার সময় আসবেন। এখন একজন লোক বলে গেল যে বেণীডাক্তার আসতে পারবেন না। এ সবই জমিদারের কাণ্ড। সে-ই ডাক্তারকে আসতে মানা করে দিয়েছে। গ্রামে ত আর ডাক্তার নেই, তাই আপনাকে ডেকেছি। এ বিপদে একমাত্র আপনি সহায়। আমার বুদ্ধি লোপ পাবার মত হয়েছে। আপনি মনুর চিকিৎসা ও সেবা উভয়েরই ভার নিন।"

পোষ্টমাষ্টারের কণ্ঠের স্বর কাঁপিতেছিল এবং দেখিলাম তাঁহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। আজিকার এ নূতন বিপদে দেখিলাম তিনি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া পাশের ঘরে মনোরমাকে দেখিতে গেলাম।

মনোরমা শয্যায় পাশ ফিরিয়া শুইয়া ছিল। বোধ হয় একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। জ্বর পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার হাত ধরিতেই তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, এবং একটু চমকিয়া আমাদের দিকে ফিরিয়া চাহিল।

আমি কহিলাম, "কোনখানে তোমার ব্যথা বোধ হচ্ছে?"

মনোরমা হস্তের ইঙ্গিতে ডানদিকের বুক ও পিঠ দেখাইয়া দিল। পোষ্টমাষ্টারকে অফিস যাইতে বলিয়া ষ্টেথোস্কোপ আনিবার জন্য আমি গৃহে গেলাম। ষ্টেথোস্কোপ লইয়া আসিয়া মনোরমাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম ডানদিকের বুক ও পিঠ নিউমোনিয়ায় গুরুতর ভাবে আক্রান্ত হইয়াছে। এবং বামদিকেও রোগ সঞ্চারের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কর্ত্তব্যের অনুরোধে পোষ্টমাষ্টারকে মনোরমার পীড়ার গুরুত্বের কথা জানাইলাম; এবং তাহার ফলে যখন মনোরমার জীবনের পূর্ণ দায়িত্ব আমার উপর আসিয়া পড়িল তখন জীবন-পণ করিয়া মনোরমার সেবা ও চিকিৎসায় নিযুক্ত হইলাম। প্রয়োজনীয় ঔষধাদির তালিকা করিয়া সেই দিনই বিপিনকে ঔষধ আনিবার জন্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলাম।

বৈকালে মনোরমার জ্বর একটু কমিল। আমি মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "একটু ভাল বোধ করছ কি?"

মনোরমা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল ভাল বোধ করিতেছে। তাহার পর সহসা আমার মুখের প্রতি উৎসুক দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া বলিল, "সায়েবের সঙ্গে বাবার কি কথা হল?"

আমি কহিলাম, "সেজন্য তোমার কোন চিন্তা নেই, সাহেব নিশ্চয়ই ভাল রিপোর্ট করবেন।"

কষ্টের মধ্যেও মনোরমার চক্ষু দুটি দীপ্ত হইয়া উঠিল। ব্যগ্রভাবে কহিল, "কেমন করে জানলেন?"

মনোরমার এ প্রশ্নে আমি একটু বিপদে পড়িলাম; কারণ সাহেব যে ভাল রিপোর্ট করিবেন সে সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান ছিল না। শুধু মনোরমাকে একটু আশ্বস্ত করিবার উদ্দেশ্যে ওরূপ কহিয়াছিলাম। আমি কহিলাম, পিয়নকে সত্য কথা বলতে রাজী করেছি। সে বলবে যে জমিদারের আদেশমত জমিদারের একজন আত্মীয়কে টাকা দিয়ে এসেছিল। তাহলে আর তোমার বাবার কোন ভয় থাকবে না।"

আমার কথা শুনিয়া মনোরমার চক্ষু দুটি কৃতজ্ঞতায় সজল হইয়া উঠিল।

আমি কহিলাম, "মনোরমা তোমার পুলটিস্ বদলে দেবার সময় হয়েচে।"

মনোরমা কহিল, "থাক, আর দিতে হবে না।"

"কেন?"

মনোরমা ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া, একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "আপনার হাতে অত গরম লাগে, ফোস্কা হতে পারে।"

আমি হাসিয়া কহিলাম, "সে জন্যে তোমার ভাবনা নেই, তুমি আগে ভাল হয়ে ওঠ, তারপর না হয় আমার ফোস্কার সেবা তুমিই কোরো।"

মনোরমার ক্লিষ্ট অধরে সলজ্জ হাসির রেখা স্ফুরিত হইয়া উঠিল। আমার কথার কোন উত্তর না দিয়া সে অন্যদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

হঠাৎ চিকিৎসা এবং সেবা আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়াই হউক কিম্বা যে কারণেই হউক সন্ধ্যা পর্যন্ত মনোরমা অপেক্ষাকৃত ভালই ছিল। কিন্তু সন্ধ্যার পর হইতে জ্বর এবং অপরাপর উপসর্গ পুনরায় বৃদ্ধি পাইল। আমি ও পোষ্টমাষ্টার সমস্ত রাত্রি মনোরমার শিয়রে বসিয়া সেবা করিলাম কিন্তু কোন ফল হইল না। পরদিন প্রাতে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম মনোরমার ফুসফুস পরিপূর্ণভাবে আক্রান্ত হইয়াছে।

আমার ডাক্তারী-জীবনের প্রথম রোগী মনোরমা। কলেজের দীন অভিজ্ঞতার উর্দ্ধে এক ইঞ্চিও উঠিতে পারি নাই—কিন্তু ভোরের আলোয় মনোরমার মুখ দেখিয়া মনে হইল সে আর বাঁচিবে না। তাহার সুনির্ম্মল মুখের উপর সূক্ষ্ম অথচ স্পষ্ট এমন একটা ছায়া লক্ষ্য করিলাম যাহা দেখিযা আমার মন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

আমার ডাক্তারী শিক্ষার সমস্ত শক্তি এবং জ্ঞান সঞ্চিত করিয়া প্রাণপণে আর একবার মনোরমার চিকিৎসায় লাগিলাম। যাহা কিছু আমার জানা বা শুনা ছিল কিছুই বাকি রাখিলাম না। কিন্তু বৃথা! বৃথা! তখন ত আর ব্যাধির কোন কথা ছিল না, জগতের সমগ্র চিকিৎসাশাস্ত্রের সমবেত চেষ্টা যাহাকে প্রতিরোধ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম তাহাই মনোরমার দেহের মধ্যে ধীর এবং অপ্রতিহত ভাবে তখন প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। দেশ ভাসাইয়া বন্যা ছুটিয়াছিল, তাহার সম্মুখে এক মুঠা মাটি ফেলিয়া কোন লাভ ছিল না।

দ্বিপ্রহর হইতে মনোরমার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। মুখে তাহার আর কোন কথা রহিল না, শুধু প্রশান্ত দুটি চক্ষুর সকরুণ দৃষ্টি প্রভাত আকাশের বিলীনোদ্যত তারকার মত আমাদের দিকে ক্ষীণভাবে সমস্ত দিন জাগিয়া রহিল! তাহার পর সন্ধ্যাকালে যখন একটির পর একটি করিয়া তারকা ফুটিয়া উঠিতেছিল তখন দেখিলাম মনোরনার চক্ষু তারকা সেই সময়েরই একটি কোন্ মুহূর্ত্তে সহসা স্থির অপলক হইয়া গিয়াছে।

* * *

সে ঘটনার কথা অবগত হইয়া জমিদার মহাশয় এবং আমার পিতা বোধ হয় কতকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মনোরমাব মৃত্যু দশ বৎসর হইয়া গিয়াছে, আমি এখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারি নাই। আমার এখনও মনে হয়—'এ জীবনে যাহা ঘটিল না তাহা—'।

১৫ বর্ষ, শ্রাবণ ১৩২২



পচা

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ট্রেন থামলো মোটে এক মিনিট, তারি মধ্যে ষ্টেশনে লোক নামলো প্রায় একশো। পৌষ মাস। সকলেরই মাথা মুখ র‍্যাপারে ঢাকা, দেখা যায় কেবল চোখদুটি। কে যে কে তা বোঝবারই জো নেই। চারিদিকে চাইছি পচার সন্ধানে, তার আর দেখা নেই। প্যাসেঞ্জারের দল যেমন তাড়াতাড়ি নেমেছিল তেম্নি তাড়াতাড়ি মেঠো পথে অদৃশ্য হয়ে গেল। ডেলি প্যাসেঞ্জারের পায়ে আছে ডানা, তাদের চলা উড়ে-চলা। তার উপর আছে হিমের ভয়, অন্ধকারের ভয়, সাপ-খোপ ভূত-প্রেত কতকিছুর ভয়; অল্প যে কজন ভাগ্যবানের লণ্ঠন আছে, তাদের পিছু পিছু ধাওয়া না করে উপায় কি! তারা যে আঁধারের কাণ্ডারী!

শূন্য প্লাটফরমের উপর উবু হয়ে ব'সে ছোট হাতলণ্ঠনটা জ্বাললুম। তার পর ভাবলুম একবার শেষ চেষ্টা করা যাক। তারস্বরে ডাকলুম—পচা, ও পচা! দূরের অন্ধকা'র থেকে 'যাই বাবু' আর একটা অন্ধকারের মতনই কালো মনুষ্যমূর্ত্তি ছুটে বেরিয়ে এল।

তাকে বল্লুম—কি রে দেরী কেন?

সে বল্লে—আজ্ঞে আমাদের তো আর ঘড়ি নেই... টেরেনের সময় তো আর ঠিক জানা থাকে না.. বড়বাবু বললেন আটটার গাড়ীতে আসবে। গাছ কেটে ফিরে এসে সন্ধ্যার সময় একটু নেশা করে তারপর বেরুলুম। ঐ মাঠ থেকে দেখি গাড়ী আসচে, তখনি দৌড়তে দৌড়তে এলুম। ইষ্টিশান-মাষ্টার আমাদের কাছ থেকে আর টিকিস্ চায় না .. বাবুদের মোটমাট বই দেখে কিনা। তবে রেলে চড়লে আমাদের টিকিস্ করতে হয়। আগে আগে শিবামপুরে রস নিয়ে যেতুম... এখান থেকে উঠে পড়তুম.. সেখানে গিয়ে টিকিস্-বাবুর হাতে ভাড়ার অর্দ্ধেক পয়সা গুঁজে দিতুম... ঐ দিলেই আর কিছু কথা হয় না... আবার সেখান থেকে আসবার সময় এখানে অর্দ্ধেক পয়সা দিয়ে দিতুম। একদিন যাবার সময় গাড়ীতে ইনিস্‌পেক্‌টর উঠেছে... টিকিস্ তো নেই.. ইনিস্‌পেক্‌টর চন্দনপুর থেকে ভাড়া চাইলে.. পয়সা তো আমাদের কাছে ছেল না . তারপর বাবু, বেলুড়ে গিয়ে আমাদের নেবিয়ে দিলে.. ইষ্টিশান-মাষ্টারের হাতে জিম্মে করে দিয়ে তারা তো চ'লে গেল। মাষ্টারের হাতে পায়ে ধ'রে সেবার তো অনেক কষ্টে ছাড়া পেলুম। মাষ্টার বললে, তোরা রোজ রোজ যাওয়া আসা করিস, ইনিস্‌পেক্‌টর দেখে উঠিস না কেন? সেইদিন থেকে বাবু টিকিস্ করি... সেই অপমানকে অপমান হওয়া আর সেই পয়সা গচ্ছা দেওয়া!

পচা মোট মাথায় তুললে। পথে বার হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—রোজই নেশা করিস না কি?

—একটু নেশা না করলে চৌপরদিন গাছে গাছে ঘুরতে পারি কি বাবু!

রোজ ক' পয়সার নেশা করিস?

পচা একটু হাসলে। বললে—পয়সা দিয়ে কি আর নেশা করতে পারি! গাছ কাটতে কাটতে ঝোপে-টোপে দু-এক ভাঁড় সরিয়ে রাখি। তাই দিয়েই নেশা হয়.. পুলিসের যে কড়াক্কড়ি...

ঘুটঘুটে অন্ধকার। সরু মেঠো পথ নির্জ্জন। দুধারে চাষের ক্ষেত। অন্ধকারের আবছায়ায় আখের গাছগুলো মনে হচ্ছে যেন পায়ে ফেটিবাঁধা সেপাইয়ের দল এক কদম বাড়িয়ে দিয়ে সারবন্দী দাঁড়িয়ে আছে—হুকুম পেলেই চল্‌তে শুরু করবে। অন্ধকারে পচা একবার হোঁচট খেলে। জিজ্ঞাসা করলুম—কি রে মোট ভারি নাকি?

পচা বললে—নাঃ এমন আর ভারি কি! আগে কত মোট বয়েছি... তখন গায়ে জোরও ছেল তেম্নি। আপনাদের বাড়ীর কার যেন ছাপাখানার কাজ ছেল। চারটে লোহার পেঁটরা—বড় বড় পেঁটরা বাবু—কাগজপত্তরে একবারে বোঝাই—ভারিও এক একটা হবে দু মণ আড়াই মণ।

জহর-বাবু আগে তিন চার জনকে ডেকেছেল—কলাছড়া ইস্টিশানে নিয়ে যাবার জন্যে... তারা এসে পেঁটরা চাগাতেই পারে না....তারপর আমাকে ডেকে আন্‌লে... জহরবাবু বললে, এগুলো ইস্টিশানে দিতে হবে, পারবি পচা? আমি বললুম ভারি আছে নাকি? জহরবাবু বললে, ভারি আর কি, একমণ সওয়ামণ ক'রে হবে বোধ হয়। আমি বললুম, আপনাদের আশীর্ব্বাদের জোর থাকলে তা পারব বৈকি। চাগিয়ে দেখলুম খুব ভাবি, মাথায় তুললে একেবারে দেবে যেতে হয়। সেই চারটে পেঁটরা, বাবু, চার বারেতে কলাছড়া ব'য়ে দিয়ে এলুম। তা দিয়েছিল আমাকেও বাবু... দেড়টি টাকা আমায় 'জল খাস' বলে দিয়ে গেল। তখনকার দিনে বাবু খেতেও পেতুম বেশ। বাবুদের বাড়ী কাজে বার হতুম... বড় সরার—যাতে পায়রা পোষে সেই সরার একসরা লুচিগুড়ো, সন্দেশের গুড়ো, জিলিপির ভাঙা পাপড়ি এম্‌নি কত কি খুব মেরে দিতুম। তারপর আবার দুপুরে পাত পেড়ে বসতুম... তখন ভাত তরকারি... এই ডাঁই... তাও মেরে দিতুম। তখন খাওয়া ছেল বেশ... শরীরে জোরও ছেল। এখন আর খেতে পাই না . সে সময়ও নেই। তখন বড়বাবু একলাই রোজ্‌গার ক'রেছে... তখন কাজেকম্মে তো বটেই, এমনি রোজ পাঁচ ছয় জন লোক ভাত তরকারি খেয়ে এসেছে। তবুও কত্তার আমলে একলার রোজ্‌গার... এখন তো ছেলেরা সবাই রোজ্‌গাব করছে .. অথচ সে জিনিসটি নেই! এখন যদি একটু পেসাদ পেতে হয়, সকালে গিয়ে ব'লে আসতে হয়.—মা একটু পেসাদ পেতে চাই। সবাই রোজ্‌গার করলে কি হবে, এখন যে যার নিজের বুঝ্‌তে শিখেছে।

পচা একদমে এতখানি ব'কে দম নেবার জন্যে যেই একটু থেমেছে সেই অবসবে তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—বাবুদের বাড়ী কাজ করতিস নাকি?

পচা বললে—তা আর করিনি, দশ দশ বছর কাজ কবেছি। কেবল ছোটবাবুর বে দিইনি, আর বড়বাবুর বের পরে গেছলুম, তা ছাড়া মেজবাবু, সেজবাবু, সবায়ের বে আমি দিয়েছি।

—তোর বাড়ীতে কজন লোক থাকে?

—তা আর বল কেন! আমার ছ ছেলে। পাঁচজন তো বছব দেড় দুই ক'বে বেঁচে বেঁচে ম'রে গেল! একটা বেঁচে ছেল... সেটাকে পড়াচ্ছিলুম... অসুখ হ'ল। একদিন একটু ভালো দেখে কাজে গেছি... সেখানে একজন লোক গিয়ে বললে, পচা, তোব ছেলের ভাবি অসুখ। গিয়ে দেখি তার কলেরা হয়েছে। রাজেনবাবু আর যতীন বাবুকে ডেকে আনলুম। তাবাও চারটি টাকা নিয়ে বাড়ী থেকে বেরুলো, আর এদিকেও শেষ হ'ল। বাড়ী ফিরে অবধি আব তার জ্ঞান হ'ল না! সেদিন আপনাদের বাড়ীতে যাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছলুম সেটাকে আমি মানুষ করেছি... সে আমার ছেলে নয়।

জিজ্ঞাসা করলুম, —সে তবে কার ছেলে?

পচা বললে—যখন ছেলেপুলেগুলো মারা গেল, বাবুরা আমাব হাতে কলকেতায় সাড়ে তিনশো টাকা পেঠিয়েছিল... আমারই হাতে টাকাকড়ি পাঠায় কিনা... সবাইকে তো বিশ্বাস হয় না... আমি বলি—বাবু, আমি যদি একদিন টাকা নিয়ে পেলিয়ে যাই... বাবুরা বলে, তুই পালাবি কোথা, তোকে জল ছেঁকে বার করব! আহিরিটোলায় টাকা জমা দিয়ে ওতোরপাড়ার ঘাট দিয়ে আসছি . তখন বিকেল পড়ে গেছে... গঙ্গার ঘাটে লোকজন বেশী নেই... হাতপা মুখ ধুচ্ছি, এমন সময় দেখলুম একটা ছোট্ট ছেলে বালির ওপর প'ড়ে আচে, তার মুখ দিয়ে গেঁজা উঠচে। আমি বলি কে ফেলে দিয়ে গেল, এখুনি তো ম'রে যাবে। ঘাটের ওপর উঠে উড়ে বামুনদের জিজ্ঞেস করলুম... তারা বললে ও কৈবর্ত্তর ছেলে। ওর বাপ মা আজ তিন দিন হল কলেরায় মরেছে... ওর মাসীর হাতে ছেলেকে দিয়ে গেছলো... মাসী রাখতে না পেরে ওখানের এক মেয়েলোকের হাতে দিয়ে যায়, সেই বোধ হয় ফেলে দিয়ে গেছে! শুনেছিলুম চণ্ডীতলা থানার দারোগা-বাবু ওতোরপাড়ায় বদলি হয়েছে... আমি সোজা থানায় চ'লে গেলুম! দারোগা-বাবু তো আগে থেকেই আমায় চিনতো... বললে কি রে পচা! আমি বল্লুম, এজ্ঞে গঙ্গার ঘাটে একটা ছেলে ফেলে দিয়ে গেছে, আমি সেটাকে নিতে চাই। তিনি বললেন, তুই কি মানুষ করতে পারবি? আমি বল্লুম, হ্যাঁ খুব পারবো। দারোগা বললে, তাহলে তুই নিয়ে যা। তারপর আমি গঙ্গার ঘাটে ফিরে এলুম... আসবার পথে দু'পয়সার তালের মিছরি

কিনলুম। ঘাটে এসে গামছা পরে কাপড়টা ছেড়ে ছেলেটাকে তুলে নিলুম, নিয়ে এক কোমর জলে গিয়ে গঙ্গার জলে বেশ ক'রে ছেলেটাকে নেইয়ে দিলুম। কোষা ক'রে গঙ্গার জল একটু মুখে দিলুম, ছেলেটা একটু মুখ নাড়লে। তখন বুঝলুম ছেলেটা বাঁচবে বোধহয়। জল থেকে উঠে এসে গামছার খোঁটে একটু মিছরি বেঁধে সঙ্গের কাটারি দিয়ে গুঁড়ো করে গঙ্গার জলে ভিজিয়ে মুখে ধরলুম... ছেলেটা তখন চক্‌চক্ ক'রে খেতে লাগ্‌লো। তখন বুঝলুম না খেতে পেয়ে ছেলেটা মরার মত হ'য়ে ছেল... আর ঘণ্টাখানেক না তুললে ম'রেই যেত!...

মেঠো পথ ছেড়ে গাঁয়ের পথ দিয়ে চলেছি। সেই পোড়ো বাড়ী, সেই পচা ডোবা, পানাপুকুর, বাঁশঝাড়, বনজঙ্গল সমস্তই ঠিক আছে—বারো বছরে একচুল এদিক্ ওদিক্ হয়নি। মনে হচ্ছে যেন কাল দেখে গেছি। পতিতপাবন পল্লী এই সুদীর্ঘকাল সকল আবর্জ্জনাকেই পরমাগ্রহে বুকে ধ'রে রেখেছে, কাউকে বর্জ্জন করেনি! নিকটের জঙ্গল থেকে একদল শেয়াল ডেকে উঠলো। তাদের কোলাহল ও পচার বকুনি থামলে পচাকে জিজ্ঞাসা করলুম—তখন ছেলেটার বয়স কত?

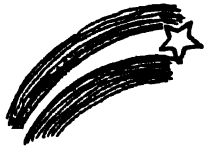
পচা বললে—মোটে চার দিন। হওয়ার পরই ওর বাপ মা ম'রে গেল। ছেলেটাকে কোলে ক'রে ঘাট থেকে উঠে এলুম... ভাবলুম হেঁটে গেলে আর তাকে বাঁচানো যাবে না.. আড়াইটি টাকা দিয়ে কালীপুর পর্য্যন্ত একখানা ঘোড়ার গাড়ীতে উঠে এলুম। বাড়ীতে তো ছেলেটাকে নিয়ে এসে দিলুম। বউ জিজ্ঞেস করলে, একে কোথায় পেলি? বললুম ওতোরপাড়ার ঘাটে পোড়ে ছিল. এটাকে নিয়ে এসেছি, মানুষ করবো। ছেলেটাকে তো আর দুধ না খাওয়ালে বাঁচে না.. তখন আমার এক গাই বিইয়েছিল.. কিন্তু দধ খাওয়াই কি ক'রে? তখন বাবুদের বাড়ী গিয়ে বললুম, এই রকম ছেলে এনেছি.. আপনাদের একটা ম্যানা-বোতল দিতে হবে। তাঁরা বললে, ম্যানা-বোতল তো আছে কিন্তু তার রবাট নেই। আমি বললুম একটা রবাট কিনে নেব 'খন। তখনি নারাণ-বেনের দোকানে গিয়ে দশ পয়সা দিয়ে একটা বোঁটা কিনে নিলুম। বাড়ীতে এসে বোতলটা বেশ ক'রে ধুয়ে, বাড়ীতে দুধ ছিল তা গরম ক'রে বোতলে পুরে বোঁটাটা পরিয়ে দিলুম। ছেলেটার মুখে বোঁটা ধরতেই ছেলেটা চকচক চকচক ক'রে খেতে লাগলো। ছেলেটার কিন্তু পয় আছে বাবু.. ছেলেটার দুধের বরাত খুব! সেই সময়েই তো একটা গাই বিইয়েছিল.. সেটার যতদিন দুধ রইলো খুব ভরপেট খেলে.. তারপর তোমাদের পূন্ন-বাবুর সেই সময়ে একটা বক্‌না ছিল.. সেটাকে আমাকে এক বিয়েনে মানুষ করতে দিলে...

—তার মানে?

প্রথম বিয়েনের পর দুধ আর বাছুর আমি পাবো, তারপর আবার গর্ভিন হয়ে দুধ বন্ধ হ'লে গরু ফেরৎ দিতে হবে। ঐ গরুটা বিয়োনোর পর খুব দুধ হতে লাগলো, তারপর গাবিন হওয়ার পর অনেক দিন দুধ দিলে। সব দুধই ছেলেটা খেয়েছে। তা না হ'লে আমার কি আর দুধ কিনে খাওয়াতে পারি বাবু, না ভূষি খোল দিয়ে গরু পুষতে পারি! এধার ওধার চরিয়ে নিয়ে খাওয়াই। এখন ছেলে আড়াই বছরের হয়েছে... গোড়ায় গোড়ায় বউ ওর গু মূত কাটতো না... আমিই করতুম সব। আর এখন একদণ্ড সেটাকে চোখের আড়াল করবে না! কোলে নিয়েই যেখানে যাবে সেখানে ট্যাঙস ট্যাঙস ক'রে নিয়ে যাবে... ছেলেটাই কি ভোগাচ্ছে কম! এই সেদিন জ্বরবিকার হয়েছিল... তোমাদের পোবোধবাবু দেখে ওষুধ দিলে... আঠারো দিন পরে তবে জ্বর ছেড়েছে। এই দেখনা পরের ছেলে নিয়ে মানুষ করছি... বড় হয়ে মানবে কি না মানবে... নিজের ছেলেই তো আজকাল মানে না! তা যাই হোক, প্রাণ তো দিয়েছি আমি... একটা প্রাণ তো বাঁচালুম.. তা ওর ধর্ম্মে যা হয় তাই করবে...

বাড়ীতে মোট নামিয়ে দিয়ে পচা বিদায় হল। রাত্রে বিছানায় শুয়ে ভাবছিলুম, নিরক্ষর কেওরার ছেলে পচা—সে কি ছোটলোক?

২৩ বর্ষ, বৈশাখ ১৩৩০



তারা ও উল্কা

নিরুপমা দেবী

সাঁজের বেলায়, নীল আকাশের একটি কোণে, চক্‌চকে ছোট্ট তারাটি রোজ যেমন ওঠে, তেমনি সেদিনও উঠে নীচের পানে চাইলে।

নীচে, পৃথিবীরও একটি কোণে, একটি ছোট্ট নদী কূলে কূলে ভ'রে বয়ে যাচ্ছে! তার দুই ধারে অনেক দূর পর্য্যন্ত, সবুজ ঘাসের দুখানা পুরু আসন বিছানো! দূরে বনের আঁধার রেখা! সেই নদীটির জলে মুখ দেখতে দেখতে, কূলের সেই সবুজ গালিচার পানে চাইতেই, সেই ছোট্ট তারার, তার চেয়েও ছোট্ট মনটি অন্য দিনের মতই কেমন যেন হ'য়ে উঠল। একদৃষ্টে সেই বনের রেখা, নদীর জল, ও তার কূলের পানে চেয়ে তারাটি সেদিনও বিমনা হ'য়ে ভাবতে লাগল "কেন এমন হয়? ওখানে কি ছিল কে আমায় বলে দেবে?"

"আমি বলব, শুনবে?"

তারা সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলে কোথা হতে একটা জ্বলন্ত উল্কা এসে তার আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্চে!

"ওখানে কি ছিল আমি বলব শুনবে?"

তারা মৃদুস্বরে বললে "বল!" উল্কা বলতে লাগল।

অনেক দিনের কথা। তখনো অমনি বনের মাঝে দুই ধারের সবুজ ঘাসের ক্ষেতের তলার ঐ নদীটি ব'য়ে যেত। বর্ষায় তার জল বেড়ে ঘাসবনের অর্দ্ধেকখানি ডুবিয়ে তাদের মাঝে মাঝে এমনি করেই কল্‌কল্ ছল্‌ছল্ ক'রে খেলা করত, আবার শীত গ্রীষ্মে অমনি ঘাসের নীচে নেমে গিয়ে তাদের তলায় তলায় কুলুকুলু ঝুরুঝুরু সুরে গান গাইত। বনের অশান্ত বাতাস তার কাছে এসে তার ঠাণ্ডা জলটি ছুঁয়ে এমন শান্তি নিরীহটি হ'য়ে যেত যে তার সে নরম ভাবের স্পর্শে কচি ঘাসগুলি আনন্দে নুয়ে নুয়ে তার সঙ্গে একজুটী হ'য়ে সেই নদীর ধারে সারা বিকাল খেলা করত।

নদীর ওপারে, সূর্য্য যখন এমনি অস্ত যেতেন, তখন নদীর জলে তাঁর আলোর খেলা সারা হবামাত্র পাঁচরঙা মেঘেরা এসে ঐ আয়নাখানিতে মুখ দেখবার জন্যে দলে দলে ঝুঁকে পড়ত। তার পরে মেঘেরা যখন তাদের সে খেয়াল সেরে ঘরে যাবার জন্যে এদিকে ওদিকে স'রে পড়ত, নীল আকাশে যখন কোন দিন একটুখানি চাঁদ, কোন দিন কেবল গোটাকতক ছোট বড় দপ্‌দপে মিট্‌মিটে নক্ষত্র ফুটে উঠত, তখন দেখা যেত আরও একটি কে এই নদীর ঘাসবনের ওপারে থেকে তার আঁচলখানি সেরে তুলে নিয়ে অস্তবেলার লোহিতরাগের মত নিঃশব্দে ঐ বনের গভীর আঁধারের মধ্যে মিশে যাচ্ছে।

সেই বনের মাঝে বিজন নদীর তীরে কে সে, কেউ জানত না! কেবল সেই নদীর জল, যার স্পর্শ মাত্রে তারা পুলকিত উল্লসিত হ'য়ে কলভাষায় তাকে আদর করত; সেই ঘাসের সবুজ কোমলশির, যার পদস্পর্শে তারা একটুও নুইত না; সেই স্নিগ্ধ বাতাস, যে তার কপালের চুলগুলি ও লুটানো আঁচলখানি নিয়ে সারা বিকাল খেলা করত; তারাই মাত্র জানত চিনত সে কে! সাঁঝের তারার প্রশ্নভরা দৃষ্টি তার ওপর পড়বা মাত্র সে সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠে দাঁড়াত এবং বনতল তখনি সেই কৌতূহলী দৃষ্টির মধ্য হঁতে নিজের কোলে তাকে টেনে নিয়ে অটল মৌনভাবে দাঁড়িয়ে তার বুকের মাঝের লুকানো ধনটির আভাস মাত্র আর কারুকে জানতে দিত না।

সেদিনও সে সারা বেলা আপন মনে ভূঁইচাপা ও ঘাসের ফুলগুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে জলে ভাসিয়ে দিচ্ছিল। বর্ষার জলভরা নদী তার পা দুখানিকে হাতের কাছে পেয়ে মনের সাধে কেবলি আদর ক'রে ছুঁয়ে ছুঁয়ে পালাচ্ছিল আর তাদের রাঙা রংটুকুকে ধুয়ে নেবার চেষ্টায় ছিল। কোমল ঘাসের সবুজ আসন সেই তনুদেহখানিকে সযত্নে বুকে ধরে' তার চারিপাশে লুটিয়ে পড়েছিল; বাতাস সেদিন

তার মনোযোগ আকর্ষণ করতে না পেরে অশান্ত হ'য়ে উঠে ঘাসের উপর লুটানো চুলগুলিকে তার চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়ে, কানের পাশের গুলিকে চোখে মুখে এনে ফেলে তাকে বিব্রত ক'রে তুলছিল। বাতাসের এই অত্যাচারে শেষে জ্বালাতন হ'য়ে নীলাভ সুন্দর চক্ষু দুটি আর রাঙা মুখখানি দ্বিগুণ রাঙা ক'রে সে মুখ ফেরাতেই দেখতে পেলে, সেই বিজনবনভূমির বিজন নদীর বুকে কোথা হ'তে একখানি নৌকা ভেসে এসেছে! চোখের মুখের চুল সরিয়ে অবাক হ'য়ে তারপরে চেয়ে দেখ্‌লে, শুধু নৌকা নয়, নৌকার মাঝেও কে একজন! তারই মত অবাক্ হ'য়ে সেও তার পানে চেয়ে আছে।

তাদের সেই অবাক দৃষ্টি যে কতক্ষণ দুজনার দৃষ্টির মধ্যে আটকানো ছিল তার তারা কেউই খোঁজ রাখেনি। হঠাৎ সম্মুখের নীল আকাশে শুক্লাতৃতীয়ার ছোট্ট একখানি জ্যোতির নৌকা ভেসে তাদের চোখের কাছে এসে দাঁড়াবামাত্র কূলের সে চঞ্চল হ'য়ে উঠল এবং নদীর বুকে চোখের দৃষ্টি তেমনি স্থির রেখে অস্তগামী তারকার মত ক্রমে ক্রমে সে বনের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেল! নৌকাখানি তারপরে নদীর কূলে কূলে কতক্ষণ ফিরল! বনের দিকে অনিমেষে কতক্ষণ চেয়ে চেয়ে গভীর রাত্রে সে-নৌকা আবার একদিকে ভেসে গেল।

পরদিন আবার যথাকালে একটু যেন বাধো বাধো পায়ে, নদীর দিকে তেমনি স্থির দৃষ্টি নিয়ে বনের বাধা ভেদ ক'রে সে এসে দাঁড়াল। নদীর জল উতলা হ'য়ে তাকে আবাহন করলে, তার স্পর্শ পেতে অধীর হ'য়ে উছ্‌লে উছ্‌লে উঠতে লাগল, বাতাস আনন্দে ছুটে গিয়ে তার আঁচলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, ঘাসেরা তাদের সবুজ দেহ মাটিতে লুটিয়ে দিয়ে আগ্রহে মাথা নেড়ে ডাকাডাকি করতে লাগল "এস এস, আমাদের চিরদিনের আপন ধন! আমাদের কাছে এস! কেন অমন ক'রে নদীর পানে চাইছ, কেউ নেই, কিছু নেই কোথাও! কেবল তোমার চিরদিনের আমরাই তোমার জন্যে বুক পেতে দিয়ে প'ড়ে আছি, তুমি আসবে বলে' পথ চেয়ে আছি! এস তুমি আমাদের বুকে এস।"

কোথাও কেউ নেই দেখে একটু আশ্বস্ত ভাবে সে অন্যদিনের মতই নদীর জলে পা ডুবিয়ে বসল বটে, কিন্তু তবু তার চিরদিনের সাথীদের ডাকে সেদিন উত্তরও দিতে পারলে না এবং তার বিমনা ভাবও গেল না। ক্ষণেক পরেই সেই বনভূমি দেখলে, সেদিন তাদের চেয়েও শতগুণ বেশী আগ্রহে আর একজনও তার পথ চেয়ে ছিল। তখনি নদীর বুকে সেই নৌকা ভেসে এল, এবং আবার জলের ও স্থলের চারটি চোখের দৃষ্টি একত্র হ'য়ে নিবিড়তর ভাবে মিলিত হ'ল। জলে একজন, স্থলে একজন, তবু কি গভীর সে মিলন! মুহূর্ত্তে সে নদী, সে বায়ু, সে শতস্পন্দনময়ী প্রকৃতি, সব নিস্তব্ধ নীরব হ'যে সেই দৃষ্টির মিলনকে অব্যাহত ও গভীরতর ক'রে তুললে। সেই দুটি প্রাণীর চারিটি দৃষ্টি ছাড়া জলে স্থলে সেদিন যেন আর অন্য কিছুরই স্বতন্ত্র সত্তা মাত্র রইল না। সেই বিজন স্থানের নীরব নদীকূলের এবং পশ্চাতের বনরেখার দৃশ্যপটে সেই দুটি দৃষ্টি-মুগ্ধ প্রাণীর চিত্র আঁকবার জন্যে প্রকৃতির সেই নিস্তব্ধ নীরব আয়োজন!

সন্ধ্যার অন্ধকারে এবং চাঁদের কঠোর করস্পর্শে চকিত হ'য়ে আবার সে অন্য দিনের মত বনের বুকে লুকিয়ে গেল। নদীর জল কুলু কুলু রবে কেঁদে উঠল, "গেল সে আজকের মত গেল। আবার পাব কি, কাল আবার তার দেখা পাব কি?" বায়ু গুম্‌রে উঠেও আশ্বাস দিলে "আসবে, আসবে সে, আসবে আবার!" চাঁদের নির্ম্মম করস্পর্শে তাদের এ সুখচিত্র ভেঙে গেল বলে' তারা যেন চাঁদের ওপর বিষম ক্রুদ্ধ হ'য়ে জলের তরঙ্গের অশান্ত আঘাতে তার তনুদেহের ছবিখানি চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে ভাঙতে লাগল। পাল উঠিয়ে নিশ্বাস ফেলে আবার সে নৌকাও পূর্ব্বদিনের মত দৃষ্টিপথের অন্তরালে চলে গেল।

পরদিনে সে বন হ'তে বার হয়ে নদীতীরে আসবার আগেই নৌকাখানি নদীর বুকের মধ্যখানে এসে তার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল এবং তার আসার বিলম্ব দেখে নৌকার মধ্য হ'তে অধীর সঙ্গীতধ্বনি বেজে উঠল—

"এস ওগো এস! এই প্রকৃতির নির্জ্জন খনির মণিস্বরূপা, গভীর বনের বনলক্ষ্মী! ঐ সবুজ সমুদ্রে বিকচ পদ্মের মত ফুটে উঠে এই প্রাণহীনা শোভনা প্রকৃতিতে প্রাণ সঞ্চারিত কর! বায়ু ম'রে

আছে, নদীর বুকে, এসে তাদের ভাষা দাও, আশা দাও, প্রাণ দাও, তাদের চঞ্চল এবং কলধ্বনিময় কর। আর বনে লুকিয়ে থেক না,—এস ওগো এস! আমি তোমার নিকটে যাবনা, আর কিছু চাইব না, কেবল এমনি দূর হ'তে তোমায় চেয়ে দেখব মাত্র! যেমন নদীর এই অপর পারের গভীর বনভাগ—তার বুকের ঘন আঁধার চিরদিন অটলভাবে বুকে ব'য়ে স্তব্ধনেত্রে কেবল দূর হ'তে তোমায় চেয়ে দ্যাখে,—এপারের এই সবুজ ঘাসের মত, নদীর জলের মত তোমার পা দুটি স্পর্শ করেও কৃতার্থ হতে পায় না,—আমিও তেমনি দূরে দাঁড়িয়ে কেবল তোমায় দেখব মাত্র, একটি কথা কইব না, একটি কথা কইতেও বলব না। এস ওগো এস! এসে এ তোমার সবুজ আসনের উপরে একবার দাঁড়াও! বাক্‌হীন জলস্থল অধীর বাসনায় গুম্‌রে মরছে, তাদের আশা একবার পূর্ণ কর!"

এই আবেগভরা প্রাণের কাতর আবাহনকে সার্থকতা দিয়ে সে ধীরে ধীরে অতিকুণ্ঠিতপদে ক্রমে নদীতীরে এসে দাঁড়াল! সে-দৃষ্টি সেদিন এক-একবার লজ্জিত কুণ্ঠিত, আবার এক-একবার ঐ গানের মতই ভাষাময় আশাময় আবেগময়। সে-প্রাণের গোপন কথাও বুঝি সেদিন সেই সঙ্গীতেব মত ভাষাময় হয়ে ফুটতে চাচ্ছিল, পারছিল না; —তাই এক অব্যক্ত ব্যথায় ভরে উঠে কেবল দুই চক্ষের আকুল দৃষ্টিপথে ছুটে গিয়ে সেই নৌকার গায়ে নদীর ঢেউয়ের সঙ্গে আছড়ে পড়ছিল! —দেখতে দেখতে আবার স্থল ও জলের চারটি দৃষ্টি তেমনিভাবে এক হ'য়ে সে বিজনভূমিকে একেবারে নিস্তব্ধ করে দিলে! কতক্ষণ, কদণ্ড যে তাদের সেই দৃষ্টিমিলন সেইভাবে ছিল, তা সেখানকার বায়ু নদী বা সেই বিজনভূমি কেউই বলতে পারে না! তারাও সেই দৃষ্টি বিনিময়ের মধ্যে এমন হ'য়ে মিশে গিয়েছিল! যখন তাদের আপন আপন সাড়া ফিরে এসে আপন কথায় তারা চঞ্চল ও মুখর হ'য়ে উঠল তখন তাদের সর্ব্বাঙ্গ চাঁদের আলোয় ভরে গেছে, সন্ধ্যাতারা উঠে কখন্ অস্ত গেছে, নদীর তট ও বুক একেবারে খালি। সে বনের লক্ষ্মী উঠে কখন বনের বুকে মিলিয়ে গেছে এবং নৌকাখানাও পাল তুলে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে কোন্‌দিকে চ'লে গেছে।

এমনি করে সেই জলস্থলের ব্যবধানের মাঝের সেই দৃষ্টির মিলন কতকাল কতদিন ধরে যে চলেছিল—তারও হিসাব রাখবার মত সেখানে কেউ ছিল না! নদীস্রোত সাদর কলভাষার সঙ্গে সেই নৌকাখানিকে প্রত্যহ যথাস্থানে নিয়ে আসত, ফুলের কোমল আসনখানি তার জন্যে তেমনি বিছিয়ে রাখত, বন তার বুকের ধনটিকে যথাকালে নদীতীরে বার ক'রে বসাত, বায়ু তেমনিভাবেই তাদের সেই একাগ্রদৃষ্টির বাধাস্বরূপ তার সুমুখের চুলগুলিকে পেছনে সরিয়ে দিত এবং লুটানো আঁচলখানিকে গুছিয়ে রাখত। তাদের সেই মিলনের জন্য এরাও যেন সমস্ত রাত ধরে প্রতীক্ষা করে আছে; সে মিলনের যেন এরাই উত্তরসাধক দূতস্বরূপ ছিল। তাদের অনুকূল চেষ্টায় সংঘটিত সেই মিলনচিত্রটি রাত্রির আগমনে ভেঙে যেত বলে' নদীর ধারের চখাচখীর সঙ্গে তারাও রাত্রি আর চাঁদকে কেবল গাল পাড়ত।

সেই নদীর বুকের নৌকা থেকে কতদিন কতভাবেব কত আকুলভাষার সঙ্গীত, বায়ু তার সেই রাঙা পা-দুখানির কাছে ব'য়ে এনে দিয়ে তাদের লজ্জায় সঙ্কুচিত করত, এবং কখনো বা রাঙা রাঙা কপোল দুখানির পাশের চুলগুলি সরিয়ে সেকথা তার কানে কানে ক'য়ে সে দুটিকে আরও রাঙা ক'রে তুলত। সে সঙ্গীতের এক একদিনের এক একটি নূতন ভাবের নূতন ভাষার অর্থও বোধহয় সবদিন সে ঠিক বুঝে উঠতে পারত না। যেদিন তার আসার বিলম্ব দেখে সে সঙ্গীতে আবাহনের অধীর রাগিণী বাজত, সেদিন সে নদীর কূলে একটু যেন অগ্রসর হয়ে বসত; যেদিন সে সঙ্গীতের ভাষায় ও সুরে তাদের সেই নিত্যমিলনের আশা আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ ও কৃতার্থতা আরতির দীপশিখার মত জ্বলে উঠে তার পদতল হতে সর্ব্বাঙ্গ ঘিরে তাকে বন্দনা ক'রে ফিরত, সেদিন সে নির্ব্বাক মুখে দ্বিগুণ স্পন্দহীন হ'য়ে যেত। এবং যেদিন সে নৌকা হতে ভাবীবিরহের আশঙ্কাকাতর বিষাদাপ্লুত করুণ সুর ভেসে আসত, সেদিনও সে এক অজ্ঞাত বেদনায় দুই চক্ষে জল ভরে' একভাবেই বসে থাকত। ঐ একদৃষ্টে চেয়ে থাকা ছাড়া সে আর যেন জগতের বেশী কিছু বুঝত না বা জানত না!

একদিন সে ঘাটে এসে শুনলে ওকি এক নূতন রাগিণী সেই নৌকা ও নদীর বুক ছাপিয়ে

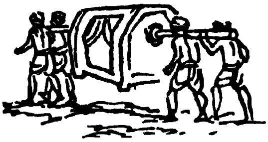
জলে এসে আছড়ে পড়ছে। এ তো সেই ভাবী বিরহ-আশঙ্কার বিষাদমন্থর অলস করুণ স্বর নয়, এ যে স্থির নিশ্চিত কোন তীক্ষ্ণ বেদনার তীব্রবেগে ভরা সুর, সে সুরের ভাষাও ততোধিক তীব্র আকুলতায় ভরা। গান উঠছিল—

"আর নয়, আর নয়! ওগো আমার জীবন দুদিনের, অথচ চিরকালের জন্য উদিত স্থিরোজ্জ্বল তারা, তোমার ও অপলকদৃষ্টি আমার দিক্ হ'তে ফিবিয়ে নাও!— আর নয়, কালপূর্ণ হয়ে এসেছে, আজ তাকে তোমার ঐ নয়নের শেষদৃষ্টিতে সারাজীবনের চিরসম্বল দিয়ে বিদায় দাও। হতভাগ্য সে জগতে তার স্থিতির স্থির কেন্দ্র কোথাও নাই, উল্কার মতই সে ঘুরে বেড়ায়। দণ্ডের জন্য তোমার পাশে এসে তোমার ঐ মধুরোজ্জ্বল দৃষ্টিসুধায় অভিষিক্ত হ'য়ে আবার তার সেই অভিশপ্ত জীবন নিয়ে অনির্দ্দিষ্ট শূন্য পথে ছুটে চলল! জানি না কবে তার এ অনির্দ্দিষ্ট গতির শেষ হবে, কবে তার এ জ্বলন্তজীবন একেবারে পুড়ে ছাই হয়ে রেণু রেণু হয়ে তোমারই চারিপাশে ঘিরে থাকবে। ক্ষমা ক'রো, ওগো তোমার দৃষ্টিপথের এই দু'দণ্ডের অতিথিকে ক্ষমা ক'রো। তারই কথা ভেবে, তারই প্রতীক্ষায় এই নদীতীরে এমনি করে' সুদূরের পানে চেয়ে যদি চিরদিনই তোমায় ব'সে থাকতে হয় ওগো তবু এই অপরাধীকে ক্ষমা ক'রো। সাধ্য নাই তার, একস্থানে স্থিরভাবে তার থাকবার ক্ষমতা নাই! উল্কার মতই এসে সে আবার তেমনি চলল। —কিন্তু তবু,—দেখা হবে আবার। লোকলোকান্তে যুগযুগান্তে একদিন তোমার ঐ স্থিরদৃষ্টির সম্মুখে আমি পড়ব, একদিন অন্ততঃ দুদণ্ডের জন্যও আমাদের আবার দেখা হবে। বিদায়—এখন তবে বিদায়। তোমার ও ভীত স্তব্ধ মুগ্ধদৃষ্টি আমার দিক্ হ'তে তুলে নাও। ঐ দ্যাখ তোমার চিরদিনের সঙ্গীনা তোমার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, নদীর জল পদতল স্পর্শ করে' স্নেহগদগদকণ্ঠে সান্ত্বনা জানিয়ে বলছে "হবে, আবার একদিন দেখা হবে। —বিদায়— আজ তবে বিদায়।"

কোথায়! কে কোথায়! বিস্ময়ে বেদনায় স্তব্ধ নির্ব্বাকমুখে তারকা চেয়ে দেখলে—তার পাশে আর কেহ নাই! এইমাত্র পাশে দাঁড়িয়ে যে এই কাহিনী বলছিল তার আর সেখানে চিহ্নমাত্রও নাই! —হুহু শব্দে জ্বলতে জ্বলতে সে উল্কা—কোথায়—অসীম আকাশের কোন্‌দিকে ছুটে চলে গেছে।

আশে পাশে তার আকাশভরা অপরিচিত তারার দল। কেউ তার পরিচিত নয়, কারো মুখ সে চেনে না। নীচে চেয়ে দেখলে এই অস্পষ্ট বনের রেখা নদীর তীর, চাঁদের আলোয় মৌন মূক হয়ে কাদের স্মৃতি বুকে করে' একভাবে দাঁড়িয়ে আছে, এবং তাদের সেই মৌন বুক হ'তে একটা বহুদিনের পরিচিত সান্ত্বনার অননুভূত স্পর্শ ও সহানুভূতির কোমল স্মৃতি নীরবে উঠে সেই সুদূর নক্ষত্রলোক পর্যন্ত ভেসে আসছে। তারাটি খানিকক্ষণ তাদের সেই মূক স্নেহনিবেদনটি উপভোগ ক'রে নিয়ে এবং পরে মুখ তুলে—যে দিকে সেই ক্ষণপরিচিত অতিথি এইমাত্র ছুটে চলে গেছে—সেই অসীম শূন্যপথে স্থির দৃষ্টে চেয়ে রইল।

১০ই আশ্বিন ১৩২১



প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বৃদ্ধবয়সে পত্নীবিয়োগ হওয়াতে বামনদাস একান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। বৃদ্ধবয়সের এ দুঃখ অর্ব্বাচীন পুত্রগণ বুঝিল না, তাই যখন তাহারা তিন চারি দিন ধরিয়া ঈশান ঘটককে ক্রমাগত আসিতে এবং পিতার সহিত গোপনে পরামর্শ করিতে দেখিল তখন অন্তরালে তাহারা ঈশানকে এমন শাসাইয়া দিল যে অতঃপর ঈশান আর বামনদাসের বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াইতে সাহস করিল না।

সেদিন বদমায়েস প্রজা নিতাই প্রামাণিকের নিকট হইতে বহুদিনকার পড়ো খাজনা আদায়ের জন্য বামনদাস যখন স্কন্ধে চাদর ফেলিয়া ছেঁড়া চটি ফটর ফটর করিতে করিতে বাহির হইল, তখন চৌধুরীদিগের বাগানের প্রকাণ্ড তালগাছের পশ্চাতে সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল। গাঙ্গুলিদিগের পুষ্করিণীর পার্শ্বে যে অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে, তাহারই সম্মুখে বামনদাস ঈশানের সাক্ষাৎ পাইল।

ঈষৎ হাসিয়া বামনদাস কহিল, "কি হে ঈশেন, আর ওদিকে যাও-টাও না যে?"

ঈশান কহিল, "আজ্ঞে যাব কি? ও বাড়ীতে মাথা গলালে আপনার ছেলে আমার পা ভাঙ্গবে বলেছে!"

বামনদাস কহিল, "যত কুলাঙ্গার জুটেছে! তা আমি আছি কেমন পা ভাঙ্গে দেখব না।"

ঈশান কহিল, "আজ্ঞে পা ভাঙ্গলে পর দেখা দেখিতে বিশেষ এসে যাবে না—তবে দুঃখ হচ্ছিল আপনার জন্যে—শরীরটা ক্রমেই যেন ভেঙ্গে পড়ছে—যত্ন আত্তি করছেন না বুঝি মোটে!"

বামনদাস ছোট একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "তুমিও যেমন নিজের শরীরে আর যত্ন কে কবে করে থাকে, ঈশেন? গিন্নি কি তোয়াজেই রাখতেন—ছেলেপিলেরা কি কিছু বোঝে, না দেখে; নিজেদের নিয়েই চব্বিশ ঘণ্টা ব্যস্ত আছে!"

ঈশান কহিল, "আজ্ঞে, ঘোর কলি তবে আর বলেছে কেন? মোদ্দা এমন অযত্ন করলে শরীর আর কদিন টিঁকবে?"

"আর টিকেই বা লাভ কি, বল—এ যেন হালভাঙ্গা নৌকোখানা বানচাল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি বইত নয়!" বলিয়া বামনদাস সহানুভূতি লাভের আশায় একটা হতাশামিশ্রিত হাসি হাসিল।

ঈশান কহিল, "বলেন কি, মশায়? আপনারা আছেন, তবু পর্ব্বতের আড়ালে আছি! তা একটা বিয়ে থা করে—"

"ঐ জন্যেই ত তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে চাই ঈশেন। একটি বিয়ে না করলে ত আর চলে না। সে যেমন আমাকে বুঝবে, চালিয়ে নিয়ে বেড়াবে এমন কি ছেলেমেয়েরা পারে!"

"বটেই ত! বলে, দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে! তা ভারী একটা হাত-ছাড়া হয়ে গেল!"

"কেন, কেন?"

"আজ্ঞে ঐ ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তীর এক শালী ছিল! চমৎকার মেয়ে, যেন দুর্গাঠাকরুণটি! আর বয়স, বলব কি মশায়, আপনার সঙ্গে মানাতো!"

"আহাহা! ঐ অমনটি হলেই ভালো হয়—হাজার হোক আমারও কিছু বয়স হয়েছে—এখন কি আর কচি মেয়ে মানুষ করা পোষায়! তা ছাড়া বুঝেছ আমি কেমনটি চাই?—এই দুদিনে আমাকে বুঝে নিতে পারে—আফিমটুকু ঠিক করে রাখলে, দুটো পান ছেঁচে দিলে, একটু গা-হাত-পা টিপে দিলে, দু ছিলিম তামাক—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ ও আর আমাকে বলতে হবে না—অর্থাৎ আপনি যা চান এসেই একেবারে নিজের দখলটুকু বাগিয়ে ঠিক করতে পারে।"

"এই! এই! তুমি একটু দেখে শুনে লাগো দাদা—তোমায় বিশেষ রকম পরিতোষ করবো।"

ঈশান একটু মাথা হেলাইয়া আকাশের দিকে চাহিল—পরে কহিল, "কিন্তু মশায়, আমার

একটি মিনতি আছে—আপনার বাড়ীতে আমি যেতে পারব না। যে সব ছেলে—আপনি বিবাহ করলে ছেলেপিলেও ত হবে তারা বিষয়ের অংশ নেবে—কাজেই এরা রেগে টং হয়ে আছে! বিয়ের কথা শুনলেই আমার পিঠে লাঠি হাঁকড়াবে! অথচ বাপের বিয়ে দেওয়াটা কত দরকার তা বুঝবে না! এই বুড়ো বয়সে সেবা যত্ন করে কে? তার জন্যেও তো—কি বলেন আপনি!"

বামনদাস কহিল, "কুপুত্র! কুপুত্র!" স্বরে একটা ভীতির আভাস জাগিয়া উঠিতেছিল। একটু কাশিয়া কহিল, "কিছু ভেবোনা দাদা—"

ঈশান কহিল, "না মশায় আপনার বাড়ী যেতে পারবো না, পথে ঘাটেই কথাবার্ত্তা কওয়া যাবে এ সম্বন্ধে।"

বামনদাস কহিল, "তুমি একটু উঠে পড়ে লাগো দাদা—আবার সামনে ভাদ্র মাস আসছে, তিন মাস আর ও পাট হবে না! তুমি মনে করলেই সব হবে! বুঝেছো দাদা, এ ত গিন্নি মরেন নি, আমাকেই মেরে গেছেন!"

"বটেই তো, বটেই তো—তা আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—যখন ঈশান ঘটক কথা দিয়েছে, তখন তার আর নড়চড় হচ্ছে না, এই বলে রাখলুম।"

"বেঁচে থাকো, দাদা,—চিরজীবী হও!"

ঈশান চলিয়া গেল। বামনদাস দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ঈশানের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল—সে দৃষ্টির অন্তরালে মিলাইলে বৃদ্ধ নিতাই প্রামাণিকের উদ্দেশ্যে চলিল।

ইহার পর ঘোষেদের বাগানে, মিত্রদের বাড়ীর পাশে, গ্রামের বাবা ঠাকুরতলায় ও ঈশানের ঘরে পরামর্শাদি এমন সবেগে চলিতে লাগিল যে ব্যাপারটা পুত্রগণের আর অগোচর রহিল না। এবং তাহারা ইহার পর এমন ভাব ধারণ করিল যে, বাধ্য হইয়া অবশেষে কলিকাতায় কালী দর্শনের নাম করিয়া বামনদাস একদিন গৃহত্যাগ করিল, ঈশান আসিয়া ষ্টেশনে বৃদ্ধের সহিত যোগ দিল। উভয়ে কলিকাতায় আসিল।

২

কলিকাতা বৈঠকখানা বাজারে এক মেসে আসিয়া দুইজনে একটি কক্ষ অধিকার করিল। ঈশান সারাদিন ট্রামে চড়িয়া চিড়িয়াখানা, মিউজিয়ম, ঈডেন গার্ডেন দেখে, মধ্যে মধ্যে পাত্রীরও সন্ধান করিয়া ফেরে। বৃদ্ধ বামনদাস সারাদিন তামাকু ঢালিয়া সাজিয়া টানিয়া ঈশানের আশায় পথ চাহিয়া বসিয়া থাকে। মেসের সম্মুখ দিয়া ফিরিওয়ালা হাঁকিয়া যায়, মাতাল হল্লা করে, দপ্তরীরা বই বাঁধে, বর্ষায় কলিকাতার রাস্তা নদীর মত হইয়া পড়ে, পাড়ার ছেলেরা সেই জলে কলার ভেলা ভাসায়, জানালার মধ্য দিয়া সে তাহাই দেখে। এমন করিয়াই দিন কাটিয়া যায়।

একদিন সন্ধ্যার সময় ঈশান শশব্যস্তে আসিয়া কহিল, "দাদাঠাকুর!"

"কেন দাদা?"

ঈশান আবেগের সহিত কহিল, "চট্ করে পিরাণটা গায় তুলে একটা চাদর ঘাড়ে কর। কিনারা হয়েছে। এখনি যেতে হবে পাত্রী আশীর্ব্বাদ করতে,—সেই ভবানীপুরে!"

বৃদ্ধ বিস্মিতভাবে কহিল, "পাত্রী? কার—?"

ঈশান চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "কার আবার, আপনার! বলেছি ঈশান যখন মনে করেছে, তখন ফস্কাবার জো কি! পাত্রীটি সুন্দরী, কুলীনের মেয়ে। বাপের পয়সার জোর নেই, এই আঠারোতে পা দিয়েছে—যেন আস্ত পরী গো দাদাঠাকুর, আস্ত পরী।"

সাজসজ্জা করিয়া বৃদ্ধ পাত্রী আশীর্ব্বাদ করিতে চলিল। পাত্রীটি সত্যিই সুন্দরী! বিবাহের দিন স্থির হইল, ২৭এ শ্রাবণ। তার পূর্ব্বে ভালো দিন নাই।

কলিকাতার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল। পাত্রী দেখাশুনায় বিলম্ব হইয়া পড়িয়াছিল—ট্রাম চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, অগত্যা গাড়ী ভাড়া করিয়া বাসায় ফিরিতে হইল।

গাড়ীতে বসিয়া বামনদাসের তন্দ্রা আসিতেছিল—তন্দ্রার ঘোরে সে কত বিচিত্র মধুর স্বপ্ন দেখিতেছিল। যেন অগাধ সমুদ্রে সে ভাসিয়া চলিয়াছে—কূলকিনারা দেখা যায় না—তরঙ্গের পর

তরঙ্গ তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে—বুঝি জীবনের আশা ফুরাইল,—এমন সময় আলোকচ্ছটায় চারিধার ভরিয়া গেল—বৃদ্ধ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া দেখে, এক পরী উড়িয়া আসিতেছে। তাহারই পানে সে আসিতেছে!—সীমন্তে সিন্দূরের স্থলে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে—মাথায় একরাশি আলোকের ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে—পরী তাহাকে উঠাইবার জন্য হাত বাড়াইয়াছে—সে যেমন পরীর কোমল সুন্দর হাত ধরিয়া জল ছাড়িয়া উঠিবে, অমনই কড় কড় শব্দে মেঘ গর্জ্জিয়া উঠিল—আকাশের বুক চিরিয়া একটা আগুনের রেখা ছুটিয়া গেল—একটা তরঙ্গ আসিয়া সজোরে তার মাথায় ঘা দিল—মাথাটা কাঁপিয়া উঠিল! তন্দ্রা ভাঙ্গিলে বৃদ্ধ দেখিল, গাড়ীর কাঠে মাথাটা রীতিমত ঠুকিয়া গিয়াছে। চেতনাসঞ্চারে একটা কথা মেঘগর্জ্জনের মত বৃদ্ধের বুকের মধ্যে ধ্বনিয়া উঠিতেছিল—পাত্রী দেখিতে গিয়া পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে এক রমণীকে সে বলিতে শুনিয়াছিল, "বাহাত্তুরে বুড়ো—এখনও বিয়ের সখ! ও বুড়ো মিন্সে বরের বাপ, না ঠাকুর্দ্দা।" আর একজন কহিল, "না গো, এই বর!" সঙ্গিনী উত্তর দিয়াছিল, "মরণ আর কি! এমন মেয়েটা এই বুড়োর হাতে দেবে—তার চেয়ে থুবড়ো করে রাখলে না কেন!" এই কথাটাই বৃদ্ধের বার বার মনে পড়িতেছিল।

৩

গাত্রহরিদ্রার দিন অপরাহ্নে ঈশান আসিয়া বলিল, "একটু মুস্কিল হয়েছে।" বামনদাসের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল—সে কহিল, "কেন?"

ঈশান কহিল, "ওরা বলছিল, বিয়ে ত আমরা দোব—কিন্তু তারপর জামাইয়ের বয়স হয়েছে—যদি ভালোমন্দ হয়, তখন আমাদের রাইমণি কি জলে পড়বে—ছেলেরা মারধোর করে যদি বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়—তার উপায় কি হবে?"

একটা ঢোঁক গিলিয়া বামনদাস কহিল, "তাই ত ঈশেন—শুভকাযের সময় এ'ত মহাবিভ্রাট দেখছি! ভালোয় ভালোয় এখন—"

ঈশান কহিল, "মেয়ের মা অতশত কিছু বলেনি—মেয়ের এক মামা আছে, হুগলির আদালতে সে মোক্তারি করে—সেই আজ এসে ফ্যাসাদ বাধালে। আর বিশেষতঃ আপনার ছেলেগুলিও কিছু সত্যি শান্তশিষ্ট ত নয়!"

বামনদাস কহিল, "তাই ত উপায় কি করা যায় এখন, ঈশেন? তুমিই বলো দাদা? আমার ত শুনে আর হাত পা আসছে না! আহা এই দুটো দিন ভালো ভালোয় কেটে গেলে মার পুজো দিয়ে আসি যে আমি—"

ঈশান কহিল, "তা দেখুন, এক উপায় আছে! আমি.ত আপনার মতের উপর নির্ভর না করেই এক কথা বলে এসেছি—সে মামার যা রোখ, বলে, এর একটা নির্ণয় না হলে বিবাহ হতেই পারে না—বলে, তার এক কুটুম্ব কে আছে কালনায় বাড়ী—সে এক পয়সা না নিয়ে বিয়ে করতে রাজি আছে—তার বয়স আপনার চেয়েও নাকি ঢের কম, তা ছাড়া তার ছেলে নেই, দুটি মেয়ে তার আবার একটির বিয়ে হয়ে গেছে—"

বামনদাস মহাশঙ্কিত হইয়া পড়িল, "তাই ত তুমি কি বলেছ?" ঈশান কহিল, "দেখুন কর্ত্তা, চাল চালতে ঈশেন যে হঠবে এমন ঈশেন আমি নই। আমি অমনি বললুম 'সে কি কথা—কর্ত্তা তো দেশে ছেলেদের ত্যাজ্যপুত্র করে এসেছেন—তারা ওঁকে দেখে না, শোনে না—তাইত বিবাহ করছেন, নইলে বিবাহে ওঁর ইচ্ছাই ছিল না! তা বিবাহ যখন কচ্ছেনই, তখন স্ত্রীর জন্য ব্যবস্থা করবেন বই কি!' তা আমি ত একটা কথা বলে ফেলেছি!"

বামনদাস কহিল, "কি কথা ঈশেন?"

ঈশান কহিল, "আজ্ঞে, আমি বলিছি, বিয়ের রাত্রে লেখাপড়ার কাগজ ঠিক করে রাখবেন—কর্ত্তা একখানা দানপত্র করে আপনাদের মেয়ের নামে সমস্ত বিষয় কড়ি লিখে দেবেন। এই ত কর্ত্তা আমি বলে এসেছি, এক কথা না বললে বিয়ে ত ভেঙ্গে যাচ্ছিল!"

বামনদাস কহিল, "বাঃ বেশ বলেছো, খাসা কথা। আর কি জানো ঈশেন, আমিও তাই ভাবছিলুম—বিয়ে করে একে নিয়ে যদি বাড়ী যাই, তাহলে ত ছেলেগুলো তিষ্ঠুতে দেবে না। তাই আমার ইচ্ছে এখানেই ছোট একখানি বাড়ী ভাড়া করে না হয় থাকবো।"

ঈশান কহিল, "আরও এক কথা। ওঁরা বলে দিয়েছেন, বিবাহ কলকাতায় হবে না। মেয়ের মামার বাড়ী রিষড়ে— এখানে লোকজন আসায় খরচ আছে, তাই দেশেতে কাজটা হয় মেয়ের মামার সেইরূপ ইচ্ছা!"

"তা, তা বেশ, আমার কোন আপত্তি নেই!"

ঈশান কহিল, "তা হলে গোটাকতক টাকা এখন দিতে হবে, আমাকে। টোপর, চেলির কাপড় এ সবগুলো কিনে আনতে হবে ত। সেদিন লগ্ন হল রাত্রি একটার পর। তা তিনটে অবধি সময় আছে। আমরা পৌণে দশটার গাড়ীতে বেরুবো, তাহলেই হবে!"

বামনদাস ঈশানের হাত ধরিয়া কহিল, "দাদা তোমার উপরই সমস্ত ভার দিলুম। তুমিই হলে কর্ম্মকর্ত্তা। যা ভাল হয় করবে—পয়সা কড়ি তোমার কাছে সব দিচ্ছি, যাকে যা দিতে হয়, যা খরচপত্র করতে হয় সব তুমিই করবে! আমার জন্য দেশের কাজকর্ম্ম ফেলে যে রকম করে বসে আছ, তোমার ঋণ কোনকালে শোধ দিতে পারব না। তুমি আর জন্মে আমার কে ছিলে, তা বলতে পারি না। ভগবান তোমার ভালো করুন, দাদা।"

৪

বিবাহের দিন সন্ধ্যার পরই একখানা সেকেণ্ডক্লাস গাড়ীর মাথায় ট্রাঙ্ক চাপাইয়া বামনদাস ও ঈশান হাবড়া স্টেশনে আসিল। বামনদাসের পরিধানে থান। চেলিখানা পরিয়া ষ্টেশনে আসিতে বাধিতেছিল। গায়ে গরদের কোট, গলায় কোটের নীচে ফুলের মালা!

হাবড়া ষ্টেশনে তখন লোকে লোকারণ্য! চারিধারে আলো, চীৎকার, গোলমাল! বৃদ্ধ বামনদাসের মনে হইতেছিল যেন তাহার বিবাহের জন্যই চারিধারেই একটা মহাধূম বাধিয়া গিয়াছে।

ঈশান তাহাকে হুইলারের বুকষ্টলের নিকট আনিয়া বলিল, "আপনি বসুন। আমি টিকিট কিনে আনছি, উঠবেন না যেন!"

বামনদাস কহিল, "বেশ দাদা, তুমি শীঘ্র এস, ট্রেনখানা যেন ফেল না হয়ে যাই।" কথাটা ভাবিতেও বৃদ্ধ শিহরিয়া উঠিতেছিল।

বৃদ্ধ বসিয়া ভাবিতেছিল, ভবিষ্যতের সুখের কথা! একটি নোলকপরা কচিমুখের মধুর হাসি, চুড়ি বালাপরা দুইখানি কোমল হস্তের মধুর স্পর্শ, অলক্তরঞ্জিত দুইখানি চরণের মলের রুনুঝুনু সঙ্গীত! শুষ্ক বৃক্ষ পত্রপল্লবে আবার সাজিয়া উঠিবে। নবোঢার কত আদর আব্দার—ভাবিতেও বৃদ্ধ আনন্দে অধীর হইয়া উঠিতেছিল! বামনদাস আরও ভাবিতেছিল, মাথার চুলগুলা পাকিয়া গিয়াছে, তাহাতে কি আসিয়া যায়—প্রাণটার মধ্যে এখনও রসের নির্ঝর শুখায় নাই ত! পাকাচুল কলপ লাগাইলেই কালো হইয়া যাইবে—আর দাঁত কয়টা বাঁধাইয়া লইতে কতক্ষণ! মনে একটা অনুতাপ জাগিয়া উঠিল, এই দুই দিনে যদি সুবিধা করিয়া দাঁত কয়টা বাঁধাইয়া লইতে পারিতাম, চুলগুলার রং বদলাইয়া লইতাম!

টিকিট কিনিতে গিয়া ঈশান এক গোলে পড়িয়াছিল। অত্যধিক বুদ্ধি খেলাইতে গিয়া এক টিকিট কলেক্টরের হস্তে পড়িয়া সে বিষম নিগ্রহ ভোগ করিল। কোন মতে পায় ধরিয়া পুলিশের হাত এড়াইয়া সে টিকিট কিনিতে ছুটিল।

ঈশানের বিলম্ব দেখিয়া বৃদ্ধ এদিকে অস্থির হইয়া পড়িতেছিল—তখন বাঁশী বাজাইয়া আরো দুই চারিখানা ট্রেন ছাড়িতেছিল—আসিতেছিল। অগণিত জনপ্রবাহ দেখিয়া বৃদ্ধ আকুল হইয়া উঠিতেছিল—যদি ঈশান তাহাকে লইতে ভুলিয়া গিয়া থাকে—চারিধারে লোক ছুটিয়া ট্রেনের দিকে চলিয়াছে। বৃদ্ধের মন ধৈর্য্য মানিল না, সে অশান্ত হইয়া উঠিল।

একটা কুলি আসিয়া কহিল, "মোট লেগা নেহি বুড়া বাবু—টইম তো হো গিয়া, ট্রেন আভি ছুট্ যায়গা।" বৃদ্ধ কথাটা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া কুলির মস্তকে মোট চাপাইয়া ক্ষিপ্রগতিতে

ছুটিয়া একেবারে ট্রেনে আসিয়া চাপিল। কোন মতে স্থান সংগ্রহ করিয়া ঈশানের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। ট্রেন যথাসময়ে বংশীধ্বনির সহিত প্লাটফর্ম্ম ছাড়িয়া ছুট দিল।

বামনদাসের প্রথমটা তত ভাবনা হয় নাই—সে ভাবিল, রিষড়ায় নামিয়া ঈশানকে খুঁজিয়া লইবে! পার্শ্বোপবিষ্ট ভদ্রলোককে কহিল, "মশায়, রিষড়া ষ্টেশনে অনুগ্রহ করে আমায় নামিয়ে দেবেন তা"

ভদ্রলোকটি সবিস্ময়ে কহিল, "রিষড়া? আপনি রিষড়া যাবেন?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"করেছেন কি, আপনি! এ যে পঞ্জাব মেল—এ'ত রিষড়ায় থামে না!"

"তবে" বলিয়া বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "কি হবে? কোথায় নামবো তবে!"

"আর কোথায় নামবেন—একেবারে বর্দ্ধমানে গিয়ে গাড়ী থামবে! তার আগে আর নামবার উপায় নেই।"

বর্দ্ধমান! বৃদ্ধের ধারণা ছিল, বর্দ্ধমান প্রয়াগের নিকট! সে কতদূর! সর্ব্বনাশ! হায়, হায়, এখন উপায় কি! একবার মনে হইল, চলন্ত ট্রেন হইতে লাফাইয়া পড়ে। ঈশানের উপর রাগ হইল—সে তাহাকে এমন করিয়া বসাইয়া রাখিয়া শেষে একেবারে মজাইল! হতভাগা, বদমায়েস! বামনদাসের চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল।

বাবুটি কহিলেন, "আপনি বুঝি হাবড়া ষ্টেশনে কখনো আসেন নি। কলকাতায় থাকেন না?"

বামনদাস কহিল, "আজ্ঞে না।"

বাবুটি কহিলেন, "কারুকে জিজ্ঞাসা করে গাড়ীতে উঠতে হয়। কুলি বেটা কি জানতো না কোথায় যাবেন আপনি!"

আর একটি ভদ্রলোক চশমা চোখে দিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। চশমার উপর দিয়া দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তিনি কহিলেন, "আরে এই হাবড়া ষ্টেশন এমনই হয়েছে যে—লোকাল ট্রেনগুলো কোন প্ল্যাটফর্ম্ম থেকে ছাড়বে, যাদের রীতিমত ট্রাভ্‌ল করা অভ্যাস নেই, তারা ধারণা করতে গিয়েই তো ট্রেন ফেল করে বসে।"

বামনদাসের চক্ষে সমস্ত জগৎটা ছোট একটা কৃষ্ণবিম্বে পরিণত হইল। নানা তর্ক বিতর্কের মধ্যে সে দিশাহারা হইয়া পড়িল। তখন ট্রেন দ্রুতগতিতে ছুটিতেছিল—মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ষ্টেশনগুলা ক্ষীণ আলোক লইয়া বাহিরের বিপুল অন্ধকারের মধ্যে জোনাকির মত ক্ষীণভাবে জ্বলিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু বামনদাস ভাবিতেছিল, উপায় নাই, উপায় নাই—বিবাহের সমস্ত আশা বুঝি নির্ম্মূল হইল! হায়, রাইমণি!

ট্রেন আসিয়া বর্দ্ধমানে থামিলে, বাবুর দল বৃদ্ধকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দিল, কহিল, "ষ্টেশনে বলুন, সমস্ত ব্যাপার খুলে—তারপর ওদিককার ট্রেন এলে তাইতে করে রিষড়া যাবেন।"

একজন বলিল "ছ সাত ঘণ্টা পরেই ট্রেন পাবেন!"

বামনদাস হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। ষ্টেশনে সংবাদ লইয়া জানিল, ছয় সাত ঘণ্টা পরে একখানি প্যাসেঞ্জার ট্রেন আছে—রিষড়া পৌঁছিতে ভোর হইয়া যাইবে! হতাশভাবে বামনদাস একটা বেঞ্চে বসিয়া পড়িল। তাহার চোখের সম্মুখে বিবাহ-বাটীর ছবিখানা বায়োস্কোপের ছবির মত ফুটিয়া উঠিল! শাঁখ বাজিতেছে—উলুধ্বনি হইতেছে—চারিধারে লোকজন ব্যস্ত সমস্ত ভাবে ঘুরিতেছে—চেলির কাপড় পরা, সিঁথিময়ূর মাথায় অবগুণ্ঠিতা বধূ পিঁড়ির উপর মাটির পুতুলটির মত বসিয়া আছে! বর কোথায়? নাই, নাই—! সে বেচারা বর্দ্ধমান ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে বেঞ্চে পড়িয়া রহিয়াছে! কি গ্রহ!

৫

ভোরে আসিয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেন যখন রিষড়া ষ্টেশনে থামিল, তখন বৃদ্ধ শশব্যস্তে গাড়ী হইতে নামিল। সারারাত্রি জাগিয়া তাহার কোটরগত চক্ষু আরও কোটরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। নামিয়াই দেখে, ঈশান দ্রুত ট্রেনের দিকে ছুটিয়াছে। বৃদ্ধের মৃতদেহে যেন নবপ্রাণ সঞ্চারিত হইল। বৃদ্ধ ডাকিল, "ঈশেন!"

ঈশান চমকিয়া ফিরিয়া কহিল, "কে? কর্ত্তা নাকি! এ কি, কোথায় ছিলেন, সারারাত্রি?"

"বর্দ্ধমানে!" বামনদাসের চক্ষে সত্যই জল আসিল।

তখন বাহিরে গিয়া বৃদ্ধ সকল কথা—দুর্দ্দশার আমূল বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল! ঈশান বলিল, "বেশ—আমি টিকিট নিয়ে এসে দেখি, আপনি নেই! ট্রেনে উঠলুম—আপনাকে খুঁজে সাড়া পেলুম না! ভাবলুম বুঝি কোথায় আছেন, ঘুমিয়ে পড়েছেন! রিষড়া ষ্টেশনেও খুঁজে পেলুম না—আরো দু-একটা ট্রেন অপেক্ষা করলুম—আপনাকে পেলুম না! তখন এঁদের বাড়ীর দিকে চললুম। পথই কি চিনি! এ'কে জিজ্ঞাসা করে তাকে ধরে কোনমতে পৌঁছুনো গেল! আপনার কথা তুলতেই তারা ত অবাক! আমাকে 'জোচ্চোর' বলে সব তেড়ে এল। বলে, 'গায়ে হলুদ দিয়ে জাত নষ্ট কর! কোথাকার ঘাটের মড়াকে ধরে এনে বর খাড়া করা—' আমি ত গতিক বুঝে চম্পট দিলুম। তারপর টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি শুরু হল, আমি না রাম না গঙ্গা বলে সটান্ ভিজে ষ্টেশনে এলুম! সারারাত্রি বৃষ্টির ছাট আর মশার কামড় সহ্য করে মশায়, সকালের ট্রেনে বাসায় ফিরছিলুম, এমন সময় আপনি ডাকলেন—"

বামনদাস কহিল, "অদৃষ্টের ভোগ সব দাদা। এখন একবার চল! খপরটা নেওয়া যাক! সে মেয়ের বিয়ে হল কি না।"

"হ্যাঁ, সেই বৃষ্টির রাতে বর জোগাড় করা সহজ ব্যাপার কিনা! তাহলে আর বিয়ে এদ্দিন আপনার জন্যে পড়ে থাকে? বর ত আর দোকানের মুড়ি নয় যে, খোলায় চাট্টি চাল ফেলে ভেজে নিলেই হল।"

ষ্টেশনে গাড়ী ছিল না। একখানা পাল্কীতে বামনদাস চড়িয়া বসিল, ঈশান পদব্রজে চলিল।

পাত্রীপক্ষের বাড়ীর কাছাকাছি রাস্তা দিয়া দুইজন লোক যাইতেছিল। ঈশান শুনিল, তাহাদের মধ্যে একজন বলিতেছে, "সেই রাত্রে কি সর্ব্বনাশ ভদ্রলোকের! ভাগ্যে গাঙ্গুলির ভাগনেটিকে পাওয়া গেল—নৈলে বুড়ো বর বেটা ত আচ্ছা নাকাল করেছিল। যা হোক ভদ্রলোকের জাতটা রইল।"

আর একজন বলিল, "আর মেয়েটারও গতি হল। নইলে সে বুড়ো বেটার হাতে দেওয়াও যা, ঘাটের মড়া ধরে দেওয়াও তাই!"

ঈশান ভাবিল, কথাটা ত ভালো নয়! কিন্তু কথাটা সে শুনিয়া চাপিয়া গেল।

এমন সময় অদূরে শঙ্খনিনাদ শুনা গেল।

বামনদাস কহিল, "ও কি ঈশেন, শাঁখ বাজে যে! ব্যাপারখানা কি?"

"আজ্ঞে, বড় সুবিধের বলে ত মনে হচ্ছে না।"

"কাককে জিজ্ঞাসা করো দেখি!"

একটি বালক খাবার হস্তে দোকান হইতে ফিরিতেছিল। ঈশান তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও শাঁখ বাজে কোথায় জানো?"

বালক কহিল, "গাঙ্গুলির ভাগনের সঙ্গে ওদের রাইমণির কাল রাত্রে বিয়ে হয়েছে। এখন বরকনে বিদেয় হবে, বরণ হচ্ছে কি না—" বালক চলিয়া গেল।

বামনদাস ডাকিল, "ও ঈশেন, বলে কি? এখন উপায়।"

ঈশান কহিল, "পাল্কী ফেরানো যাক, ষ্টেশনের দিকে! ভাবনা কি, কর্ত্তা,—ঈশেন ঘটক বেঁচে থাকুক্—শ্রাবণে হল না, অঘ্রাণের প্রথম তারিখেই প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ ঘটে যাবে।"

পাল্কীওয়ালা ষ্টেশনের দিকে পাল্কী ফিরাইল। বামনদাস পাল্কীর মধ্যে শুইয়া পড়িয়াছিল, তাহার বুকটা ফাটিয়া যাইতেছিল! বিবাহবাটী হইতে শঙ্খের সঘন নিনাদ মুহুর্মুহু উত্থিত হইয়া তখন নিস্তব্ধ পল্লীটিকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল। এবং গতরাত্রের দুই একটা অতৃপ্ত পথের কুকুর নিষ্ফল আক্রোশে থাকিয়া থাকিয়া ডাকিয়া উঠিতেছিল।

১১ বর্ষ, বৈশাখ ১৩১৮



অন্নপূর্ণার পুত্রবধূ

জগদীশ গুপ্ত

পুত্রের বিবাহে প্রচুর পণ লইয়া কৃতার্থ হইবেন, এ আকাঙক্ষা অন্নপূর্ণা কিছুমাত্র করিতেছেন না। তাঁর পুত্র অশোক বিশেষ মেধাবী ছাত্র—তার ভবিষ্যৎ পরম উজ্জ্বল। তাহাকে জামাতা করিবার অভিলাষ বড়লোকে যদি করে, এবং অন্নপূর্ণা যদি সেই দিকেই লক্ষ্য রাখেন, তবেই মানায়। কোন কোন বড়লোকের তরফ হইতে এই মানানসই কাজের প্রস্তাবও না আসিয়াছে এমন নয়; কিন্তু কোন বড়লোকের অভিলাষ পূর্ণ করিবার ইচ্ছা অন্নপূর্ণার নাই। তিনি চান দরিদ্র পরিবারের একটি কন্যা। কন্যাটির অসাধারণ রূপের গৌরব না থাকিলেও চলিবে, কিন্তু বুদ্ধিমতী আর সহিষ্ণু প্রকৃতির হওয়া চাই। দরিদ্রের ঘরেই নারীর বুদ্ধিমত্তার প্রভাবগত শিক্ষা, আর সহিষ্ণুতার সহজ কঠিন পরীক্ষা নিয়তই চলিতে থাকে বলিয়া অন্নপূর্ণার ধারণা; এবং গরীবের মেয়ের হিসাবী হওয়াই সম্ভব। তাহাকে যদি পুত্রবধূ করিতে চান তার পিতামাতা যদি জীবিত থাকেন তবে তাঁহারা যথেষ্ট ভদ্র এবং সবলচিত্ত কিনা তাহা দেখিতে হইবে; তাঁহারা যদি জীবিত না থাকেন তবে সে অবস্থা আরও ভাল, অর্থাৎ তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে অনুকূল, ইহাও অন্নপূর্ণা এক সময় প্রকাশ করিয়াছেন।

অনেকেই মনে করিতেছে, অন্নপূর্ণার এ কেমন সৃষ্টিছাড়া খেয়াল! ছেলের বিবাহে টাকা লওয়াই রেওয়াজ, এমন কি আভিজাত্যের লক্ষণ; টাকা সম্বন্ধে যত চাপ, আভিজাত্য তত উচ্চ আর দুরতিক্রম্য—ইহা কে না স্বীকার করে! কিন্তু অন্নপূর্ণা একটি পয়সাও লইবেন না। শ্বশুর-শাশুড়ী না থাকিলে শ্বশুরবাড়ীতে জামাইয়ের সুখ থাকে না—কুটুম্বিতার প্রীতিই জন্মে না; বৈবাহিক ঐ অভাবটা লোকে সুখেরই ক্ষতি আর ষোল আনা আনন্দের পরিপন্থীই মনে করে; কিন্তু অন্নপূর্ণা পছন্দ করিতেছেন ছেলের শ্বশুর-শাশুড়ী না থাকাটাই! তার উপর ছেলের বয়স এখন মাত্র আঠার কি উনিশ; কিন্তু অন্নপূর্ণা অনুসন্ধান করিতেছেন একটি ডাগর মেয়ে—তার বয়স পনের কি ষোল হইলে আপত্তি নাই, কেবল আপত্তি নাই নয়, ঐ বয়সের মেয়েই তাঁর ছেলের জন্য চাই।

লোকে একটু অবাকই হইল।

ঘটক-ঘটকী এবং আত্মীয়স্বজনকে ইচ্ছা ও বিবরণ জানানো ছিল; তাহাদের একজন সংবাদ দিল যে, নিকটেই এক ষ্টেশন পরেই, দুর্লভপুরে ৺পরমেশ্বর রায়ের ঠিক তেমনি একটি মেয়ে আছে যেমন অন্নপূর্ণা চান—গোত্রে না বাধিলে মেয়েটিকে লওয়া যাইতে পারে। মেয়ের বাপ বাঁচিয়া নাই; মা আছে। চিরকাল তারা দুঃখী মানুষ। এই মেয়েটিই মায়ের জ্যেষ্ঠ সন্তান; তার পর দুটি পুত্র। মেয়েটির রূপ আর রং চোখধাঁধানো না হইলেও চোখে ধরে; বয়স পনের পূর্ণ হইয়া আষাঢ়ে ষোলয় পড়িয়াছে। পুত্রদ্বয়ের বয়স যথাক্রমে তের এবং দশ।

প্রাথমিক সংবাদ অনুকূল, এবং সত্য হইলে গ্রহণীয়।

অন্নপূর্ণা নিজেই গেলেন মেয়ে দেখিতে; দেখিয়া তার চেহারা তাঁর পছন্দ হইল। পরিবার অভাবী সন্দেহ নাই; কিন্তু অভাবের মধ্যেই মেয়েটির সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর একটি পরিপুষ্টি এবং পরিচ্ছন্নতা দেখা দিয়াছে।

মেয়ের মা শরৎ বলিলেন, বাপের চেহারা সুন্দর ছিল; স্বাস্থ্যও ছিল খুব ভাল।

—তিনি মারা গিয়েছিলেন কিসে? অন্নপূর্ণা জানিতে চাহিলেন।

সেও এক পরম দুঃখের কাহিনী। শরতের চোখ ছলছল্ করিতে লাগিল...

পরমেশ্বর রায় লেখাপড়া জানিতেন অল্প; তবে বাংলামতে হিসাব রাখায় এবং জমিদারী সেরেস্তার কাজে তিনি বিশেষ পটু ছিলেন। চাকরির চেষ্টা করিতে করিতে তাঁর চাকরি মিলিল রাজসাহীর এক বৃহৎ জমিদারের সেরেস্তায়; বেতন খোরাকী বাদে চার টাকা। কিন্তু সেখানে তিনি একটি দিনও কাজ করিতে পারেন নাই। রাস্তায় বোধ হয় অখাদ্য-কুখাদ্য খাইয়াছিলেন; ষ্টেশন হইতে

জমিদারের কাছারিতে সন্ধ্যায় পৌছিবার পর ভোরবেলা কলেরায় আক্রান্ত হইয়া তিনি সেখানে, সেই নির্বান্ধব বিদেশে, মারা যান—শুশ্রূষা কি চিকিৎসা সম্ভবতঃ হয় নাই।

কাঁদিতে কাঁদিতে বিধবা এই কাহিনী বিবৃত করিলেন; মেয়েটিও কাঁদিতে লাগিল, অন্নপূর্ণার চোখেও জল আসিল।

অন্নপূর্ণা দেখিলেন, মেয়েটির চোখে মুখে কথায় এমন একটি মৃদুতা আছে যা বিষণ্ণতার প্রকারান্তর নহে, নির্জীবতার লক্ষণও নহে, নিবুর্দ্ধিতার পরিণামও নহে, সুরুচিসম্পন্ন বিনয় এবং শোভনতার জ্ঞান। অন্নপূর্ণার মনে হইল, এই প্রকৃতির মানুষই হয় প্রকৃত প্রেমাকাঙ্ক্ষী, আর নিঃশব্দে যন্ত্রণা সহিতে পারে। কিন্তু কাজের বেলায় মেয়েটি ভারি দ্রুত, ভারি পরিচ্ছন্ন, একেবারে নিখুঁত।

এদিককার অবস্থাও অন্নপূর্ণা দেখিলেন, একখানা মাত্র ঘর—তাহাতেই শোয়। ঘরখানা সামনের দিকে ঝুঁকিয়া আছে; বাতাস কিছু প্রবল হইলেই ঘর ভূমিসাৎ হইবে বলিয়া অন্নপূর্ণার মনে হইল। ভূমিসাৎ হওয়ার সম্ভাবনার দিকে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে শরৎ বলিলেন, হীরালাল বলে একটা লোক এখানে আছে; সে আমাদের দেখে শোনে। বাঁশ যোগাড় করে দেবে বলেছে। জলও পড়ে চাল দিয়ে; খড়ের ব্যবস্থা করতে পারলেই মেরামত করিয়ে দেবে।

মেয়েটি তার মাকেই বলিল, উইয়ে চাল রাখে না, মা.

—একটা কথা বলি যদি কিছু মনে না করেন' —অন্নপূর্ণা বিনীতভাবে বলিলেন।

—বলুন, বলুন। বলিয়া শরৎ অন্নপূর্ণার কথা শুনিতে আগ্রহান্বিতা হইয়া ভারি কুণ্ঠিত হইয়া রহিলেন; কথা বলিবার জন্য তাঁর অনুমতি চাহিয়াই যেন তাঁহাকে লজ্জাকর একটা গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, ঘর মেরামতের খরচটা আমিই দিতে চাই। নেবেন?

—সম্পর্ক ঘটুক, তারপর নেব। —বলিয়া শরৎ অন্নপূর্ণার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। হাসিটুকু ফুটিয়াছে সুখকর সম্পর্কের সূত্রেই, মনে রাখিতে নয়, বা স্বার্থের প্রয়োজনে নয়, অন্নপূর্ণা তা পরিষ্কারভাবে হৃদয়ঙ্গম করিলেন, বলিলেন ঃ ঘটতে বাকি নেই। এ ত ঘটকের কথা নয়, আমি নিজে বলছি। ভাল করে মেরামত করান, এখন আমাকে নিঃসম্পর্কের লোক মনে করলে ভারি দুঃখিত হব।

শরৎ খানিক মুখ নত করিয়া রহিলেন; তারপর দান বা দয়া গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন, বলিলেন—নেব।

রান্নাঘরের সংস্কারের প্রস্তাবও অন্নপূর্ণা করিলেন; "অত খরচের" আপত্তি করিয়া শরৎ তাহাতেও সম্মতি দিলেন।

অন্নপূর্ণা তখন মেয়েটির নাম জানিতে চাহিলেন ঃ মেয়ের নামটি কি?

—কিরণ, কিরণময়ী। ডাক নাম গুণ্না।

—বড় ছেলের নাম?

—অবনী।

—ডাকুন তাকে; একটু আলাপ করি তার সঙ্গে।

অবনীকে ডাকা হইল—

অন্নপূর্ণা তাহার সঙ্গে আলাপ করিলেন, অর্থাৎ জানিতে চাহিলেন ঃ স্কুলে সে প্রত্যহই যায় কিনা, স্কুল কত দূরে অবস্থিত; মাহিনা দেয়, না, ফ্রী; কতগুলি বই পড়িতে হয়; সব বই আছে কি না; কখনো পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছ কিনা, ইত্যাদি।

প্রথম সে দু'বার হইয়াছে। কিন্তু অন্য স্কুল হইতে একজন টিচারের সঙ্গে একটি ছেলে আসিয়াছে; তাহার সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছে না—দ্বিতীয় স্থানে নামিয়া আসিয়াছে। —বলিয়া অবনী পরাজয়ের দরুন অত্যন্ত ম্রিয়মান হইয়া রহিল।

ছেলেটি বুদ্ধিমান সন্দেহ নাই; বইয়ের অভাবে তার অসুবিধা হয় এবং সে নানানজনবে তোয়াজ করিয়া লোকের অনুগ্রহভাজন হইয়া অর্দ্ধ বেতনে পড়ে, ইহাও দুঃখের বিষয়।

অন্নপূর্ণা বলিলেন ঃ মেয়ের সঙ্গে ছেলেটিকেও আমি নেব; আমার কাছে রাখব, পড়াব।

জিজ্ঞাসু হইয়া শরৎ অন্নপূর্ণার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন...

অন্নপূর্ণা বলিলেন ঃ এখানে থাকলে ছেলের সে-রকম উন্নতি হবে না। আমার কাছে থাকবে; বড় স্কুলে পড়বে; বাড়ীতে পড়া বুঝিয়ে দেবার লোক থাকবে। ছেলে মানুষ হলে একদিন আপনার সুখের দিন আসতে পারে। •

একদিনকার এতবড় সৌভাগ্যের সম্ভাবনায় শরতের দু'চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। বলিলেন ঃ দিন বুঝি এসেছে, দিদি। আপনাকে পেয়ে বহুদিন পরে আজ আমি সুখের স্বাদ পাচ্ছি।

তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন ঃ আব একটি কথা, দিদি..

—কি কথা?

—দু'বছরের মধ্যে যদি ছেলে না হয় তবে আমি ছেলের আবার বিয়ে দেব।

শরৎ অকাতরে বলিলেন ঃ নিশ্চয় দেবেন। অনেকেই তা দেয়। কিন্তু আপনার ছেলের বয়স তো বেশী নয়!

—অর্থাৎ দু'বছরের পরও আমি অপেক্ষা করতে পারি?

—হ্যাঁ।

অন্নপূর্ণা কথা কহিলেন না।

মেয়ে দেখিয়া অন্নপূর্ণা চলিয়া আসিলেন; কিরণকে তাঁর খুব পছন্দ হইয়াছে। অত্যন্ত নম্র ভদ্র পরিবার সন্দেহ নাই—অপরিচ্ছন্ন কি বুদ্ধিহীন নয় কেউই। কিরণই ভাই দুটিকে লালন করে; ভাইদের যত চাওয়া দিদিরই কাছে। কিরণের মুখের চেহারায় বেশ একটি লক্ষ্মীশ্রী আর বুদ্ধির স্বচ্ছ দীপ্তি আছে—কিন্তু তা শাণিত কি নগ্ন নয়, সহজ ব্রীড়ার আবরণে তা মধুর। সৌন্দর্য্যগত ত্রুটি ঢেরই আছে; কিন্তু অন্নপূর্ণা নিখুঁত অপ্সরা চান না—তিনি যা চান কিরণময়ীতে তা আছে। শবীরেব গঠন আরও সৌষ্ঠবযুক্ত হইতে পারিত, কিন্তু এ-ও বেশ; রং কালো নয়; কণ্ঠস্বব ভারি মধুর; দাঁতগুলি চমৎকার সাজানো—হাসিলে বেশ দেখায়। ভাবিয়া লইতে অন্নপূর্ণা কিছুমাত্র বাধা পাইলেন না যে, কিরণময়ী তৃপ্তিপ্রদ আর আনন্দজনক আর নিবিড়চিত্ত। আলস্যে কি অনিচ্ছায় তার হাত পা নিশ্চল হইতে জানে না—খাসা চলে; হস্তাক্ষর সুন্দর।

অন্নপূর্ণা অভয় দেন নাই, সে সুর তাঁর কণ্ঠে ফোটে নাই, কেবল বলিয়াছেন যে, বিবাহেব দরুন "একটি পয়সাও" মেয়ের মাকে খরচ করিতে হইবে না—কহিলে তিনি ব্যথিত হইবেন। উপকবণ বলিতে যা বুঝায় তা সমুদয়ই তিনি পাঠাইয়া দিবেন। ছেলেটিকেও তিনিই মানুষ করিবেন; ছুটিতে সে মায়ের কাছে আসিবে—যে-কদিন ইচ্ছা বাড়ীতে থাকিয়া যাইবে।

অবনী বলিয়াছিল ঃ গরমের ছুটিতে আম কাঁঠাল খেয়ে যাব।

শুনিয়া ওঁদের সঙ্গে সঙ্গে কিরণও হাসিয়াছিল।

অন্নপূর্ণা জানিতে চাহিয়াছিলেন, মেয়ের "কুষ্ঠী" আছে কি না? "নাই" শুনিয়া তিনি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হন নাই; কারণ, ছেলের কোষ্ঠীতেই অদৃষ্ট এবং ভবিষ্যৎ লিপিবদ্ধ আছে—অদ্বিতীয় এক পণ্ডিত-দৈবজ্ঞের গণনা তা।

অন্নপূর্ণার হাতে টাকা আছে অনেক। শ্বশুরের টাকা ছিল প্রচুর; স্বামী জানকীজীবন হঠাৎ বড় চাকরি পাইয়া আগে করিয়াছিলেন ভবিষ্যতের চিন্তা—বহু টাকার জীবনবীমা করিয়াছিলেন। তিনি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার পর সেই টাকা অন্নপূর্ণা ভোগ করিতেছেন; কিন্তু মৃত্যুর দেওয়া দুঃখ তিনি ভুলিতে পারেন নাই। শরৎকুমারীকে তিনিও স্বামীর মৃত্যুর কাহিনী বলিয়াছেন—দুরন্ত সেই সান্নিপাতিকের কথা; এবং এ দুঃখও জানাইয়াছেন যে, এমন সুন্দর, এমন অপরূপ লক্ষ্মী মেয়ে কিরণময়ী এ জীবনে তৃষ্ণা মিটাইয়া বাবা বলিয়া ডাকিতে পাইল না।

এই কথায় সকলেরই মনে তখন অপার দুঃখ জন্মিয়াছিল।

অন্নপূর্ণা সর্ব্বান্তঃকরণ ঢালিয়া দিয়া ভাবেন মেয়েটির কথা। এক কথায় সে "দিব্যি", "প্রাণভরা" আর এখনই যেন তাঁর চোখের তারা। ভাবিতে ভাবিতে এক সময় হঠাৎ একটা নিঃশ্বাসের শব্দে চমকিয়া উঠিয়া অন্নপূর্ণা দেখেন, তাঁহারই একটা নিঃশ্বাস পড়িয়াছে।

বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গেল। অন্নপূর্ণার টাকায় এবং হীরালালের উদ্যমে শরৎকুমারী আয়োজন ও ব্যবস্থা করিলেন উৎকৃষ্ট, এবং বরযাত্রীরা পরিশ্রম করিল প্রচুর। আর, বউ দেখিয়া ওদিককার লোক এবং জামাই দেখিয়া এদিককার লোক প্রশংসা করিতে লাগিল ইহাই বলিয়া যে, ইহাকেই বলে শুভবিবাহ; দরিদ্রা বিধবার কন্যা অত্যন্ত আনন্দপ্রদভাবে বাঞ্ছনীয় ঘর আর বর পাইয়া গেল। ইহা, অর্থাৎ অসহায়ের নিঃসম্বল বিধবাকে কন্যাদায়ে উদ্ধার, যে করে সে নারী হইলে মহীয়সী, পুরুষ হইলে সে মহাশয় ব্যক্তি, ইত্যাদি।

উনিশ বছরের ছেলের এমন স্বাস্থ্যবতী ষোল বছরের বউ—ইহার ভিতরকার বেপরোয়া ভাবটার দিকে যে কেহই অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিল না এমন নয়, তবে তাহা চুপে চুপে; আবার ইহাও অনেকের মনে হইল যে, অমন হইয়া থাকে—কোনো কোনো স্ত্রীলোকের পৌত্র কোলে পাইবার আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত অসময়েই দ্রুত অস্থিরকর হইয়া উঠে, বিশেষ করিয়া বিধবার—ক্ষুদ্রের প্রতি লোভ, আর, ক্ষুদ্র একটি তনুকে অবলম্বন করিয়া উদ্বেল স্নেহের সেচন, আর আত্মবিস্মৃতিকে এমন স্বর্গীয় সুখ মনে হয় যে, তার জ্ঞান থাকে না যেন। কাজে সাহায্য করিবার জন্যও কেউ কেউ বউ চায় বড়, আর তাড়াতাড়ি। এও হয়ত তাই।

তবু সকলেই স্বীকার করিল যে, বেমানান হয় নাই—ছেলের বয়স অল্প হইলেও শরীর বৃহৎ এবং বলিষ্ঠ—পুরুষশ্রী চমৎকার এখনই।

অল্প কথায়, দুর্লভপুরের লোকে বলিল, বৈবাহিকা নমস্যা, আর, জামাই সৎ এবং সুস্থ; আর কানাইগ্রামের লোকে বলিল, বধূ সুদর্শনা এবং সুলক্ষণযুক্তা।

বুদ্ধিমতী বধূ পাইয়া অন্নপূর্ণাও নিশ্চিন্ত হইলেন, খুশী হইলেন—বিস্মিতও হইলেন কম নয়; এমনটি পাইবেন বলিয়া তিনি সম্পূর্ণ আশা করেন নাই। ভগবান যেন স্বহস্তে সাজাইয়া আনিয়া হাতে তুলিয়া দিয়াছেন।

বধূ কিরণময়ী পিতৃগৃহে যেমন ছিল এখানেও সে ঠিক তেমনি কার্য্যকুশলা, সেবায় তৎপর, আর বেশ হাসিখুশী। পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে তার ভাব হইয়াছে; তাহাদের সঙ্গে আলাপের সময়ে সে এমন সপ্রতিভভাবে এমন সঙ্গত সব কথা বলে যে, অন্নপূর্ণা অবাক না হইয়া পারেন না; তাঁর মনে হয়, এমনি মেয়েই সম্পদে বিপদে নিজেকে রক্ষা আর দৈবকে পরাস্ত করিয়া চলিতে পারে।

একটি বিষয়ে অন্নপূর্ণার অহেতুক আর অতিরিক্ত আগ্রহ দেখা যাইতে লাগিল : নিরবচ্ছিন্নভাবে বধূকে তিনি কাছে রাখিয়াছেন; মায়ের কাছে তাহাকে এক দিনের জন্যও যাইতে দেন না। অবনী তাঁর কাছে থাকে। ছোট ছেলেকে সঙ্গে লইয়া শরৎ মাসে এক বার কি দুই বার আসিয়া দিনকতক মেয়ের বাড়ীতে থাকিয়া যান। তখন অন্নপূর্ণার দিনগুলি পরম আনন্দে কাটে।

ছেলে অশোককে কলেজ ছাড়িতে বাধ্য করিয়া অন্নপূর্ণা বাড়ীতে বসাইয়া রাখিয়াছেন; বলিয়াছেন : চাকরি করতে হবে না তোকে; টাকার জন্যে তোকে হয়রান হতে হবে না। পুঁজি বাঁচিয়ে হিসেব করে চললে মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অভাব তোর কোনদিনই হবে না।

মা বিধবা। মায়ের সেই দুঃখই একান্ত আর দুস্তর। মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারণ আর মায়ের কথার প্রতিবাদ করিয়া অশোক তাঁর দুঃখ বাড়াইতে চাহে না। মায়ের আদেশে সে কলেজ ছাড়িয়া দিয়াছে; বাড়ীতেই জ্ঞানার্জ্জন করে; আর সবজীবাগ প্রস্তুত করিয়া সেই উৎসাহেই সে স্বাস্থ্য এবং আনন্দ দুই পাইতে চায়।

বধূ কিরণময়ীর বিষয়ে অন্নপূর্ণা আরও চিন্তা করেন এই সংশয় আর আনন্দের দোলায় দোল

খাইতে খাইতে যে বউ যদি বন্ধ্যা হয়, অথবা যদি বন্ধ্যা না হয়! হইলে সে অনন্ত দুর্ভাগ্যের কি প্রতিকার সম্ভব, এবং না হইলে, অর্থাৎ বধূ পুত্রবতী হইলে, সে আনন্দ কতটা—অন্নপূর্ণা তা নিরূপণ করিতে পারেন না; ভাবিতে ভাবিতে অন্নপূর্ণার মাঝে মাঝে কিছুই ভাল লাগে না; মাঝে মাঝে অত্যন্ত কান্না পায়, সময় সময় মনে হয়, মানুষের প্রতি দুঃসহ নিষ্ঠুরতা করিয়াই অদৃষ্ট খুব কুটিল পথে জটিল গতিতেই চলে; অদৃষ্ট কখনও কখনও যেন যোগাযোগ আর ষড়যন্ত্রমূলক। মনের এই অবস্থায় তিনি বধূকে কাছে ডাকেন; কিন্তু তাহাকে কি বলিবেন, আর তাহাকে লইয়া কি করিবেন তার দিশা তিনি পান না; খানিকক্ষণ তাহাকে সামনে রাখিয়া হঠাৎ বলেন ঃ কিছু নয়, মা। যাও।

কিন্তু অন্নপূর্ণা কেবল অদৃষ্টেরই উপর নির্ভর করিয়া নাই—কিরণময়ীকে তিনি যেন সহস্র চক্ষু মেলিয়া সতর্ক হইয়া পক্ষপুটে ধরিয়া রাখিয়াছেন—শরীরের এমনধারা অযত্ন সে না করে যাহাতে সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইয়া তার সন্তানধারণের কাল বিলম্বিত বা সম্ভাবনা ব্যর্থ হইতে পারে; রোগের সৃষ্টি না হয়, জরায়ু ক্লিষ্ট না হয়!

এটা কেবল তাঁর স্নেহের চঞ্চলতা নয়, একটা আতঙ্কের অস্থিরতা যেন। কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া অশোক আর কিরণ উভয়েই কখনও অবাক হয়, কখনও হাসে।

বিবাহের দেড় বৎসর পরেই কিরণময়ীর গর্ভের লক্ষণ প্রকাশ পাইল; এবং তখনই দেখা গেল অন্নপূর্ণার এমন অদ্ভুত ভীতি আর অস্থিরতা যাকে বলা যায় প্রায় ক্ষ্যাপামি। বধূকে কেন্দ্র করিয়া এবং গর্ভস্থ সন্তানকে লক্ষ্য করিয়া শুরু হইল তাঁর অষ্টপ্রহরব্যাপী অভাবনীয় ঘূর্ণন, বাচনিক এবং দৈহিক....

—বউমা, খুব সাবধানে আছ তো? —বলিয়া বউয়ের দিকে নিষ্পলক চক্ষে তাকাইয়া অন্নপূর্ণা যেন অসাবধানতার লক্ষণই অনুসন্ধান করেন। —বলেন ঃ খুব সাবধানে চলাফেরা করবে—পা টিপে টিপে; মা, পা টিপে, টিপে। সিঁড়িতে উঠবে নামবে এমন আস্তে আস্তে যে, খবরদার যেন পা না হড়কায়। বুঝলে তো?

—হ্যাঁ।

—না, বোঝো নি।

কিরণময়ী বলে ঃ না, মা, বুঝেছি।

—মনে থাকবে তো?

থাকবে মা।

অন্নপূর্ণা দৃঢ় স্বরে বলেন, থাকে যেন, সর্ব্বদাই যেন থাকে...

কেবল নিজে প্রহরা দিয়া, আর বধূকে সাবধানে থাকিতে আদেশ উপদেশ দিয়া ছেলেমানুষ বউয়ের সম্বন্ধে অন্নপূর্ণা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত নন—কিরণময়ীর ভাই অবনীকে তিনি গুপ্তচর, সেবক এবং শাসক নিযুক্ত করিয়াছেন। তার উপর তিনি ডাকাইলেন কবিরাজ রামপ্রাণ গুপ্তকে; তাঁর প্রশ্নের উত্তরে কবিরাজ বলিলেন, আছে বৈ কি সব; গর্ভিণীর স্নায়ু প্রভৃতি সুস্থ থাকবে, গর্ভস্থ সন্তান স্বাভাবিক সবল অবস্থায় থাকবে, এমন উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ ঔষধ আমাদের আছে।

—তাই দেবেন; কিন্তু উগ্র না হয়।

—না, মা, মৃদুবীর্য্য—বলিয়া কবিরাজ ঔষধ দিতে সম্মত হইলেন, এবং পাঠাইয়া দিলেন। সেই মৃদুবীর্য্য অথচ যথেষ্ট ফলপ্রদ ঔষধ কিরণময়ীকে প্রতিদিন সেবন করানো চলিতে লাগিল।

অশোক স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে, ব্যাপার কি?

কিরণময়ী বলে, মা আমাকে একেবারে রাজরাণী করে পাটে বসিয়ে রেখেছেন যেন। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী রাজপুত্র আসছেন।

—তা নয়তো কি! তিনখানা সিংহাসন তার জন্য পাতা আছে.....

—কোন্ কোন্ রাজ্যে?

—মার বুকে, তোমার বুকে, আর আমার বুকে।

শুনিয়া কিরণময়ীর চোখ হঠাৎ সজল হইয়া ওঠে; অশোক চুম্বন করিয়া তাহাকে প্রকৃতিস্থ করে, অর্থাৎ হাসায়।

কেবল কবিরাজই নয়, এবং কেবল ঔষধই নয়, আহ্বান পাইয়া জ্যোতিষশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তিশালী এবং কররেখাবিচারক পরমব্রহ্ম ভট্টাচার্য্যও আসিলেন; তাঁর কাছে অন্নপূর্ণা জানিতে চাহিলেন আর কিছু নয়, কেবল এই কথাটি যে, প্রথম সন্তান পুত্র না কন্যা?

নানান স্থান এবং নানান সূত্র হইতে নিদর্শন সংগ্রহ করিয়া পরমব্রহ্ম একেবারে নিঃসন্দেহ হইয়া ঘোষণা করিলেন যে, প্রথম সন্তান পুত্রই।

শুনিয়া অন্নপূর্ণা আশ্বস্ত হইলেন—পরমব্রহ্মের উক্তি মিথ্যা হইবার নয়।

দেবালয়ে পূজা পাঠাইলে কোনও প্রকার সুফল পাওয়া যাইতে পারে কিনা তাহাও অন্নপূর্ণা জানিতে চাহিলেন।

কল্যাণার্থে দেবালয়ে পূজা প্রেরণ বাঞ্ছনীয় কার্য্য নিশ্চয়ই। পরমব্রহ্ম বলিলেন, পাঠাও মা পূজা; তোমার যা কামনা দেবতাকে তা জানাও। দেবতা প্রসন্ন হলে সুফল নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

পূজা প্রেষিত হইল—

প্রসাদ আসিলে অন্নপূর্ণা বলিলেন, মাথায় ঠেকিয়ে মুখে দাও বউমা, মনে মনে একটুও অভক্তি কি অবিশ্বাস করো না।

কিরণময়ী অঞ্জলি পাতিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিল; মাথায় ছোঁয়াইয়া তা মুখে দিল; অভক্তি কি অবিশ্বাস একটুও করিল না। অন্নপূর্ণা তার মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন; দেখিলেন, বিশ্বাসে তৃপ্তিতে আর শ্রদ্ধায় তার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

মুখের এই ঔজ্জ্বল্য সম্পূর্ণ বজায় রহিল; এবং সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা সফল করিয়া হুলুধ্বনি আর অনন্ত পরমায়ুলাভের আশীর্ব্বাদের মাঝে কিরণময়ীর পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল; অন্নপূর্ণা চমকিত হইয়া উপলব্ধি করিলেন যে, তাঁর এই অভিলাষটি ভগবান পূর্ণ করিয়াছেন। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইতে কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটিল না—প্রসূতিপরিচর্য্যায় কিছুমাত্র ত্রুটি কি নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল না। অন্নপূর্ণা দেখিলেন, ছেলের সর্ব্বাঙ্গই সুন্দর আর সুপরিপুষ্ট—সুস্বাস্থ্যের বৈলক্ষণ্য একটুও নাই।

ছেলের নাম রাখা হইল শুভময়। শুভময় বাড়িতে লাগল...

এবং তারপরেও কিরণময়ীর গর্ভে আর একটি পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। ইহাদের দ্বারাই বংশের ধারা বহমান থাকিবে। অন্নপূর্ণা প্রায় নিশ্চিন্ত হইলেন।

মাত্র তেইশ বছর বয়সেই দুইটি সন্তানের জনক হইয়া অশোকের একটু ইতস্ততঃ ভাব আসিয়াছে—এটা যেন স্বেচ্ছাজনিত দুরবস্থার মত হাস্যকর আর করুণ। কিন্তু সেকথা ধর্ত্তব্য নয়, ধর্ত্তব্য ইহাই যে, জননী চরিতার্থ হইয়াছেন—তাঁর ইঙ্গিত ইহাই যে, পূর্ব্বপুরুষগণকে আর সংসারকে আনন্দপ্রদ দেয় বস্তু হিসাবে সন্তানের জন্মদান করিয়া সে তার কর্ত্তব্য সম্পাদন এবং ঋণ পরিশোধ করিয়াছে।

পরমব্রহ্ম ভট্টাচার্য্য আসেন, যান; অন্নপূর্ণার সঙ্গে তাঁর কি কথা হয় তা জানা যায় না; কিন্তু দেখা যায় মাঝে মাঝে তিনি কিছু টাকা লইয়া চাদরে বাঁধেন; আর শনিবারে শনিবারে খুব সতর্কতা আর শুচিতার সহিত নিখুঁত আয়োজন করিয়া শনির পূজা করেন—সে পূজায় উল্লাস উৎসব কিছুই থাকে না, থাকে কেবল অটুট গাম্ভীর্য্য আর সুগভীর নিষ্ঠা।

দিন এমনি করিয়া পূজার্চ্চনার ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে শোচনীয় একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিল অন্নপূর্ণার নিজের শরীরে আর মনে, কি কারণে তিনি নিঃশব্দ হইয়া উঠিতেছেন, আর সর্ব্বদাই

তিনি অস্থিরচিত্ত তা বুঝা যায় না। দেখা যায়, তাঁর মুখ বড় শুকাইয়া উঠিতেছে; দিন দিন তাঁর শরীর শীর্ণতর হইয়া আসিতেছে; একটা শোকাচ্ছন্ন বৈরাগ্যবশতঃ তিনি যেন স্বতন্ত্র হইয়া যাইতেছেন...

অশোক আর কিরণের উদ্বেগ আর প্রশ্নের শেষ নাই ঃ মা, তোমার শরীর এমন হয়ে যাচ্ছে কেন? কি হয়েছে তোমার বল।

অন্নপূর্ণা বলেন, কিছুই হয় নি রে! তোরা ভাবিস্ নে।

—নাতিরা এসে তোমার আয়ুহরণ করছে দেখছি! বলিয়া অশোক হাসিতে চেষ্টা করে। কিরণ বলে, মা বড্ড খাটেন ওদের নিয়ে।

—তা হতে দিও না। সেই মেয়েটাকে আবার রাখো না কেন? বেশ যত্ন করতে পারে। বলিয়া আশোক মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে।

কৈবর্ত্তদের একটি বার-তেরো বছরেব মেয়েকে 'ছেলে ধরা'র জন্য রাখা হইয়াছিল। আন্না তার নাম। ছেলে রাখিতে রাখিতে আন্না ছোট ছেলেটাকে কোলে করিয়াই একদিন আঁচলে পা বাঁধিয়া আছাড় খাইল। ছেলের গায়ে আঘাত কিছু লাগে নাই; কিন্তু সে ভয় পাইয়া কাঁদিল বিস্তর। আন্নাব তেমন দোষ ছিল না; সে পরিয়া আসিয়াছিল তার মায়ের কাপড়; অতবড় কাপড় হঠাৎ এক সময় সামলাইতে পারে নাই—পায়ে জড়াইয়া গিয়াছিল। কিন্তু অন্নপূর্ণা তাহাকে ক্ষমা করিলেন না ঃ যে মেয়ে অসাবধান তার কাছে ছেলে দিয়া বিশ্বাস নাই বলিয়া তিনি আন্নাকে তাড়াইয়া দিলেন। ছেলেব হাত-পা ভাঙিতে পারিত; বুকে যদি আঘাত লাগিত।

শিহরিয়া উঠিয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন, সে মেয়েকে এনে আর কাজ নেই। সত্যি আমার শরীব খুব খারাপ দেখছিস তোরা?

—হ্যাঁ মা; খুব খারাপ হয়ে গেছে।

—তবে আমায় কলকাতায় নিয়ে চল। কিছু দিন স্থান বদলে আসি।

অশোকের মনে হইল, স্থানের একঘেয়েমিই বুঝি মায়ের কাতরতার কারণ; বলিল, চল।

বন্দোবস্ত হইয়া গেল—সবাইকে লইয়া অন্নপূর্ণা কলিকাতায় আসিলেন; বলিয়া আসিলেন, হে মা দুর্গা, সবাইকে বজায় রেখে যেন ফিরে আসতে পারি। বলিয়া দুর্নিবাব একটা আবেগে বিহ্বল হইয়া একবার পুত্রকে, এক বার বধূকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁর এই কান্নার কারণ না পাইয়া ওরা অত্যন্ত বিস্মিত হইল।

কিন্তু কলিকাতায় আসিয়াই অন্নপূর্ণা দেশে ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। দেখিলেন, কলিকাতায় দুর্ঘটনার সম্ভাবনা অত্যধিক। বলিলেন, অনুমান করতে পারি নি যে, কলকাতা এমন প্রবল সাংঘাতিক স্থান! আমার বড় ভয় ভয় করছে। —বলিয়া তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিলেন; এবং দেশে ফিরিয়াই তাঁর মনে হইল, এখানে তাঁরা ভারি অসহায়। যে চিকিৎসকগণ অসুখ-বিসুখে এখানে তাঁদের শরণ্য তাঁদের ক্ষমতা অল্প। বলিলেন, চল্, কলকাতাতেই থাকি গিয়ে। কিন্তু তোরা কেউ বেরুতে পাবিনে আমার অনুমতি না নিয়ে। একটা চালাক-চতুর চাকর বাখতে হবে। তাকে সঙ্গে নিয়ে সবাই একসঙ্গে বেরুবো।

মা যেন দিশাহারা হইয়া গেছেন, এবং দিশাহারা করিয়া দিতেছেন; তবু সম্মত হইয়া অশোক সবাইকে লইয়া আবার কলিকাতায় আসিল। এবার সঙ্গে আসিলেন পরমব্রহ্ম ভট্টাচার্য্য।

সবাইকে বাসা-বাড়ীতে আবদ্ধ রাখিয়া অন্নপূর্ণা পরমব্রহ্মকে সঙ্গে লইয়া নিত্য-নিয়মিতভাবে যাইতে লাগিলেন দেবতার দুয়ারে; সেখানে উপুড় হইয়া তিনি পড়িয়া থাকেন; তাঁর চোখের জলে সেই দুয়ার ভাসিয়া যায়; আশীর্ব্বাদভিক্ষা আর করুণাভিক্ষা তাঁর শেষ হইতে চাহে না।

পরমব্রহ্ম জানেন সব। কিন্তু এখন তিনি নিঃশব্দ, তিনি কেবল অন্নপূর্ণার সঙ্গী; বাড়ীতে থাকিতেই তাঁর যে কাজ ছিল তা সম্পন্ন হইয়াছে—সাত দিন তিনি হোমানল নির্ব্বাপিত হইতে দেন নাই।

আর একটি বিষয় অন্নপূর্ণা দিবারাত্রির প্রতিটি মুহূর্ত ধ্যান করিতেছেন, যার মত উগ্র আর সর্বগ্রাসী আর কিছুই তাঁর সম্মুখে নাই। ১৩২১ সালে যার জন্ম, ১৩৪৫ সালে তার বয়স কত?

হিসাবটি অন্নপূর্ণা করেন—

তাঁর চোখের পাতা কখনো নিস্পন্দ হইয়া আসে, কখনো চক্ষু নিমীলিত হইয়া থাকে—সংসারের গতির দিকে আর আলোর দিকে আকর্ষণ বিলুপ্ত হইয়া যায়—বুকের শিরা ফট্‌ফট্‌ করিয়া দুস্তর অন্ধকারের মাঝে তিনি মাটিতে লুটাইয়া পড়েন।

'৪৫ সাল চলিতেছে। অন্নপূর্ণা সবাইকে খুব সাবধানে, নিজেকে ধ্যানমগ্ন, আর সর্ব্বাঙ্গে ও সর্ব্বান্তঃকরণে অনুভূত একটা অতলস্পর্শতার মাঝে একমাত্র ভরসাস্থল মনে হওয়াতে পরমব্রহ্মকে কাছে রাখিয়াছেন।

সাবধানে থাকিতে থাকিতে এবং রক্ষাকর্ত্তা দেবতাকে আহ্বান করিতে করিতে এক দিন অন্নপূর্ণা অশোকের মুখের দিকে চাহিয়া কাঁপিয়া উঠিলেন—চক্ষের নিমেষে প্রাণ কণ্ঠাগত হইল। অশোককে অত্যন্ত শ্রান্ত ক্লিষ্ট পাণ্ডুর দেখাইতেছে..

অশোক বলিল, মাথাটা বড্ড ধরেছে মা; ফেটে যাচ্ছে যেন। তারপর 'শোব' বলিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে যাইয়া সে উঠিতে পারিল না। অন্নপূর্ণা তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া শোয়াইয়া দিলেন—তখন অশোক ঘামিতেছে; দেখিতে দেখিতে ঘাম গলদধারে বহিতে লাগিল; তারপরই অন্নপূর্ণা দেখিলেন, সে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে।

পরমব্রহ্ম ভট্টাচার্য্য অন্নপূর্ণার মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকা হইল—

আরও ডাক্তার আসিল; তার পর আরও বড়, তার পর তাঁরও বড়; কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা এবং চিকিৎসা ব্যর্থ হইয়া গেল—অশোক বাঁচিল না; জননীকে পুত্রহীন, কিরণময়ীকে বিধবা, আর পুত্র দুটিকে পিতৃহীন করিয়া সে চলিয়া গেল।

তিন দিন নিঃশব্দ আর অনাহারে থাকিবার পর অন্নপূর্ণা কথা কহিলেন; বিধবা পুত্রবধূকে ডাকিয়া সম্মুখে আনিলেন—তার রিক্ত মূর্ত্তির দিকে শুষ্ক নিস্পলক চক্ষে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে অন্নপূর্ণার যখন মনে হইতে লাগিল, তাঁর অপরাধের সীমা নাই, আর ক্ষমা নাই, তখন তিনি কথা কহিলেন, বধূর দুটি হাত দু'হাতে জড়াইয়া ধরিয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন, মা, আমায় ক্ষমা কর। এ আমি জানতাম

তার পরে আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিলেন, কোষ্ঠীর কথা ফলেছে; তার আয়ুর শেষ দিনে সে গেছে। বংশধর চেয়ে সেই আকাঙ্ক্ষার যূপে তোকে বলি দিয়েছি।

কিরণময়ী বিভ্রান্ত চক্ষে অন্নপূর্ণার মুখের দিকে খানিক তাকাইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

[illegible] জ্যৈষ্ঠ ১৩৫[illegible]



পাষাণী

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

শিল্পী পাথর কাটিয়া মূর্ত্তি গড়িতেছিল। আহার নিদ্রা নাই; —কোনো দিকে তাহার খেয়াল নাই।

নির্জ্জীব নীরস পাথর শিল্পীর নিপুণ করস্পর্শে একটু একটু করিয়া সজীব হইয়া উঠিতেছিল। বসন্তের বাতাসে ফুল যেমন করিয়া ফোটে, শ্যামলতা যেমন করিয়া জাগে, তেমনি করিয়া, মূর্ত্তির অঙ্গে যেখানে শিল্পীর হাত লাগিতেছিল সেইখানে সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতেছিল, মাধুরী ঝরিয়া পড়িতেছিল। অমন যে কঠিন পাথর তাহাও রসে পরিপূর হইয়া উঠিতেছিল।

শিল্পী নিজের সৃষ্টি-করা সৌন্দর্য্যে নিজেই মুগ্ধ। নিজের হাতে-গড়া প্রতিমার পানে চাহিতে তাহার সর্ব্বশরীর আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিতেছিল—সেই আনন্দেরই প্রলেপ লাগাইয়া সে মূর্ত্তিটিকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতেছিল, এমন সময় কোথা হইতে এক অনিন্দ্য রূপসী আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল।

মুগ্ধ নয়ন রূপসীর পানে তুলিয়া শিল্পী বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"কে গো, তুমি কে!"

সুন্দরী হাসিয়া কহিল—"তুমি যাহাকে গড়িতে চাহিতেছ আমি সেই।"

শিল্পী অবাক হইয়া নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল। এবং সুন্দরীর মুখ হইতে হাসির জ্যোতিটুকু লইয়া মূর্ত্তির ওষ্ঠপুটে তাহা ফুটাইতে থাকিল।

সুন্দরী বলিল—"শিল্পী! তুমি মূর্ত্তি গঠন কর—আমি তোমায় গান শোনাই।"

এই বলিয়া সুন্দরী মৃদুগুঞ্জনে গান আরম্ভ করিল।

কেবলই কাজ করিয়া শিল্পীর মনের ভিতর যে একটা শ্রান্তি জমিয়া উঠিতেছিল সুন্দরীর পানে তাহা মুহূর্ত্তের মধ্যে দূর হইয়া গেল। শিল্পীর মনে হইতে লাগিল, এই গানের গুঞ্জনে তাহার চিত্তকমলের যে দলগুলি মুদিয়া ছিল সেগুলি আজ যেন ধীরে ধীরে উন্মীলিত হইয়া উঠিতেছে। সে তাহার হৃদয়ের মধ্যে নব নব ভাবের, নব নব রসের উন্মেষ অনুভব করিতে লাগিল;—তাহার প্রাণ নবীন ছন্দে, নবীন সুরে নূতনতর গান গাহিয়া উঠিল।

শিল্পী উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল—"ওগো সুন্দরী, আমার কাছে আসিয়া বোসো।"

সুন্দরী শিল্পীর কাছে আসিয়া বসিল।

শিল্পী মুগ্ধ নয়নে তাহাকে দেখিতে লাগিল; —তাহার হাতের কাজ মাটিতে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল।

সুন্দরী বলিল—"ওগো শিল্পী, তুমি কাজে মন দাও—আমি তোমায় গান শোনাই।"

শিল্পীর মুগ্ধ নয়নের আগে বসিয়া সুন্দরী গান গাহিতে লাগিল।

শিল্পী জড়িতকণ্ঠে কহিল—"সুন্দরী, তোমার গান ভালো করিয়া শোনাও—আরো কাছে আসিয়া বোসো।"

সুন্দরী গাহিতে গাহিতে শিল্পীর কাছ ঘেঁসিয়া বসিল।

শিল্পী বলিল—"ওগো আরো কাছে এস।"

সুন্দরী আরো কাছে আসিয়া বসিল।

গানের সুরে শিল্পীর মন মাতোয়ারা হইতেছিল, ছন্দের তালে তালে তাহার মন নৃত্য করিয়া উঠিতেছিল। সুন্দরীর রূপের মোহ শিল্পীর প্রাণে আবেশ আনিতেছিল—তাহার নিশ্বাসের স্পর্শে সে মাদকতা অনুভব করিতেছিল—সে যেন ঢুলিয়া পড়িতেছিল।

সুন্দরী বলিল—"ওগো শিল্পী, তুমি জাগো—জাগো। মূর্ত্তি তোমার সম্পূর্ণ কর।"

শিল্পী সে কথায় কর্ণপাত করিল না—সে কথা তাহার ভালো লাগিল না। সে বলিল—"থাক আমার কাজ। তুমি আমার ঘরে, আমি কোন্ প্রাণে তোমায় ভুলিয়া কাজ লইয়া থাকি! ওগো কাজের কথা রাখো—এখন মুখোমুখি হইয়া বোসো—তোমার ঐ বাহুর পরশ বারেকের তরে দাও।"

সুন্দরী মাথা নাড়িয়া বলিল—"না!"

শিল্পী পাগল হইয়া বলিয়া উঠিল—"ওগো সুন্দরী, কথা রাখো—তোমার অধর-সুধা আমায় একবার পান করাও।"

সুন্দরী মাথা নাড়িয়া বলিল—"না!"

শিল্পী তখন হাত বাড়াইয়া সুন্দরীকে ধরিতে গেল।

সুন্দরী হাত তুলিয়া বাধা দিয়া বলিল—"শিল্পী থামো। অমন কর কেন? আমি তো তোমারই।"

শিল্পী অধৈর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিল—"ওগো তবে কেন দূরে অমন করিয়া দাঁড়াইয়া—এস এই বক্ষে।"

সুন্দরী আর কিছু বলিল না—শুধু একটু হাসিল।

শিল্পী উৎসাহিত হইয়া সুন্দরীকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া ফেলিল—তাহার ওষ্ঠপুটে একটি আবেগভরা চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিল।

কিন্তু একি! এমন কোমল ওষ্ঠপুট এত কঠিন হইল কেমন করিয়া। শিল্পী সবিস্ময়ে দেখিল, তাহার সুন্দরী পাষাণী হইয়া গেছে! —তাহার ওষ্ঠপুটে শিল্পীর চুম্বন-রেখাটি কেবল জ্বলজ্বল করিতেছে!

১৩ বর্ষ, ভাদ্র ১৩২০



মতিলাল

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

পাঠক! একবার মনশ্চক্ষু উন্মীলন করুন। কল্পনানেত্রে দেখুন আজিকার এই প্রাসাদ-কণ্টকিত কলকাতা শহরের বুকে, প্রায় সদর রাস্তার ওপরেই একখানা খোলা মাঠ। মাঠখানা রাস্তা থেকে দেখা যায় না। চার পাশে গোটাকয়েক বড় বড় বাড়ী তাকে যেন ধনীদের শ্যেনচক্ষুর দৃষ্টি থেকে আগলে রেখেছে। রাস্তা থেকে বোঝাই যায় না যে, এখানে এত বড় একটা মাঠ একেবারে মাঠে মারা যাচ্ছে। মাঠের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে চার পাশে চাইলে মনে হবে বড় বড় বাড়ীর মাঠমুখো জানালাগুলো যেন অবাক হ'য়ে এই খোলা জায়গাটুকুর শ্যামল সৌভাগ্যের দিকে চেয়ে আছে।

এই ময়দানটি ছিল আমাদের ছেলেবেলার লীলাভূমি। আমরা প্রায় গুটি-কুড়িক ছেলে প্রতিদিন এখানে খেলতে আসতুম—শহরের নানা দিক থেকে।

মাঠের একদিকে প্রকাণ্ড প্রাসাদের মতন একখানা বাড়ী। এই বাড়ীর একটি ছেলে ছিল আমাদের বন্ধু। তাদেরই ছিল এই মাঠ। একদিন বিকেলে, আমরা তখন খেলায় উন্মত্ত, এমন সময় বাড়ীর মধ্যে কান্নার রোল উঠল। আমরা খেলা ফেলে ছুটে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলুম। বন্ধু বললে, দেনার দায়ে তাদের সমস্ত সম্পত্তি আটকা পড়েছে। তার পরে প্রতিদিন পাওনাদারেরা এসে ঝাড়, লণ্ঠন, খাট, পালং বের করে নিয়ে যেতে লাগল। সবার শেষে একদিন তারা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ছেড়ে দিয়ে চলে গেল পশ্চিমের কোন এক শহরে। কিন্তু যাক সে আর এক কথা—

হাইকোর্টে মামলা চলতে লাগল বছরের পর বছর ধরে, আর আমরা একদল লক্ষ্মীছাড়া ছেলে সেই বিরাট প্রাসাদ ও তারই সংলগ্ন এই মাঠখানা নিরুপদ্রবে ভোগ করতে লাগলুম।

বিকেলে ছুটির পর মাঠে ফুটবল খেলা সুরু হতো। আমাদের মধ্যে দুটি দল ছিল। একদল ছিল খেলোয়াড়, আর একদল ছিল গাইয়ে-বাজিয়ে। গাইয়ে-বাজিয়ের দল খেলার সময় এক দিককার গোল-পোস্টের কাছে বসে থাকত। খেলা শেষ হ'য়ে গেলে তাদের মধ্যে একজন বলটিকে কোলে নিয়ে বাজাতে বসত আর গান শুরু হতো। খেলোয়াড়ের দল তখন গাইয়ে-বাজিয়েদের ঘিরে গোল হ'য়ে বসত। দু-দলই ছিল দু-দলের গুণের কদরদান আর দু-দলের মধ্যে যোগসূত্র ছিল পাঁচ নম্বরের একটি ফুটবল। যেটি ছিঁড়ে গেলে কিংবা যার ভেতরকার হাওয়া কমে গেলে দু-দলেরই ফূর্ত্তি হতো একদম মাটি।

মতিলাল ছিল শেষের দলের অর্থাৎ গাইয়ে-বাজিয়ে দলের লোক। কিন্তু মাঠের সভার রীতিমত সভ্য হ'য়েও আমাদের ধরণ-ধারণের সঙ্গে তার চালচলনের ঠিক মিল ছিল না। তার কথাবার্ত্তা, হালচাল সব কিছুর মধ্যেই পাকা সংসারীর একটা ছাপ ফুটে উঠত। সে ছিল, যাকে সোজা কথায় বলে কাজের লোক। আমরা ছিলুম লেখাপড়ায় একেবারে সেরা ছেলে। প্রত্যেক পরীক্ষায় কে কত নীচে থাকতে পারে আমাদের মধ্যে প্রতি বৎসর তারই প্রতিযোগিতা চলত। ছুটি জিনিষটিকে বরাবর আমরা ছুটি বলেই মান্য করতুম। কিন্তু মতিলাল ছিল ঠিক তার উল্টো। লেখাপড়ায় সে ভাল ছেলে না হলেও ভাল হবার চেষ্টা সে করত। একমাত্র সরস্বতী পুজোর দিন ছাড়া বছরের প্রতিদিন নিয়ম ক'রে রুটিন-মত সে পড়াশুনা করত। ইংরেজী শেখবার প্রতি তার ছিল অসাধারণ ঝোঁক। তার বাবা ও ঠাকুরদাদা দুজনেই ছিলেন ডেপুটি। সে বলত যে, তার জন্যেও হাকিমের চেয়ার খালি পড়ে রয়েছে—বি-এ পাশ ক'রে এখন গুটি গুটি সেখানে গিয়ে বসতে পারলে হয়।

মতিলাল মাঠে আসত একেবারে সন্ধ্যা ঘেঁষে। স্কুলের ছুটির পর প্রত্যহ সে গড়ের মাঠের দিকে যেত। প্রতিদিন নিয়ম ক'রে এই বায়ু সেবন করতে যাবার স্পৃহা যে বায়ুরোগেরই একটি বিশেষ লক্ষণ—এ কথা উল্লেখ করলে মতিলাল বলত—গড়ের মাঠের দিকে কি হাওয়া খেতে যাই রে! ওদিকে মেম-সাহেবদের পেছু পেছু ঘুরলে অনেক ভাল ভাল Idioms and Phrases শিখতে পারা যায়।

সাহেব মেমরা যে কি অযাচিতভাবে মুক্তকণ্ঠে Idioms ও Phrases ছড়াতে ছড়াতে পথে বিচরণ করে, মধ্যে মধ্যে মতিলালের মুখে তারই দু-একটা উদাহরণ শুনে আমাদের মনে হতো ইংরেজী ভাষাটা আমাদের আর শেখা হ'ল না। কারণ তা শিখতে যা অধ্যবসায়ের প্রয়োজন তা একমাত্র মতিলালেরই আছে এবং তার জন্য অনুপ্রেরণা আসছে ভবিষ্যতের সেই হাকিমী-পদ থেকে—যে অনুপ্রেরণা আমাদেব মধ্যে কারুরই ছিল না।

মতিলালের দেশ ছিল পূর্ব্ববঙ্গে। কিন্তু পিতা ও পিতামহের সঙ্গে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের জেলায়-জেলায় ছেলেবেলা থেকে ঘুরে তার পূর্ব্বত্বটুকু সম্পূর্ণরূপে খসে গিয়েছিল। কথাবার্ত্তা বলত সে পরিষ্কার, আর তার কণ্ঠটি ছিল মন-মাতানো। তা ছাড়া গানের সংগ্রহও ছিল তার বিস্তর। সে-সব গান তখনও কারুর মুখে শুনতে পেতুম না—এখনও পাই না।

পাঠক, দৃষ্টি আর একটু প্রসারিত করুন। মাঠের আর এক কোণে কতকগুলো ভাঙা ঘর। এক সময়ে বোধ হয় সেখানে গোয়াল ছিল। এখানটায় রীতিমত জঙ্গল। মানুষ-ভর উঁচু উঁচু বুনো কচুগাছ হঠাৎ বড়লোকের মত অত্যন্ত কদর্য্যভাবে নিজেদের সমারোহ জাহির করতে ব্যস্ত। এদের মাঝে পাঁচ-ছটা উঁচু নারকোল গাছ মাথার ওপরে চিরশ্যাম ডালি নিয়ে দিনরাত তাদের ঝর্ঝর রাগিণীতে বোধ হয় সেই বাড়ীরই পুরোনো গাথা গেয়ে যেত।

মাঝে-মাঝে সন্ধ্যার পরে এই জঙ্গলটার ঠিক পেছন দিকে চাঁদ উঁকি দিত। জঙ্গলের পরেই ছিল একখানা বাড়ী। এই বাড়ীব একটা আলসে-বিহীন খোলা ছাত মাঠের দিকে বার করা ছিল। যেন দেওয়ালের কঠোব আলিঙ্গন থেকে মুক্তি পাবার জন্য বাড়ীরই খানিকটা মাঠের দিকে ছুটে বেরিয়ে এসেছে।

নারকোল গাছগুলোর পেছন থেকে চাঁদ উঁকি দেওয়ার কিছু পরেই সেই খোলা ছাতে এসে দাঁড়াত একখানি চাঁদমুখ। এরা ছিল যেন দুই সখী। চাঁদের সাড়া পেলে চাঁদমুখ আর কিছুতেই ঘরে থাকতে পারত না।

সে ছিল তরুণী। উজ্জ্বল গৌর ছিল তার দেহেব বর্ণ। কিছুক্ষণ চাঁদের দিকে চেয়ে থেকে সে আকুলভাবে মাঠের দিকে চাইত। মাঠের মধ্যে কি যে ছিল তার ধ্যানের বস্তু, কে যে তাব কামনার ধন তা আমবা কেউ জানতুম না। জানবাব চেষ্টাও কোনো দিন করি নি। অনেকক্ষণ সেইভাবে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে আবাব সে ঘবে ফিরে যেত।

যেদিন এই ব্যাপার হতো, সেদিন আর আমাদের গান মোটেই জমত না। তরুণী ছাতের ধারে এসে দাঁড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গে নির্ম্মলের হাতে ফুটবলের ওপর তবলার বোল তার অজ্ঞাতেই থেমে যেত। মতিলালের কণ্ঠ ধীরে ধীরে কখন যে বাতাসে মিলিয়ে যেত তা আমবা বুঝতে পাবতুম না। আমরা অনিমেষ নয়নে সেই তরুণীর দিকে চেয়ে থাকতুম। তার পরে ধীরে ধীরে যখন তার মূর্ত্তি ছাতের এক কোণে মিলিয়ে যেত তখন আমাদের মনের পটে ফুটে উঠত এক একটি ভাব-মূর্ত্তি, আব উঠত ছোট্ট সেই সভাতলে দীর্ঘশ্বাসের ঝড়। এর পরে কথা কি গান কিছুই জমবে না বুঝেই আমরা যে যার বাড়ীর দিকে রওনা হতুম।

কৈশোরের কল্পনা-সাগরে আমাদের জীবন-তরণী যখন এইভাবে টলমল করছে তখন চাঁদ এসে ধরলে তার হাল আর লক্ষ্য হ'ল চাঁদমুখ। চাঁদের সঙ্গে তার সঙ্গিনীর দলও এল। চিত্রা আসতে লাগল তার বিচিত্র রূপ ধবে, শ্রবণা এল নৃত্যের তালে দ্যুলোকে ভূলোকে মাদল বাজিয়ে, ভদ্রা তার বিরহের গাথা অশ্রুধারে ঢেলে দিতে লাগল। স্বাতী, রাধা আর অনুরাধা খেলতে লাগল লুকোচুরি আর সবার শেষে ফল্গু যেত হৃদয়-দোলায় দোল দিয়ে। এদের পাল্লায় পড়ে কোথায় গেল পড়াশুনো আর কোথায় গেল কি! বাইরের সংসারটা হয়ে পড়ল একটা অত্যন্ত অনাবশ্যক ও অবান্তর জিনিষ। নিজের মনের মধ্যে একটা বিরাট কল্পনার রাজ্য তৈরি ক'রে তারই সিংহাসনে মশগুল হ'য়ে বসে রইলুম। আমাদের হালচাল দেখে প্রতিবেশীদের রসনা হ'য়ে উঠল সংবাদপত্রের চাইতেও তীক্ষ্ণ, আর অভিভাবকদের নির্যাতন কববার শক্তি দেখে জেলের কর্ত্তৃপক্ষও হতো লজ্জিত। কিন্তু আমাদের সে

সব দিকে ভ্রূক্ষেপও ছিল না। আমরাও বলতুম, হে ভগবান এরা যে কি করছে তা এরা বুঝতে পারছে না—তুমি এদের মার্জ্জনা কোরো।

একদিন—সেদিন এই চাঁদ আর ছাতের কোণের সেই চাঁদমুখ অনেকক্ষণ ধরে আমাদের মনের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা ঝড় তুলে সবেমাত্র অস্ত গিয়েছে। এমন সময় নির্ম্মল বললে যে, একটি মেয়েকে সে ভালবাসে। মেয়েটির বাড়ী তার মামার বাড়ীর পাশেই। মামাদের সঙ্গে তাদের খুব ভাব। সেইখানেই সেই কিশোরীর সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়। কিন্তু পরিচয় এখন দু-পক্ষ থেকেই গভীর প্রেমে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে মিলনের কোনো সম্ভাবনা নেই। কারণ মেয়েটির না-কি কোন এক জমিদারের ছেলের সঙ্গে বিয়ের একেবারে ঠিক হয়ে গিয়েছে।

নির্ম্মলের এই কাহিনীটি যে ডাহা মিথ্যে কথা তা বুঝতে আমাদের কারুরই বাকী রইল না, কিন্তু কারুর মুখ দিয়েই তার একটি প্রতিবাদ বেরুলো না, কারণ ঘটনাটি মিথ্যা হলেও সেই ইতিহাসের মধ্যে এমন একটা শাশ্বত সত্য ছিল যা সমস্ত অসত্যকে ছাপিয়ে একটি অখণ্ড সত্যের মূর্ত্তিতে আমাদের কাছে প্রতিভাত হ'ল।

নির্ম্মলের কাহিনী শেষ হোতে না হোতে আমাদের দীর্ঘনিঃশ্বাসগুলো পড়বার আগেই সত্যকুমার তার নিজের জীবনের একটা প্রেম-কাহিনীর বর্ণনা করলে। সত্যর পর বিমল—এমনি করে আবহাওয়াটা এমনি সংক্রামক হয়ে উঠল যে, আমিও কল্পনা থেকে নিজের জীবনের অমনি একটা কাহিনী তৈরী করে বলে দিলুম।

সকলেই নিজের নিজের কাহিনী বললে বটে, কিন্তু মতিলাল কেবল দীর্ঘনিঃশ্বাসই ফেললে—বললে না কিছুই। তাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে আমাদের মনে হল যে, তারও নিশ্চয়ই একটা প্রেম-কাহিনী আছে। শুধু আছে নয়, তার মূলে কিছু সত্য আছে বলেই সেটা সে প্রকাশ করতে চায় না। আমরা তাকে চেপে ধরলুম—বলতেই হবে।

মতিলালও কিছুতেই বলবে না। আপত্তি তার যতই দৃঢ় হতে থাকে আমাদের সন্দেহও ততই ঘনীভূত হয়। শেষকালে অনেক বলা-কওয়ার পরে অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে সে প্রকাশ করলে যে, তাদের বাড়ীর দোতলার ছাতের গায়েই আর একজনদের ছাত একেবারে লাগানো। এই বাড়ীরই একটি মেয়ের সঙ্গে তার খুব ভাব হয়েছে। তাকে সে ভালবেসেছে, প্রতিদানও পেয়েছে। তাকে সে বিয়ে করবেই—এতে যা হয় হবে।'

মতিলালের কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত বটে, কিন্তু আমরা সকলেই মনে মনে স্বীকার করলুম যে, এর মধ্যে মিথ্যার আমেজ এতটুকুও নেই। চাঁদ ও চাঁদমুখ মতিলালের মত ছেলের মনেও প্রভাব বিস্তার করেছে জেনে মনে হতে লাগল যেন সে আমাদের খুব কাছে এসে পড়েছে। মনে আছে তার পরদিন থেকে সে গড়ের মাঠে Idioms ও Phrases শিখতে যাওয়া বন্ধ রেখে তাড়াতাড়ি মাঠে আসতে আরম্ভ করলে। আর চাঁদমুখের চর্চ্চা করবার জন্য গানের পরে আরও আধঘণ্টা আড্ডার সময় বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল।

এই রকম কিছুদিন যায়। দিনকয়েক মতিলালের দেখা নেই। তার বাড়ী কেউ চেনে না, কাজেই খোঁজ পাবারও উপায় নেই। ইতিমধ্যে একদিন সে আমাদের কাছে খুব গোপনে প্রকাশ করেছিল যে, তাদের মিলনের পথে দু-একজন লোক বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও জানিয়ে রেখেছিল যে, তাকে না পেলে সে আত্মহত্যা করবে।

মতিলালের অদর্শনে আমরা উদ্বিগ্ন হ'য়ে দিন কাটাচ্ছি। এমন সময় সংবাদ পাওয়া গেল যে তার সাংঘাতিক অসুখ, বুঝি এ যাত্রা আর বাঁচে না।

মতিলালের অসুখের খবরটা যে কেমন ক'রে কোথা দিয়ে এসে পৌঁছল তা মনে নেই। খোঁজ পড়ল তার বাড়ী কোথায়? কিন্তু কেউ-ই তার বাড়ী চেনে না। ঠিক হ'ল তার স্কুলে গিয়ে বাড়ীর ঠিকানাটা জেনে আসা হবে। সে আবার পড়ত এক অদ্ভুত ইস্কুলে। স্কুলটির নাম ছিল সর্ব্বমঙ্গলা ইন্‌স্টিটিউশন। তার বাবার একজন চেনা লোক সেই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন, সেই সুবাদে মতিলালকে

সেখানে ভর্ত্তি হতে হয়েছিল। স্কুলটি ছিল নির্ম্মলের বাড়ীর কাছেই। নির্ম্মল বললে যে, কাল সেখানে গিয়ে সে মতিলালের ঠিকানা জেনে আসবে।

পরদিন নির্ম্মল মতিলালের ঠিকানা জেনে নিয়ে এল। আমরা জন-চার পাঁচ খেলা ফেলে মতিলালের বাড়ীর উদ্দেশে বেড়িয়ে পড়লুম।

গলির গলি তস্য গলি ঘুরে ঘুরে প্রায় সন্ধ্যার সময় আমরা তার বাড়ী আবিষ্কার করলুম।

হরি! হরি! এই বাড়ীতে মতিলাল থাকে! সে একটা খোলার বাড়ী। পঞ্চাশ রকমের লোক হরদম বাড়ীর মধ্যে ঢুকছে আর বেরুচ্ছে। যাকেই মতিলালের কথা জিজ্ঞাসা করা যায় সেই বলে জানি না। নির্ম্মল নিশ্চয় ভুল ঠিকানা এনেছে সাব্যস্ত করে আমরা ফিরব ফিরব করছি এমন সময় একটি লোককে ওষুধের শিশি হাতে বাড়ীর মধ্যে ঢুকতে দেখে জিজ্ঞাসা করা গেল—হ্যাঁ মশায়, মতিলাল থাকে এই বাড়ীতে?

সন্ধান পাওয়া গেল। এই বাসাতেই মতিলাল থাকে বটে। লোকটি আমাদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকল। কতকগুলো এঁদো পচা নর্দ্দমা ও আঁস্তাকুড় পেরিয়ে একটা নীচু ঘরে গিয়ে আমরা ঢুকলুম। ঘরের এক কোণে খাটে একটা স্যাঁৎসেঁতে বিছানায় মতিলাল পড়ে আছে। খাটের কাছে দু-তিনজন লোক মাটিতে বসে গল্প করছে। এক কোণে মাটির পিলসুজের ওপরে প্রদীপ জ্বলছে। আমরা গিয়ে খাটের ওপরে বসতেই মতিলাল অদ্ভুত একরকম দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাইতে লাগল। জিজ্ঞাসা করলুম—মতিলাল কেমন আছিস ভাই?

মতিলাল চীৎকার করে উঠল—হামারা সর্ব্বাঙ্গমে বেশ করকে গঙ্গামৃত্তিকা আর তুলসীপাতা বাট্‌কে লেপ্‌কে লেপ্‌কে দেও—জল্ যাতা হ্যায়।

মতিলালের মুখে এই রকম হিন্দী কথা শুনে তো আমরা কজনেই হেসে ফেললুম। কিন্তু সে আবার তখুনি চেঁচিয়ে উঠল—কেয়া! হামারা দুর্দ্দশা দেখ্‌কে তোমলোক্ হাসতা হ্যায়? নির্দ্দয় কাঁহাকা—

হাসি মিলিয়ে গিয়ে চোখ অশ্রুতে ভরে উঠল। মতিলালের দিকে চেয়ে দেখি তার চোখে আর সেই অদ্ভুত দৃষ্টি নেই—চাহনি বেশ স্বাভাবিক। অতি ক্ষীণস্বরে একবার সে বলে উঠল—Oh how helpless!

কথাগুলো বলেই সে চোখ বুজিয়ে ফেললে।

রোগ কিংবা রোগী সম্বন্ধে আমাদের কারুরই কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না কিন্তু তবুও মনে হল যে, মতিলালের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। সেখানে যে লোকগুলি বসেছিল তাদের জিজ্ঞাসা করা হ'ল —মতিলালের বাড়ীতে অসুখের খবর দেওয়া হয়েছে কি?

তারা বললে—না এখনো জানানো হয় নি. বিকারটা তো আজ দুপুর থেকে শুরু হ'ল কিনা—

তাদের কাছ থেকে মতিলালের বাবার ঠিকানা জেনে নিয়ে তখুনি তাঁকে তার ক'রে দিলুম —তার পাওয়ামাত্র চলে আসবেন—মতিলালের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলুম যে মতিলালের এক দূরসম্পর্কের কাকা কলকাতায় থাকেন এবং মতিলাল তাঁরই তত্ত্বাবধানে থাকে।

যা হোক, সেদিন তার ক'রে রাত্রে বাড়ী ফেরা হ'ল। পরদিন বিকেলবেলা গিয়ে দেখি মতিলালের বাবা এসে পড়েছেন, খুব ধূম ক'রে চিকিৎসা শুরু হয়ে গেছে। ভদ্রলোক আমাদের দেখে ভারি খুশি হলেন। আমাদের খেলার মাঠের কাছেই একখানা বাড়ী ভাড়া ছিল। সেই বাড়ীটা ঠিক ক'রে মতিলালকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হ'ল। তার মা ও অন্য ভাইবোনেরা দু-একদিনের মধ্যেই এসে পড়লেন। আমরা প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় গিয়ে তাকে দেখে আসতে লাগলুম।

মতিলালের সে-যাত্রা পরমায়ু ছিল। দেড়মাস রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করে সে আরোগ্যের পথে অগ্রসর হতে লাগল। তার বাবা ফিরে গেলেন বিহারের সেই শহরে—কর্ম্মস্থলে। মা ও অন্য ভাইবোনেরা কলকাতাতেই রয়ে গেলেন। ঠিক হ'ল যে এবার থেকে তাঁরা কলকাতাতেই থাকবেন।

স্কুলের গ্রীষ্মের ছুটির সময় মতিলালরা যাবে বাবার কাছে, আর পুজো ও বড়দিনের ছুটির সময় বাবা আসবেন তাদের কাছে।

মতিলাল সেরে উঠে আবার স্কুলে যেতে আরম্ভ করলে। কিছুদিনের মধ্যেই আড্ডায় নিয়মিত হাজিরাও পড়তে লাগল। কিন্তু ছাতের কোণে সেই চাঁদমুখের উদয় হ'লেই সে আর বসত না, কোনো রকম ছুতো ক'রে পালিয়ে যেত। চাঁদমুখ দেখে সরে পড়বার কারণটা আমাদের কাছে যতই সে ঘুরিয়ে বলুক না কেন, আমরা ঠিক বুঝতে পারতুম, চন্দ্রবদনের প্রতি তার আকস্মিক এই যে বিতৃষ্ণা এর মূলে আছে দোতালার ছাতের সেই প্রেমকাহিনী। আমরা সভায় নিজেদের যে প্রেমকাহিনীর বর্ণনা করেছিলুম তার মধ্যে অন্ততঃ বাড়ীঘরগুলো ছিল সত্যি, কিন্তু মতিলাল অতখানি গৌরচন্দ্রিকার পর এমন একটি গল্প ছাড়লে যে তার মধ্যে সত্যের রেশটুকু পর্যান্ত নেই। খোলার বাড়ীর দোতালার ছাতের কথা নিয়ে তার অসাক্ষাতে আমাদের মধ্যে মাঝে মাঝে খুব হাসির ধূম পড়ে যেত। হয়ত মতিলালের কানে কোনো সূত্রে কিছু পৌঁচেছিল। তাই সে ইদানীং চাঁদের সঙ্গে চাঁদমুখের উদয় দেখলেই পালিয়ে যেত।

কিন্তু একদিন সত্যই বাঘ এল। মতিলালের বাবা বিহারের যে শহরে তখন হাকিমী করছিলেন সেই শহরের একজন উকীল ছিলেন তাঁর বিশেষ বন্ধু। উকীল বন্ধুটির দু-তিন পুরুষ ধরে এখানে বাস। তাঁর বাবা ও ঠাকুরদাদা সে অঞ্চলে বেশ বিষয়-আশয়ও ক'রে গিয়েছেন। তাঁদেরই একখানা বাড়ী ভাড়া নিয়ে মতিলালেরা সেখানে থাকত। বাড়ীর পাশে বাড়ী হওয়ায় দুই পরিবারের মধ্যে সদ্ভাবও ছিল খুব। জগবন্ধুবাবুর স্ত্রী কিছুদিন থেকে নানারকম অসুখে ভুগছিলেন। সেখানকার ডাক্তার কবিরাজেরা কিছু করতে না পারায় তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসবার কথা চলছিল। জগবন্ধু মতিলালকে লিখলেন একটা বাড়ী ভাড়া করবার কথা। বাড়ীর জন্য বেশী কষ্ট পেতে হ'ল না। তাদের বাড়ীর পাশেই একখানা বাড়ী খালি ছিল। সেই বাড়ীখানা জগবন্ধুবাবুদের জন্য ঠিক করা হ'ল।

জগবন্ধুবাবুর পরিবার খুব বড় নয়। তাঁর বৃদ্ধা মা পুত্রবধূর সঙ্গে এলেন, আর এল মুমূর্ষু মায়ের সেবার জন্য কৃষ্ণা একাদশীর অস্তমান চন্দ্রের পাশে শুক্লা চতুর্দ্দশীর পূর্ণশশীর মতন তাঁর একমাত্র বিধবা মেয়ে হিমানী।

জগবন্ধুবাবুর স্ত্রীকে মতিলাল মাসীমা বলে ডাকত। যেদিন তাঁরা এসে পৌঁছিলেন সেদিন থেকে মতিলালের আর বিশ্রাম নেই। এই ডাক্তারের বাড়ী ছোটা, এই ডাক্তারখানায় যাওয়া, ঝি-চাকরের ব্যবস্থা করা, বাজার করা, রোগীর সেবা করা—একাই সে একশো হয়ে উঠল।

আমরা তাদের বাড়ীতে গেলে মতিলালের মা হিমানীর মা'র উদ্দেশ্যে বলতেন—গেল-জন্মে মতিলাল বোধহয় ওরই ছেলে ছিল। ছেলেটা এই সেদিন ব্যারাম থেকে উঠেছে, আবার না পড়লে বাঁচি।

মতিলালের সঙ্গে সঙ্গে হিমানীদের বাড়ীতে আমাদের গতিও অবারিত হয়ে উঠল। হিমানীর বাবার অগাধ কাজ। তাই তিনি সব সময়ে রুগ্না স্ত্রীর কাছে থাকতে পারতেন না। দশ পনেরো দিন অন্তর শনিবার দেখে তিনি কলকাতায় আসতেন আর রবিবার সন্ধ্যার সময় ফিরে যেতেন।

মাস কয়েক ধরে ডাক্তার, কবিরাজ, অবধূত ক'রে কিছুতেই হিমানীর মা'র অসুখ সারল না। এতদিন তবুও তিনি উঠতে-হাঁটতে পারছিলেন, কোথাকার এক দিগ্গজ কবিরাজ এসে দুটি-তিনটি গুলির আঘাতে ভদ্রমহিলাকে একেবারে বিছানায় পেড়ে ফেললে।

আবার ডাক্তারী সুরু হ'ল। পঞ্চাশ রকমের ওষুধ মালিশ—ঘণ্টায় দু-তিনবার ক'রে। তার ওপরে পনেরো মিনিট অন্তর জ্বরের তাপ দেখা। খাতায় চৌকো ঘর কেটে তাতে জ্বরের নক্সা করা, ইত্যাদি ব্যাপারে কাজ বেড়ে গেল চারগুণ। আমি আর নির্ম্মল এসে হিমানী ও মতিলালকে সাহায্য করতে লাগলুম।

কিন্তু আমাদের সেবা ও ডাক্তারদের চিকিৎসা সমস্ত ব্যর্থ ক'রে দিয়ে হিমানীর মা স্থির মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলতে লাগলেন। ক্রমে তাঁর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হ'য়ে উঠল।

সেদিন বোধ হয় পূর্ণিমা। সকাল থেকেই রোগিনীর অবস্থা খারাপ। ঠিক হ'ল যে আমি আর নির্ম্মল রাত্রি একটা অবধি জাগব, তার পরে হিমানী ও মতিলাল বাকী রাতটুকু জাগবে। হিমানীর ঠাকুরমা রাত্রির পর রাত্রি পুত্রবধূর শিয়রে জেগে বসে থাকতেন, এতে তাঁর কোনো ক্লান্তি ছিল না। তবে তিনি ওষুধপত্র কিছু খাওয়াতে পারতেন না। পাছে ভুল ক'রে মালিশের ওষুধ খাইয়ে দেন, এইজন্য আমাদের কারুকে থাকতেই হতো।

সে রাত্রি আমি আর নির্ম্মল একটা অবধি জেগে মতিলালকে তুলে দিতে গিয়ে দেখি বিছানায় সে নেই। আমি আর নির্ম্মল শুতুম ছাতের ওপরে একটা ছোট্ট ঘরে। হাওয়া পাবার জন্য হয়ত সে আমাদের বিছানায় গিয়ে শুয়েছে মনে করে ছাতে গিয়ে দেখি যে এক কোণে মতিলাল ও হিমানী দাঁড়িয়ে আছে।

হিমানী কাঁদছিল। তার মা যে আর বেশি দিন নেই এ কথা বোধ হয় সে বুঝতে পেরেছিল। দেখলুম সে ঘাড় হেঁট ক'রে চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদছে আর মতিলাল গুন গুন করে কি বলে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

আমরা সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছি তা তাদের দুজনের একজনও টের পায়নি। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটবার পর হিমানী সেই অশ্রুসিক্ত আঁচলখানা গলায় জড়িয়ে হাঁটু গেড়ে মতিলালকে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়াল, আর মতিলাল হিমানীর মুখখানা তুলে তার অধরোষ্ঠে গভীর চুম্বনের দাগ এঁকে দিলে।

চাঁদের আলোতে মতিলালের মুখখানা ঝকঝক করছিল। তারই দেহের ছায়া হিমানীর মুখের ওপর পড়ায় তার মুখখানা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। অবর্ণনীয় সেই আলো ও আবছায়ার খেলা। দক্ষালয়ে যাবার আগে সতী যখন মহাদেবের পায়ে মাথা ঠেকিয়েছিলেন, অভিমান-অপগত প্রিয়তমার প্রসন্ন মুখ দেখে ভোলানাথ বোধ হয় এমনিই বিহ্বল হয়েছিলেন। মৃত্যু যে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সংহারের দেবতা মহেশ্বর সেদিন নিজেই তা দেখতে পান নি।

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে মতিলাল আমাদের দেখতে পেয়ে হিমানীকে কি বললে। তার পরে আমাদের সঙ্গে কোনো কথা না বলেই তারা দুড় দুড় ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল।

পরদিন সকালবেলা হিমানীর মা অচৈতন্য হ'য়ে পড়লেন। সমস্ত দিন তাঁর আর জ্ঞান ফিরে এল না। সন্ধ্যাবেলা আমি ও নির্ম্মল একবার বাড়ী ঘুরে এসে তাদের বাড়ীতেই শুয়ে রইলুম। সেদিন আর কারুর ব্যস্ততা বা রাত জাগবার পালা নেই। রোগিনী সকলকেই অবসর দিয়েছেন। সকলেই শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করছে।

অনেক রাত্রে একবার ঘুম ভেঙে যাওয়ায় রোগীর ঘরের জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম। ঘরের এক কোণে একটি বাতি জ্বলছে। চারিদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম। সেই নিষ্ঠুর নিস্তব্ধতার মধ্যে রোগিনীর অন্তিম নিঃশ্বাস--জীবনগাথার শেষ রাগিণী তালে-তালে ধ্বনিয়ে উঠছে।

জানলায় মুখ দিয়ে ভেতরে দেখলুম, মুমূর্ষুর শিয়রে বসে আছেন হিমানীর বৃদ্ধা পিতামহী আর তাঁর দুপায়ের দুধারে বসে হিমানী ও মতিলাল।

সেই দৃশ্য মনে পড়লে আজও আমার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে। সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে আমার মনে হতে লাগল যেন রোগিনীর মাথার কাছে রুদ্র ভৈরব তার পৈবিক নিশান নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে, আর পায়ের কাছে মন্মথ তার মকরকেতন ওড়াচ্ছে। সংহার ও সৃষ্টির দুই দেবতায় মিলে উৎসব ক'রে সেই পুণ্যবতীকে মৃত্যুর পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে এসে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লুম।

পরদিন সকালে হিমানীর মা মারা গেলেন। দিনদুয়েক পরে তার বাবা এসে তাদের নিয়ে চলে গেলেন।

সেবারে ছিল আমাদের প্রবেশিকা পরীক্ষা। দিন কয়েক বই নিয়ে বসা গেল। পরীক্ষার পর মতিলালেরা কলকাতার বাসা তুলে দিয়ে তার বাবার কর্ম্মস্থলে চলে গেল।

মাসকয়েক মতিলালের আর কোনো খবর পাইনি। পরীক্ষায় পাশ ক'রে আমরা কলেজে ঢুকলুম।

মতিলালও পাশ করলে, কিন্তু সে আর কলকাতায় ফিরে এল না। সেবার পুজোর ছুটির মধ্যে একদিন মতিলালের ছোট ভাই যতিলাল আমাদের বাড়ীতে এসে হাজির। যতিলাল বললে—মা, তোমায় একবার ডেকেছেন—আজই যাবে।

খবর নিয়ে জানলুম যে, তারা কলকাতায় মাস খানেকের জন্য একটা বাড়ী ভাড়া ক'রে আছে। এখানে এসেই আমাকে খবর দিয়েছে।

মাঠের আড্ডা তখনও পুরোদমে চলেছে। সেদিন আর মাঠে না গিয়ে মতিলালদের ঠিকানায় গিয়ে হাজির হওয়া গেল। মতিলালের মা তো আমায় দেখেই কাঁদতে আরম্ভ করে দিলেন। তাঁর চোখে জল দেখে আমিও চমকে উঠলুম—তবে কি মতিলাল নেই! তবুও জিজ্ঞাসা করলুম—মতিলাল কোথায়?

মা বললেন—আজ দু-মাস হ'ল সে কোথায় চলে গিয়েছে, সেই থেকে তার আর কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

কথাটা শুনে একেবারে দমে গেলুম। জিজ্ঞাসা করলুম—ঝগড়া-ঝাঁটি কিছু হয়েছিল নাকি?

তিনি বললেন—ঝগড়া হয়নি। সেই হিমানী ছুঁড়িকে তোমার মনে আছে? তাকে নিয়ে সে পালিয়েছে। তারা নিশ্চয় কলকাতাতেই কোনো জায়গায় আছে। তোমরা তাকে খুঁজে বের কর, বাবা। আমার ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে এস, তা না হ'লে আমি বাঁচব না।

মতিলালের মা'র কাছ থেকে যতখানি সংবাদ সংগ্রহ করা গেল তার তাৎপর্য্য হচ্ছে এই যে, হিমানীর মা'র মৃত্যুর বোধ হয় মাস দুয়েক পরেই তার বাবা আর একটি তরুণীর পাণিপীড়ন করেছেন। ইতিমধ্যে হিমানীর সঙ্গে কলকাতায় মতিলালের পত্র-ব্যবহার চলছিল। পরীক্ষা দিয়ে বাড়ীতে যাবার কিছুদিন পরেই একদিন সকালবেলা দেখা গেল যে, মতিলাল ও হিমানী দু-জনেই অন্তর্দ্ধান করেছে।

তখুনি মাঠে গিয়ে সংবাদটা প্রচার করা গেল। তখন ফুটবল খেলা শেষ হ'য়ে গানের আসর বসেছে। মতিলালের কথা শুনে মাঠসুদ্ধ ছেলে চেঁচিয়ে উঠল—জয় মতিলালের জয়!

ঠিক হ'ল পরদিন থেকে তার খোঁজ সুরু হবে।

দিন দশেক আতি-পাতি ক'রে খুঁজে মতিলালকে ঠিক ধরে ফেলা গেল। বেলেঘাটা অঞ্চলে একটা খোলার ঘর নিয়ে সে আর হিমানী বাস করছিল। হিমানীকে আমরা মতিলালের মতন নাম ধরেই ডাকতুম, কিন্তু এবার দেখার পরেই আমরা অকে বৌদি বলে ডাকতে আরম্ভ করলুম। আমার মুখে বৌদি ডাক শুনে প্রথমে সে লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠল। কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যেই সে সঙ্কোচ কাটিয়ে হিমানী এমন ব্যবহার করতে লাগল যেন এই ডাকেই সে চিরদিন অভ্যস্ত।

পরামর্শ সুরু হ'য়ে গেল। অবিশ্যি আমাদের এই পরামর্শ-সভায় হিমানীও এসে বসল। প্রথমেই উঠল গ্রাসাচ্ছদনের কথা। হিমানী ও মতিলালের কাছে যা ছিল তা রেল ও গাড়ীভাড়া তার ওপরে নতুন সংসার পাতা, দুমাসের দু টাকা ক'রে ঘরভাড়া আর খাওয়ায় প্রায় সব নিঃশেষ হ'য়ে এসেছিল। হিমানী হিসাব করে বললে, মাসে দশটা টাকা হ'লে তাদের খাওয়া ও বাড়ী ভাড়া চলে যেতে পারে। আমি আর নির্ম্মল দুজনে এই দশ টাকার ভার নিলুম। কারণ মতিলাল বললে যে, বাড়ীতে ফিরে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। হিমানীকে ফেলে সে কি ক'রে বাড়ী যাবে।

মনে হল সত্যিই তো। হিমানীকে ফেলে মতিলাল কি ক'রে বাড়ী যেতে পারে।

কয়েকদিন পরে মতিলালের মা'র সঙ্গে গিয়ে দেখা করলুম! ছেলেকে দেখবার আসায় তিনি দিন গুণছিলেন। তাঁকে বললুম—আজ কলেজ থেকে বাড়ী ফেরবার সময় পথে মতিলালের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল।

মতিলালের মা যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। তিনি বললেন- -তাকে ধরে নিয়ে আসতে পারলি নে—

বললুম—সে চেষ্টা অনেক করেছিলুম কিন্তু কিছুতেই সে এল না।

—কি বললে সে?

—সে বললে হিমানীকে ফেলে কি ক'রে আমি বাড়ী যাব! আমার সঙ্গে যদি তাকেও তাঁরা স্থান দেন তা হ'লে যেতে পারি।

আমার কথা শুনে তাঁর চোখ দুটো জলে ভরে উঠল। রুদ্ধকণ্ঠে তিনি বললেন—তা কি ক'রে হবে বাবা! তোমরা তো লেখাপড়া শিখেচ—বুদ্ধি বিবেচনাও আছে। গেরস্তর সংসারে হিমানীকে কি ক'রে ঠাঁই দিই—

মতিলালের মা'র পরে আরও অনেকের মা'র মুখেই এ রকম শুনেছি বটে, কিন্তু কেন যে গেরস্তর সংসারে তাদের স্থান হতে পারে না তা কখনও বুঝতে পারিনি, আজও বুঝতে পারি না।

তাঁর কথার কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে বসে রইলুম। কিছুক্ষণ পরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—হতভাগা কোথায় আছে?

বললুম অনেক চেষ্টা ক'রেও তার ঠিকানাটা বার করতে পারলুম না। সে বললে—কলেজে গিয়ে এক সময় তোর সঙ্গে দেখা করব।

—সেই ছুঁড়িটা সঙ্গে আছে তো?

কথাটা শুনে ভারি হাসি পেল। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ঘাড় নেড়ে জানালুম—হ্যাঁ আছে।

—একবার তাকে কোনো রকমে আমার কাছে ধরে নিয়ে আসতে পারিস?

—চেষ্টা ক'রে দেখব—বলে সেদিন তাঁর কাছে বিদায় নেওয়া গেল।

পরদিন বেলেঘাটার সেই প্রাসাদে আবার আমাদের পরামর্শ-সভা বসল। হিমানীকে ফেলে মতিলালের একলা বাড়ীতে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। অনিশ্চিত অদৃষ্টসাগরে তারই মুখ চেয়ে যে ভেলা ভাসিয়েছে, তাকে ফেলে কেমন ক'রে সে ঘরের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে ফিরে যাবে!

একদিন মতিলালের মাকে বলে ফেলা গেল—আচ্ছা, হিমানীকে স্থান দিতে আপনার আপত্তি কি?

কথাটা শুনে তিনি অদ্ভুত এক রকমের দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। সে দৃষ্টির অর্থ—ও তোমরাও বুঝি ঐ দলের?

কিছুক্ষণ পরে তিনি বললেন—হিমানী কি সম্পর্কে আমাদের এখানে থাকবে? সে যদি মতিলালের সঙ্গে না গিয়ে অন্য কারুর সঙ্গে যেত তা হ'লেও নয় কথা ছিল। আমার এখনও একটি ছেলেমেয়েরও বিয়ে হয়নি।

আবার কিছুক্ষণ পরে একটু শ্লেষের সঙ্গে বললেন—হিমানীর নিজের বাড়ীতেই কি তার আর স্থান হবে? তোমরা তো তার শুভার্থী, একবার চেষ্টা ক'রে দেখ না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা এই কথা শুনে হিমানী বললে—আমাকে বাড়ীতে ফিরিয়ে নিলেও আমি যাব না।

মতিলাল বললে—তোরা আর মার কাছে যাস নে।

আমরা মতিলালের মার সঙ্গে দেখা করা বন্ধ করে দিলুম। পুজোর পরে কলেজ খুললে একদিন খোঁজ নিয়ে জানতে পারলুম, তাঁরা কলকাতা থেকে চলে গিয়েছেন।

মতিলাল দিব্যি সংসার করতে লাগল। সে সমস্ত দিন চাকরীর সন্ধানে ঘোরে। সন্ধ্যের সময় মাঠে এসে জোটে। সন্ধ্যের পরে আমি আর নির্ম্মল তার সঙ্গে বেলেঘাটার সেই প্রাসাদে গিয়ে ঘণ্টাখানেক গল্প-গুজব ক'রে ফিরে আসি।

এমনি কিছুদিন যায়। মতিলাল ইতিমধ্যে একটি ছেলে-পড়ানোর কাজ জুটিয়েছিল। মাস-দুয়েক পরে সে কাজটা আবার চলে গেল। পাঁচ টাকা ক'রে দু-মাসের মাইনেতে তাদের জোড়া-

দুয়েক কাপড় হ'ল, তা ছাড়া আমাকে ও নির্ম্মলকে একদিন হিমানী নেমন্তন্ন ক'রে মাংস রেঁধে খাওয়ালে।

বছরখানেক এইভাবে কাটবার পর একদিন বিকেলে মতিলাল বললে—ওহে, বেড়ে একটা মতলব ঠাওরানো গিয়েছে।

মতিলালেরা যে জায়গাটায় থাকত তার চারিদিকে ছিল ব্যবসাদার, আড়তদারদের বাস। এদের কারও কারও সঙ্গে তার খাতিরও জমেছিল। মধ্যে-মধ্যে দু-একজনের খাতা লিখে, ইংরেজীতে চিঠি লিখে সে টাকাটা-সিকিটা উপায়ও করত। মতলব ঠাওরানোর কথা শুনে আমরা মনে করলুম তার মাথায় বুঝি কোনো ব্যবসায়-বুদ্ধি চেপেছে। সে বললে—দেখ আমার অভাবে মা বাবা ভাই বোন সবাই কষ্ট পাচ্ছে, তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু একটি কাজ করলে তাঁরা হিমানীকে সুদ্ধ বাড়ীতে স্থান দিতে কোনো আপত্তি করবেন না। হিমানীরা আমাদের স্বজাত। আমি মতলব করেছি তাকে বিয়ে ক'রে একদিন দুম ক'রে দুজনে বাড়ীতে গিয়ে হাজির হবো। ছেলের বউকে তো আর বাপ মা ফেলে দিতে পারবে না।

ঠিক! মনে হ'ল চাঁদমুখের প্রভাব মতিলালের সাংসারিক-বুদ্ধিকে এখনও ম্লান করতে পারেনি। আমরা তাকে উৎসাহ দিলুম—লাগিয়ে দাও বিয়ে—আমরাও যাব তোমার সঙ্গে।

আমাদের উৎসাহে হিমানী ও মতিলাল দুজনেরই উৎসাহ গেল বেড়ে। অনেক দিন পরে আবার একটা নতুন উত্তেজনা পেয়ে আমরা মেতে উঠলুম। মতিলাল কোথা থেকে পুরোহিত জোগাড় ক'রে আনলে। বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তার শূন্য আসন শাস্ত্রের মন্ত্রে পূর্ণ হয়ে উঠল। টাকাকড়িরও বিশেষ অভাব হ'ল না। নির্ম্মলের ছিল সোনার হাতঘড়ি, আর আমার ছিল সোনার বোতাম ও আংটি। তাছাড়া দু-চারখানা বইও হুকারের দোকানে চলে গেল।

শুভ দিন-ক্ষণে হিমানীর সঙ্গে মতিলালের বিয়ে হ'য়ে গেল। মতিলাল তার বাবাকে চিঠি লিখলে—হিমানী এখন আমার স্ত্রী, আপনার পুত্রবধূ। তাকে গৃহে স্থান দিতে আশা করি আপনাদের কোনো আপত্তি হবে না। আমরা শীগগিরই বাড়ী যাব।

দিন-পনেরো চলে গেল, কিন্তু মতিলালের চিঠির কোনো জবাব এল না। চিঠির জবাব না আসাতে মতিলাল ও হিমানী দুজনেই মুষড়ে পড়তে লাগল। সেই কঠোর দারিদ্র্য বোধ হয় আর তাদের সহ্য হচ্ছিল না।

আরও দিন পনেরো কেটে যাবার পরও যখন তার বাবার কাছ থেকে কোনো উত্তর এল না তখন একদিন মতিলাল বললে —না আসুক জবাব—চল বেরিয়ে তো পড়া যাক, তারপরে যা হবার তাই হবে।

আমরাও রাজি। বেনারস কলেজের সঙ্গে ফুটবলের ম্যাচ আছে ব'লে বাড়ী থেকে তিন দিনের ছুটি নিয়ে একদিন রাত্রে সাড়ে নটার গাড়ীতে মতিলাল ও হিমানীকে নিয়ে ট্রেনে উঠে পড়া গেল।

যখন ট্রেন থেকে ষ্টেশনে নামলুম তখন রাত্রি শেষ হতে বোধহয় ঘণ্টা খানেক দেরী। ভোর হওয়ার পর একখানা গাড়ী ভাড়া ক'রে মতিলালদের বাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করা গেল। শহর, ষ্টেশন থেকে মাইল চার-পাঁচ দূরে। টিকোতে-টিকোতে প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে গাড়ী গিয়ে তাদের বাড়ীর কাছে পৌঁছল। বাড়ীর দরজায় মতিলালের একটি বোন দাঁড়িয়েছিল। সে আমাদের দিকে কিছুক্ষণ অবাক হ'য়ে চেয়ে থেকে ছুটে বাড়ীর ভেতরে চলে গেল।

হিমানীকে নিয়েই ভেতরে যাওয়া হবে কিনা তারই পরামর্শ চলছে, এমন সময় বাড়ীর মধ্যে মতিলালের বাবার চীৎকার শুনতে পাওয়া গেল। আমরা স্থির করলুম আপাততঃ হিমানী গাড়িতেই বসে থাক। ঝড়ের প্রথম ঝাপটাটা কেটে যাবার পর তাকে নিয়ে যাওয়া যাবে।

গাড়ী থেকে নেমে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়া গেল। আগে নির্ম্মল, তার পরে আমি, তার পরে মতিলাল। কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হতে হ'ল না। মতিলালের বাবা হন হন ক'রে বাইরের দিকে

এগিয়ে আসছিলেন। তাঁর পেছনে তার ভাইবোনের দল উৎসাহের আবেগে চঞ্চল হ'য়ে ছুটে আসছে—এই অবস্থায় দুই শোভাযাত্রায় সঙ্ঘর্ষ বাধল। মতিলালের বাবা বললেন—বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে, অমন ছেলের মুখদর্শন করতে চাই না।

ভদ্রলোককে আমরা বোঝাতে লাগলুম, কিন্তু তিনি সে সব কথা কানে না তুলে আমাদেরও গালাগালি দিতে আরম্ভ করলেন! তাঁর এক কথা! হিমানীকে ছেড়ে চলে এস—আমি মেয়ে ঠিক করেছি তাকে বিয়ে কর—তবেই এ বাড়ীতে তোমার স্থান হবে।

মতিলাল একধারে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে রইল। পিতার সহস্র কর্কশ কথার একটি জবাবও সে দিলে না। ভাইবোনেরা একে-একে তাদের বাবার পেছন থেকে এগিয়ে এসে তাকে ঘিরে গোল হ'য়ে দাঁড়াল। সবচেয়ে ছোটটি মতিলালের একটা আঙুল ধরে নাড়তে আরম্ভ করে দিলে।

ঘণ্টাখানেক ধরে অবিশ্রান্ত গালাগালি শোনার পর মতিলাল ধরা-গলায় আমাদের বললে—চল যাই।

আমরা ফিরলুম। তার বাবা চীৎকার ক'রে উঠলেন। —দাঁড়াও—ওকে না ত্যাগ করলে আমার বিষয়ের একটি পয়সাও তোমায় দেব না—মনে থাকে যেন।

কথাটা শুনে মতিলালের ম্লানমুখে একটুখানি হাসি ফুটে উঠল। অপূর্ব্ব সে হাসি। তাঁর কথার কোনো উত্তর না দিয়ে সে আমাদের বললে—চল যাই, হিমানী অনেকক্ষণ একলা বসে আছে।

আমরা ধীরে ধীরে বাইরে এসে একে একে গাড়ীতে উঠে বসলুম। মতিলালের ভাইবোনেরা ভিড় ক'রে বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়াল—তাদের সবার চক্ষুই অশ্রুভারাক্রান্ত। কারও মুখে কোন কথা নেই। হঠাৎ এই নিস্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে দড়াম ক'রে ওপরকার একটা জানলা খুলে গেল। জানলায় বোধ হয় মতিলালের মা এসে দাঁড়ালেন, কিন্তু আমরা কেউ আর গাড়ী থেকে মুখ বাড়ালুম না।

কয়েক মুহূর্ত্ত বাদে হিমানী বলে উঠল—ঠাকুর-পো, ঐ যে দেখছ বাড়ীটা—যেটার দরজায় তালা লাগানো—ঐটে আমাদের বাড়ী।

তারপরেই মতিলালের দিকে ফিরে সে হাসতে-হাসতে বললে—তাড়িয়ে দিলেন তো? তুমিও না যেমন! কোনো বাপ-মা কখনও এ-রকম ছেলেকে ঘরে নিতে পারে! কি বল ভাই, খুশী ঠাকুর-পো?

নির্ম্মল খুব হাসত বলে হিমানী তাকে খুশী ঠাকুরপো বলে ডাকত।

নির্ম্মল বললে—আমি যদি বাপ হতুম তা হলে নিশ্চয় পারতুম।

হিমানী আবার মতিলালের দিকে ফিরে বললে—দেখ, তুমি ও-রকম মুখ ক'রে থাকলে আমার ভারি খারাপ লাগে। আমি কিন্তু এক্ষুণি কেঁদে ফেলব—তখন তোমরা তিনজনে মিলে আমায় থামাতে পারবে না।

হিমানীর দুই চোখ অশ্রুতে ভরে উঠল। মতিলাল গাড়ী থেকে এবার মুখ বাড়িয়ে গাড়োয়ানকে বললে—এই, ষ্টেশন চলো।

গাড়ী চলতে আরম্ভ করতেই মতিলাল হিমানীকে বললে—আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে বলে আমার কোনো দুঃখ হয়নি। আমরা সমস্ত দুঃখকে তো বরণ করেই নিয়েছি হিমানী।

হিমানীর চোখের জল এক নিমেষে অপসারিত হ'য়ে গেল। সে তার চোখ দুটোকে বড় বড় ক'রে বললে —তবে তুমি অমন মুখ ক'রে রয়েছ কেন?

মতিলাল বললে—আমার দুঃখ এই যে, আমাদের জন্য বন্ধুরা মিছিমিছি বাবার কাছে কতকগুলো গালাগালি খেলে।

মতিলালের বাবার গালাগালিতে আমাদের মনের মধ্যে যতটুকু গ্লানি জমা হ'য়ে উঠেছিল, হিমানীর হাসির আঘাতে ষ্টেশনে পৌঁছবার আগেই তা উড়ে গেল। যেমন হাসতে হাসতে আমরা বেরিয়েছিলুম, পরদিন সকালে আবার তেমনি হাসতে হাসতে আমরা তাদের বেলেঘাটায় সেই খোলার বাড়ীর দরজায় গাড়ী থেকে নামলুম।

এই ব্যাপারের দিন দশ-বারো পরে একদিন বিকেলে মতিলালের বাড়ীতে গিয়ে দেখি নির্ম্মল মুখখানি চুণ ক'রে একখানা জলচৌকির ওপরে বসে আছে। এক কোণে হিমানী দাঁড়িয়ে, তার মুখে হাসির রেখা তখনও মিলিয়ে যায় নি, আর মতিলাল গম্ভীর হয়ে খাটের ওপরে বসে।

ঘরে ঢুকেই বুঝতে পারলুম একটা কিছু হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলুম—ব্যাপার কি?

নির্ম্মল হিমানীর দিকে হাত বাড়িয়ে বললে—জিজ্ঞাসা কর ওঁদের—

হিমানীকে জিজ্ঞাসা করলুম—কি হয়েছে বৌদি?

হিমানী বললে—কি আবার হবে!

নির্ম্মল ঝেড়ে-ফুঁড়ে ঠিক হয়ে বসতে বসতে বললে—আমরা এখানে আসি—ওঁদের সেটা ইচ্ছা নয়।

হিমানী বলে উঠল—দেখ খুশী ঠাকুরপো, যা-তা বোলো না বলছি—তা হ'লে এই পাখা পেটা খাবে। আমি তাই বলেছি!

নির্ম্মল গম্ভীরভাবে বললে—তা না তো কি! যা বলেছ তার সরল অর্থ ঐ—

হিমানী এবার আমার দিকে চেয়ে বললে—আচ্ছা ঠাকুরপো তুমিই বল—

আমি বললুম—ব্যাপারটা কি হয়েছে খুলেই বল না ছাই।

মতিলাল এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার সে বললে—আচ্ছা আমিই বলছি।

মতিলালের কথা শুনে নির্ম্মল মুখ তুলে তার দিকে চাইলে। কিন্তু তার চোখ দুটো অশ্রুভারে তখুনি নুয়ে পড়ল। সে অন্যদিকে মুখখানা ফিরিয়ে নিলে।

মতিলাল বললে—আমি আর হিমানী স্থির করেছি যে, তোমাদের কাছ থেকে আর অর্থ-সাহায্য নেব না।

এই অবধি বলে মতিলাল চুপ করলে। আমাদের কারুর মুখ দিয়েই আর কোনো কথা বেরুলো না, মতিলালও চুপ ক'রে রইল। হেমন্তের সন্ধ্যা তার অন্ধকারের সঙ্গে রাশি-রাশি ধোঁয়া নিয়ে ছোট্ট সেই খোলার ঘরখানার ভেতরে এসে জমা হতে লাগল। তারই মধ্যে বসে বসে আমার মনে হতে লাগল, একদিন প্রখর দিবালোকে আমরা যে এই চারটি বন্ধু পরস্পরের কাছাকাছি হয়েছিলুম এই অন্ধকারের মধ্যে বুঝি সেই বন্ধনের গ্রন্থি ছিন্ন হয়ে গেল। অনেকক্ষণ এইভাবে কেটে যাবার পর নির্ম্মল বলে উঠল—বাতিটা জ্বালো বৌদি।

হিমানী বললে—এই যে জ্বালি।

হিমানীর কণ্ঠস্বর ভারী। বেশ বুঝতে পারা গেল অন্ধকারে সে কাঁদছিল।

বাতিটা জ্বালবার পর মতিলাল বললে—এর জন্য তোমরা দুঃখু কোরো না বন্ধু। আমি হিমানীর জন্য ও হিমানী আমার জন্য কতখানি সহ্য করতে পারে তা অভাবে না পড়লে তো বুঝতে পারব না। হিমানীকে পাওয়ার সুখ আমি সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করতে কিছুতেই পারছি না, যতক্ষণ না তাকে পাবার দুঃখটাও ভোগ করছি। এতে তোমার ক্ষুন্ন হয়ো না। তা হ'লে আমরা দু-জনেই মর্ম্মান্তিক দুঃখ পাব।

সেদিন এ সম্বন্ধে আর আমাদের কোন কথা হল না। বাড়ী ফেরবার সময় সমস্ত পথটা মতিলালকে গালাগালি দিতে দিতে ফেরা গেল।

তখন মাসের শেষ, বাড়ী ভাড়া দেবার সময়। আমি আর নির্ম্মল স্থির করলুম যে, চুপি-চুপি তাদের ওখানে গিয়ে বাড়ীওয়ালাকে ঘরভাড়াটা দিয়ে হিমানীর সঙ্গে দেখা না ক'রেই পালিয়ে আসব। ঠিক করা হ'ল যে, দুপুরবেলায় গিয়ে কাজটি সেরে আসতে হবে, কারণ সে সময় মতিলাল বাড়ীতে থাকে না।

দুই বন্ধু দুপুরবেলা মতিলালের বাড়ীতে গিয়ে সোজা একেবারে বাড়ীওয়ালার ঘরে গিয়ে ওঠা গেল। বাড়ীওয়ালা আমাদের প্রস্তাব শুনে হেসে বললে—তাঁরা তো কাল বাড়ীভাড়া চুকিয়ে দিয়ে চলে গেছেন।

মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। বাড়ীওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলুম—কোথায় গেল তারা? কেন গেল তারা?

বাড়ীওয়ালা তার আন্দাজ মত দু-একটা জায়গার নাম করলে। তখুনি দুজনে ছুটলুম সেখানে। বস্তির পর বস্তির আতি-পাতি ক'রে খুঁজে বেড়ালুম, কিন্তু মতিলাল ও হিমানীর কোনো সন্ধানই পেলুম না।

মতিলাল কেন আমাদের ছেড়ে গেল! না হয় সে আমাদের সাহায্য না-ই নিত। এই নির্ব্বান্ধব শহরে আমাদের চেয়ে বন্ধু সে কোথায় পাবে?

পরদিন থেকে আমি আর নির্ম্মল মাঠে যাওয়া বন্ধ রেখে কলকাতা শহরের বস্তিতে বস্তিতে সেই পলাতক বন্ধু আর বান্ধবীর সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। একমাস অবিশ্রান্ত চেষ্টা ক'রেও তাদের কোনো সন্ধান না পেয়ে হতাশ হ'য়ে আবার একদিন সন্ধ্যাবেলায় মাঠে ফিরে এলুম।

মাঠের সেদিনকার অবস্থা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। সেখানে গিয়েই বুঝতে পারলুম একটা বিষাদের ছায়া সেখানকার অনাবিল আনন্দকে ম্লান করে ফেলেছে। ফুটবল খেলা বন্ধ, গানও বন্ধ—বন্ধুরা এককোণে ম্লানমুখে বসে রয়েছে। মাঠের ঠিক মাঝখানেই দেখি একটা বড়গোছের হোগলার ঘর উঠেছে। এখানে সেখানে চারিদিকে লম্বা-লম্বা গর্ত্ত।

সংবাদ পাওয়া গেল যে, যারা জমিটা কিনেছে তারা বাড়ী তুলছে। মাস দুয়েকের মধ্যেই সেখানে বড় বাড়ী তৈরী হবে।

চোখের সামনে প্রতিদিন একখানার পর একখানা ইঁট গেঁথে মিস্ত্রিরা সেখানে দালান তুলতে লাগল। বন্ধু বান্ধবেরা একে একে আসা বন্ধ করতে লাগল—দেখতে দেখতে আমাদের কৈশোরের স্মৃতির ওপরে বিরাট প্রাসাদ তৈরী হ'য়ে গেল।

মাঠের আড্ডা উঠে যাওয়ার পর কিছুদিন আমরা এখানে-সেখানে জমায়েৎ হতে লাগলুম। কিন্তু আড্ডা আর তেমন জমল না। বছরখানেকের মধ্যেই আমরা একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লুম। তারপরে জীবনে কতবার চাঁদ উঠল, কত চাঁদমুখ দেখলুম তার ঠিকানা নেই। অভিজ্ঞ সংসার দেখিয়ে দিলে, চাঁদে রয়েছে কলঙ্ক আর চাঁদমুখ—যাক্ সে কথা আর তুলে কাজ নেই।

মাঠের আড্ডা উঠে যাওয়ার বোধ হয় পনেরো-বিশ বছর পরে নানা ঘাটের জল খেয়ে তখন এক মাসিকপত্রের সম্পাদকীয় বৈঠকে বেশ কায়েমী হ'য়ে বসা গিয়েছে, এই সময় একদিন সন্ধ্যেবেলা সম্পাদক-মশায় একটি নতুন লোককে আড্ডায় নিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন—তোমরা কবি শশিশেখরের এত প্রশংসা কর; ইনিই সেই কবি শশিশেখর।

ভদ্রলোক সভাস্থ সবাইকে নমস্কার ক'রে অতি সঙ্কুচিতভাবে ফরাসের একটি কোণে গিয়ে বসে পড়লেন। কবির চেহারাটি যেমন সচরাচর হ'য়ে থাকে, অর্থাৎ মোটেই কবিজনোচিত নয়। মাথার চুল কদমছাঁট, পরণে একখানা ময়লা ধুতি, অঙ্গে একটা আধময়লা জামা—সেটা না-পাঞ্জাবী, না-সার্ট না-কোট। পায়ের জুতোজোড়া ছেঁড়া, শততালি হ'লেও জুতোর মালিক যে সৌখীন তা জুতোর আকৃতি দেখলেই বুঝতে পারা যায়। মাথার চুল কতকগুলো পেকে গিয়েছে। বেশ বুঝতে পারা যায় যে, দুর্দ্দশায় পেকে গিয়েছে। মুখের চেহারাও তার অঙ্গের জামা-কাপড়েরই সামিল। দাড়িগোঁফ বোধ হয় মাসখানেক আগে কামানো হয়েছিল।

লোকটি খাটে বসে আসরের চারদিকে চেয়ে আমার দিকে একবার দৃষ্টিনিবদ্ধ ক'রে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। তার চোখের ওপরে চোখ পড়তেই আমার মনে হ'ল যেন মুখখানা কোথায় দেখেছি। যতই তার মুখের দিকে চাই, ততই মনে হয় যেন এ মুখ পরিচিত। গৃহ-প্রত্যাগত প্রবাসী ঘরে ফিরে তার বাড়ীর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে যেমন ক'রে তার হারাণ রতন খুঁজে বেড়ায় আমিও তেমনি স্মৃতির ধ্বংসস্তূপে আমার ছেলেবেলাকার বন্ধুদের মুখগুলো খুঁজতে লাগলুম—কে—কে এই কবি শশিশেখর।

আড্ডা ভাঙবার কিছু আগে নবাগত কবি সকলকে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলে। তারপরে গুটি-গুটি আমার কাছে এসে বললে—আমায় চিনতে পারলে না তো?

চীৎকার ক'রে উঠলুম—মতিলাল!

মতিলাল বললে—হ্যাঁ, চিনেছ?

মতিলালকে ধরে বসালুম। কিন্তু সেদিন তার বড্ড তাড়া ছিল ব'লে আর বসতে পারলে না। পরের দিন আসবে বলে চলে গেল।

পরের দিন তার অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত চিত্তে বসে রইলুম, কিন্তু সে এল না। তার পরের দিন আড্ডা ভাঙবার কিছু আগে মতিলাল এসে হাজির।

মতিলালকে কাছে বসালুম। সে ছদ্মনামে কবিতা লেখে। সকালে দৈনিক একখানা বাংলা কাগজে চাকরী করে। মাইনে পঞ্চাশ টাকা, কিন্তু তিনমাস অন্তর একমাসের মাইনে পায়। সন্ধ্যাবেলায় দু-জায়গায় ছেলে পড়ায়, সেখান থেকে ত্রিশ টাকা পায়।

আড্ডা ভেঙে যাবার পর রাস্তায় এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—কোন্ দিকে যাবে?

মতিলাল উত্তর দিকের একটা রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে বললে—এই দিকে।

বললুম—চল, আমিও ঐদিকে যাব।

দু-জনে পাশাপাশি অনেকক্ষণ ধরে নীরবে চলবার পর অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলুম—বৌদি কোথায়?

মতিলাল একটু হেসে বললে—তাকে মনে পড়ে?

আর সামলাতে পারলুম না। বলে ফেললুম—রাস্কেল, ছোটলোক, বর্ব্বর, অকৃতজ্ঞ! মনে পড়ে! আমাদের বন্ধুত্বের যা প্রতিদান তুমি দিয়েছ তাতে তোমাদের কথা আর মনে না রাখাই উচিত—

রাগের ঝোঁকে তাকে আরও অনেক কথা বলে ফেললুম, কিন্তু সে একটি কথারও উত্তর না দিয়ে চুপ করে সমস্ত শুনে গেল। আমার বক্তব্য শেষ হ'য়ে যাওয়ার পর ধরা গলায় মতিলাল জিজ্ঞাসা করলে—নির্ম্মল কোথায়? কেমন আছে সে?

—নির্ম্মল! নির্ম্মল চলে গিয়েছে—সে আজ পাঁচ-ছ বছরের কথা।

মতিলাল আর কোনো প্রশ্ন করলে না। কিছুক্ষণ পরে আবার আমি জিজ্ঞাসা করলুম—বৌদি কোথায়?

মতিলাল বললে—এখানেই আছে, দেখবে তাকে?

—নিশ্চয়, কোথায় কতদূরে, তোমার বাড়ী?

মতিলাল বললে—বাড়ী এখান থেকে অনেক দূরে, সেই বাগবাজারের গঙ্গার ধারে। আজ রাত্রি হয়ে গিয়েছে, কাল সন্ধ্যেবেলায় এসে তোমায় নিয়ে যাব।

সেদিনকার মত বিদায় নেওয়া গেল। পরদিন সন্ধ্যার সময় মতিলাল এসে বললে—চল।

শহরের এক কোণে, বাগবাজারের গঙ্গার ধারে একখানা বাড়ী। পথটা অত্যন্ত সরু। দূরে দূরে গ্যাস জ্বলছে। হেমন্তের শীতল আবহাওয়ায় উনুনের ধোঁয়াগুলো আটকা পড়ে পথের মধ্যে ভিড় ক'রে আছে। বিশ বছর আগে এমনি এক সন্ধ্যায় বেলেঘাটার সেই খোলার ঘরে হিমানীর সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল।

ঘরের মধ্যে আসবাবপত্র কিছুই নেই বললেই হয়। এক কোণে একটি ছোট বিছানা পাতা। সেখানে গলা অবধি চাদর ঢাকা দিয়ে কে শুয়ে রয়েছে। ঘরে ঢুকে মতিলাল বিছানার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে—ওগো, চেয়ে দেখ, কে এসেছে!

বিছানার কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখি সেখানে হিমানী শুয়ে রয়েছে। তপ্তকাঞ্চনের মত রং তার একেবারে কালিবর্ণ, পরিপূর্ণ নিটোল অঙ্গ একেবারে কঙ্কালে পরিণত।

তার সেই মূর্ত্তি দেখে আমি একেবারে শিউরে উঠলুম। একবার সন্দেহও হ'ল—নিশ্চয় এ অন্য আর কেউ।

হিমানী চোখ দুটো তুলে আমার দিকে চাইলে। তারপর আস্তে আস্তে বললে—ঠাকুরপো! তোমাকে যে আর চেনা যায় না।

সেদিন অনেক রাত্রে মতিলালের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ী ফিরলুম। হিমানীর যক্ষ্মা হয়েছে, সে আর বাঁচবে না। মতিলাল বললে যে, তারও মুখ দিয়ে বার কয়েক রক্ত উঠেছিল— হিমানী যে তার আগেই যাচ্ছে এইটেই তার মস্ত সান্ত্বনা।

পরদিন থেকে নিয়ম ক'রে তাদের ওখানে যেতে আরম্ভ করলুম। সকালবেলা আমি যাবার পর মতিলাল বেরোয় খবরের কাগজে চাকরী করতে। বেলা বারোটার সময় সে কাজ সেরে ফিরলে পর আমি বাড়ীতে ফিরি। বিকেলে আমি গেলে সে ছেলে পড়াতে যায়, সন্ধ্যার পর ফেরে। রাত্রি দশটা এগারোটা অবধি সেখানে থেকে আমি বাড়ী ফিরি।

হিমানীকে চিকিৎসা করছিল এক কবিরাজ। ডাক্তার দেখাতে বিস্তর পয়সা খরচ। খবরের কাগজের আপিস থেকে মাসে মাসে মাইনে পাওয়া যায় না। ছেলে পড়িয়ে যা ত্রিশ টাকা পাওয়া যায় তাই তখন তাদের সম্বল। এই দুঃসময়ে মতিলাল আমার কাছে সাহায্য চাইলে, কিন্তু আমারও তখন দেবার কিছুই নেই। একদিন মতিলালকে সাহায্য করতে চেয়েছিলুম, সে তা নেয় নি। আজ সে সাহায্য চায়, কিন্তু তাকে দেবার কিছুই নেই। নির্ম্মল ইহলোকে নেই, আমি আছি, কিন্তু সোনার বোতাম ও আংটি আর নেই।

মাসখানেক এইভাবে কেটে গেল। হিমানী বেশ জানতো সে ধীরে ধীরে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে চলেছে। একদিন সন্ধ্যাবেলায় মতিলাল তখনও বাড়ী ফেরেনি। সমস্ত দিন টিপিটিপি বৃষ্টি পড়ায় শীতটা বেশ জোরে পড়েছে। হিমানী ইদানীং আর নিজে নড়তে চড়তে পারত না, তাকে পাশ ফিরিয়ে দিতে হয়। একখানা শততালি-দেওয়া লেপ তার অঙ্গে ঢাকা দিয়ে ধারগুলো মুড়ে দিচ্ছিলুম এমন সময় ধীরে ধীরে সে বললে—ঠাকুরপো, তোমার হাতে এই সেবাটুকু পাব বলেই বোধ হয় এতদিন বেঁচেছিলুম। আমার ওপরে আর রাগ নেই তো ভাই?

আমি বললুম—রাগ তোমার ওপর কোনো দিনই ছিল না, বৌদি।

আর কোনো কথা বলতে পারলুম না। হিমানী আরও কিছু শোনবার জন্য উৎসুক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে বললুম—তোমার চিকিৎসা না হ'লেও তবুও তো তুমি আমাদের সেবা পেলে—একবার আমাদের কথা ভেবে দেখ,

হিমানী বললে—মরতে আমার বড্ড ভয় করছে ভাই। তোমরা যদি আগে যেতে তা হ'লে আমার কোনো ভয় ছিল না। আমায় সেখানে একলা থাকতে হবে। মা গিয়েছেন বটে, কিন্তু বাবা যখন ক্ষমা করেন-নি তখন মা কি ক্ষমা করবেন?

কিছুক্ষণ পরে সে উৎসাহভরে বলে উঠল—কিন্তু খুশী-ঠাকুরপো আছে না সেখানে! ও, তবে কোনো ভাবনা নেই। সে ভারী অভিমানী—তা হোক, কই তুমি তো অভিমান করে থাকতে পারনি।

পৌষের মাঝামাঝি একদিন সকালবেলা হিমানী বললে—ঠাকুরপো, আজ ভাই বিদায়ের দিন। আজ আর আমার জ্বালা-যন্ত্রণা কিছু নেই। মনে হচ্ছে আজই দিনশেষের সঙ্গে সঙ্গে—

হিমানী হাসিমুখে কথাটা আরম্ভ করেছিল, কিন্তু শেষ করবার আগেই তার দুই চোখ দিয়ে দু-ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তার হাত দু-খানা আমার হাতের মধ্যে নিয়ে দেখলুম বরফের মতন ঠাণ্ডা। নাড়ী—একেবারে শেষ অবস্থা!

তার জন্য কয়েকদিন থেকে একটা ঝি রাখা হয়েছিল। তার তদ্বিরে হিমানীকে রেখে আমি ছুটলুম মতিলালের সেই খবরের কাগজের আপিসে।

সেখানে গিয়ে দেখি মতিলাল একটা চেয়ারে উবু হ'য়ে বসে বন্ বন্ ক'রে কি লিখে চলেছে। দুপাশে দুজন কম্পোজিটার দাঁড়িয়ে আছে। একখানা কাগজ শেষ হতেই একজন সেটা তার হাত

থেকে একরকম টেনে নিয়ে চলে গেল। সেই ফুরসতে একবার মুখ তুলে আমাকে দেখে সে বললে—কি খবর?

বললুম—বৌদির অবস্থা খুব খারাপ বলে মনে হচ্ছে। শীগ্‌গীর চল, তোমাকে ডাকতে এসেছি।

মতিলাল ততক্ষণে আর একখানা কাগজ টেনে লিখতে সুরু করে' দিলে। তার কাণ্ড দেখে বললুম—কি, কথার জবাব দিচ্ছ না যে বড়?

মতিলাল হেসে লিখতে লিখতেই বলতে লাগল—ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর মস্ত একটা ভুল ধরে ফেলা গেছে—তারই একটা জবাব আর জেনারেল ফ্রেঞ্চের সমরনৈতিক চালের আর একটা মারাত্মক রকমের ত্রুটি—তার ওপরে খানিকটা মন্তব্য লিখতেই হবে—মনিবের হুকুম। আজকে কিছু পাবার আশা আছে, লেখাগুলো যদি শেষ না ক'রে যাই তা হ'লে সে গুড়েও বালি পড়বে। তুমি বরং হিমানীর কাছে গিয়ে বসো—আমি আসছি।

তখুনি আবার ছুটলুম হিমানীর কাছে। আমায় দেখে সে জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় গিয়েছিলে?

বললুম—এইখানেই গিয়েছিলুম একটু—

এদিকে বারোটা বেজে গেল তবুও মতিলালের দেখা নেই। আমি ব্যস্ত হচ্ছি দেখে হিমানী বললে—সে ঠিক আসবে—আমারই একটু কাজে গেছে।

আরও কিছুক্ষণ কাটবার পর হিমানী হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—ঠাকুরপো তুমি বাড়ী থেকে চট করে ঘুরে এস। যাও, আজকে আর অবাধ্য হয়ো না।

সেখান থেকে বেরিয়ে মতিলালের আপিসের দিকে ছুটলুম। সেখানে গিয়ে দেখি মতিলাল নেই। ঘণ্টাখানেক আগে সেখান থেকে বেরিয়ে গেছে।

নিজের বাসাতে এসে খেয়ে দেয়ে যখন তাদের সেখানে গিয়ে পৌঁছলুম তখন তিনটে বেজে গিয়েছে। গিয়ে দেখি হিমানীকে একখানা লাল চওড়া পাড়ের শাড়ী পরানো হয়েছে, তার মাথায় একরাশ সিঁদুর, পায়ে আলতা, পা থেকে গলা অবধি ফুলে ঢাকা।

খাটের কাছে গিয়ে দেখি হিমানীর একখানা হাত মতিলালের হাতে, দুটি চোখ স্থিরভাবে মতিলালের দিকে চেয়ে আছে, আর তার দুই গাল বয়ে অবিরল অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

আমাকে দেখে মতিলাল বললে—এই বোধহয় মিনিট পাঁচেক হ'ল কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছে।

সেদিন দিনের আলো নিভে যাবার সঙ্গে সঙ্গে হিমানীর অঙ্গ হিম হয়ে গেল।

হিমানী মারা যাবার পরের দিন থেকে মতিলাল খবরের কাগজের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সারাদিন বসে বসে কবিতা লিখতে আরম্ভ ক'রে দিলে। মাসকয়েকের মধ্যে সে মোটা-মোটা খানকয়েক খাতা কবিতায় ভরিয়ে ফেললে। আমি সেগুলোকে মাসিকপত্রে ছাপাতে চাইলে সে বলত—না না থাক, ওগুলো অন্য দরকারে লাগবে।

শ্রাবণ মাস নাগাদ, অর্থাৎ হিমানী মারা যাবার মাস ছয়েক পরে একদিন রক্ত বমি করে মতিলাল বিছানায় এলিয়ে পড়ল। তার অবস্থা দেখে তক্ষুনি ডাক্তার ডাকা হল। ডাক্তার দিনকয়েক দেখে বললেন—ওষুধে কিছু হবে না, বিদেশে নিয়ে গিয়ে দেখতে পারেন।

আমাদের একটি বন্ধুর সাঁওতাল পরগণার এক স্বাস্থ্যকর জায়গায় ছোট্ট একখানা বাড়ী ছিল। তাকে বলে-কয়ে মতিলালের জন্য বাড়ীখানা জোগাড় করা গেল। কিন্তু শুধু বাড়ী হলেই তো চলবে না, অর্থও কিছু চাই।

মতিলাল বললে—আমার ঐ কবিতাগুলো যদি বিক্রি করতে পার তা হ'লে কিছু আসতে পারে।

কবিতার খাতা ক'খানা বগলে নিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল। কিন্তু কবিতার বই বিক্রি করতে এসেছি শুনে বইওয়ালারা তো হেসেই আকুল। সাতদিন প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে একজন বইগুলো নিয়ে দয়া করে একশটি টাকা দিলে। এ ব্যক্তি বইয়ের কারবার করার আগে সাহিত্যচর্চা করত।

মতিলালকে গিয়ে যখন সংবাদটা দিলুম, তখন সে বললে—কেমন বলেছিলুম কিনা, ওগুলো সময়ে ভারি কাজ দেবে।

বললুম—আরও শতখানেক টাকা চাই যে—

মতিলাল বললে—ঐতেই হবে—আর লাগবে না!

মতিলালকে নিয়ে যাওয়া গেল। সে স্থানটি জনবিরল। পুজো ও শীতের সময় দু-চার জন লোক আসে, অন্য সব সময়ে প্রায় সমস্ত বাড়ীতেই তালা লাগানো থাকে। সে সময়টা সেখানে বর্ষা নেমেছিল। বিকেলে রোজ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে চমৎকার আলো হতো। মতিলাল সেখানে দিনপাঁচেক বেশ রইল। ছ-দিনের দিন থেকে তার রক্তবমি সুরু হ'ল। দিনদুয়েক অনবরত বমি করে সে একেবারে অবশ হ'য়ে পড়ল।

তারপর দিন দুয়েক প্রায় নির্ব্বাক অবস্থায় কাটিয়ে একদিন সকালে সে কথা বলতে আরম্ভ করলে। ইদানীং সে বেশী কথা বলতো না। কিন্তু সেদিন তার কথার পরিমাণ অস্বাভাবিক হ'য়ে উঠল। আমি শঙ্কিত হ'য়ে উঠলুম, কারণ হিমানী যেদিন মারা যায় সেদিন সে-ও ঐ রকম কথা বলতে আরম্ভ করেছিল।

বিকেলের দিকে সেদিন আর বৃষ্টি নামল না। মতিলাল বললে—আমায় বারান্দায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিতে পার?

বাড়ীতে একটা মালী ছিল। তাকে ডেকে খাটসমেত মতিলালকে বারান্দায় নিয়ে যাওয়া হল।

বাড়ীর কিছু দূরেই ছিল এক শালবন। তারই মাথায় প্রকাণ্ড একখণ্ড কাল মেঘ এসে দাঁড়াল, আব তারই মধ্যে।বজলীর ছিনিমিনি খেলা চলতে লাগল। মতিলাল আমার সঙ্গে কোনো কথা না বলে একদৃষ্টে সেই দিকে চেয়ে রইল।

সন্ধ্যার একটু পরেই মুষলধারে বৃষ্টি সুরু হ'ল। মতিলালকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে দরজা জানলাগুলো বন্ধ ক'বে দিলুম। দেখতে দেখতে প্রলয়ের নাচন সুরু হয়ে গেল। বাইরে আকাশ তার সম্পত্তি নিঃশেষ ক'রে দিতে চায়, আব ঘরের মধ্যে মতিলালের মহাপ্রাণ সেই জীর্ণ পিঞ্জর ভেঙে বেরিয়ে আসতে চায়। ঘরে ও বাইরে সেই মহাপ্রলয়ের মধ্যে আমি একা হাঁপিয়ে উঠতে লাগলুম।

রাত্রি তখন প্রায় চারটে। বাইরে বৃষ্টি থেমে গিয়েছে, এমন সময় মতিলাল হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—বেশ কাটানো গেল পৃথিবীতে—কি বল ভাই?

এবার অশ্রুসংবরণ করা দুরূহ হ'ল। বললুম—তোমার মতন দুঃখ—

মতিলাল আমার কথা থামিয়ে দিয়ে বললে—না না দুঃখ আমি কিছুই পাইনি রে—আমাকে দুঃখ দেবার চেষ্টা সংসার কবেছে বটে, কিন্তু তাতে আমার সুখের মাত্রা বেড়েই উঠেছে—

মতিলালের কণ্ঠস্বর মিলিয়ে এল। আমি ঝুঁকে পড়ে তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে যেতেই একটুখানি হাসিতে তার মুমূর্ষু মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেই হাসি আর একবার তার মুখে দেখেছিলুম—যেদিন তার বাবা তাকে বিষয় থেকে বঞ্চিত করবার ভয় দেখিয়ে হিমানীকে ছেড়ে বাড়ীতে ফিরে আসবার কথা বলেছিলেন। তখনও বুঝতে পারিনি যে, সেই হাসিটুকুর অবকাশে তার প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছে। চীৎকার ক'রে ডাকলুম—মতিলাল—

বাইরে একটা ভোরের পাখী জবাব দিলে—পি-উ-উ।

তাড়াতাড়ি জানলাটা খুলে দিয়ে দেখি, মতিলালের মুমূর্ষু মুখের শেষ হাসিটুকুর মতন একটুখানি আলোর রেখা পূব-গগনে ফুটে উঠেছে।

বৈশাখ ১৩৩৫



পৌষপার্ব্বণ

শান্তা দেবী

(১)

সন্ধ্যা তখন হয়ে এসেছে। রাঙা সূর্য্যের উগ্র মূর্ত্তি আর নেই। তিনি তখন পশ্চিম আকাশের শেষ প্রান্তে সিঁদুরের ফোঁটার মত স্নিগ্ধ শোভা ছড়াচ্ছেন। ঢেঁক্‌শালে বসে বসে দত্তদের বিধবা বৌ সুরমা চাল ঝাড়তে ব্যস্ত। পাড়ার দুটি চাষীদের মেয়ে ঢেঁকিতে পাহার দিচ্ছে। তাদের সংস্পর্শে উৎফুল্ল হয়ে ঢেঁকি ঢকর-ঢক্ করে নেচেই চলেছে। সুরমা কুলোখানা নামিয়ে মাঝে-মাঝে এক-একবার পশ্চিমের মাঠের পারের ধূলায় ধূসর রাস্তাটার দিকে যখন চেয়ে দেখছিল, তখন চাষীদের মেয়ে ফেলী প্রায়ই একটু নরম সুরে বলে উঠ্‌ছিল, "আহা বৌঠান, অত উতলা হও কেন? গোপাল দাদা এই এল বলে।"

বই বগলে একটি শ্যামবর্ণ রোগা পাতলা ছেলে এসে দাঁড়াল। মাথায় তার একরাশ চুল, চোখ দুটি বড় বড়, হরিণ-শিশুর মত কেমন যেন অসহায় দৃষ্টি। ছেলেটি লম্বায় নেহাৎ কমসম নয়, কিন্তু মুখখানি তার মায়ের কোলের কচি ছেলের মতই ঢলঢলে। এই কিশোর বালকটিকে দেখলে তার অতখানি দৈর্ঘ্য সত্ত্বেও বোধ হয় মেয়েরা একটু আদর করে গাল না টিপে থাকতে পারে না।

সুরমা চোখ তুলবার আগেই গোপাল বইগুলো ঝুপ করে একটা চালের ধামার মধ্যে ফেলে দিয়ে তার আঁচল ধরে টানাটানি বাধিয়ে দিলে। চাবির গোছা এক নিমেষে আঁচল ছেড়ে গোপালের হাতে এসে হাজির। তারপর গোপালের সে কি নাচ! সুরমা হাত বাড়িয়ে যত বলে, "আরে চাবি নিয়ে কোথা যাস? শীগ্‌গির দে, কোথায় হারিয়ে ফেলবি, তারপর আমি বাড়িসুদ্ধ খুঁজে বেড়াব।" গোপাল তত লাফিয়ে লাফিয়ে দূরে যায় আর বলে, "দেব না, কি মজা; হাতে পেয়েছি আর ছাড়ছি না; বল আগে চার আনা পয়সা দেবে, নয়ত এই দৌড় দিচ্ছি একেবারে তালপুকুরের পাড়ে।" বলতে না বলতে গোপাল দৌড়তে সুরু করল। বৌ অগত্যা হাতের কাজ ফেলে, "এই বাঁদর ছেলে থাম বলছি; লক্ষ্মীটি ভাই গোপাল অমন করে না" ইত্যাদি নানা কথা বলে বালকের পিছনে ছুটল। ঢেঁক্‌শালের সামনের নিকোনো তকতকে মস্ত উঠোনটা পার হতেই বাইরে দরজার পাশ থেকে গ্রামের ডাক হরকরা ডেকে বল্লে, "বৌমার চিঠি আছে একখানা।" বৌমা এলো চুলের উপর ঘোমটা টেনে দিয়ে কপাটের আড়াল থেকে হাতখানা বের করে চিঠিখানা নিয়ে উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। "ও ভাই বৌঠান, তোমার নামে চিঠি! কে লিখেছে, বল না ভাই। খুলে, দেখি আমি।" গোপালের আর তর সয় না। না জানি কি একটা নূতন খবর আছে! সেটা না জেনে চিঠিখানা হাতে করে অপেক্ষা করা কি কম কথা! গোপাল সে পারবে না, এখুনি তার সব জানা চাই। বৌঠান ঘরে গিয়ে তবে চিঠি খুলবে, তার পর পড়বে; তারপর গোপালের হাতে দিতেও পারে, নাও দিতে পারে।

বৌঠানের কিন্তু অত তাড়া দেখা গেল না। তার মুখখানা চিঠির নামেই কেমন যেন শুকিয়ে এল। কথার কোনো জবাব না দিয়ে কেবল হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা সে চেয়ে নিলে। গোপাল বৌঠানের নীরব মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর অমন মুখ দেখে মুহূর্ত্তের মধ্যে শান্ত হয়ে গেল। বৌঠানের মুখের সব ভাবই তার চেনা। সে মুখে কি একটা অমঙ্গলের ছায়া দেখে দুরন্ত ছেলেটির ঢলঢলে স্নিগ্ধ চোখদুটিও ব্যাকুল হয়ে উঠল। সুরমার সকল ব্যথাই যে তার মনে ব্যথার সঞ্চার করে, একথা সে নিজে হয়ত কোনো দিনই স্পষ্ট করে অনুভব করে নি; কিন্তু সেই ব্যথার গোপনস্পর্শে তার আনন্দ-উচ্ছ্বাস আপনি থেমে যেত, তার কচি মুখখানির উপরও বিষাদের ছায়া এসে পড়ত।

ঘরে গিয়ে গোপাল বল্লে, "কি ভাই বৌঠান, চিঠিতে বুঝি কিছু মজার কথা নেই?" বৌঠান বল্লে "না।" তখনি একবার "ওঃ" বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে কখন যে আবার সে ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে তা সে নিজেও টের পায়নি সুরমাও পায়নি।

"বৌঠান চিঠি কে লিখেছে?" শুনেই সুরমা এক টানে বলে গেল, "আমার বাপের বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে, আমায় একবার সেখানে যেতে হবে।"

গোপাল কেমন একটু চমকে উঠে আগ্রহ-ভরে বল্লে, "আর আমাকে?"

"তোমাকে না ভাই, তুমি এখানেই থাকবে।"

কচি মুখখানি আঁধার করে গাল ফুলিয়ে সে বললে, "একলাটি? তুমি আর আসবে না বুঝি?"

কথা বলতে গোপালের গলার স্বর ভারী হয়েছিল কি না কে জানে; সুরমার কানে কিন্তু গলাটা কেমন ভার-ভার ঠেক্‌ল। মনে হ'ল চোখের জলে তার কচি গলা একটু যেন মোটা হয়ে আসছে। তাই গোপালের আগেই তার বৌঠানের চোখ ছলছল করে উঠল। কিন্তু গোপাল দেখলে ভাববে কি? হেসে কথা কইতেই হবে। সুরমা বল্লে, "ওমা আসব না কেন ভাই? চট্ করে ফিরে আসব। তোমার কিনা ভাই পড়াশুনো, তাই তোমায় রেখে যেতে হ'ল। নইলে ভাইটিকে ছেড়ে কি আমি থাকতে পারি।"

গোপাল অত আদর সোহাগের কথা পছন্দ করে না। সে এখন বড় হয়েছে, বৌঠানের ও-সব ছেলেভুলোনো কথা শুনলেই তার লজ্জা করে। ম্লান মুখে একরাশ হাসি ফুটিয়ে সহজে তার নরম মুখখানি বৌঠানের মুখের দিকে তুলে গোপাল খুব একটা লম্বা টান দিয়ে বললে, "আরে ভারি ত! আচ্ছা যাও না, কি আর হয়েছে? আমি বুঝি একলা থাকতে পারি না ভেবেছ? চাল ডাল সব রেখে যেও, ফেলীকে বোলো বাসন মেজে রোজ একবারটি উনুনটি ধরিয়ে দিতে, বাস্! দিব্বি থাকব। হ্যাঁ, আর একটা টাকা দিয়ে যেও; আমি শশীপুরের মেলায় যাব। বুঝলে? উনুনটা কিন্তু ভাই আমি ধরাতে পারি না, সেটা বলে যেও।"

গোপাল আপন মনে নিজের ভবিষ্যৎ ঘরকন্নার আনন্দের ব্যাখ্যা করতে করতে বেরিয়ে চলে গেল। সুরমার কিন্তু কথাগুলো মনের মত হ'ল না। গোপাল কান্নাকাটি গোলমাল কিছু না করলেই ভাল, নইলে রেখে যাওয়া শক্ত হবে। কিন্তু তবু কেন জানি না, তার হৃদয়ের ভালবাসা একটু কান্নাকাটির পথ চেয়েই বসে ছিল। বৌঠান গোপালকে ছেড়ে চলে যাবে, আর গোপাল কিনা ওই দুটো কথা কয়েই অভিমানের পালা শেষ করে আনন্দের গান শুরু করে দিলে। সুরমার মন চাইছিল গোপাল চুপচাপ থাকে, কিন্তু তার মনের মন আড়াল থেকে চাইছিল গোপালের কান্না। কেন সে এমন করে নিরাশ করে দিয়ে গেল? ভাল থাক ভালই, চলে যাবার পর আনন্দ করুক, কিন্তু যাবার কথা শুনে যদি দু-ফোঁটা চোখের জল পড়ত! সুরমার মন আপনা থেকেই সিদ্ধান্ত করে বসল—আমার মন খারাপ হবে বলে ও অমন ছল করে চলে গেল। মনে ওর খুবই লেগেছে, নইলে কথাটা শুনেই চমকে উঠবে কেন? বেরিয়ে যাবার সময় কেমন যেন চট্ করে ছুটে চলে গেল; চোখে বোধ হয় জল আসছিল।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার সময় গোপাল কোনো কথাই কইলে না। সুরমা আঁচল আড়াল দিয়ে প্রদীপটা নিয়ে রান্নাঘরের দাওয়া থেকে শোবার ঘরে গিয়ে উঠল। পিতলের মাজা পিলশুজের উপর প্রদীপটা রেখে সুরমা যখন বিছানা ঝাড়তে ব্যস্ত ততক্ষণে গোপাল এসে হাজির। ম্লান আলোর রেখা জলচৌকির উপর সাজানো ঘরের বাসনগুলির গায়ে পড়ে চিক্‌চিক্ করছিল, গোপাল তারি আশেপাশে খানিক ঘুরে হঠাৎ আঙুল দিয়ে সুরমার চুলের একটা গোছা জড়াতে শুরু করে দিলে।

সুরমা বল্লে, "আঃ করিস কি, লাগে না?"

গোপাল তার উত্তরে একেবারে বলে বসল, "বৌঠান ভাই, পিঠে পার্ব্বণ করবে? তখন তুমি আসবে ত? নইলে আমায় পিঠে করে দেবে কে?

ছোট দেওরটির ওইটুকু টানের কথাতেই সুরমার স্নেহভিক্ষু মন নরম হয়ে এল। এ ত পিঠে খাবার ভিক্ষে নয়, এ বৌঠানকে পাবার জন্য ব্যাকুল ক্রন্দন। সে তাড়াতাড়ি বললে, "হ্যাঁ ভাই, নিশ্চয় আসব। কত কত পিঠে করে তোমায় খাওয়াব। সেখানে বসে থাকলে আমার অত পিঠে খাবে কে? বাবা মা বুড়ো মানুষ, তোমার সিকির সিকিও খেতে পারবেন না।" দেওর বৌঠানের কথায় বেজায় খুসী, হ্যাঁ, বৌঠান আমায় চিনেছে বটে!

পাশাপাশি দুখানা তক্তাপোষে শুয়ে সে রাত্রে দুজনের কত না গল্প! সুরমা একরকম শ্রোতাই ছিল, বক্তা গোপাল। সুরমার মনটা বাপের বাড়ীর দুঃসংবাদ পেয়ে কেমন খারাপ হয়ে গিয়েছিল; মনের ব্যথা মনে চেপে বেশী কথা কইতে সে পারে না। কিন্তু আদরের দেওরটির আনন্দকল্লোল পাছে তার মৌনতার কঠিনস্পর্শে থেমে যায় তাই প্রদীপের আলোর দিকে পিছন ফিরে সে দু-চারটে কথা বলে কথার ধারাটা বজায় রাখছিল। সে কত সাত রাজ্যের সাত'শ রকম কথা! কবে কোথায় মেলায় অন্ধ ভিখারী একলা মেলার বাইরে বসে আপন মনে গান গাইত, তার করুণ মুখের সেই বিষাদমাখা দুঃখ-গাথার কথা, আবার কোথায় বিজয়ার দিনের ঘটার বাইচ করার কথা; কখনও বা শীতের সন্ধ্যায় দোলাই গায়ে আগুনের পাশে বসে গরম গরম মুড়ি-ফুলুরি খাওয়ার কথা ওঠে, কখনও বা গুরুমশায়ের হাতে পাঠশালার ছেলেদের অনন্ত দুর্দ্দশার কথা ওঠে। কত সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার স্মৃতিজড়িত সে সব গল্প। কোন কথার মধ্যে গোপাল হঠাৎ বলে বসল, "জানো বৌঠান, আজ সন্ধ্যায় কেন এত দেরী করে বাড়ী এলাম? যদু-ময়রা গুরুমশায়কে খবর দিলে পাড়ায় নাকি একটা আড়কাঠি এসেছে। সে কিরকম কাঠি ভাই, আমি ত কখনও দেখিনি! বল্লে, গোয়ালাপাড়ার পাশের সেই নীলকুঠির লাল ইঁটের ঘরখানার কাছেই নাকি দেখা যাবে। আমরা সবাই ত দে দৌড়। ছুটে আমার সঙ্গে কে পারে বল? কিন্তু গিয়ে দেখি রাজ্যের খড়কুটো পাতাকাঠি জড়ো করে দিব্যি আগুন জ্বেলে একটা মস্ত মোটা লোক জোড়া চাদর গায়ে দিয়ে হাত দুখানা বাড়িয়ে পা মেলে খুব আরামে বসে আছে। সবাই বল্লে কিনা, ওই লোকটাই আড়কাঠি। আমাকে বোকা পেয়েছে কিনা, কিছু না পেয়ে যা তা বুঝিয়ে দিলে। আমি বাবা, তেমন ছেলেই নয়; সোজা গিয়ে বলে এলুম, 'মশায়, আপনাকে এরা কাঠি না কুটো কি বলছে শুনছেন?' সে শুনে হেসেই অস্থির। হাসির চোটে তাঁর প্রকাণ্ড ভুঁড়িটা দুলে দুলে উঠছিল। ওরে বাস্‌রে, তার সে চেহারা নয় ত, যেন ঢাকাই জালা।"

বৌঠান মৃদু গলায় সংক্ষেপে উত্তর দিলে, "তাই নাকি?"

ভোরে কাক কোকিলও ডাকেনি, এমন সময় সুরমা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছে। গোপাল তখন দুই হাতে বালিশটা আঁকড়ে হাঁটু দুটো বুকের কাছে এনে লেপের তলায় কুণ্ডলী পাকিয়ে অগাধ নিদ্রায় মগ্ন। শীতে জড়সড় ঘুমন্ত ছেলেটির মুখে ঘুমের মধ্যেই হাসি ফুটে উঠেছে। বোধ হয় ঢাকাই জালার দোলায়মান দেহের তরঙ্গ স্বপ্নে তাকে তখনও হাসি জোগাচ্ছিল। ডালিমফুলের নক্‌সা করা একখানা পোষাকী-বালাপোষ আলনায় ঝুলছিল; সুরমা গোপালের গায়ে সেইখানা চাপা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। খিড়কির পুকুর-পাড়ে অত ভোরেই পল্লীবধূদের দু-চারজনের দেখা মেলে। চোখ রগড়াতে রগড়াতে দত্তদের ওবাড়ীর বড় মেয়ে এসে উপস্থিত। বৌকে দেখে একটু হেসে বল্লেন, "কি বৌ, বড় ভোর ভোর যে! গোপাল ভাল তো?"

সে বল্লে, "হ্যাঁ দিদি, গোপাল ভালই। আমার বাপের বড় অসুখ, যেমন-তেমন নয়, বসন্ত। মন বড় খারাপ, আজ দুপুরে বেরিয়ে রাতের গাড়ী ধরতে হবে।"

ঠাকুরঝি বল্লেন, "আহা বড় ভাল লোক ঘোষ মশাই। মা শেতলা ভালয় ভালয় রেখে গেলেই ভাল।"

বৌ একটু আমতা আমতা করে হঠাৎ বল্লে, "ঠাকুরঝি, তোমার বাড়ীই যাব ভেবেছিলাম। গোপালকে তো সেখানে নিয়ে যাবার নয়। তুমি যদি তাকে এ কদিন রাখ তবেই...।"

দিদির মন ছিল ভাল; বল্লেন, "ওমা, তা রাখব বৈকি। ভাইটিকে দু-দিন কাছে তো বড়বোনে রেখেই থাকে।"

সুরমা চুপিচুপি এইবার আসল কথাটি পাড়লে, "জানই তো ঠাকুরঝি, ভাইটি তোমার আমায় দুদণ্ড চোখের আড়াল করে না, ভুলিয়ে রাখবার জন্যে বলেছি পিঠেপার্ব্বণের আগেই আসব। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, সে হবার নয়। তাই বলছিলুম কি, তোমার ভাই, পর নয়—তুমি ত দেখবেই, তবে কিনা একটু চোখে চোখে রেখ; বড় অভিমানী, পার্ব্বণের দিন হয়ত কান্নাকাটি করবে। তা' তোমায় অবিশ্যি বলতে হবে না, আমার চেয়ে তোমার টান কম ত আর না—রক্তের টান। তবে একবার বল্লাম।"

ঠাকুরঝি বল্লেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখব শুনব, পিঠে করে দেবো। তোমার কোনো চিন্তা নেই বৌ।"

বেলা বারটায় একখানা গরুরগাড়ী দরজায় এসে দাঁড়াল। গোপাল তখন বাক্স খুলে শশীপুরের মেলার জন্য পোষাক গোছাতে ব্যস্ত। ভাইফোঁটার পাওনা জরিপেড়ে কাপড়খানা দুহাতে ঘসে ইস্ত্রি করা চলছে। একটা সবুজ ডোরাকাটা টিনের ছোট বাক্স, একটা বড় ধামা, তার উপর লাল গামছার চার কোণে বাঁধা চারটে ছোট পুঁটলি গাড়ীর মধ্যে তোলা হ'ল। তারপর নীল একখানা পুরানো শাল গায়ে দিয়ে ভিতরের ঘরের গায়ে চাবি দিয়ে সুরমা গাড়ীর দিকে এগিয়ে এসে গোপালকে দেখে বল্লে, "গোপাল আমার যে সময় হয়েছে।" গোপাল ঠোঁটটা একটু ফুলিয়ে বড় বড় চোখদুটি তুলে একবার বৌঠানের মুখের দিকে তাকালে, হাত দুখানা তখনও তার বাক্সের মধ্যে। বৌঠান তার নরম গালদুটি টিপে কপালের উপর একবার নিজের মুখটা ঠেকালে। প্রণাম করতেও গোপালের তখন সময় নেই। সে আব— বাক্সের মধ্যে মুখটা ঢুকিয়ে দিলে। গাড়ীর ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে গোপাল আবার —ার মুখ তুলে চেয়ে দেখলে বৌঠান গাড়ীর ছই-এর পিছনের চটের পর্দ্দাটা তুলে গোপালের দিকেই চেয়ে আছে।

সারা পথ সুরমার মন কেবল গোপালের জন্যেই আকুলিবিকুলি করছিল। বাবার কথা যে তার মনে পড়েনি, তা নয়; তবে যে-বন্ধন শৈশবে সমাজ নিষ্ঠুর হাতে ছিঁড়ে কচি মেয়েটির মন রক্তে রাঙা করে দিয়েছিল, আজ সেই ক্ষত পূর্ণ করে সেখানে নূতন বন্ধনের সৃষ্টি হয়েছে। যতবার সে আজ বৃদ্ধ পিতার মুখ মনে করতে চাইছিল, ততবারই সেখানে জেগে উঠছিল কোঁকড়া কালো চুলে ঘেরা একটি কিশোর মুখের শ্যাম শোভা। বাড়ীর পেছনে বাঁকা বাঁশের মাচার উপর যেখানে লাউগাছ সহস্র ফণা তুলে ঊর্দ্ধমুখী হয়ে পড়ে আছে, পথের মোড় ফেরবার সময় পর্য্যন্ত সেইখানটি দেখা যায়। সুরমা যতক্ষণ দৃষ্টি চলে সেই দিকে চোখ মেলে বসেছিল। কেবলি মনে হচ্ছিল, এইবার গোপাল একবার বেরিয়ে আসবে, মাচার পাশ থেকে হয়ত দুষ্টুমি করে হাত দুলিয়ে দুলিয়ে তাকে ডাকবে। কিন্তু সে ত এল না। তবে বুঝি ঘরের মেঝেয় পড়ে কাঁদছে। সুরমার ইচ্ছা করছিল ছুটে গিয়ে একবার সহস্র চুম্বনে গোপালের চোখের জল মুছে দিয়ে আসে। কিন্তু গোপাল তখন শশীপুরের মেলার চিন্তায় বিভোর। আর বৌঠান ভাবছে, আসবার সময় গোপাল কথা কইলে না, প্রণাম করলে না, বুঝি কথা কইতে গেলে চোখের জল ঝরে পড়ত। সুরমার মনে সেই বড় বড় চোখের অসহায় দৃষ্টি ঘুরে ফিরে কত কান্নার নালিশ জানিয়ে যাচ্ছিল সেই যে বাক্সর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ঠোঁট ফুলিয়ে মুখখানা উঁচু করে গোপাল শুধু একবার চেয়েছিল, তারি নীরব অভিযোগ মনে করে সুরমারই চোখ ছলছল করে উঠছিল।

সোনার অঙ্গ ধূলায় পেতে সরগুঁজার ক্ষেত হাসিমুখে মাঠের মাঝখানে পড়ে আছে। সুরমার গাড়ী তারি পাশ দিয়ে ঝড়াং ঝড়াং করে হেলতে দুলতে চলেছে। আজ তার মনে পড়ছে, অনেক দিন আগেকার আর এক পৌষের কথা। বিয়েরও আগে এমনি সোনার ক্ষেতের ভিতর দিয়ে দশবছর বয়সের সময় মাসতুতো বোনের শ্বশুরবাড়ী দেখতে দিদির সঙ্গে সে এই গাঁয়েই এসেছিল। দিদি একদিন দত্তদের বাড়ী নূতন খোকা দেখবার জন্যে তাকে নিয়ে যায়। সেই দিনই মায়ের কোলে প্রথম সে গোপালকে দেখে। আজ মনে পড়ছিল, মুখ নীচু করে ঝুঁকে পড়ে সে যখন খোকার মুখ দেখতে যায়, তখন তার কাঁধ পর্য্যন্ত কোঁকড়া চুলের গোছা এলিয়ে পড়ে খোকার নরম নরম হাতের কাছে

ঝুলে পড়েছিল। সেই চার মাসের কচি খোকা সেই দিনই তার মধ্যে কি দেখলে জানি না, খিল খিল করে হেসে তখনি কিন্তু সে ছোট ছোট গোলাপী হাতের মুঠোয় তার চুলের গোছা চেপে ধরলে। সত্যি, খোকা সেইদিনই কি করে তাকে চিনে ফেললে, আজও সে কথার অর্থ সুরমা ভেবে পায় না। তখন কে জানত ঐ সুরমাই দত্তবাড়ীর বড় বৌ হবে, আর কেই বা জানত যে ঐ অতটুকু খোকা আজ সুরমার সর্ব্বস্ব হয়ে বসবে?

তের বছর বয়সে দ্বিরাগমনে শ্বশুরবাড়ী এসেই সুরমা বিধবা হয়। সেই বছরই বড় ননদ বিয়ে হয়ে স্বামীর ঘর করতে চলে গেল। অতবড় ছেলের শোকে শাশুড়ী সেই যে শয্যা নিলেন, এজন্মে আর সে শয্যা তাঁকে ছুটি দিলে না। তিন বছরের খোকা সব হারিয়ে বৌঠানকেই সম্বল করলে। বাপ-মায়ের বড় আদরের মেয়ে হয়েও তাই সে স্বামীর শূন্য সংসার ফেলে মায়ের কোলে দুদিন পড়ে জুড়তে পায়নি। চির দুর্ভাগিনী বাঙালীর বিধবা সুরমা আপন বলে গোপালকেই বরণ করে নিলে। মনের মধ্যে চেয়ে আজ যদি সে খোঁজ করে গোপাল তার কে, কিছুই ঠিক উত্তর পাওয়া যাবে না। গোপাল তার ছেলে নয়, কিন্তু গোপালই তার সব। সেই তার বুকজোড়া সুখ, নয়নভরা আনন্দ। স্বামীর মুখ তার মনে পড়ে বটে। চতুর্দ্দোলায় চড়ে চেলীর জোড় পরে বরবেশে শাঁখের মঙ্গলধ্বনি আর সানাইয়ের সুরের মাঝখানে তরুণমূর্ত্তি লজ্জানম্র মুখে একদিন তারি সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, তার মুখখানি এখনও তেমনি মধুররূপে সুরমার হৃদয়ের ছোট্ট একটি কোণ আলো করে জেগে আছে। কিন্তু শুধু উৎসবের দিনের সুখস্মৃতি দিয়ে শুধু একদিনের হাসিগানের স্মৃতি দিয়ে মেয়েমানুষের মনপ্রাণ যে পূর্ণ হয়ে থাকে না। সে চায় একটা জীবন্ত মানুষের প্রাণের স্পর্শ। স্মৃতিকে যদি নিতান্তই সম্বল করতে হয়, তবে সে স্মৃতি সুখে-দুঃখে জড়িত, হাসি কান্না-মাখা, মান অভিমানে ঘেরা পরিপূর্ণ মানুষের স্মৃতি হওয়া চাই। সংসারের সকল আনন্দ-বিষাদের মাঝখানে, ছোট বড়র মধ্যে সেই দুদিনের উৎসবের সাথীটিকে ত সে একেবারেই পায়নি। তাই ওই বালা-মূর্ত্তিটিকে ঘিরেই তার যত মিলনের গান, বিরহের ক্রন্দন ধ্বনিত হয়ে ওঠে। স্বামী তার কল্পনার আলোয় দেবতা হয়ে দূর থেকে এখনো হাসেন, কিন্তু এই চিরদিনের সাথী কিশোর কুমারটিই তার বুকের কাছে মানুষের স্পর্শ নিয়ে তার সকল দৈন্য ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে।

(২)

পৌষ সংক্রান্তির দিন পীড়িত পিতার সেবায় ব্যস্ত সুরমার মন যতবার সুযোগ পেয়েছে কেবলি দত্তবাড়ির শূন্য ঘরখানির দিকে উধাও হয়ে ছুটেছে। আজ তার গোপালের কাছে ফিরে যাবার কথা; কিন্তু সে যে হবার নয়। গোপালের শশীপুরের মেলা ফুরিয়ে গেছে। বাঁশীর সুরের মোহন মোহ, হাজার আলোর মধুর স্বপ্ন, সব টুটে গেছে। বেঁধে রাখবার সকল স্বর্ণশৃঙ্খল আজ ছিন্ন! এখন শূন্য মনটি বৌঠানের কাছেই ছুটে যেতে চায়, খুঁটিনাটির মধ্যে তার আদর-তিরস্কারগুলো স্পষ্ট করে অনুভব করতে চায়। কিন্তু ছেলেমানুষের মন নিজের অভাবটা নিজেই ভালো করে বুঝতে পারছে না। থেকে থেকে কেবল বৌঠানের উপর রাগ হচ্ছে, অভিমানে ঠোঁট ফুলে উঠছে, দিদির বাড়ীর পায়েস পিঠে তার মনে ধরছে না। কি অন্যায় বৌঠানের, কথা দিয়ে কথা ভাঙে। আজও এল না কেন? সত্যি, এমন করলে কিন্তু চলবে না। এত অত্যাচার গোপাল সইবে না; যেমন করে হোক বেঁধে আনবে। গোপাল রাগের চোটে একখানা চিঠিই ফেঁদে বসল।

(৩)

মাঘ মাসের ১লা কি ২রা। সকালে উঠোনজুড়ে রোদ পড়েছে। সুরমার বাপের বাড়ীর সবকটি কচি ছেলে রান্নাঘরের দাওয়ার উপর রোদে পিঠ দিয়ে মহা কলরবে বাসি পিঠে খেতে বসেছে। কারুর ঘাড়ে গিরোবাঁধা চেককাটা শালের গা বেয়ে রসের ধারা নামছে, কারুর বালাপোষের উপর দিয়ে পিঁপড়ের দলও ভোজের নিমন্ত্রণে যোগ দিতে চলেছে। অতি-সাবধানী কেউ পরে খাবার জন্যে

ভাল পিঠেগুলি জমিয়ে রাখছে, কেউ বা লোভে পড়ে তাড়াতাড়ি সব শেষ করে শূন্যথালা সামনে করে থাবার মত করে মেঝেয় হাত দুখানা চেপে ধরে ঝুঁকে পড়ে লুব্ধদৃষ্টিতে অন্যের পূর্ণপাত্রের রূপ দেখছে। সুরমা কদিন ধরে এক-রকম যমের সঙ্গে যুদ্ধ করে বাপকে ছিনিয়ে এনেছে। আজ পিতার আরোগ্যলাভের আশা দেখে এতদিন পরে তাঁর ক্লান্ত নয়ন ঢুলে আসছে। ছেলেদের সামনে চৌকাঠের উপর জড়সড় হয়ে বসে সে ঝিমচ্ছিল। সামান্য একটু তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখলে, গোপাল বলছে, "এবার আমি পিঠে খেতে পেলাম না। বৌঠান, তোমার সঙ্গে জন্মের মত আড়ি। দেখ আর কখ্খনো কথা কইব না।" ডাকহরকরার ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। খামের উপর রস মাখিয়ে একটি ছেলে চিঠি দুখানা হাতে করে এনে বললে, "পিসিমা, তোমার দু'খানা চিঠি; বাবারে!" গোপালের হাতের লেখা দেখে আনন্দে সজাগ হয়ে উঠে তাড়াতাড়ি খাম খুলে সুরমা পড়লে—

"বৌঠান তুমি ভারি দুষ্টু হয়েছ। দাঁড়াওনা মজা দেখাচ্ছি। এমন জব্দ করব যে টের পাবে। ভারি না বলেছিলে পিঠেপার্ব্বণের দিনে নিশ্চয় আসবে। আমি কাল ভোরেই তোমার বাপের বাড়ী রওনা হচ্ছি, তোমায় জোর করে টেনে নিয়ে আসব। কেমন জব্দ।"

কার সঙ্গে অতটুকু ছেলে অজানা দেশে আসছে মনে করে চিন্তিত মুখে অন্যমনস্কভাবে দ্বিতীয় চিঠিখানা খুলতেই চোখে পড়ল—

"পরম কল্যাণীয়াসু,

বৌ, অনেক দিন তোমাদের কুশল-সংবাদ না পাইয়া চিন্তিত আছি। পত্রপাঠ কুশল দিয়া চিন্তা দূর করিবে। পিঠে পার্ব্বণের দিন তুমি নেই মনে করে কাল সারাদিন পিঠে করে গোপালকে খাওয়ালাম। কেমন যেন মুখ ভার করে খেলে। কিন্তু রাত্রে শুতে যাবার সময় দেখলাম বেশ হাসিখুশি চেহারা। তারপর বলতে সাহস হচ্ছে না, আজ ভোর বেলা বিছানায় গিয়ে গোপালকে না দেখে যেন মনটা কেমন করে উঠল। চারধারে খোঁজ করে কোথায়ও পেলাম না। একটা জেলে রাত থাকতে মাছ ধরতে যায়। সে বললে, নীলকুঠির সেই আড়কাঠিটার সঙ্গে ভোর রাত্রে গোপালের মত অতবড় একটি ছেলেকে ইস্টিশানের পথে যেতে দেখেছে। খোঁজ নিয়ে শুনলাম সে লোকটাও গাঁয়ে নেই। যা হয় শীগ্গীর একটা উপায় কর।"

সুরমা কাঠের পুতুলের মত চিঠি হাতে করে বসে রইল। তার চোখের সামনে একটা কচিমুখের দুষ্টু হাসি ফুটে উঠেছিল। সে হাসি যেন আঙুল তুলে বলছে—কেমন জব্দ!

[illegible]



জবানবন্দি

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

ভাই নলু,

রমাদির ব্যাপারটা নিয়ে আমরা যেরকম ঘোঁট পাকিয়েছিলুম, তাঁকে অপ্রস্তুতে ফেলবার কোনো সুযোগকেই যে আমরা হেলা করিনি, সেই-সব কথা আজ তাঁর ইহলোক থেকে অপসারণের পর আমার বুকে জগদ্দল পাহাড়ের মত চেপে বসেছে। তাকে ঝেড়ে ফেলতে তো কিছুতেই পারছিনে, তাই আজ তোর কাছে মনের ভারের ভাগ দিতে এসেছি।

বুড়ো হৃদয়-জেঠামশাই যখন বৃদ্ধবয়সের একমাত্র অবলম্বন কন্যাটিকে হারিয়ে পাগলের মত হয়ে রইলেন, তখন বাবা, মাকে আর আমাকে নিয়ে তাঁর কাছে চলে গেলেন। আমি রমাদির পরিত্যক্ত জিনিসগুলো গোছগাছ করতে গিয়ে একখানা খাতা পেলুম। তার থেকে কিছু আজ তোকে তুলে দিচ্ছি—পড়েই বুঝবি বিচারকের আসনে কিচ্ছু না জেনে শুনে হঠাৎ বসে পড়লে বিচার-বিভ্রাট কি রকম ভয়ানক ভাবে প্রাণান্তকর হয়ে ওঠে। আজ আমার কেবল মনে হচ্ছে মানুষ মানুষকে এই রকম করে বিচার করবার কে, যেরকম করে আমরা এই মেয়েটিকে বিচার করেছিলুম? এমন কি গুরু অপরাধ তিনি করেছিলেন যে আমরা বোর্ডিং সুদ্ধ লোক তাঁর উপর এতদূর খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছিলুম যে তাঁকে বোর্ডিং-ছাড়া হতে হল? শুধু তাই নয়, মানুষেব বিদ্রূপবাণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে তাঁকে মরণের আশ্রয় চাইতে হল? আজ আমরা দণ্ডিতার জবানবন্দি পাচ্ছি; কিন্তু কত পবে ভাই, কত পরে?

১১ই আগষ্ট ১৯১৫

বাড়ী এসেই আজ শুনলাম, যে বাবার চা-এর মজ্‌লিসে আজ র-বাবু ত আসবেনই, নি-ও নাকি আসছেন। তাঁর সঙ্গে অনেক দিন পরে আজ দেখা হবে। বিলাত থেকে তিনি কেমন হয়ে এসেছেন জানবার জন্যে মনটা উৎসুক হয়ে উঠল। ছোট্টবেলা থেকে তাঁকে জানি, কিন্তু মাঝেকার এই ব্যবধানটা আমাদেরকে দূরে ফেলেছে কি না জানতে ইচ্ছা হল। নি—কিন্তু এসে এমন ব্যবহার করলেন যেন এই সবে কাল তাঁতে আমাতে বিচ্ছে হয়েছিল—মাঝেকার এ পাঁচবছর যেন কিছুই নয়। আমরা খুবই গল্প করছিলাম, নি-র সেই অফুরন্ত হাসি সমানভাবেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিল—মজার মজার গল্পে আসরটা জমেছিল বেশ। র-বাবু ছিলেন অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে। একটা উচ্চরোল হাসির মধ্যে হঠাৎ তিনি আমায় বললেন, "রমা, এত জোরে হাসি তোমাদের শোভা পায় না। আর সমস্তক্ষণ হাসিঠাট্টাই বা কিরকম! গাম্ভীর্য্য জীবনে বড্ড দরকার। তুমি একটা উঁচু ধরণের গান কর ত!"

আমি অবিশ্যি গান করলাম না।

৪ঠা সেপ্টেম্বর

আজ চা-এর সময় কথা উঠল আমি বি-এ পাশ করে কি করব। আমি ওকালতী শিখব বলাতে র-বাবুর ভুরু আকাশে উঠল। তিনি বললেন "ছিঃ রমা! তুমি এরকম স্ত্রী-জনোচিত যা নয় তা কখনই করবে না!"

র-বাবুর এই নরম নরম কথা আমার মোটে ভাল লাগে না। মনের যেন কোনও জোর নেই। এর মধ্যে নি—বাধিয়ে বসলেন গণ্ডগোল। তিনি বললেন, "কিচ্ছু ভয় নেই আপনার। ওকালতী শিখলে পরে আপনার নারীত্ব হারাবেন এ আশঙ্কা করবার কারণ কিছু নেই।" র-বাবুতে আর নি-তে তুমুল তর্ক হল। নি—এমন মিষ্টি মিষ্টি Sarcasm ছাড়লেন যে কি বলব—র-বাবুকে হারতেই

হল। তিনি ত খুবই রেগে চুপ হয়ে গেলেন। নি—বিদায় নিয়ে চলে গেলে বললেন, "ছেলেটি অত্যন্ত ফাজিল। গাম্ভীর্য্য একেবারেই নেই।"

গাম্ভীর্য্যের জ্বালায় গেলাম।

১২ই সেপ্টেম্বর

আজ র-বাবু আমার জন্যে দুখানা চকচকে বাঁধানো ইংরেজী বই এনেছেন। নাম দেখেই পড়তে ইচ্ছে করছে না, একটার নাম With the Saints in Heaven, আরেকটা Get Thee Gone, Satan। বই দুটো দিয়ে বললেন "তোমার মানসিক উন্নতি হবে বলে এই বই দুটি অনেক আশায় তোমায় দিলাম। তোমাকে বিপথের দিকে ঝুঁকতে দেখে আমার প্রাণে অত্যন্ত ক্লেশ বোধ হচ্ছে।"

নি-র সঙ্গে আজ নারীর অধিকার নিয়ে অনেক কথা হল। তিনি বললেন, নরনারীর সমান অধিকার বলতে এ বুঝায় না যে নারী পুরুষের সমস্ত অভ্যাস বা কাজ গ্রহণ করবে—ইংরেজীতে যাকে aping বলে তা করবে—তার মানে এই, নারী এবং পুরুষ যেখানে দুজনেই মানুষ সেখানে তাদের অধিকার সমান—কিন্তু নারীর বিশেষত্ব তাঁকে সম্পূর্ণ বজায় রেখে চলতে হবে এবং তিনি স্বভাবতঃই তেমনি চলবেনই। এই বিশেষত্ব সমাজ ঠিক করে দেবে না—নরনারীর সহজ মিলন থেকেই পরিস্ফুট হয়ে উঠবে—তাঁরা নিজেরা ঠিক করে নেবেন—সমাজ সেটা মেনে নেবে।

১৯শে অক্টোবর

নি-র এখানে আসাটা র-বাবু যেন পছন্দ করতেই পারেন না। তিনি বড্ড রেগে ওঠেন আজকাল। কিন্তু নি-র গ্রাহ্যই নেই। তবু যদি র-বাবুর মত প্রতিদিনই তিনি আসতেন—তা হলে র-বাবু ক্ষেপেই যেতেন বোধ হয়।

র-বাবু বোর্ডিংএও আজকাল খুব যাচ্ছেন। বাবার যেমন বুদ্ধি— ওঁর সঙ্গে সব সময়েই দেখা করতে পাবি অনুমতি দিয়ে বসে আছেন। কি যে ওতে দেখেন।

লীলার কিন্তু ওঁকে খুব ভাল লাগে। আমার তো ওঁকে মানসিক শুচিবায়ুগ্রস্ত বলে মনে হয়। পাপ এলো, পাপ এলো, সব দুয়ার জানালা বন্ধ করে বসে থাক। কিন্তু সেই বন্ধ করার ফলে ভগবানকেও কি বন্ধ করা হবে না? তার চেয়ে দুয়ার খুলে থেকে পাপের সঙ্গে যুদ্ধ করবার চেষ্টাটাই কি বড় নয়?

২৪শে অক্টোবর

আজ র-বাবু তাঁর মনের কথা প্রকাশ করেছেন। তিনি আমায় বিয়ে করতে চান—আমায়! আমার মন যে তাঁর ভালোবাসাকে গ্রহণ করতে সম্পূর্ণ নারাজ! সে বলছে সে সুখী হবে না, হবে না।

তার চেয়ে—

২৫শে অক্টোবর

বলেছি "না"। তবু তিনি শুনছেন না। তাঁর মত সচ্চরিত্র গুণবানকে স্বামীরূপে পেলে নারীমাত্রেই ধন্যা হবে—এই তাঁর বিশ্বাস। কিন্তু আমি যে ধন্যা হব না এটা তাঁকে কিছুতেই বোঝাতে পারছি না।

তিনি বললেন, "নি-র এই সব কাণ্ড। মাথায় যত কিছু উদ্ভট কল্পনা পুরে দেওয়া। বিয়ে হলেই স্ত্রীলোকে স্বামীকে ভালবাসে। সচ্চরিত্র গুণবান স্বামী—এর চেয়ে আবার কি চাওয়া যেতে পারে? মনের মিল—একসঙ্গে থাকতে থাকতেই মনের মিল হয়ে যায়।"

আমি রেগেই বললুম "নি-র কোনো কাণ্ড নয়—আমার নিজেরই এ কাণ্ড।"

র-বাবুর মতে গল্পের বই পড়ে—বিশেষ করে আজকালকার লেখকদের বই পড়ে আমার এ বুদ্ধি হয়েছে। সৎগ্রন্থ সব পাঠ না করে এ-সব পড়লে এ হবেই।

জিজ্ঞাসা করেছিলেন Smiles পড়েছি কিনা। বললাম, হাঁ, ছেলেবেলায়।

—আমি ওকে বিয়ে করব না—কিছুতেই না। হাঁপিয়ে তা হলে মরে যাব।

২৯শে

কিছুতেই শোনেন না যে। কি করে হাত থেকে এড়াই। কি করব কেউ যদি বলে দিত। নি—যদি আসতেন তো জিজ্ঞাসা করতুম। কিন্তু তিনিও আসেন না।

আজ নীলা তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিয়ে অনেক ঠাট্টা করল—আর তাঁতে আর র-বাবুতে তুলনা করে বলল—"আকাশ-পাতাল প্রভেদ।" আমি তা স্বীকার করলাম, তবে উল্টো অর্থে।

২৩শে জুন ১৯১৬

আজ ছোটকাকার ওখানে গিয়েছিলাম। র-বাবুকে নিয়ে অনেক কথা হল। অনেকে—বিশেষ করে বয়স্কা যাঁরা তাঁরা—বলতে লাগলেন, তাঁকে আমার এমন করে ঘোরানো ভাল হচ্ছে না। আমি ঘোরাচ্ছি নাকি? আমি তো বারণই করছি, তিনি শুনছেন না কেন? মেয়ের মা'দের মধ্যে কেউ যদি তাঁকে জামাই করে ফেলেন তো আমি বাঁচি। আমি তো তাই চাই। অত ভাল লোক দিয়ে আমার পোষাবে না। আমার সব সময়ে যে মনে হবে তাঁর মানসিক শুভ্রতা আমার সংস্পর্শে ময়লা হয়ে যাচ্ছে, অথবা আমি মন্দিরে সার্‌মন শুনছি।

নি—র কথাও আজ হল। এমন ভাবে কথা ওঠে যে আমার লজ্জা করে।

লতু এসে গলা জড়িয়ে বলল, "বেশ করেছিস ভাই, র-বাবুকে বিয়ে করবি না বলেছিস। নি-র সঙ্গে যদি তোর বিয়ে হয় তো বেশ হবে।" আমি হাসছি দেখে শোভনা বললে "হাসি কিসের রে! হওয়া তো সম্ভব! তোরা যে দুজনেই একেবারে—" আমি রেগে গেলাম, বললাম "কখখনো না।" শোভনা বললে "ঐ রাগেই যে রে হাঁ প্রমাণ হচ্ছে।" আমি আরো রেগে বললাম "কখখনো না! আমি জানি—অর্থাৎ আমার সঙ্গে তাঁর ব্যবহারে আমি এমন কোনো প্রমাণ পাইনি যে তিনি আমায় ভালবাসেন।" শোভনা বললে "তুই যে দেখছি এখন থেকেই তাঁর হয়ে লড়াই করছিস।" লতু আমার দিক নিয়ে বললে "ও যেন লড়াই করছে, শোভনা-দি; এতে নয় বুঝলে যে ওই না হয়...! কিন্তু নি-র কথা কি করে বল, তিনি তো কোনও দিন ওকে নিয়ে ঠাট্টা করলে রাগেন না বা ওর হয়ে লড়াইও করেন না।" আমি উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম "তবে কি করেন?" লতু বললে "যা করা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। মিষ্টি হেসে বলেন, 'ঠিক বলেছিস লতু—তুই ভিন্ন আর আমার মনের কথা এত চট্ করে কে ধরবে! আর কাকে ভালবাসি বল তো?"

ভাল তা হলে বাসে কি? বন্ধুর মতই দেখে বোধ হয়। ভেবে ভেবে মাথাটা গরম হয়ে উঠেছিল, কোন এক মুহূর্তে সে পাগল হয়েই গিয়েছিল বোধ হয়, তাই গোপনে যা এতদিন রেখেছিলাম তাকে প্রকাশ করে ফেললাম। এখন অনুতাপ (?) হচ্ছে। লজ্জাও অনুভব করছি। কিন্তু চিঠিখানা লিখবার সময় তো লজ্জাবোধ একটুও করিনি! কি জানি কি উত্তর পাব? কেন এত লজ্জাবোধ হচ্ছে? এখন জানি, যদি তিনি দেখা করতে আসেন তো সামনে দাঁড়াতে পারব না, মাথা তুলে মুখের দিকে চাইতে পারব না। কিন্তু এটা যে বড় সত্যি যে আমি তাকে চাই—পৃথিবীতে যদি কাউকেও আমি চাই তো সেই তাঁকেই। কিন্তু মেয়ে বলে এমন হবে কেন? সে কেন যা পেলে সুখী হবে তা খুলে বলতে পারবে না? সত্য যা, তা বলতে বাধবার কারণ কি? সত্য বললে সে নির্লজ্জা আখ্যাই বা পাবে কেন? তিনি অবাক হয়ে যাবেন এবং এক্ষেত্রে যা স্বাভাবিক তাই করবেন অর্থাৎ আমার চাওয়াটাকে গ্রাহ্য করবেন না। আমি প্রত্যাখ্যাতই হব। জানি তা। কিন্তু প্রত্যাখ্যানের ভয়টাতে বিকল

হওয়ায় লাভ কি—তার সুমুখে আসা যাক নাই বা কেন? যে পাওয়াটা নিজের কাছে সার্থক হবে জানি, সে পাওয়ার চেষ্টা করায় কি দোষ? তবে এত লজ্জা কেন?

২৪শে

সারাদিন কি ভয়ে, কি বেদনায় কাটিয়েছি। কেন এত ভয়, কেন এ গভীর বেদনা? আমার আর কি উপায় ছিল? র-বাবু যেরকম পীড়াপীড়ি লাগিয়েছিলেন, তিনি যে কোন আপত্তিই গ্রাহ্য করছিলেন না। আর তার উপর বাবার বন্ধুবর্গের অবিশ্রান্ত চেষ্টা—আমায় ধরে বেঁধে তাঁরই ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া—যদিও তাঁর সঙ্গে আমার কোনো বিষয়েই কোনো রকমই মেলে না।

আর বাবাকে ত আমি একরকম জানিয়েইছিলাম—কিন্তু তিনি বললেন বামন হয়ে তিনি চাঁদেব আশা করবেন না। বামনের হাতের কাছে যে চকচকে রঙীন বাতিগুলো এসেছে তারি একটিতে তিনি তৃপ্ত হতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু তাতে হাতই পুড়ুক আর মনই জ্বলুক। সারাজীবন একটা অতৃপ্তির মধ্যে বাস করতে হবে! ..মনের মধ্যে এ কথাটা সর্ব্বদাই উঁকি ঝুঁকি মারে যে চাঁদকে ডাকলে হয়ত সে বামনেব কাছে ধরা দেবে। সেই সংশয়টার অবসান করবাব জন্যেই আমি এত বড় দুঃসাহসের কাজটা করেছি। পাব না—মনে মনে জানছি বাবার কথা ঠিক—তবু ঐ যে আশা—কুহকিনী আশা যাকে বলা হয়, সে যে—আবার আশ্বাস দেয়—তাই একেবারে সব পরিষ্কার করে জেনে নিতে চেয়েছিলাম। এখন ভয়ে কাতর হচ্ছি। এখন মনে হচ্ছে কিসের আশ্বাসে এই দুরাকাঙ্ক্ষা মনে আমার জেগেছিল? তাঁর কাছ থেকে যে বন্ধুত্ব আমি পেয়েছিলাম, তাও বুঝি আজ নিজেব দোষে হারালাম।

চিঠি পেলে খুলতে পারব না! তার মধ্যে শুধু একটি নিদারুণ "না"।"

জানি "না" লিখবেন; তবু কেন, যদি "হাঁ" লেখেন তাহলে কি করব ভাবছি? হায় মানুষের মন! যেখানে আশা নাই, সেখানেও আশা করে! "হাঁ"—কখ্খনো তা হবে না। তবে কেন ভাবছি? এরকম ভাবলে যখন "না" শুনব তখন কান্না কি রাখতে পারব? এখনই যে কাঁদছি। কাঁদছিই ত! উঃ কী বুকফাটা এ কান্না।

২৫শে

মনে হচ্ছে কত বড় একটা অপরাধ করেছি। কিন্তু এটা কি অপরাধ? একজন পুরুষ নিঃসঙ্কোচে একটি মেয়েকে বলতে পারে যে সে তাকে চায়—তাতে যদি অপরাধ না হয়ে থাকে, একটি মেয়ে একটি পুরুষকে বললেই হবে কেন? পুরুষেরা এ নিয়ে হাসাহাসি ত করেই। আমরা মেয়েরাও করি। করি না? আজ আমিই যদি শুনতাম কোনো মেয়ে এমনি করেছে তা হলে আমিহ কি তাকে নির্লজ্জ বলতাম না? বলতাম বৈ কি! সমাজের শাসন-ধারার বাইরে যে সে কাজ করত—তাই সমাজের জীব আমরা চোখ কপালে তুলে কত কি মন্তব্যই না প্রকাশ করতাম।

আজ আমার এই যে লজ্জাবোধ, এও তো সমাজেব কথা ভেবেই।

২৬শে

বুক থেকে কি এ ভার নামবে না? আমার কি রকম যে অস্বস্তি বোধ হচ্ছে তা বলা যায় না।

ওগো, আমার উপর দয়া কর! না, আমি তোমার দয়া চাই না।

বড় গর্ব্ব ছিল আমার, যে, আমার প্রতি তোমার একটা অনাবিল স্নেহ আছে—সেটাকে মাটি করে দিয়েছি ত?

তিনি যদি আমায় ভালবাসতেন ত আমায় জানাতেন। তা যখন জানান নি তখন কোন্ সাহসে আমি তাঁকে লিখতে গেলাম? তিনি আমায় কি ভাবছেন? —নির্লজ্জ, বেহায়া? না, না, তিনি আমায় নির্লজ্জ ভাববেন না। তিনি কি বুঝবেন না?

সমাজ কত বড় হয়ে মনের উপর বসে থাকে—আজ তার চাপে আমি আমার মানুষের অধিকারে যে কাজ করেছি সেটা কি রকম ছোটো হয়ে আমার চোখে দেখা দিচ্ছে, যে লজ্জায় বেদনায় কাতর হয়ে পড়ছি।

ওগো নারী! তোমার নারীত্ব বজায় রাখতে হলে তোমায় কত কিছুকেই দূরে সরাতে হয়, গণ্ডী এঁকে তার ভিতর কত ভয়ে, কত সঙ্কোচে দিন কাটাতে হয়।

২৭শে

কৈ চিঠিরও ত উত্তর পেলাম না। দিন আমার কি ভাবে যাচ্ছে কেউ বুঝছে না। অন্তরে প্রলয় নিয়ে বাইরে বেশ শান্তমূর্ত্তিতেই ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু অন্তর আমার লজ্জায় পীড়িত হয়ে উঠছে—বিশ্ব-সংসারের কারো মুখের দিকে সে তাকাতে পারছে না। মনে হচ্ছে যেন সবাই-ই জানে—সে নিজেকে দিতে গিয়েছিল, যেচে, সেধে, কিন্তু যাকে দিতে গেল সে নিলে না।

যে নিলে না সে কি হাসল? না, সে হাসে নি, সেও ব্যথা পেলে। আমি যে তার বন্ধুত্বের উপর আঘাত করলাম। বন্ধুত্ব যদি নষ্ট হয়ে যায় তা হলে তাঁর কি দুঃখ হবে?—হবে বৈ কি! নিশ্চয়ই!

শুনেছিলাম একটি মেয়ের কথা, সেও নাকি আমারি মত কাজ করেছিল। সে কি এতদূর গিয়েছিল—কিছুতেই নয়! কেউ আমার মত এতটা নির্লজ্জ হতে পারে না যে প্রত্যাখ্যাত হবে জেনে শুনে নিজেকে দিতে যায়। আমি আশার কুহকে ভুলে জোর করে যখন কল্পনা করি যে "হ্যাঁ" বলেছেন, তখন আমার মনের পিছন থেকে বুদ্ধি বলে "দূর বোকা! জানিস ত যে 'না' বলবেন।" আর আমার কান্না পেতে থাকে। কেউ ঘরে না থাকলে বালিশে মুখ গুঁজে খুব একচোট কাঁদি।

বালিশটাকে জড়িয়ে ধরে তাতে মুখ গুঁজে আস্তে আস্তে বললাম, "আমি যে চাই সেটা সত্যি, কিন্তু আপনি যে চান সেটা কি সত্যি?" বলেই আমার হাসি পেল—আমি কি পাগল? নিজেই উত্তর দিলাম "না, সেটা সত্যি নয়।"

কারো পায়ের শব্দ পেলে, কেউ কাছে এলে, ভয় করে, বুঝি বা সে সেই চিঠিখানা আনছে, যেটা আমার ভাগ্যলিপি বয়ে আনবে। দিনের বেলাই যেন ভূতের ভয়ে গা ছমছম করছে সন্ধ্যাবেলা কি করব? বড্ড ভয় করছে।

কেউ বুঝবে না যে আমার জীবনের একটা crisis যাচ্ছে।

সন্ধ্যাবেলা বৃষ্টি পড়ছে—বাইরে, আর ভিতরে বালিশে মুখ গুঁজে আমি গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদছি। মনে করেছিলাম কাঁদব না, কিন্তু বুকের ভিতর যে অস্থির হয়ে কি যেন তোলাপাড়া করছে।

চিঠি নেই, দেখাও নেই। একটা ছোট্ট "না" লিখতে কি সময় পান না? রাগ করেছেন কি? রাগ করবার কি আছে? আমি ত শুধু জিজ্ঞাসা করেছি আমায় নিতে পারবেন কিনা। "না" লিখে দিলেই ত হয়। তিনি যদি লিখতেন আমি কি তবে উত্তর দিতাম না? সে ক্ষেত্রে সমাজ বলবে, ও যে পুরুষ আর তুমি নারী। পুরুষ লিখলে তুমি উত্তর দিতে বাধ্য, কিন্তু তুমি লিখলে পুরুষ সেটা গ্রাহ্য না করতে পারে; উত্তর না দেওয়াতে তার দোষ নেই। তুমি নির্লজ্জতা করেছ তার শাস্তি পাও।

নারী বললেই যত দোষ—না? কেন, সে কি আর মানুষ নয়? তাঁকে পেলে আমি সুখী হব যখন আমি জানি তখন আমার সে কথা স্বীকার করায় কি দোষ হয়েছে যে চিঠির জবাব পর্য্যন্ত দেওয়া যায় না? নিতে পারবেন কি না জিজ্ঞাসা করেছি—নিতে হবেই এমন কথা ত বলিনি। "না" বলতে কি হয়?

তিনি হয়ত আমার চিঠি পেয়ে আমোদ অনুভব করেছেন—হয়ত বিদ্রূপের বাঁকা হাসি তাঁর ঠোঁটে ফুটে উঠেছে—যাক গিয়ে, আমি ত আর দেখতে যাই নি।

থাক, এসব কথা আর ভাবব না। বুকের ভিতর ধড়ফড় করছে যে। উঃ কী ভয়ানক কষ্ট।

২৮শে

চিঠি পেয়েছি—চিঠি পেয়েছি। আমি তাঁর প্রতি অন্যায় করেছিলাম—বিদ্রূপ তিনি এসব বিষয় নিয়ে করতে পারেন না। তাই ত আমি তাঁকে ভালবাসি—তাঁর ঐ সুন্দর মনটিকে।

আমি তাঁকে ভালবাসি—ভালবাসি।

ছোট্ট একটি "না"। কিন্তু নিষ্করুণ নয়, সঙ্গে সঙ্গে তার কি সহজ, কি সরল, কি গভীর বিশ্বাস।

২৯শে

কাল সর্ব্বনাশ হয়েছে। চিঠিখানা যখন পেয়েছিলাম তখন সেই ছোট্ট "না"টি আমায় এমন আঘাত দিয়েছিল যে মরণাহতের মত বিছানায় লুটিয়ে পড়েছিলাম, মুখখানা চিঠির কাগজটারই মত সাদা হয়ে গিয়েছিল। লীলা তখন ঘরে ছিল। আমি জানি না—কিছু মনে নেই—কি হয়েছিল। তবে এইটুকু জানি যে সেই বেদনার মুহূর্ত্তে আমি এমন কিছু বলেছিলাম যাতে করে সে আমার হৃদয়ের এই গোপনতম রহস্যটুকু জানতে পেরেছে। তাব কি অন্যায়! সে নিজে জেনেই ক্ষান্ত হয় নি, সকলকে জানিয়ে দিয়েছে। অথচ সে নিজেকে আমার বন্ধু বলেই কবুলাত।

সে তাঁর চিঠিখানাও পড়েছে। তার থেকে সে যতটুকু আবিষ্কার করতে পাবে, তার উপর মিথ্যা এবং অতিরঞ্জনের খড়ি এবং রং লাগিয়ে সত্যটুকুকে ঢেকেঢুকে বিচিত্র রং সাজিয়ে সকলের সামনে তুলে ধরে আমার চারদিকে এমন একটা বিশ্রী উপহাসেব কলরব তুলেছে যে কি বলব। যেখানে যাচ্ছি সেখানে বাঁকা চোখের ঠারে চাওয়া এবং ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের হাসি। যেসব মেয়েদের গায়ে যৌবনের বাতাস এসে এই সবে লেগেছে—যারা মানব-হৃদয়ের এই চিরন্তন আকাঙ্ক্ষার বিষয়ে কিছুই বলতে গেলে জানে না—ওঃ তাদের কি হাসির ঘটা।

আমার ম... .যেতে ইচ্ছা করছে।

১০ই জুলাই

ব্যাপার এতদূর গড়িয়ে গেল যে আমার বোর্ডিংএ থাকা হল না। গত মাসের শেষ দিন বাবা এসে দেখা করে বললেন, "তুমি বাক্স-পেঁটরা গুছিয়ে নিয়ে চল। আর তোমার এখানে থেকে দরকার নেই! এই জন্যেই কি তোমায় লেখাপড়া শেখানো হয়েছিল? এর চেয়ে তুমি মরলেই যে ছিল ভাল।" আমি মুখ ফুটে বলতে পারলাম না "মৃত্যু তো আমি আকাঙ্ক্ষা করছি, বাবা। প্রাণ দিয়ে যে তাকেই চাচ্ছি।" নীরবে বাক্স জিনিস উঠিয়ে চলে এলাম। আসবার সময় একটি মেয়েও দুঃখপ্রকাশ করলে না বা সান্ত্বনার বাণী বললে না। কঠোর নির্ম্মম ভাবেই তারা আমার পরিত্যাগ করলে।

যাক গিয়ে, ব-বাবুর হাত থেকে তো বেঁচেছি। তিনি এরূপ লজ্জাহীনা :: পত্নী বলে গ্রহণ করতে রাজী নন। শুনছি নাকি লীলার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবার কথা হচ্ছে।

*　　　*　　　*

বাবা যেন সমাজের প্রতিনিধি। সব সময়ে চোখ রাঙিয়েই আছেন। আমি সবই সহ্য করতে রাজী আছি, কিন্তু বাড়ীতে সমাজের মাতব্বরদের যে অবাধ মেলা বসছে এবং তাতে আমার সম্বন্ধে সব বিচিত্র মন্তব্য প্রকাশ হচ্ছে সেইটাই অসহনীয় হয়ে উঠছে।

নবীন পিসেমশাই—যার মতটা কিন্তু অতি প্রাচীন—এসে খুব গম্ভীর ভাবেই বললেন— "তুমি তো শোন না কিচ্ছু, হৃদয়নাথ। লেখাপড়া শেখালেই মেয়েরা ঐ রকম হয়ে যায়। কলেজে পড়ে মেয়েরা ভাবে তারা যেন কি হয়ে উঠেছে—'স্বাধীনতা' 'স্বাধীনতা' করে ক্ষেপে গিয়ে তারা এই রকম 'পুরুষামি'ই করে। তাই তো বলি যে মেয়েদের বেশী লেখাপড়া শেখানো কোনো কাজের নয়।"

আমি যে নারীত্বের সীমারেখা পার হয়ে গেছি এটা আমি স্বীকার এখনো করতে পারছি না। তর্কের খাতিরে না হয় ধরে নিলাম যে তাই করেছি—তাই বলেই কি এটা স্বতঃসিদ্ধ হয়ে গেল যে যেহেতু একটি লেখাপড়া-শেখা মেয়ে তার নারীত্বটুকু বজায় রাখতে পারে নি তাই বলেই লেখাপড়া-শেখা মেয়ে মাত্রেই তা পারবে না। এটা কোন্ ন্যায়-শাস্ত্রে লেখে?

১৫ই

জীবনটা দুর্ব্বহ হয়ে উঠছে। শরীরও দিন দিন অবসন্ন হয়ে পড়ছে।

আমার ভবিষ্যৎ ভেবে আজকাল হঠাৎ এত লোকের চিন্তান্বিত হয়ে ওঠবার খুব বড় একটা কারণ যে কি ঘটেছে তা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। বাবাকেও কন্যাদায়গ্রস্ত বলে হঠাৎ সর্ব্বায়ের ঠাউরে ওঠবার কারণ কি?

আমি একজনকে ভালবেসেছি এবং তাকে পাই নি—তাই বলে যাকে ভালবাসি না এবং যার মন সম্বন্ধে কিছুই বিশেষ জানি না এমন একটি লোককে আমার জীবনের সঙ্গীরূপে বরণ করে নিতেই হবে এর মানেই বা কি? আমার "পাপের" (?) বুঝি এই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

অনেকে আমাকে অযাচিত উপদেশও দিয়ে যাচ্ছেন। উপদেশ মাথায় তুলে নিতে আমি রাজি আছি—কিন্তু যেখানে উপদেশ আমার বুদ্ধির আয়ত্তে কিছুতেই আসে না, আর যেখানে বুঝি সেটা উপদেশচ্ছলে আমায় এবং আমারই মত আরো কয়েকটি মেয়েকে—যারা মুক্তির আনন্দটা পাবার জন্যে, প্রকৃত স্বাধীনতা পাবার জন্যে ভুলচুকের মধ্যে দিয়েও যাচ্ছে তাদেরই, —উপহাস এবং নিন্দা, তখন উপদেশটা গ্রহণ করবার জন্যে প্রাণটা উন্মুখ না হয়ে বিদ্রোহী হয়েই ওঠে।

একজনের উপদেশের বিষয় ছিল "লজ্জাই নারীর ভূষণ এবং সংযমেই মানব-জীবনের সার্থকতা।" কিন্তু তাঁর মনের কথা এই যে তিনি যে ব্যক্তিটিকে সৎপাত্র বিবেচনা করে এনে উপস্থিত করেছেন তাঁকে, আমার সঙ্গে তাঁর মনের এবং আদর্শের কোনো প্রকার মিল আছে কি না না জেনেই, গ্রহণ করা। কিন্তু সেটাই যে আমি পারছি না।

৩১শে

আমার এরকম করাটা নারীর স্বভাব-বিরুদ্ধ হয়েছে, এবং শুধু এই নয়, এতে করে আর্টের অত্যন্ত ক্ষতি করা হয়েছে।

পুরুষ এসে ভিখারীর বেশে নারীর কাছে দাঁড়াবে—আর নারী অন্নপূর্ণার মত এই ভিখারী শিবের ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ করবেন। গদ্যে, পদ্যে, চিত্রে, লেখায় এ ছবি কি সুন্দর?

কিন্তু আজ তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, নারী কি তার লজ্জার আভায় রাঙিয়ে সুন্দর করে তার মনের কথাটি বলতে পারে না? সেই যে পুরাণে ইতিহাসে পড়া যায়, রুক্মিণী ঊষা সংযুক্তা প্রভৃতি কত কন্যা লেখন পাঠিয়েছিল বীরের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে, তার মধ্যে কি এমন সৌন্দর্য্য কিছু নেই যাকে আর্ট গ্রহণ করতে পারে?

চিরন্তন নারী স্বভাবের অনুযায়ী কাজ আমি করি নি। দুর্ব্বলতা দেখাতে সে ভালবাসে, পুরুষ তাকে জয় করে নেবে এই সে চায়। শিকার হতে সে ভালবাসে, তার জন্যে এই যে মৃগয়া সে তাতে গৌরব অনুভব করে। পাথরের যুগের নারী ঐখানেই ত আমাদের মধ্যে উঁকি মারছে।

আমি ভাল করেছি বা মন্দ করেছি এ সম্বন্ধে আমি কিছুই বলছি না। সে বিচার করবার ভার আমার একার উপর নেই—কিন্তু সেটার ভার এই বিচারক পদে স্বতঃ উপবিষ্টদের উপরও যে বেশী আছে তাও আমার মনে হচ্ছে না। আমার মনে হয়, সেটা বিচার করবার ভার তাঁর উপর সব চেয়ে বেশী যাঁকে জড়িয়ে এ কাজটা দাঁড়াতে পেরেছে।

যাঁরা নির্ম্মম-ভাবে আমাকে বিচার করছেন তাঁদেরকে আমি "ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে" বলে যে আমার কাজের সাফাই দেবো এও নয়। আমার ভুল হয়ে থাকতে পাবে—কিন্তু এই ভুলটা যে একটা ভীষণ রকমের অন্যায় তা আমি স্বীকার করছি না।

৩রা আগষ্ট

স্কুলের বন্ধুদের চিঠি দিয়েছিলাম—তারা কেউ জবাব দেয় নি। আজ লেডী সুপারিন্টেণ্ডেন্টের এক কড়া চিঠি পেয়েছি। তিনি মনে করেন আমি অত্যন্ত খারাপ মেয়ে, অন্য মেয়েরা আমার সংস্রবে

এলে খারাপ হয়ে যেতে পারে। আমার সম্বন্ধে তাঁর এই ধারণার পোষকরূপে তিনি দুটি বিশেষ কারণ দিয়েছেন ঃ

(১ম) বিবাহের চিন্তা অত্যন্ত খারাপ চিন্তা, আমি সেই চিন্তাকে মনে স্থান দিয়েছি।

(২য়) কোনও পুরুষকে কোনও নারীর প্রেম বা ভালবাসা সম্বন্ধে কিছু বলা অত্যন্ত ধর্ম্মবিগর্হিত কাজ। আমি তাও করেছি।

অতএব আমার মত পচা রসাল ফলের সঙ্গে তিনি অন্য ভাল রসালগুলিকে কিছুতেই এক জায়গায় থাকতে দিতে পারেন না।

তাঁর আদেশ শিরোধার্য্য।

দেওঘর, ৫ই জানুয়ারী, ১৯১৭

নিন্দা এবং অপমানের বোঝা বয়ে দিন কেটে গেল। মরণ তার নিবিড় কালো শান্তি নিয়ে ঘিরে আসছে আমায়।

এখানে এসে আমি শান্তি পেয়েছিলাম অনেকটা। প্রকৃতি যে মানুষ নয়—সকলকেই সে শ্যামল স্নেহে বুকে তুলে নেয়।

মনে করেছিলাম বাবার স্নেহ হারিয়েছি, কিন্তু সেটা আমার ভুল হয়েছিল। যে স্নেহের পক্ষপুটের নীচে আমার জীবন বেড়ে উঠেছে—সে স্নেহ যে অপরাজেয় এবং অপরিমেয়। আজ আসন্ন-মরণ কন্যাটিকে তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেছেন যে তাঁর মতে আমি অন্যায় কিছু করি নি—তবে চিরাগত যে প্রথাকে অবহেলা করেছি তাকে অবহেলা না করলেই ভাল ছিল। এটা নারীর লজ্জার বিরুদ্ধে বলে এটা লোকচক্ষে শোভন হয় না এবং লোকে বড্ড ভুলও বুঝতে পারে।

আর বিচারের ভার আমি নিজে যাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলাম—মনে মনে, অবিশ্যি—তাঁরও বিচার কি হয়েছে, তা, বোধ হচ্ছে, জেনেছি। তাঁর বন্ধুত্ব যখন আমার উপর অটুটই আছে—তখন তাঁর স্নেহও আমি হারাই নি। তাঁর চিঠিগুলি সব কি করুণ স্নেহে ভরা আর কোথায়ও আমার ব্যবহারের উল্লেখ নেই।

তাই মরণকে আজ হাসিমুখেই আমি বরণ করতে পারছি। যেন আমি কিছু করি নি, যাতে করে আমাদের মধ্যে র-বাবুর মত মানুষের মতে বন্ধুত্ব আর থাকতে পারে না—অপরিচিতের মত হতে হয়।

*   *   *

জানিনে ভাই রমাদির মন্তব্যগুলো সব ঠিক কি না। কিন্তু আমাদের এই স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়নি—নারীদের মধ্যে মিথ্যা লজ্জার ভড়ং—ইংরিজীতে যাকে false prudery বলি সেটা ত কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি নে—প্রমাণ আমাদের লেডী সুপারিন্টেণ্ডেন্টটি।

একটা বিষয়ে একজন ভুল করেছে বলে সে যে আগাগোড়াই খারাপ আর তার সঙ্গ যে একদম পরিত্যাজ্য—এইটাই কি খুব ন্যায়-বিচার, তাই ভাবছি।

আজ ইচ্ছা করছে যে রমাদির কাছে ক্ষমা চাই—কিন্তু তিনি যে আজ তার অতীত হয়ে গেছেন।

ইতি—

তোদের সুবু।

১৮ বর্ষ, ভাদ্র ১৩৩৩

কর্পূরের মালা

শৈলবালা ঘোষ (জায়া)

গোলমালে ভিড়ের ভিতর মাসীমার হাত ছাড়াইয়া ছবি যে কখন পিছাইয়া পড়িয়াছিল তাহা সে কিছুই টের পায় নাই, হঠাৎ অপরিচিত লোকের ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ির মাঝে আপনাকে নিঃসহায় বেপথুমানা দেখিয়া ভয়ে সে কাঁদিয়া ফেলিল।

দোলযাত্রা উপলক্ষে সেদিন জগন্নাথ-দেবের শ্রীমন্দিরে লোকে লোকারণ্য। সকলেই কনুইয়ের ধাক্কায় লোক হটাইয়া অগ্রসর হইতে উদ্‌গ্রীব। যাত্রী-পরিচালক পাণ্ডা ও ছড়িদারদের হাঁকডাকে কানে তালা ধরিয়া যাইতেছে। ত্রয়োদশবর্ষীয়া পাৎলা ডিগ্‌ডিগে মেয়ে ছবি—লোকের হুড়াহুড়ির ঠেলায় পিছু হটিতে হটিতে একেবারে মন্দিরের দরজার গোড়ায় আসিয়া পৌঁছিল।

ছবি আকুলক্রন্দনে অধীর হইয়া উঠিল। কে কাহাকে দেখে, কে কাহার কথা শোনে? তাহার পানে কেহ ফিরিয়া তাকাইলও না। —আজ দেবতা দর্শনে তাহারা আসিয়াছে—দেবতা দেখিবে, দুঃস্থকে দেখিবার অবকাশ নাই; দেবতার দর্শনে স্বর্গলাভ হয়—সে স্বর্গ যদি বাহুবলের প্রভাবে, গুঁতাগুঁতির দ্বারা দুর্ব্বল দলনে পাওয়া যায়, তবে কোন্ বুদ্ধিমান তাহাতে ইতস্তত করে? কে এমন স্বার্থত্যাগী নির্বোধ আছে, নির্লজ্জ আছে, যে পরের খোঁজ লইতে গিয়া নিজের অনায়াসলভ্য স্বর্গ হারাইতে আপত্তি করে না? কেহই না! —আতঙ্ক-পীড়িতা বালিকার ক্ষীণরোদন প্রচণ্ড কোলাহলের মাঝে ডুবিয়া তলাইয়া গেল।

"কি হয়েছে খুকি, কি হয়েছে তোমার—কেন কাঁদছ গা?" শ্যামবর্ণ, একহারা, কপালে চন্দনের ফোঁটা গলায় মালা, কোমরে গামছা জড়ান, ঈষদ্দীর্ঘাকৃতি একটি তরুণ কোমলমূর্ত্তি ছবির মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া স্নেহময় স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "কেন কাঁদছ খুকি?—" চারিদিকে অদ্ভুত বৈচিত্র্যময়ী কট্‌কীভাষার কিড়িমিড়ির মাঝে, হঠাৎ পরিষ্কার বাংলা প্রশ্ন শুনিয়া ছবির কান্না বন্ধ হইল, ছবি জলভরা বড় বড় চোখ দুটি তুলিয়া সবিস্ময়ে প্রশ্নকর্ত্তার মুখপানে চাহিল, আহা কি সুন্দর, মমতাময় সরল মুখখানি! সদ্য শঙ্কিতা ছবি অনেকটা আশ্বস্ত হইল।

আবার স্নেহময় স্বরে সেই ব্যগ্রপ্রশ্ন—।

সহসা পিছনের সজোর ধাক্কায়, সোলার পুতুলের মত ক্ষীণকায়া ছবি, ছিটকাইয়া সেই লোকটির উপর গিয়া পড়িল—ক্ষিপ্রহস্তে পতনোন্মুখ ছবিকে ধরিয়া ফেলিয়া সেই লোকটি অতি যত্নে তাহাকে বাম হাতের বেষ্টনে আগ্‌লাইয়া লইয়া বিপুল বিক্রমে দক্ষিণ হস্তের অমিত প্রতাপে লোক ঠেলিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে একটু তফাতে আসিয়া দাঁড়াইল।

ছবি এতক্ষণে প্রাণপণে অন্তিম অবলম্বনের মত সেই অপরিচিত লোকটির হাত চাপিয়া ধরিয়া ছিল। এখন ফাঁকা জায়গায় আসিয়া সঘন উচ্ছ্বসিত নিঃশ্বাস ফেলিয়া, লোকটির হস্তবদ্ধ নিজের ঘর্ম্মাক্ত হাতখানি খুলিয়া লইয়া সলজ্জ সঙ্কোচে একটু সরিয়া দাঁড়াইল। লাবণ্যময়ী কিশোরীর মুখপানে প্রীতি-পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া, তরুণ যুবাটি করুণাকোমল কণ্ঠে শুধাইল, "কার সঙ্গে মন্দিরে এসেছিলে খুকি?"

থামিয়া থামিয়া শুষ্ক কণ্ঠে ছবি বলিল, "আমার মা, মাসীমা, মেশোমশাই, ঝি—সবাই এসেছে। আমি মাসীমার হাত ধরেছিলুম, তার পর মন্দিরে ঢুকে—" ছবি আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

"চুপ কর, চুপ কর, এখনি তাদের পাবে, কান্না কি? তোমাদের ছড়িদার কেউ নেই?"

"হ্যাঁ আছে, কপালে ফোঁটা পরে একজন—

"তার নাম কি বল দেখি?"

"তা জানিনে, তার মাথায়,—ঐ তোমার মত চুল ঝুঁটা নেই ত, বড় বড় চুলে চূড়ো বাঁধা আছে।"

সরল বালিকার এই অভ্রান্ত যুক্তিপূর্ণ অভিজ্ঞান নির্দ্দেশে লোকটির মুখ হাসিতে ভরিয়া উঠিল।

চারিদিকেই তো শত শত চূড়া-বাঁধা মাথা, তাহার মধ্য হইতে একটি চূড়া-চিহ্নিত পরিচিত মাথা খুঁজিয়া বাহির করা নিতান্তই সহজ!

"আচ্ছা পাণ্ডার নাম কি জান?"

"না, মায়েরা কেবল সেই লোকটার সঙ্গেই ঠাকুর দেখতে ঢুকেছেন।"

"মন্দিরে ঢুকেছেন তো? আচ্ছা, তবে কোন ভয় নেই, এখনি বেরুলেই পাওয়া যাবে। তোমার নামটি কি খুকি?"

"আমার নাম ছবি।"

সেই রবিকরোজ্জ্বল মধুর প্রভাতে সেই স্নিগ্ধ লালিত্যময় সুন্দর মুখখানির প্রতি চাহিয়া চাহিয়া মুগ্ধ-হৃদয় যুবা ভাবিল "ছবি বটে!"

কোলাহল করিতে করিতে যাত্রীদল জলপ্রবাহ-বৎ যাওয়া-আসা করিতেছে। চলিতে চলিতে কেহ বা তাহাদের দিকে কৌতুকোজ্জ্বল কটাক্ষ হানিয়া যাইতেছিল,—ছবি নত দৃষ্টিতে সসঙ্কোচে জড়সড় হইতেছিল। অদূরে আবির-লাঞ্ছিত অদ্ভুতদৃশ্য কয়েকজন ছোকরা তাহাদের লক্ষ্য করিয়া, গোপন বিদ্রূপে চোখ টেপাটেপি করিয়া বেজায় হাসিতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজন দণ্ড দুয়েকের জন্য সরিয়া গিয়া মন্দিরদ্বারে ভিড়ে মিশিল, তার পর সহসা অত্যন্ত ব্যস্তভাবে আসিয়া আচম্বিতে ছবির হাত ধরিয়া এক হ্যাঁচকা মারিল। "আরে আমার যাত্রীর মেয়ে ভিড়ে হারিয়েছে, আয়!"

সেই সর্ব্বদর্শী তরুণ যুবা এই লোকটার আচরণ আগাগোড়া সব লক্ষ্য করিতেছিল; বহুকষ্টে এতক্ষণ সংযত ছিল, আর পারিল না, সদ্যকৃত ধৃষ্টতার প্রত্যুত্তরে অকস্মাৎ রুদ্রমূর্ত্তি ধরিয়া সেই অসভ্যটার গালে সশব্দে এক চড় বসাইয়া দিল, "বিশ্বম্ভর পাণ্ডার হাতে-গড়া চেলা, ছড়িদারদের সর্দ্দার সে,—রঞ্জনমিশ্র তার নাম, তার কাছে বেয়াদবি!"

অপ্রত্যাশিত চপেটাঘাতে বিপর্য্যস্ত হইয়া আলোড়িত মস্তিষ্কে বুদ্ধিমান লোকটা যন্ত্রণাকাতর মুখে গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে তাড়াতাড়ি ভিড়ে ভিড়িয়া পড়িল, আর পাছু ফিরিয়া চাহিল না। ভয়াকুলা ছবিকে শান্তস্বরে আশ্বস্ত করিয়া রঞ্জন তাহাকে আবার আগলাইয়া দাঁড়াইল।

"মেয়ে কই, মেয়ে কই"—কোলাহল করিতে করিতে একদল লোক মন্দির হইতে বাহির হইয়া ব্যগ্র ব্যস্ততায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। —"ওগো এইদিকে একটি মেয়ে দেখেছ গা,—এই এতটুকু মেয়ে—পাৎলা চেহারা—সুন্দর মতন, কেউ দেখেছ গা—"

চারিদিকে প্রশ্নোত্তরের উচ্ছৃঙ্খল কলরব পড়িয়া গেল।

"আরে এই হরুয়া—এই, এই ধারে ফের, আরে—এই বোকা এ দিকে দেখ, এই, কি খুঁজছিস—"

"আরে মেয়ে হারিয়েছে, মেয়ে হারিয়েছে, [illegible]।"

"দেখ দেখি এই কি সেই?"

"হাঁ হাঁ, এই এই! —ভয় নেই বাবু, পাওয়া গেছে, এই দিকে এই দিকে আসুন আসুন,—এই যে গো এই!"

ভয়ঙ্কর ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ির ভারি ধুম পড়িয়া গেল, কে কাহার ঘাড়ে পড়ে, —ঠিক নাই। অনেক লোক ছুটিয়া আসিয়া রঞ্জন ও ছবিকে ঘিরিয়া ফেলিল, রোরুদ্যমানা আকুলা বিধবা জননী ছবিকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। সদ্য-আশঙ্কা-মুক্ত আশ্বস্ত অন্তরে জগবন্ধুর উদ্দেশে তাঁহার চক্ষু হইতে পূর্ণ আবেগে অশ্রু উছলিয়া পড়িতে লাগিল!—

(২)

তাহার পর দিনকয়েকের মধ্যেই সেই পরিবারের সহিত অপরিচিত যুবার ঘনিষ্ঠতা খুব পাকাপাকি হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সেটা সকলের প্রীতিকর হইল না। সংসারে এক শ্রেণীর কতকগুলি জীব আছে, যাহারা নিজেরাও হাসিতে পারে না, আর পরের হাসিও সহ্য করিতে পারে না। গোপন

অন্ধকারে, ব্যর্থ ঈর্ষাকে ক্রমাগত কঠিন বিদ্বেষে শানাইয়া বড়ই তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল করা যায়; কিন্তু সেটা যে কেবল পরের চর্ম্মই ভেদ করিবে,—এমন কথা নিঃসংশয়ে কেহ বলিতে পারে না, বরং সেটা বিপরীত মুখে প্রক্ষিপ্ত হইয়া অনেক সময় একে আর হইয়া দাঁড়ায়, এবং যন্ত্রণার ঝালটা বাড়িতে থাকে সেই লক্ষ্যচ্যুত পরের উপর।

দুষ্ট গ্রহের অনুকম্পায় রঞ্জনের সেইরূপ কতকগুলি সুহৃদ জুটিল। পাণ্ডার ছড়িদারেরা তাহার উপর মর্ম্মান্তিক চটিয়া গেল; বাস্তবিক এত উচ্ছৃঙ্খলতা কি সহ্য করিতে পারা যায়? কোথাকার কে—সম্পূর্ণ অপরিচিত, অনাহুত, অন্য পাণ্ডার এক লক্ষ্মীছাড়া ছড়িদার—সে লোকটা সহসা অতর্কিতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়া তাহাদের একান্ত ইজারা-করা যাত্রী-পরিবারকে ছোঁ মারিয়া যে অসঙ্কোচে নিজের খাস দখলের অন্তর্ভূত করিয়া লইবে, —ইহা কখনই কোন সহিষ্ণু ব্যক্তি ক্ষমা করিতে পারে না! আর রঞ্জনের উপরই বা ইহাদের এত টান কেন রে বাপু! ছোঁড়া যাদু জানে না কি?—

বাস্তবিকই, সরল হাস্যমণ্ডিত মুখে এই প্রিয়দর্শন যুবাটি যাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইত তাহারই প্রাণে একটা স্নিগ্ধ মাধুরী ফুটাইয়া তুলিত; রমণীরা ছলছল নয়নে তাহার মুখপানে চাহিয়া ভাবিতেন, আহা ছেলেটি কি মায়াবী! পুরুষেরা ভাবিত আরামের সঙ্গী বটে। দরিদ্রের প্রতি চিরতাচ্ছিল্যশালী ক্রূর দাম্ভিক অন্তঃকরণও এই আত্মসম্ভ্রমে উদাসী সুকোমলকান্তি যুবাটির নম্র সরলতায় অকপট স্নিগ্ধতায় চমৎকৃত হইত। রঞ্জন কাহারো খাতির রাখিত না, নিজেও খাতিরের জন্য লালায়িত ছিল না, কিন্তু সকলের উপরই তাহার অগাধ অপরিসীম ভালবাসা! রঞ্জনের একটা মহৎ গুণ ছিল, সে সকলের সঙ্গেই অবাধে মানাইয়া চলিত, কখনো কোথাও দ্বিধাপীড়িত হইয়া কেহ তাহাকে ইতস্তত করিতে দেখে নাই। সকল হৃদয়ের সঙ্গেই সে সমানভাবেই হৃদয় মিশাইতে অভ্যস্ত ছিল, কিন্তু কোথাও এতটুকু অসংযম বর্ব্বরতার চিহ্ন ছিল না। নিজেদের ত্রুটি যাহারা সংশোধন করিতে জানে না, এবং পরের নৈপুণ্য সহ্য করাও যাহাদের ক্ষমতার অতীত, তাহাদের মত লোকের চক্ষুঃশূল ছিল রঞ্জন! কিন্তু উন্মুক্ত-উদার-প্রাণ রঞ্জনের তাহাতে কিছু আসিয়া যাইত না। সে প্রতিদ্বন্দ্বীর আক্রোশের আক্রমণ কৌতুকের হাসিতে নিষ্ফল করিয়া শত্রুকে অমায়িক ব্যবহারে অভিভূত করিয়া ফেলিত। তাহাকে যে অপদস্থ করিতে আসিত,—সেই অপ্রস্তুত হইয়া ফিরিত।

অবসরে অনবসরে রঞ্জন মেসো-মহাশয়ের অন্তরঙ্গ সহচর হইয়া উঠিল। শ্রীমন্দিরে বিগ্রহদর্শনের সময় তাঁহাদের নিজ পাণ্ডার ছড়িদার থাকা সত্ত্বেও তিনি রঞ্জনকে টানিয়া আনিতেন। সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে হইবে, তাও রঞ্জন সঙ্গী। রাত্রে বাসায় বসিয়া গল্পগুজব করিবেন, তাহাতেও প্রায় রঞ্জনই রঙ্গদার থাকিবে। দূরে দেবদর্শনে যাইতে হইবে, সেও রঞ্জন সঙ্গে থাকিলেই ভাল হয়। না হইলে মেসো-মশায়ের একান্ত অস্বস্তি বোধ হয়। সকল বিষয়েই রঞ্জন হইয়াছিল তাঁহার প্রধান নির্ভর।

নিজের প্রভুর কাজ বাজাইয়া এতটুকু অবসর পাইলেই রঞ্জন আসিয়া তাঁহার কাছে জুটিত। তাঁহাদের সহিত ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহাদের সব দেখাইয়া শুনাইয়া, কে জানে কেন—রঞ্জন এক অনির্ব্বচনীয় পরিতৃপ্তি পাইত। বিশেষ ছবি। —আহা ছবিটি বেশ মেয়ে, ছবির কমনীয় ছবিখানি দেখিবার জন্য তাহার প্রাণে সযত্নে লুক্কায়িত একটা অপরিসীম আগ্রহ সঞ্চিত ছিল। তাহার প্রাবল্যে রঞ্জন একটু বেশ রীতিমতই বিব্রত হইয়াছিল। ছবির নিকট হইতে সে ইদানিং সতর্কতার সহিত তফাতে থাকিতে চাহিত। প্রাণপণে আত্মদমন করিয়া সকলের নিকট চিরপরিচিত আত্মীয়ের মত স্বভাবসিদ্ধ সহজসুরে দিব্য কথাবার্ত্তা কহিত, কিন্তু এতটুকু ছোট মেয়ে,—সে সকলের নিতান্ত অগ্রাহ্যের বস্তু—তাহার কাছে রঞ্জনের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া হঠাৎ সব গোলমাল হইয়া যাইত। হাসিভরা মুখের সুধাভরা বাক্যগুলা অকস্মাৎ নির্ম্মম সঙ্কোচে পরস্পর আত্মঘাতী হইয়া মরিত। সকলের মুখপানে সে অসঙ্কোচে চাহিত, কিন্তু যদি দৈবাৎ অতর্কিতে ছবির সহিত চোখোচোখী হইত তবে সে ব্যাকুল উৎকণ্ঠায়, ত্রস্তে চোখ নামাইয়া, কোনমতে সেখান হইতে সরিয়া যাইতে পারিলে তবে হাঁফ ছাড়িয়া সুস্থ হইত। কিন্তু কে জানে কি একটা তীব্র আকর্ষণ তাহাকে ক্রমাগতই সেই দিকে টানিত।

পনের বছর বয়স হইতে সে যাত্রী চরাইতেছে, কিন্তু কই তাহার তো কাহারও কাছে এক মুহূর্ত্তের জন্য সঙ্কোচ হয় নাই। এখন তবে একি হইতেছে? এতটুকু একজনের কাছে এত কিসের......।

নিজের গতিক বুঝিয়া সে নিজেই ধাঁধায় পড়িয়া গেল, একি হইল।—

(৩)

বিকালে, বাসার বারান্দায় পৈঠার উপর বসিয়া ছুরি দিয়া মেসো-মশাই কাঁচা আম ছাড়াইতেছেন ও অদূরবর্ত্তী রোয়াকে উপবিষ্টা, হরিনামের ঝুলি হস্তে, ছবির জননীর সহিত ছবির বিবাহ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। খিড়কির পশ্চাদ্ভাগে পোড়া জমীটায় ছেলেরা সকলে খেলা করিতেছিল। সেখান হইতে তাহাদের উচ্চ কলরব বেশ স্পষ্ট শোনা যাইতেছিল, অন্য স্ত্রীলোকেরা তখন রান্নাঘরে ছিলেন।

সদর দুয়ার পার হইয়া প্রাঙ্গণে রঞ্জন মিশ্র দেখা দিল। মুহূর্ত্তে মেসোমশায়ের মুখের কথা ঠোঁটের মধ্যে থামিয়া গেল, হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলিলেন, "এস এস রঞ্জন এস, কাল তোমায় দেখতে পাইনি কেন ঠাকুর?"

"বড় কাজের ভিড় পড়েছে বাবু। ওকি কচ্ছেন? আম? দিন আমায় আমি ছাড়াচ্ছি"— মেসোমশায়ের হাত হইতে ছুরি লইয়া রঞ্জন তৎক্ষণাৎ আম ছাড়াইতে বসিয়া পড়িল। সস্নেহ দৃষ্টিতে একবার তাহার পানে তাকাইয়া মেসোমশাই আবার ছবির বিবাহেব প্রসঙ্গ লইয়া পড়িলেন।

রঞ্জনের শ্রবণেন্দ্রিয়ের উপব শরীরের সমস্ত তড়িৎ আসিয়া কাজ করিতে লাগিল। প্রাণপণে উত্তেজনা চাপিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত সে ছুরি চালাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রঞ্জন সব আমগুলি পরিষ্কাররূপে ছাড়াইয়া ফেলিল, "দেখুন তো বাবু হয়েছে?"

"বেশ হয়েছে। আচ্ছা রঞ্জন, তুমি এত বাংলা শিখলে কোথা? কখনো বাংলা দেশে গিছ্‌লে?"

"না বাবু, এইখানেই যাত্রীদের সঙ্গে মিশে শিখেছি।

"বাঃ! বাহাদুর ছেলে তুমি, খাসা বুদ্ধিমান!"

রঞ্জন উপস্থিত কৌতুকে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বালকের মত অসঙ্কোচ আনন্দ-সুন্দর দৃষ্টিতে মেসোমশায়ের পানে তাকাইয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল "আপনারা আমায় বড় ভালবাসেন। না?"

তাহার সুকোমল সরল প্রশ্নে ছবির জননীব মনে গভীর মমতার উৎস উথলিয়া উঠিল; জীবনের সহস্র শোক বেদনায় সন্তপ্তা রমণীর চক্ষু হইতে বাৎসল্য-স্নেহের তপ্ত অশ্রু খসিয়া পড়িতেই তাড়াতাড়ি আঁচলে চক্ষু মুছিয়া আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, "নারায়ণ, নারায়ণ, হরিবোল!" মেসোমশাই সস্নেহে রঞ্জনের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে রহস্যস্মিতহাস্যে বলিলেন, "ঠিক হয়েছে দিদি, আপনি ছবির বের জন্যে ভাবছেন কেন? এক কাজ করুন—জগবন্ধুর সামনে দুটো ফুল ফেলে, ছবিকে এই ছেলেটির হাতে উচ্ছুগ্যু করে দিন, ভাবনা চিন্তে সব চুকুক, আর রঞ্জনটিও আমাদের আপনার লোক হয়ে যাক।"

রঞ্জনের কপালেব শিরা লাফাইয়া ফুলিয়া উঠিল। আঘাতের ধাক্কাটা অবিচলিত ভাবে গোপন করিতে, তাড়াতাড়ি অঞ্জলি পূরিয়া আম লইয়া রঞ্জন রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। সজল নয়নে চাহিয়া চাহিয়া ছবির জননী ভাবিলেন "আহা অমন আম্নি-সো জামাই হওয়া ভাগ্যের কথা!"

রঞ্জন ফিরিয়া আসিয়া বসিল, অন্য প্রসঙ্গের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। কিন্তু রঞ্জন সে সকল কথা আর শুনিতে পাইল না। তাহার উদ্যত আনন্দফুল্ল শ্রবণশক্তি—সহসা কালান্তকের শরবিদ্ধ মুমূর্ষুর মত প্রাণের মাঝে লুকাইয়া পড়িল। হায় অশুভক্ষণে সেই তুচ্ছ ব্যঙ্গ উচ্চারিত হইয়াছিল—রঞ্জনের অন্তরে সেটা সাংঘাতিক বাজিয়াছে, থাকিয়া থাকিয়া রঞ্জন কেবলই অধীর হইয়া উঠিতেছিল। কঠিন পৌরুষের তীব্র ভ্রূকুটি-ভঙ্গিমায় যতই সেই মোহময় উদ্বেগটাকে সজোরে ধাক্কা মারিয়া তাড়াইবার

চেষ্টা করিতে লাগিল ব্যাপারটা ততই দৃঢ় হইয়া তাহার অন্তরে প্রতিঘাত করিতে লাগিল। কি বিপদ! —রঞ্জন আকুল হইয়া উঠিল। কথাটা ক্রমশঃ তাহার সমস্ত মনটা জুড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল। কোন রকমে শিষ্টাচার বজায় রাখিয়া বিদায় লইয়া রঞ্জন খিড়কির দুয়ার দিয়া বাহির হইল। সুবিধা হইত বলিয়া সে এই পথ দিয়াই প্রায় বাটী যাইত।

খিড়কির বাহিরে, খোলা জমীতে, বালির গণ্ডী কাটিয়া মহা উৎসাহ্ আস্ফালনে ছেলেরা সব খেলায় মাতিয়াছে। কেবল ছবি একাকী, ও-দিকের রাস্তার ধারে বেড়ার কাছে দাঁড়াইয়া, একজন উড়িয়া স্ত্রীলোকের সহিত কথা কহিতেছিল। ছবি বড় হইয়াছে, সে কি আর খেলিতে পারে? —ছিঃ! তাহার কাজ এখন সকলকে আটকাইয়া খেলা করান।

রঞ্জনের পা আর সরিল না, চিত্রার্পিতের মত দুয়ার অবলম্বনে দাঁড়াইয়া আত্মবিস্মৃত রঞ্জন গভীর বিহ্বলতায় ছবির পানে চাহিয়া রহিল—আহা কি চমৎকার ছবিটি! রঞ্জনের মস্তিষ্কে ঘনীভূত উত্তেজনা জমাট বাঁধিয়া উঠিল।

ছবি স্ত্রীলোকটিকে আত্ম-পরিচয় দিতেছে, "আমার সবাই আছে, কেবল বাবা নাই।"

কথাটা রঞ্জনের মর্ম্মভেদ করিয়া ধ্যানস্থ হৃদয়ের সমবেদনার তারে সূক্ষ্ম আঘাতে গভীর করুণার আকুল ঝঞ্ঝনা বাজাইয়া তুলিল! —আহা তাহারো যে পিতা নাই!

সহসা তাহার স্বপ্নপূর্ণ চিত্ত আলোড়িত করিয়া তীব্র গ্লানির ধিক্কারে ক্ষণমধ্যে তাহার সহানুভূতিপূর্ণ সুখের আবেশে রচিত চিন্তা-গ্রন্থি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ক্ষুব্ধতাক্ষিপ্ত প্রাণ নিষ্করুণ যন্ত্রণায় হাহাকার করিয়া উঠিল হায় হায় সে করিতেছে কি? —করিতেছে কি! ভগবান জগন্নাথ দেব, তোমার আশ্রিত অনুগত সেবকের অন্তরে একি প্রলয়ঙ্কর প্রলোভনময় আকাঙ্ক্ষার দাবানল প্রজ্বলিত করিলে ঠাকুর! —রক্ষা কর রক্ষা কর প্রভু!

মাতালের মত টলিতে টলিতে রঞ্জন পথে নাবিয়া পড়িল।

(৪)

পরদিন শ্রীমন্দিরে মেসোমশায়ের সহিত রঞ্জনের দেখা হইল। সকলকে লইয়া তিনি দেবতা দর্শনে আসিয়াছেন। রঞ্জনকে ডাকিয়া বলিলেন, "ঠাকুর আজ একবার ভাল করে দর্শন করিয়ে দাও, আজই তো শেষ, আর তো হবে না।"

"হবে না। কেন বাবু?"

"কাল যে আমরা দেশে ফিরব, ঠাকুর।"

নিমেষমধ্যে কে যেন রঞ্জনের হৃদপিণ্ডের শিরাগুলি তপ্ত সাঁড়াশীতে সজোরে চিম্‌টাইয়া ধরিল, কাল! কালই—এত শীঘ্র! পীড়িত মর্ম্ম ভেদ করিয়া, বুকের মাঝখানে, বার বার আর্তপ্রশ্ন ধ্বনিত হইতে লাগিল—কাল, কালই, এত শীঘ্র! হায় দুর্ভাগ্য!

কোমরে কসিয়া চাদর বাঁধিয়া, সজোরে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া রঞ্জন মনে মনে ভাবিল "আমারই অন্যায়!"

"আবার কবে আসবেন বাবু!"

"আবার!"—রহস্যচ্ছলে হাসিয়া মেসোমশাই বলিলেন "জগন্নাথ আবার যখন ডুরি ধরে টানবেন তখন আসব, কি বল্লেন দিদি?"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া ছবির জননী মন্দির-পানে চাহিয়া বলিলেন "আহা তা আর নয়! জগবন্ধু আবার যখন মনে করবেন তখন আসব।

ম্লানমুখে ক্লিষ্টহাসি হাসিয়া রঞ্জন বলিল "তিনি সবাইকে মনে করেন মা, কিন্তু তাঁকে তো সবাইকার মনে পড়ে না।"

মেসোমশাই গম্ভীর মুখে বলিলেন "ঠিক।"

"তা হলে সবাইকে নিয়ে রথের সময় আসবেন বাবু।" কথাটা বলিয়াই দুঃসহ কুণ্ঠা রঞ্জনের

কণ্ঠ যেন চাপিয়া ধরিল, রঞ্জন তাড়াতাড়ি সকলকে লইয়া অগ্রসর হইল। চলিতে চলিতে মেসোমশাই বলিলেন, "রঞ্জন তুমি আজ বিকালে আমাদের বাসায় যাবে?"

"না বাবু, পাণ্ডার জরুরী কাজ আছে।"

"তাইত তোমার সঙ্গে যে তা হলে আর দেখা হবে না, আমরা কাল সকালের ট্রেনেই যে রওনা হব।"

ব্যস্তভাবে ছবির জননী বলিলেন, "তা হলে এইখানেই—"

"হ্যাঁ তাই হবে।"

সকলে মন্দিরে ঢুকিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিগ্রহকে প্রণাম করিয়া সকলে মন্দির প্রাঙ্গণে আবার সমবেত হইলেন। অকস্মাৎ-দৃষ্ট একটি পরিচিত লোকের সহিত মেসোমহাশয় একটু তফাতে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন দেখিয়া রঞ্জনও অন্যদিকে সরিয়া গেল, কয়েক ছড়া কর্পূরের মালা হাতে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে অন্যমনস্কভাবে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া ভাবিতেছিল। মর্ম্মান্তিক কাতরতায় তাহার সারা অন্তঃকরণটা আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল। হায় কাল হইতে সে আর ইহাদিগকে দেখিতে পাইবে না!

খানিক পরে মেসোমশাই ফিরিলেন। রঞ্জন আসিয়া মেসোমশায়ের গলায় একছড়া মালা পরাইয়া ছেলেদের সকলের গলায় একছড়া মালা দিল। রমণীদের সকলের হাতে হাতে এক এক ছড়া মালা বিলাইয়া—অবশিষ্ট মালা-ছড়াটা হাতে করিয়া মার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল "মা, এ মালাটি আপনার ছবিকে দিন।"

মমতাভরা মুখে চাহিয়া একটু হাসিয়া মা বলিলেন "তুমিই দাও না ঠাকুর।"

ঠাকুর চকিতনেত্রে একবার ছবির পানে তাকাইল। তাহার পর মুহূর্ত্তের জন্য একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "না, মা, আপনি দিন।"

রুমাল হইতে গুটিকয়েক টাকা খুলিয়া ছবির হাতে দিয়া মেসোমশাই বলিলেন, "ছবি ঠাকুরকে প্রণাম কর মা।" —ঠাকুরের চোখের সামনে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া উঠিল।

মাটীতে টাকা রাখিয়া ছবি প্রণাম করিল। কম্পিত হস্তে টাকা তুলিয়া মার হাতে দিয়া ঠাকুর বলিল "আমি আপনার ছবিকে আশীর্ব্বাদ করলুম মা।" চিরপ্রচলিত প্রথার অপব্যবহার!

"ওকি ঠাকুর, টাকা নাও, ছবির ওতে অকল্যাণ হবে, তুমি আমাদের কত উপকার করেছ,—"

গভীর দুঃখভরা হাসি হাসিয়া রঞ্জন বলিল—"টাকা নিয়ে উপকার বিক্রী করি না মা, এ টাকা আপনার পাণ্ডার ছড়িদারদের পাওনা"—চট করিয়া রঞ্জন ভিড়ের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। লোকটার আত্মম্ভরিতায় হাড়ে হাড়ে চটিয়া বিদ্বেষ-বিস্ফারিত নয়নে পাণ্ডার চেলারা চাহিয়া রহিল।

(৫)

পরদিন মেসোমশাইরা দেশে ফিরিয়া গেলেন। মনে একান্ত আগ্রহ থাকিলেও কর্ত্তব্যপরায়ণ রঞ্জন বিদায়ের শেষ মুহূর্ত্তে তাঁহাদের কাছে উপস্থিত থাকিতে পারিল না। পরাধীন জীবনের ক্লান্তিশূন্য কর্ম্মস্রোতের প্রবল তোড়ে দুর্দ্দম্য আকাঙ্ক্ষাকে নিঃশব্দে তৃণের মত ভাসাইয়া দিয়া কোলাহলের মধ্যে ডুবিয়া প্রাণের মহাশূন্যতাকে কোন রকমে পূর্ণ করিতে চাহিল, পারিল কিনা কে জানে!

দিনের পর দিন কাটিয়া চলিল, রঞ্জন মেসোমশায়ের পাণ্ডার কাছে সন্ধান লইতে লাগিল, তাঁহারা আসিবেন কি না, পত্রাদি কিছু আসিয়াছে কি?

কিছুই না! —হতাশার নিদারুণ নিষ্পেষণে রঞ্জনের আবেগ ক্রমশঃ বাড়িয়াই উঠিতে লাগিল। হায়, মেসোমশায়ের আসার গুরুত্ব কি তাহার মনের আকুলতার চেয়ে বেশী? কখনই না!

ক্রমে রথের সময় কাছাকাছি হইতে লাগিল। পাণ্ডার কাছারিতে রঞ্জনের যাওয়া আসাটা ঘন ঘন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু বিফল প্রয়াস। পাণ্ডা কোন খবরই জানে না। অবশেষে সকল

সঙ্কোচ দূরে ঠেলিয়া রঞ্জন নিজে পত্র লিখিতে বসিল। পত্র লিখিল। তাহার পর একবার তাহা পাঠ করিল, হঠাৎ কি ভাবিয়া তাহার কান দুইটা লাল হইয়া উঠিল, তৎক্ষণাৎ পত্রখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া সমুদ্রের জলে ভাসাইয়া দিল। ছিঃ! তাহার ছেলেমানুষী দেখিয়া তাঁহারা কি মনে করিবেন?

তবু রঞ্জন নিজেকে আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। রথের দিন যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, তাহার অধীরতাও তত বাড়িতে লাগিল, জীবন্ত আশা বুকে করিয়া সে প্রত্যহ ষ্টেশনে আসিয়া ব্যগ্র উৎকণ্ঠায় চতুর্দ্দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত, বিদেশ হইতে শত শত যাত্রী আসিতেছে, যাইতেছে, কিন্তু কই? যাহাদের খুঁজিতেছে তাহারা কই?

সুদক্ষ কর্ম্মচারী—কাজে অমনোযোগী হওয়ায় প্রভু দুই চারিদিন মিঠে কড়া বচনে তাহাকে সাবধান হইতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু উদ্বিগ্ন রঞ্জনের কানে সে কথা স্থান পাইল না। ক্রমে রথের দিন আসিয়া পড়িল। জগন্নাথ রথে উঠিলেন, নাবিলেন, শুইলেন, পাশ ফিরিলেন—অবশেষে উঠিয়া বসিলেন পর্য্যন্ত, তথাপি মেসোমশায়ের দেখা নাই। পূজার ছুটি আসিল, ফুরাইল, তথাপি কাহারো খোঁজ নাই!

হায়! পৃথিবীতে কেহ কাহারো অন্তর্ভেদী যাতনা বোঝে না! রঞ্জন গণিয়া গণিয়া প্রতি মুহূর্ত্ত যাপন করিতেছিল। অবশেষে পূজার ছুটীর পর যখন দাসত্বজীবী, ধনগর্ব্বী হাওয়া-খাইয়েরা দলে-দলে পুরী ছাড়িতে লাগিল, তখন রঞ্জন আর ভারাক্রান্ত মনটাকে লইয়া কোনমতে পুরীতে তিষ্ঠাইতে পারিল না। সে যখন কোন দিকে কিছু প্রতিকার খুঁজিয়া পাইল না তখন একদিন পাণ্ডার কাজে জন্মের মত জবাব দিয়া হঠাৎ ষ্টেশনে আসিয়া বঙ্গদেশের টিকিট কিনিয়া ট্রেনে চাপিয়া বসিল।

(৬)

গত রাত্রে ছবির বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আজ বর কন্যা বিদায়। মধুর প্রভাতী সুরের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই, সানাইয়ে সেই সবে, বিদায়ের করুণ-রাগিনী বাজিতেছে,—সুর বায়ুর স্তরে স্তরে ঘনায়মান হইয়া উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধে পুঞ্জীকৃত বেদনায় ঠেলিয়া উঠিতেছে।

একটা লোক অত্যন্ত ব্যস্তভাবে, ব্যগ্র ঔৎসুক্যের সহিত বিবাহবাটীর চারিদিকে ক্রমাগত দ্রুতবেগে ঘুরিতেছে; তাহার মুখে উজ্জ্বল আনন্দ ও আকুল আতঙ্ক—যেন আসন্ন ভীষণতায় গাঢ়ভাবে ঘনাইয়া আসিয়াছে; লোকটার ভাব দেখিযা বোধ হয় সে যেন বাড়ীর ভিতরকার সমাবোহের তত্ত্বনির্ণয়ে উদ্‌গ্রীব। কিন্তু না—তাহাও তো হইতে পারে না, উৎসবের কারণ জ্ঞাত হওয়া তো কিছুই দুরূহ ব্যাপার নয়, দলে দলে লোক বাড়ী ঢুকিতেছে, বাহির হইতেছে, —চারিদিকে ঘুরিতেছে। —কতবার কত লোকের সহিত তাহার মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি হইয়া যাইতেছে, তথাপি কই, সে তো কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছে না, —বরং বন্দুকের গুলির মুখ হইতে যেমন শিকার ত্রস্তে পলায়ন করে, সেও সেইরূপ কুণ্ঠিতভাবে সরিয়া যাইতেছে। লোকটার রকম কি?

কিছুক্ষণ পরে, বাড়ীর কোলাহলের ঘনঘটা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল, শীগ্‌গী নাও, শীগ্রী নাও, ট্রেনের আর সময় নেই,—চারিদিকে এমনি একটা কলরব দ্বিগুণ মুখরতায় উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। সকলের ব্যস্ততার মাত্রা চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল।

প্রাণপণে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া, এইবার অন্তিম সাহসে ভর করিয়া, লোকটা বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। উৎসবের বাড়ীতে কে কাহার পানে চাহিতেছে? লোকটা অবাধে গিয়া বাড়ীর ভিতরে উপস্থিত হইল।

প্রাঙ্গণে আলিপনা-আঁকা পীঁড়ির উপর বর ও বধূকে দাঁড় করাইয়া, পৌরাঙ্গনারা তখন মাঙ্গলিক ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতেছিল। চারিদিকে শাঁখ ও উলুধ্বনির উচ্চ শব্দ।—লোকটা গিয়া একেবারে আসন্ন আগ্রহে ঝুঁকিয়া পড়িল। অকস্মাৎ বজ্রাগ্নি সম্পাতে তাহার চক্ষু যেন ঝলসিয়া গেল। প্রচণ্ড উন্মত্ত হৃদপিণ্ডটাকে সবলে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া সযত্নে পদশব্দ লুকাইয়া—সূর্য্যের উজ্জ্বল

আলোকের মাঝে—সন্তর্পণে আপনাকে গোপন করিয়া নিঃশব্দে সে বাহিরে আসিল। কোলাহলময় জগৎ সহসা বিরাট নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া গেল! চারিদিক মৃত্যুমলিন পাংশুবর্ণে রঞ্জিত হইয়া গেল, কোন দিকে একটা ক্ষীণ শব্দ অবধি আর তাহার কানে শুনা গেল না—শুনিতে সাহসও হইল না। একটা নিঃশ্বাসের শব্দ—না না, পবন অচল হৌক, রুদ্ধ বায়ুতে সমস্ত জগৎ ধ্বংস হইয়া যাক্—সে বরং সহ্য হইবে, তবু এ সুসজ্জিত উৎসব-ক্ষেত্রে মর্ম্মভেদী ব্যর্থতার ঈষৎস্ফুরণ! —না না, সে কিছুতেই হইবে না! কিছুতেই না! যুগ-প্রলয়ের মহা ঝটিকা ভয়াবহ কঠিনতার গহ্বরে ধীরে ধীরে সুপ্তিলাভ করিল, কেহ দেখিল না, কেহ জানিল না, কেহ ফিরিয়া তাকাইল না! —ভগবান জগবন্ধু দেব! এখনো কামনা, এখনো একটি ভিক্ষা ঠাকুর, এক মুহূর্ত্তের জন্য এতটুকু শক্তি ভিক্ষা দাও ঠাকুর—ওগো দয়াময় এতটুকু বল, এতটুকু শুধু বল দাও!

সুউচ্চ হর্ষনিনাদের মধ্যে একটুখানি ক্রন্দনের অভিনয় সমাপ্ত হইলে প্রকাণ্ড অশ্বযুক্ত ঝকঝকে চকচকে ফিটনে, বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত বর বধূ সমারূঢ় হইল। গুরু গম্ভীর শব্দে মাটীর অভ্যন্তরে কম্পন-হিল্লোল তুলিয়া ফিটন ছুটিল। অগ্রপশ্চাতে আরো কয়েকখানা গাড়ীতে বরযাত্রীর দল চলিয়াছে।

গাড়ী অনেক দূর আসিয়াছে। হঠাৎ বেগগামী গাড়ীর হাতল ধরিয়া ছুটিতে ছুটিতে একটা লোক সেই চলন্ত গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। লোকটার চক্ষু নিষ্পলক, মুখে দৃঢ় কঠোরতা, হস্ত পদে মৃত্যুর শীতলতা, শরীরে শোণিতশূন্যতা, স্পষ্ট প্রতীয়মান। সে কোন দিকে না চাহিয়া, বরের গলায় একছড়া কর্পূরের মালা পরাইয়া দিয়া অচঞ্চল কণ্ঠে বলিল "জগন্নাথ দেবের সেবাইত ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ, আপনার জীবন সফলতায় চির গৌরবময় হোক।"

বর নত মস্তকে নমস্কার করিল।

তার পরে আরো কঠিন হইয়া, আরো অসঙ্কোচে—অবগুণ্ঠিতা বধূর হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া আর-একগাছি কর্পূরের মালা জড়াইয়া দিতে দিতে ধীরে ধীরে, পরিষ্কার স্বরে বলিল "এই ক্ষণধ্বংসী কর্পূরের মত—তোমাদের জীবনের সমস্ত মালিন্য লুপ্ত হয়ে যাক, ভগবান জগন্নাথদেবের নামে আশীর্ব্বাদ করি তোমরা শান্তিময় সুখে সুখী হও।"

বক্তাব ললাটে গভীর স্নিগ্ধতার সহিত মহিমাময় বিজয়শ্রীর দীপ্ত জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। মোহের দাসত্বের মুক্তি লাভে, আত্মজয়ের পূর্ণ সন্তোষে, মহা পূর্ণতায় প্রাণ পূর্ণ হইয়া গেল! প্রসন্ন সার্থকতায় সারা জগৎ ভরিয়া উঠিল। অপার্থিব শান্তির কিরণে সহসা চরাচর পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সে কি তৃপ্তি! কি আনন্দ! কি সুমহান্ জয়োল্লাস!

কণ্ঠস্বরে চমকিয়া বিস্ময়ব্যাকুলা ছবি অশ্রুসিক্ত অবনত দৃষ্টি তুলিয়া যখ.. কুণ্ঠিতভাবে বক্তার পানে তাকাইল, তখন সে গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছে! ছবি চিনিতে পারিল না, শুধু তার উদ্দেশে নমস্কার করিল। গাড়ী ছুটিয়া চলিল।

১৮ ই. জ্যৈষ্ঠ ১৩২২



মৌরীফুল

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্ধকার তখনও ঠিক হয় নাই। মুখুয্যে-বাড়ীর পিছনে বাঁশবাগানে জোনাকীর দল সাঁজ জ্বাল্‌বার উপক্রম করিতেছিল। তাল-পুকুরের পাড়ে গাছের মাথায় বাদুড়ের দল কালো হইয়া ঝুলিতেছে—মাঠের ধারে বাঁশ বাগানের পিছনটা সূর্য্যাস্তের শেষ-আলোয় উজ্জ্বল। চারিদিক বেশ কবিত্বপূর্ণ হইয়া আসিতেছে, এমন সময় মুখুয্যেদের অন্দর-বাড়ী হইতে এক তুমুল কলরব আর হৈ চৈ উঠিল।

বৃদ্ধ রামতনু মুখুয্যে শিবকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য। তিনি রোজ সন্ধ্যাবেলায় আহুতি দিয়া থাকেন, এজন্য প্রায় একপোয়া খাঁটি গাওয়া ঘি তাঁর চাই। তিনি নানা উপায়ে এই ঘি সংগ্রহ করিয়া ঘরে রাখিয়া দেন। অন্যদিনের মত আজও তাকের উপর একটা বাটিতে ঘি-টা ছিল, তাঁর পুত্রবধূ সুশীলা সেই বাটি তাকের উপর হইতে পাড়িয়া সে ঘিটার সমস্তই দিয়া খাবার তৈয়ারী করিয়াছে।

রামতনু মুখুয্যে মহকুমার কোর্টে গিয়াছিলেন। ও-পাড়ার চৌধুরীদের পক্ষে একটা মোকদ্দমার সাক্ষ্য দিতে। বিপক্ষের উকীল তাঁকে জেরার মুখে জিজ্ঞাসা করেন—"আপনি গত মে মাসে পাঁচু রায় আর তার ভাইয়ের পাঁচীলের জায়গা নিয়ে মামলায় প্রধান সাক্ষী ছিলেন না?"

রামতনু মুখুয্যে বলিয়াছিলেন—হাঁ তিনি ছিলেন।

উকীল পুনরায় জেরা করিয়াছিলেন—"দু-নালির চৌধুরীদের কানসোনার মাঠের দাঙ্গার মোকদ্দমায় আপনি পুলিসের দিকে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন কি না?"

রামতনু মুখুয্যে মহাশয়কে ঢোক গিলিয়া স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে তিনি দিয়াছিলেন বটে।

বিপক্ষের উকীল আবার প্রশ্ন করেন—"আচ্ছা এর কিছুদিন পরেই বড়-তরফের স্বত্বের মামলায় আপনি বাদী পক্ষের সাক্ষী ছিলেন কি না?"

কবে তিনি এ সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, মুখুয্যে মহাশয় প্রথমটা তাহা মনে করিতে পারেন নাই, তার পর বিপক্ষের উকীলের পুনঃপুনঃ কড়া প্রশ্নে এবং মুন্সেফবাবুর ভ্রূকুটি-মিশ্রিত দৃষ্টির সম্মুখে হতভাগ্য রামতনুর মনে পড়িয়াছিল যে তিনি এ সাক্ষ্য দিয়াছিলেন বটে এবং এই গত জুলাই মাসে এই কোর্টেই তাহা তিনি দিয়া গিয়াছেন।

তাহার পর কোর্টে কি ঘটিয়াছিল, বিপক্ষের উকীল হাকিমের দিকে চাহিয়া রামতনুর উপর কি ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছিলেন, রামতনু উকীল আম্‌লায় ভর্ত্তি মুন্সেফ-বাবুর এজলাসে হঠাৎ কিরূপে সপুষ্পা সর্ষপক্ষেত্রের আবিষ্কার করেন, সে-সকল কথা উল্লেখের আর প্রয়োজন নাই। তবে মোটের উপর বলা যায়, রামতনু মুখুয্যে যখন বাটী আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন তাঁর শরীরের ও মনের অবস্থা খুবই খারাপ। কোথায় এ অবস্থায় তিনি ভাবিয়াছিলেন পা হাত ধুইয়া ঠাণ্ডা হইয়া শ্রীগুরুর উদ্দেশে আহুতি দিয়া অনিত্য বিষয়বিষে জর্জ্জরিত মনকে একটু স্থির করিবেন, না দেখেন যে আহুতির জন্য আলাদা করিয়া তোলা যে ঘি-টুকু তাকে ছিল, তার সবটাই একেবারে নষ্ট হইয়াছে!

তার পর প্রায় অর্দ্ধ-ঘণ্টা ধরিয়া মুখুয্যে-বাড়ীর অন্দর মহলে একটা রীতিমত কবির লড়াই চলিতে লাগিল। মুখুয্যে মহাশয়ের পুত্রবধূ সুশীলা প্রথমটা একটু অপ্রতিভ হইলেও সামলাইয়া লইয়া এমন সব কথায় শ্বশুরকে জবাব দিতে লাগিল যাহা একজন আঠারো-বৎসর-বয়স্কা তরুণীর মুখে সাজে না। পক্ষান্তরে কোর্টে বিপক্ষের উকীলের অপমানে ওঘরে আসিয়া পুত্রবধূর নিকট অপমানে ক্ষিপ্তপ্রায় রামতনু মুখুয্যে পুত্রবধূর পিতৃকুল ও তাঁহার নিজের পিতৃকুলের তুলনামূলক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া এমন সব দুরূহ পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার করিতে লাগিলেন যেন বোধ হয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভুবালের গল্পে উল্লিখিত কুলাদর্শ-বিদ্যা অধ্যয়ন না করিলে সে-সব বুঝা একেবারেই অসম্ভব।

এমন সময় মুখুয্যে মহাশয়ের ছেলে কিশোরী বাড়ী আসিল, তাহার বয়স ২৫।২৬ হইবে, বেশী লেখাপড়া না শেখায় সে চৌধুরীদের জমিদারী কাছারীতে ৯ টাকা বেতনে মুহুরীগিরি করিত।

কিশোরীলাল নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল ঘরে আলো দেওয়া হয় নাই, অন্ধকারেই জামা কাপড় ছাড়িয়া সে বাহিরে হাত পা ধুইতে গেল। তার পর ঘরে ঢুকিয়া শুনিল, ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘরে সুশীলা তাহার সম্মুখের বাতাসকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে যে এ সংসারে থাকিয়া সংসার করা তাহার শক্তিতে কুলাইবে না, অতএব কাল সকালেই যেন গরুর গাড়ী ডাকাইয়া তাহাকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

কিশোরী সে কথার কোন বিশেষ জবাব না দিয়া লণ্ঠন জ্বালিয়া ও বাঁশের লাঠিগোছা ঘরের কোণ হইতে লইয়া বাহির হইয়া গেল। ও-পাড়ায় রায়-বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে গ্রামের নিষ্কর্ম্মা যুবকদিগের যাত্রার আখ্‌ড়াই ও রিহার্সেল চলিত—সেইখানে অনেকক্ষণ কাটাইয়া অনেক রাত্রে ফিরিয়া আসা তাহার নিত্যকর্ম্মের ভিতর।

রামতনু মুখুয্যে মহাশয়ও অনেকক্ষণ বাহিরের ঘরে কাটাইলেন। প্রতিবেশী হরি রায় তামাকের খরচ বাঁচাইবার জন্য সকাল সন্ধ্যায় মুখুয্যে মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপ আশ্রয় করিতেন; তাঁহাকে রামতনু জানাইলেন যে তিনি খুব শীঘ্রই কাশী যাইতেছেন, কারণ আর এ-বয়সে ইত্যাদি।

তাঁহার এ বানপ্রস্থ অবলম্বনের আকাঙ্ক্ষার জন্য দায়ী একমাত্র তাঁহার পুত্রবধূ সুশীলা। সুশীলা সকাল নাই সন্ধ্যা নাই একটা কিছু না বাধাইয়া থাকিতে পারে না। সে অত্যন্ত আনাড়ি, কোন কাজই গুছাইয়া করিতে পারে না, অথচ দোষ দেখাইতে যাইলে ক্ষেপিয়া যায়। তাহার জন্য রামতনু মুখুয্যের বাড়ীতে কাক চিল বসিবার উপায় নাই। শ্বশুর-শাশুড়ীকে সে হঠাৎ আঁটিয়া উঠিতে পারে না বটে, কিন্তু এজন্য তাহার চেষ্টার ত্রুটি দেখা যায় না।

অনেক রাত্রে কিশোরী বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দেখিল তাহার ঘরে খাবার ঢাকা আছে এবং স্ত্রী ঘুমাইতেছে। খাবারের ঢাকা খুলিয়া আহারাদি শেষ করিয়া সে শুইতে গিয়া দেখিল স্ত্রী ঘুম-জড়ানো চক্ষে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াছে। স্বামীকে দেখিয়া একটু অপ্রতিভের সুরে বলিল—"কখন এলে? তা আমায় একটু ডাকলে না কেন?"

কিশোরী বলিল—"আর ডেকে কি হবে? আমার আর কি হাত পা নেই! নিতে জানিনে?"

হঠাৎ তাহার স্ত্রী রাগিয়া উঠিল—"নিতে জান তো জেনো। কাল থেকে আমার এখানে আর বন্‌বে না। এ যেন হয়েছে শত্রুপুরীর মধ্যে বাস—বাড়ীসুদ্ধ লোক আমার পেছনে এমন করে' লেগেছে কেন শুনতে চাই। না হয় বরং—"

কান্নায় ফুলিয়া সে বালিসের উপর মুখ গুঁজিল।

কিশোরী দেখিল স্ত্রী রাত দুপুরের সময় গায় পড়িয়া ঝগড়া করিয়া একটা বিভ্রাট বাধাইয়া তোলে। এরকম করিয়া আর সংসার করা চলে না—ভাত ঢাকা ছিল, খুলিয়া লইয়া খাইয়াছে, ইহাতেও যদি স্ত্রী চটিয়া যায় তাহা হইলে আর পারা যায় না। কিছু না, ও একটা ছল, ঐ সামান্য সূত্র ধরিয়া এখনি সে একটা রাম-রাবণের যুদ্ধ বাধাইয়া তুলিবে।

কিশোরী বলিল—"যা খুশী কালকে কোরো—এখন একটু ঘুমুতে দাও। ঘুমুচ্ছিলে বলেই আর ডাকিনি এই তো অপরাধ? তা বেশ কাল থেকে ওঠাবো, চুলের নড়া ধরে' ওঠাবো।"

সুশীলা কথাও বলিল না, মুখও তুলিল না, বালিসে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

পরদিন সকালে উঠিয়া রামতনু মুখুয্যে শুনিলেন চৌধুরীরা খবর পাঠাইয়াছে কয়েকটি নূতন সাক্ষীর তালিম দিতে হইবে। যাইবার সময় তিনি বলিলেন—"ও বৌমা, একটু সকাল-সকাল ভাত দিয়ো, কোর্টে যেতে হবে।" বেলা ৯টার সময় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন সুশীলা স্নান করিয়া আসিয়া রৌদ্রে কাপড় মেলিয়া দিতেছে, গৃহিণী মোক্ষদাসুন্দরী রান্নাঘরে বসিয়া রাঁধিতেছেন। স্বামীকে দেখিয়াই মোক্ষদা চৌকীদার হাঁকার সুরে বলিতে লাগিলেন—"হয় আমি একদিকে বেরিয়ে যাই, না হয় বাপু এর একটা বিহিত করো। সেই সকাল থেকে ঘুরপাক দিয়ে দিয়ে বেড়াচ্ছে, বলচি—ও বৌমা, দুটো

ভাত চড়িয়ে দাও, ওগো যা হয় দুটো কিছু রাঁধ—হাতে পায়ে ধরতে কেবল বাকি রেখেছি। কার কথা কে শোনে? —এই বেলা দুপুরের সময় রাণী এখন এলেন নেয়ে—"

সুশীলা রক হইতে সমান গলায় উত্তর দিল—"মাইনে করা দাসী ত নই, আমি যখন পারবো তখন রান্না চড়াবো—সকাল থেকে বসে' আছি নাকি? এত খাটুনি সেরে আবার আটটার মধ্যে ভাত দেবো—মানুষের তো আর শরীর নয়—যার্ না চলবে সে নিজে গিয়ে রেঁধে নিক—"

এই কথার উত্তরে মোক্ষদা খুন্তী হাতে রান্নাঘরের দাওয়ায় আসিয়া নটরাজ শিবের তাণ্ডব নর্ত্তনের একটা আধুনিক সংস্করণ শুরু করিতে যাইতেছিলেন—একটা ঘটনায় তাহা বন্ধ হইয়া গেল।

একটা দশ-বার বৎসরের ছেলে, রংটা বড়ই কালো, ম্যালেরিয়ায় শরীর জীর্ণশীর্ণ, পরনে অতি ময়লা এক গামছা, শীতের দিনেও তাহার গায়ে কিছু নাই, হাতে একটা ছোট বাখারীর ছড়ি লইয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। ছেলেটি পাশের গ্রামের আতরালি ঘরামির ছেলে, গত বৎসর তার বাপ মারা গিয়াছে, দুটি ছোট ছোট বোন আর মা ছাড়া তার আর কেহ নাই। অবস্থা খুব খারাপ, সবদিন খাওয়া জুটে না, ছেলেটা পিঠে ছড়ি বাজাইয়া হাপু গাহিয়া মা ও বোন দুটিকে প্রতিপালন করে। সে এগ্রামের প্রায় সব বাড়ীতে আসিত, কিন্তু মুখুয্যে-বাড়ী আর কখনো আসে নাই, তাহার একটা কারণ এই যে দানশীলতার জন্য রামতনু মুখুয্যে গ্রামের মধ্যে আদৌ প্রসিদ্ধ ছিলেন না।

ছেলেটি উঠানে দাঁড়াইয়া বগল বাজাইয়া নানারূপ সুর করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাপু গাহিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে পিঠে জোর করিয়া লাঠির বাড়ি মারিতে লাগিল।

তিনটি নেহাৎ গো-বেচারী সাক্ষীর তালিম দিতে অনেক ধস্তাধস্তি করিয়া রামতনুর মেজাজ ভাল ছিল না, ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—"থাম্—থাম্, ও-সব রাখ এখন ওসব দেখবার সখ নেই—যা অন্য বাড়ী দেখগে যা—যা"

সুশীলা কাপড় মেলিয়া দিতে দিতে অবাক হইয়া হাপু গাওয়া দেখিতেছিল—ছেলেটি সঙ্কুচিত হইয়া বাহিরে যাইতেই সে তাড়াতাড়ি বাহিরের রকে গিয়া তাহাকে ডাকিয়া বলিল—"শোন্, তোর বাড়ী কোথায় রে?"

—হরিষপুর, মা-ঠাকরুণ।

—তোর বাড়ীতে কে আছে আর?

—মোর বাপ মারা গিয়েছে আর-বছর মা-ঠাকরুণ—মোদের আর কেউ নেই, মুই বড়, মোর ছোট দুটো বোন আছে—

—তাই বুঝি তুই হাপু গাস্? হ্যাঁ রে এতে চলে?

রামতনুর ধমক খাইয়া ছেলেমানুষ অত্যন্ত দমিয়া গিয়াছিল, সুশীলার কথার ভিতর সহানুভূতির সুর চিনিয়া লইয়া হঠাৎ তাহার কান্না আসিল—চোখের জল হু হু করিয়া পড়িতেই ম্যালেরিয়াশীর্ণ হাতটি তুলিয়া চোখ মুছিয়া বলিল—না, মা-ঠাকরুণ, চলে না। এ-সব লোকে আর দেখ্‌তি চায় না। মুই যদি ভাল গান গাইতি পার্ত্তম তো যাত্রার দলে যাতাম, বড় কষ্ট মোদের সংসারের—এই শীতি মা-ঠাকরুণ—

সুশীলা বাধা দিয়া বলিল, "দাঁড়া, আমি আসচি।"

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া কান্নার বেগ অতিকষ্টে সামলাইয়া চাহিয়া দেখিল আলনায় একখানা নতুন মোটা বিছানার চাদর ঝুলিতেছে—হাতের গোড়ায় সেইখানা পাইয়া সেইখানা টান দিয়া লইল। তার পর জানালা দিয়া বাড়ীর মধ্যে চাহিয়া দেখিয়া চাদরখানা তাড়াতাড়ি ছেলেটির হাতে দিয়া চুপিচুপি বলিল—"এইখানা নিয়ে যা, এতে শীত বেশ কাটবে। কাটবে না? খুব মোটা। শীগ্‌গির যা, লুকিয়ে নিয়ে যা কেউ না দেখে—"

ছেলেটা চাদর হাতে হতবুদ্ধি হইয়া ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া সুশীলা বলিল—"ওরে এক্ষুনি কে এসে পড়বে, শীগ্‌গীর যা—"

ছেলেটাকে বিদায় দিয়া সুশীলা বাড়ীতে ঢুকিয়া দেখিল শ্বশুর আহার করিতে বসিয়াছেন।

ছেলেটার দুঃখে সুশীলার মন নরম হইয়াছিল, সে গিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া কাজে মন দিল, শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনাকে কিছু দেব বাবা?"

মোক্ষদা ঝঙ্কার দিয়ে উঠিলেন—"তোমাকে আর কিছু দিতে হবে না, যে মিষ্টি বচন দিয়েছ তাতেই প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে, নাও এখন পার তো এদিকে এস একবার, হাঁড়িটা দেখ, নয়ত বলো নিজে মরি বাঁচি একরকম করে সাঙ্গ করে তুলি।"

রামতনু কোন কথা বলিলেন না, আপন মনে খাইয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন। এই সব ব্যাপারেই সুশীলা অত্যন্ত চটিয়া যাইত, রামতনু পুত্রবধূর নিকট কোন জিনিস চাহিয়া খাইলে তাহার রাগ গলিয়া জল হইয়া যাইত, কিন্তু লোকে তাহাকে জব্দ করিতেছে বা অপমান করিবার ফন্দী খুঁজিতেছে ভাবিলে তাহার আর কাণ্ড জ্ঞান থাকিত না, সেও কোমর বাঁধিয়া রণে আগুয়ান হইত। সেই বা ছাড়িবে কেন?

মাস দুই পরে।

ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি, কিন্তু বেশ গরম পড়িয়াছে। কিশোরী অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরিয়াছে। বাড়ীতে যে যার ঘরে ঘুমাইতেছে। সে নিজের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল সুশীলা ঘরের মেজেয় বসিয়া একখানা চিঠি লিখিতেছে। কিশোরী সুশীলাকে জিজ্ঞাসা করিল—কাকে চিঠি লেখা হচ্ছে?

সুশীলা চিঠির কাগজখানা তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া চাপিয়া স্বামীর দিকে ফিরিয়া একটু দুষ্টুমির হাসি হাসিল, বলিল,—বলব কেন?

—থাক, না বল, ভাত দাও। রাত কম হয়নি। আবার সকাল থেকেই খাটুনি আরম্ভ হবে।

সুশীলা ভাবিয়াছিল স্বামী আসিয়া সে কি লিখিতেছে দেখিবার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিবে। প্রকৃতপক্ষে সে চিঠি কাহাকেও লিখিতেছিল না, স্বামীকে কথা বলাইবার এ তার একটা পুরানো কৌশল মাত্র। অনেক দিন সে স্বামীর মুখে দুটো ভাল কথা শুনে নাই, তাহার নারীহৃদয় ইহারই জন্য তৃষিত ছিল এবং ইহারই জন্য সে ঘুমে ঢুলিতে ঢুলিতেও এই সামান্য ফাঁদটি পাতিয়া বসিয়া ছিল—কিন্তু কিশোরী ফাঁদে পা দেওয়া দূরে থাকুক, সে দিকেও ঘেঁসিল না দেখিয়া সুশীলা বড় নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল।

কাগজকলম তুলিয়া রাখিয়া সে স্বামীর ভাত বাড়িয়া দিল। একপ্রকার চুপচাপ অবস্থায় আহারাদি শেষ করিয়া কিশোরী গিয়া শয্যা আশ্রয় করিবার পর, সে নিজে আহারাদি করিয়া শুইতে গিয়া দেখিল কিশোরী ঘুমায় নাই, গরমে এপাশ ওপাশ করিতেছে। আশায় বুক বাঁধিয়া এবার সে তাহার দ্বিতীয় ফাঁদটি পাতিল।

—একটা গল্প বলো না? অনেকদিন তো বলনি, বলবে লক্ষ্মীটি—

বিবাহের পর প্রথম প্রথম কিশোরী তাহার কিশোরী স্ত্রীর নিকট বটতলার আরব্য উপন্যাস হইতে নানা গল্প বলিত। রাত্রির পর রাত্রি তখন এসব গল্প শুনিয়া সুশীলা মুগ্ধ হইয়া যাইত,—জনহীন দেশের মধ্যে যেখানে শুধু জীন পরীদের জগৎ, খেজুর-বনের মধ্যে ঠাণ্ডাজলের ফোয়ার হইতে মণিমুক্তা উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, পথহীন দুরন্ত মরুপ্রান্তরে মৃত্যু যেখানে শিকার সন্ধানে ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে, সমুদ্রে ঝড়, তরুণ শাহজাদাগণের দৈত্যসঙ্কুল অরণ্যের মাঝখান দিয়া নির্ভীক শিকারযাত্রা—এ সব শুনিতে শুনিতে তাহার গা শিহরিয়া উঠিত, ঘুম ভাঙিলে ঘরের মধ্যের অর্দ্ধ-রাত্রির অন্ধকার বিকটাকার জীনদেহের ভিড়ে ভরিয়া গিয়াছে মনে করিয়া সে স্বামীকে জড়াইয়া ধরিত। প্রাচীন যুগের তরুণ শাহজাদাদের কল্পনা করিতে গিয়া অজ্ঞাতসারে সে নিজের স্বামীকেই যাত্রার দলের রাজার পোষাক পরাইয়া দূরদেশে বিপদের মুখে পাঠাইত, শাহজাদাদিগের দুঃখে তাহার নিজের স্বামীর উপর সহানুভূতিতেই তাহার চোখে জল আসিত। এইরকমে গল্প শুনিতে শুনিতে অদৃশ্য নায়ক-নায়িকাদের গুণ দৃশ্যমান গল্পকারের উপরে প্রয়োগ করিয়া সে স্বামীকে ভালবাসে। সে আজ ৫।৬ বৎসরের কথা, কিন্তু সুশীলার এখনও সে ঘোর কাটে নাই।

কিশোরী স্ত্রীর কথা উড়াইয়া দিল—হ্যাঁঃ, এখন গল্প বলব! সমস্ত দিন খেটেখুটে এলাম, এখন রাত দুপুরের সময় বকবক করি আর কি! তোমাদের কি? বাড়ী বসে সব পোষায়।

অন্য মেয়ে হইলে চুপ করিয়া যাইত। সুশীলার মেজাজ ছিল একগুঁয়ে। সে আবার বলিল—তা হোক, একটা বলো, রাত এখন তো বেশী নয়—

—না বেশী নয়—তোমার তো রাত কমবেশীর জ্ঞান কত! নাও, চুপচাপ শুয়ে পড় এখন—

সুশীলা এইবার জিদ ধরিল—বলো না একটা, একটা ছোট দেখেই না হয় বলো—এত করে বলছি একটা কথা রাখতে পার না—

কিশোরী বিরক্ত হইয়া বলিল—আঃ! এ তো বড় জ্বালা হ'ল! রাতেও একটু ঘুমুবার জো নেই—সমস্তদিন তো গলাবাজিতে বাড়ী সরগরম রাখবে, রাত্তিরটাও একটু শান্তি নেই?

এইটাই ছিল সুশীলার ব্যথার স্থান। স্বামীর মুখে একথা শুনিয়া সে ক্ষেপিয়া গেল—বেশ করি গলাবাজি করি, তাতে অসুবিধে হয় আমাকে পাঠিয়ে দাও এখান থেকে—রাত দুপুর করলে কে! নিজে আসবেন রাত দুপুরের সময় আড্ডা দিয়ে—কে এত রাত পর্য্যন্ত ভাত নিয়ে বসে' থাকে? নিজের দেহ, পরের আর তো দেহ না! খেটেখুটে এসে একেবারে রাজা করেছেন আর কি! নিজের খাটনিটাই কেবল—

কিশোরী ঘুমাইবার চেষ্টা পাইতেছিল, স্ত্রীর উত্তরোত্তর চড়া সুরে তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল—উঠিয়া বসিয়া প্রথমে সে স্ত্রীর পিঠে সজোরে ঘা-কতক পাখার বাঁট বসাইল, তাহার পর তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া বিছানার উপর হইতে নামাইয়া ধাক্কা মারিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিল, বলিল—বেরো—ঘর থেকে বেরো আপদ—দূর হ—রাত দুপুরেও একটু শান্তি নেই—যা বেরো—যেখানে খুসি যা—

ঘরে আলোর কাছে আসিয়া কিশোরী দেখিল স্ত্রী দুই হাতের নখ দিয়া আঁচড়াইয়া তাহার হাতের আঙুলগুলিতে রক্তপাত করিয়া দিয়াছে।

ইরাণী শাহাজাদাগণের নজীর না থাকিলেও কিশোরী মধ্যে মধ্যে দুরন্ত স্ত্রীর প্রতি এরূপ ঔষধি প্রয়োগ করিত।

শেষ রাত্রে একাদশীর জ্যোৎস্নায় চারিদিক যখন ফুলের পাপড়ীর মত সাদা, ভোর রাত্রের বাতাস নেবুফুলের গন্ধে আর পাপিয়ার গানে মাখামাখি, সুশীলা তখন ঘরের দোরের বাহিরে দালানে আঁচল পাতিয়া অকাতরে ঘুমাইতেছিল।

সকাল হইতে যে যার কাজে মন দিল। মোক্ষদা বলিলেন—"বৌমা, আজ চৌধুরীরা শিবতলায় পূজো দিতে যাবে, আমাদের যেতে বলেছে, সকাল-সকাল সেরে নাও।"

এই চৌধুরীটি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে রামতনু মুখুয্যের প্রতিপালক, ইঁহারাই গ্রামের জমিদার এবং ইঁহাদেরই জমি-জমা-সংক্রান্ত মোকদ্দমার তদ্বির ও সাহায্য করিয়া রামতনু অন্নসংস্থান করিতেন।

বেলা দশটার মধ্যে আহারাদি শেষ করিয়া ভাল কাপড় পরিয়া সকলে নৌকায় উঠিল—দুই ঘণ্টার পথ। চৌধুরী-বাড়িতে কলিকাতা হইতে একটি বউ আসিয়াছিল। তাহার স্বামী বড়লোকের ছেলে, এম-এ পাশ করিয়া বছর দুই হইল ডেপুটিগিরি চাকরী পাইয়াছে। বউটি কলিকাতার মেয়ে, চৌধুরীদের সহিত তাহার স্বামীর কিরূপ সম্পর্ক আছে, এজন্য চৌধুরী-গৃহিণী রাসপূর্ণিমার সময় তাহাকে আনাইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে সে কখনো পাড়াগাঁয়ে আসে নাই। নৌকায় খানিকটা বসিয়া থাকিবার পর বউটি দেখিল নীলাম্বরী-কাপড় পরনে তাহারই সমবয়সী আর একটি বউ নৌকায় উঠিল। নৌকা ছাড়িয়া দিল, নৌকায় সমবয়সী সঙ্গিনী পাইয়া কলিকাতার বউটি খুব সন্তুষ্ট হইলেও প্রথমে আলাপ করিতে তাহার বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল। সঙ্গিনীর কাপড়চোপড় পরিবার অগোছাল ধরণ দেখিয়া বউটি বুঝিয়াছিল তাহার সঙ্গিনী নিতান্ত পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, অবস্থাও খুব ভাল নয়। নৌকার ওধারে চৌধুরীগৃহিণী মোক্ষদার সহিত সাবিত্রীব্রত প্রতিষ্ঠার কি আয়োজন করিয়াছেন, তাহারই বিস্তৃত বড়মানুষী ফর্দ্দ আবৃত্তি করিতেছিলেন। নৌকায় কোন পরিচিতা মেয়েও নাই, কাজেই বউটি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বউটি লেখা-পড়া জানিত এবং দেশবিদেশের খবরাখবরও কিছু-কিছু রাখিত—

চৌধুরীগৃহিণীর একঘেয়ে বড়মানুষী চালের কথাবার্ত্তায় সে বড় বিরক্ত হইয়া উঠিল। খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর, সে লক্ষ্য করিল তাহার সঙ্গিনী ঘোমটার ভিতর হইতে কালো-কালো ডাগর চোখে তাহার দিকে সকৌতুকে চাহিতেছে। বউটির হাসি পাইল, জিজ্ঞাসা করিল—তোমার নাম কি ভাই?

সুশীলা সন্দিগ্ধসুরে বলিল—শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী দেবী।

সুশীলার রকম-সকম দেখিয়া বউটির খুব হাসি পাইতে লাগিল। সে বলিল—অত ঘোমটা কিসের ভাই? তুমি আর আমি ছাড়া তো আর কেউ এদিকে নেই, নাও এস ঘোমটা খোল, একটু গল্প করি।

এই কথা বলিয়া বউটি নিজেই সুশীলার ঘোমটা খুলিয়া দিল—খুলিতেই সুশীলার সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া সে যেন মুগ্ধ হইয়া গেল—রং যদিও ততটা ফর্সা নয়, কিন্তু কালোর উপর অত শ্রী সে কখনো দেখে নাই, নদীর ধারের সরস সতেজ চিক্কণশ্যাম কল্মী-লতারই মত একটা সবুজ লাবণ্য যেন সারামুখখানায় মাখানো। মুখখানি দেখিয়াই সে এই নিরাভরণা পাড়াগাঁয়ের মেয়েটিকে ভালবাসিয়া ফেলিল। জিজ্ঞাসা করিল—উনি বসে আছেন তোমার কে ভাই, শাশুড়ী?

—হ্যাঁ।

—এস আর একটু সরে' এস ভাই, দুজনে গল্প করি আর দেখতে দেখতে যাই। তোমার বাপের বাড়ী কোথায় ভাই?

সুশীলার ভয় কাটিয়া যাইতেছিল, সে বলিল—সে হ'ল শিম্‌লে।

—কোন শিম্‌লে? কলকাতা শিম্‌লে?

কলিকাতায় শিম্‌লে আছে নাকি? কৈ তাহা তো সুশীলা কোন দিন শোনে নাই। সে বলিল—আমার বাপের বাড়ী এখান থেকে তো বেশী দূরে নয়, ৫।৬ কোশ পথ, গরুর গাড়ী করে' যেতে হয়।

নদীর ধারের যবক্ষেত, সর্ষেক্ষেত, বুনো গাছপালা দেখিয়া বউটি খুব খুশি। এসব সে পূর্ব্বে বড় দেখে নাই, আঙুল দিয়া একটা মাছরাঙা পাখী দেখাইয়া বলিল—বাঃ, বড় সুন্দর তো! ওটা কি পাখী ভাই?

—ওটা তো মাছরাঙা পাখী, কেন তুমি দেখনি কখনো?

বউটি বলিল—ভাই, আমি কলকাতার বাইরে অ্যাদ্দিন পা দিইনি, খুব ছেলেবেলা একবার বাবার সঙ্গে চন্দননগরে বাগান-বাড়ীতে যাবার কথা মনে আছে, তার পর এই এসচি—তুমি আমায় একটু দেখিয়ে নিয়ে চল। ওটা কিসের ক্ষেত ভাই?

সুশীলা দেখিল তাহার সঙ্গিনী আঙুল দিয়া নদীর ধারের একটা মৌরীর ক্ষেত দেখাইতেছে—প্রথমটা সে সঙ্গিনীর চোখ ঝলসানো রং, অদৃষ্টপূর্ব্ব দামী সিল্কের শাড়ী, ব্লাউজ এবং চিকচিকে নেক্‌লেসের বাহার দেখিয়া যে ভয় অনুভব করিতেছিল, তাহার অজ্ঞতা দেখিয়া সুশীলার সে ভয় কাটিয়া অজ্ঞ সঙ্গিনীর উপর একটু স্নেহ আসিল—কলিকাতায় মাছরাঙা পাখী, মৌরীক্ষেত এসব সামান্য জিনিসও নাই নাকি? সুশীলা হাসিয়া বলিল,—তুমি ফুলের গন্ধ দেখে' বুঝতে পার না ভাই? ও তো মৌরীর ক্ষেত। কেন, আমাদের বাপের বাড়ীর গাঁয়ে তো কত মৌরীর ক্ষেত আছে—মৌরীর শাক কখনো খাওনি? কলকাতায় বুঝি নেই?

কলিকাতার বৌটি বুঝাইয়া দিল যে কলিকাতার অতীত ইতিহাসের সে খবর রাখে না, বর্ত্তমান অবস্থায় সেখানে মৌরীক্ষেত প্রভৃতি থাকা সম্ভবপর নয়, তবে ভবিষ্যতে কি হয় বলা যায় না।

ঘণ্টাখানেক পরে যখন নৌকা শিবতলার ঘাটে গিয়া লাগিল, তখন তাহাদের দুজনের মধ্যে অনেক ঘনিষ্ঠ রকমের কথাবার্ত্তা হইয়া গিয়াছে। সঙ্গিনীর মুখে স্বামীর আদরের গল্প শুনিয়া সুশীলার মনের মধ্যে একটা গোপন ব্যথা জাগিয়া উঠিল—সেটা সে অনবরত চাপিবার চেষ্টা করে, তবু কি জানি কেন সেটা ফাঁক পাইলেই মাথা তোলে! প্রথম বিবাহের পর তাহার স্বামীও তো তাহাকে কত আদর করিত, রাত্রে ঘুমাইতে না দিয়া নানা গল্পে ভুলাইয়া জাগাইয়া রাখিত, সুশীলা পান খাইতে

চাহিত না বলিয়া কত সাধ্যসাধনা করিয়া পান মুখে তুলিয়া দিত—সেই স্বামী তাহার কেন এমন হইল? তাহার বুকটার মধ্যে কেমন হু হু করিয়া উঠিল।

দুজনে তাহারা খানিকক্ষণ গাছের ছায়ায় নদীর ধারে এদিক ওদিক বেড়াইল, কি সুন্দর দেখায় চারিদিক!... নীল আকাশ সবুজ মাঠের উপর কেমন উপুড় হইয়া আছে! ওমা, পানকৌড়ির ঝাঁক চরের উপর বসিয়া কেমন ঝিমায়!

কলিকাতার বউটি বলিল—এস ভাই, আমরা একটা কিছু পাতাই। কেমন?

সুশীলা খুশি হইয়া বলিল খুব ভাল ভাই, কি পাতাব বলো—

—এক কাজ করি এস—আসতে আসতে নদীর ধারে যে মৌরীফুল দেখে এলাম, এস আমরা দুজনে মৌরীফুল পাতাই। কেমন?

সুশীলা আহ্লাদের সঙ্গে এ প্রস্তাবে সম্মতি দিল। নদী হইতে অঞ্জলি করিয়া জল তুলিয়া তাহার মৌরীফুল পাতাইল।

এমন সময় মোক্ষদা ডাকিলেন—বৌমারা এদিকে এস।

তাহারা গিয়া দেখিল গাছতলায় অনেক লোক— সেদিন পূজা দিতে অনেক লোক আসিয়াছিল। প্রকাণ্ড বটগাছ, তার তলায় ভাঙা ইঁটের মন্দির। গাছতলা হইতে একটু দূরে এক বুড়ী নানা ঔষধ বিক্রয় করিতেছে। সুশীলা ও তাহার সঙ্গিনী সেখানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, রোগ সারা, ছেলে হওয়া হইতে শুরু করিয়া সকলরকমের ঔষধই আছে, গরু হারাইলে খুঁজিয়া বাহির করিবার পর্য্যন্ত। মেয়েরা সেখানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া ঔষধ কিনিতেছে। সুশীলার সঙ্গিনী হাসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে সেখান হইতে মন্দিরের দিকে লইয়া চলিল, বলিল—চলো মৌরীফুল দেখিগে কেমন পূজো হচ্চে।

একটুখানি মন্দিরে দাঁড়াইয়া সুশীলা একটা ছুতায় সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ঔষধ বেচা বুড়ীর নিকট দাঁড়াইল। সেখানে তখন কেহ ছিল না, বুড়ী বলিল—কি চাই?

সুশীলার মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল।

বুড়ী বলিল—"আর বলতে হবে না মা-ঠাকরুণ। তা তোমার তো এখনও ছেলে-পিলে হবার বয়েস যায়নি, ও-বয়েসে অনেকের—

সুশীলা সলজ্জভাবে বলিল—তা নয়।

বুড়ী বলিল—এবার বুঝলাম মা-ঠাকরুণ—তা যদি হয়, তা হ'লে তোমার সোয়ামীর বার-মুখো টান আছে। একটা ওষুধ দিই, নিয়ে যাও, এক মাসের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে—ওরকম কত হয় মা-ঠাকরুণ—

বুড়ী একটা শিকড় তুলিয়া বলল—এই নাও, বেটে খাইয়ে দিও। কেউ টের না পায়, টের পেলে আর ফল হবে না। আট আনা লাগবে।

স্বামীর বারমুখো টান আছে—একথা শুনিয়া সুশীলা খুব দমিয়া গেল। তাহার আঁচলে একটা আধুলী বাঁধা ছিল, আজকার দিনে জিনিষটা-আসটা কিনিবার জন্য সে ইহা বাড়ী হইতে শাশুড়ীকে লুকাইয়া আনিয়াছিল। বাড়ীর বার হওয়া তো বড় ঘটে না, কাজেই এটা তাহার পক্ষে একটা উৎসবের দিন। আধুলীটি শাশুড়ীকে লুকাইয়া আনিবার কারণ—মোক্ষদা ঠাকরুণ জানিতে পারিলে ইহা এতক্ষণ তাহার আঁচলে থাকিত না। সুশীলা আঁচল হইতে আধুলীটি খুলিয়া বুড়ীকে দিল এবং খাওয়াইবার প্রণালী জানিয়া লইয়া শিকড়টি কাপড়ের মধ্যে গোপনে বাঁধিয়া লইল।

পূজা দেওয়া সাঙ্গ হইয়া গেল। সকলে আবার আসিয়া নৌকায় উঠিল। গ্রামের ঘাটের কাছাকাছি আসিলে সুশীলা বলিল—ভাই, তুমি এখন দিন কতক আছ তো?

—না ভাই, আমি কাল কি পরশু চলে যাব। তা হ'লেও তোমায় ভুলবো না মৌরীফুল, তোমার মুখখানি আমার মনে থাকবে ভাই—চিঠিপত্র দেবে তো? এবার পাড়াগাঁয়ে এসে তোমায় কুড়িয়ে পেলাম—তোমায় কখনো ভুলবো না।

সুশীলার চোখে জল আসিল, এত মিষ্ট কথা তাহাকে কে বলে? সে কেবল শুনিয়া আসিতেছে সে দুষ্ট, একগুঁয়ে ঝগড়াটে।

তাহার হাতে একটি সোনার আংটি ছিল, ইহা তার মায়ের দেওয়া আংটি, প্রথম বিবাহের পর তাহার মা তাহার হাতে এটি পরাইয়া দিয়াছিলেন। সেটি হাত হইতে খুলিয়া সে সঙ্গিনীর হাত ধরিয়া বলিল—দেখি ভাই তোমার আঙুল, তুমি হলে মৌরীফুল, তোমায় খাওয়াবার কথা, কাপড় দেওয়ার কথা—এই আংটিটা আমার মায়ের দেওয়া, তোমায় দিলাম, তবু এটা দেখে তুমি গরীব মৌরীফুলকে ভুলে যাবে না।

সুশীলা আংটিটা সঙ্গিনীর হাতে পরাইয়া দিতে গেল—বউটি চট্ করিয়া হাত টানিয়া লইয়া বলিল—দূর পাগল! না ভাই, এ রাখো—তোমার মায়ের দেওয়া আংটি—এ কেন আমায় দিতে যাবে? না ভাই—

সুশীলা জোর করিতে গেল—হোক ভাই, দেখি—মায়ের দেওয়া বলেই—

বউটি বলিল—দূর! না ভাই, ও-সব রাখো—সে বরং—

সুশীলা খুব হতাশ হইল। মুখটি তাহার অন্ধকার হইয়া গেল—সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। গ্রামের ঘাটে নৌকা লাগিল। বউটি সুশীলার হাত ধরিয়া বলিল, —পায়ে পড়ি ভাই মৌরীফুল, রাগ কোরো না। আচ্ছা, কেন তুমি শুধু শুধু তোমার মায়ের দেওয়া আংটি আমায় দিতে যাবে ভাই? —আচ্ছা, তুমি যদি দিতে চাও এই পূজোর সময় আসবো—অন্য কিছু বরং দিও—একদিন না হয় খাইয়ো—আংটি কেন দেবে ভাই! —আর আমায় ভুলবে না তো ভাই?

সুশীলা ব্যগ্রভাবে বলিল—তোমায় ভুলবো ভাই মৌরীফুল? কখ্খোনো না—তুমি কোন জন্মে যে আমার মায়ের পেটের বোন ছিলে ভাই মৌরীফুল—

তাহার পর সে একটা আনাড়ি ধরণে হাসিয়া উঠিল—হিঃ হিঃ! কেমন সুন্দর কথাটি—মৌরীফুল—মৌরীফুল—মৌরীফুল—তুমি যে হ'লে গিয়ে আমার নদীর ধারেব মৌরীফুল—তোমায় কি ভুলতে পারি?—

কথা শেষ না করিয়াই সে দুইহাতে সঙ্গিনীর গলা জড়াইয়া ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার কালো চোখ দুটি জলে ভরিয়া গেল।

কলিকাতার বউটি এই অদ্ভুতপ্রকৃতি সঙ্গিনীর অশ্রুপ্লাবিত সুন্দর মুখখানা বাব বার সস্নেহে চুম্বন করিল—তার পর দুজনেই চোখের জলে ঝাপসাদৃষ্টি হইয়া দুজনের কাছে বিদায় লইল।

দিন কতক কাটিয়া গেল। কিশোরী বাটী নাই, কি-একটা কাজে অন্য গ্রামে গিয়াছে, ফিরিতে ২।১ দিন দেরী হইবে। মোক্ষদা সকালে উঠিয়া জমিদার-গৃহিণীর আহ্বানে তাঁহার সাবিত্রী-ব্রত প্রতিষ্ঠার আয়োজনে সাহায্য করিতে চৌধুরী-বাড়ী চলিয়া গেলেন। যাবার সময় বলিয়া গেলেন—বৌমা, আমার ফের্‌বার কোনো ঠিক নেই, রান্না বান্না করে রেখো, আমি আজ আর কিছু দেখতে পারব না, চৌধুরী-বাড়ীর কাজ—কখন মেটে বলা যায় না।

একথা মোক্ষদার না বলিলেও চলিত। কারণ ভোরে উঠিয়া বাসন-মাজা জল-তোলা হইতে আরম্ভ করিয়া এ সংসারের সমস্ত কাজের ভারই ছিল সুশীলার উপর। এ সংসারে কিশোরীর বিবাহের পর কোনো দিন ঝি-চাকর প্রবেশ করে নাই—যদিও পূর্ব্বে বাড়ীতে বরাবরই একজন করিয়া ঝি থাকিত। সুশীলার খাটুনিতে কোন ক্লান্তি ছিল না, খাটিবার ক্ষমতা তাহার যথেষ্ট ছিল—যখন মেজাজ ভাল থাকিত, তখন সমস্ত দিন নীরবে ভূতের মত খাটিয়াও সে বিরক্ত হইত না।

শাশুড়ী চলিয়া গেলে অন্যান্য কাজকর্ম্ম সারিয়া সুশীলা রান্নাঘরে গিয়া দেখিল একখানিও কাঠ নাই। কাঠ অনেক দিনই ফুরাইয়া গিয়াছে, একথা সুশীলা বহুবার শ্বশুরকে জানাইয়াছে। রামতনু মধ্যে মধ্যে মজুর ডাকাইয়া কাঠ কাটাইয়া লইতেন, এবার কিন্তু অনেকদিন হইল তিনি আর এদিকে কোন দৃষ্টি দেন নাই। কিশোরীর দোষ নাই, কেননা সে বড় বাড়ীতে থাকিত না, সংসারের সংবাদ তেমন রাখিতও না। আসল কথা হইতেছে এই যে রান্নাঘরের পিছনে খিড়কীর বাইরে অনেক শুক্‌না বাঁশ ও ডালপালা পড়িয়া আছে—সুশীলা রান্না চড়ানোর পূর্ব্বে বা রান্না করিতে করিতে প্রয়োজন-

মত এগুলি দা দিয়া কাটিয়া লইয়া কাজ চালাইত। রামতনু দেখিলেন—কাজ যখন চলিয়া যাইতেছে তখন কেন অনর্থক কাঠ কাটিবার লোক ডাকিয়া আনা—আসিলেই এখনি একটা টাকা খরচ তো? পুত্রবধূ বকিতেছে বকুক, কারণ বকুনিই উহার স্বভাব।

কাঠ নাই দেখিয়া সুশীলা অত্যন্ত চটিয়া গেল, এদিকে বাড়ীতেও এমন কেহ নাই যাহাকে বকিয়া গায়ের ঝাল মিটায়, কাজেই সে আপন মনে চীৎকার করিতে লাগিল—পারব না, রোজ রোজ এমন করে সংসার করা আমায় দিয়ে হ'য়ে উঠবে না—আজ দুমাস ধরে' বলচি কাঠ নেই, কাঠ নেই—এদিকে রান্নার বেলা ঠিক আছেন সব, তার একটু এদিক ওদিক হবার যো নেই—কি দিয়ে রাঁধবে? হাতপা উনুনের মধ্যে দিয়ে রাঁধবে নাকি? রোজ রোজ কাঠ কাটো, কেটে রাঁধো—অত সুখে আর কাজ নেই—থাকল হাঁড়ী পড়ে, যিনি যখন আসবেন, তিনি তখন করে নেবেন—

রাঁধিবার কোন আয়োজন সে করিল না। খানিকটা বসিয়া বসিয়া তাহার মনে হইল ততক্ষণ মশলাগুলা বাটিয়া রাখা যাক্—সে মাঝে মাঝে কাজের সুবিধার জন্য কয়েকদিনের মসলা একসঙ্গে বাটিয়া রাখিত।

বেলা প্রায় দশটার সময় একটি অল্পবয়সী ফুটফুটে বউ, পরনে একখানা পুরানো চেলীর কাপড়, হাতে থাকিবার মধ্যে দুগাছি শাঁখা—একটি বাটি হাতে রান্নাঘরের দোরের কাছে ভয়ে ভয়ে উঁকি মারিয়া বলিল—দিদি আছ নাকি?

সুশীলা মশলা বাটিতে বাটিতে মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল—আয় আয় ছোট বউ—আয় না ঘরের মধ্যে—ঠাকরুণ নেই—

বউটি ঘরে ঢুকিয়া বলিল—একি দিদি, এত বেলা হ'ল এখনও রান্না চড়াওনি যে!

সুশীলা মুখ ঘুরাইয়া বলিল—রান্না চড়াব! হাঁড়ীকুড়ি ভেঙে ফেলিনি এই কত! —

বউটির চক্ষে ভয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল, সে বলিল—না দিদি, ওসব কিছু কোরো না, ভাত চড়িয়ে দাও লক্ষ্মীটি, নৈলে জান তো কিরকম লোক সব—

দেব—দেখবে সব আজ কিরকম মজা, রোজ রোজ কাঠ কাটব আর ভাত রাঁধব, উঃ!

—কাঠ নেই বুঝি? আচ্ছা, দা-খানা দাও দিদি, আমি দিচ্চি কেটে।

—তোর কি দায় তুই দিতে যাবি? বস ঠাণ্ডা হ'য়ে—যাদের গরজ আছে তারা নিজেরা বুঝুক গিয়ে—

—তোমার পাড়ে পড়ি দিদি, দাও রান্নাটা চড়িয়ে, জান তো ওরা—

—তুই বস্ দেখি ওখানে চুপ করে, দেখিস এখন মজা—আজ দুমাস ধরে' রোজ বলছি কাঠ নেই, কথা কানে যায় না কারুর,—আজ মজাটি দেখাব—

সুশীলার একগুঁয়েমিতে বউটি কিছু ভীতা হইল, কারণ মজা কোন পক্ষ দেখিবে এ সম্বন্ধে তাহার একটু সন্দেহ ছিল। কিন্তু সাহস করিয়া আর কিছু বলিতে না পারিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

এই বউটি রামতনু মুখুয্যের জ্যাঠতুত ভাই রামলোচন মুখুয্যের পুত্রবধূ। পাশেই এদের বাড়ী। রামলোচনের অবস্থা খুবই খারাপ। তা সত্ত্বেও তিনি বছর দুই হইল ছেলের বিবাহ দিয়াছেন—রামলোচনের স্ত্রী ছিল না, পুত্রবধূই গৃহিণী। দুরবস্থার সংসারে ছেলেমানুষ বউকে সংসার করিতে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইত। সে সময়ে অসময়ে বাটি হাতে খুঁচি হাতে এ বাড়ীতে হাত পাতিয়া তেলটা নুনটা লইয়া যাইত, চাল না থাকিলে আঁচলে বাঁধিয়া চল লইয়া যাইত—ধার বলিয়াই লইয়া যাইত—কখনও শোধ করিতে পারিত, কখনও পারিত না। মোক্ষদা ঠাকরুণকে বউটি বড় ভয় করে—তিনি থাকিলে জিনিষপত্র তো দেনই না, যদি বা দেন তাহা বহু মিষ্ট বাক্য বর্ষণ করিবার পর। তবু বউটির আসিতে হয়, কি করিবে, অভাব। সুশীলা তাহাকে মোক্ষদা ঠাকরুণের আক্রমণ হইতে বাঁচাইয়া গোপনে এটা ওটা যখন যাহা দরকার সাধ্যমত সাহায্য করিত। সামান্য একবাটি তেল লইয়া গেলেও হুঁসিয়ার মোক্ষদা ঠাকরুণ তাহা কখন ভুলিতেন না—গলা টিপিয়া কড়াক্রান্তিতে তাহা আদায় করিয়া ছাড়িতেন। সুশীলা ছিল অগোছালো ও অন্যমনস্কধরণের মানুষ, সে ধার দিয়া অত শত মনেও রাখিত না, বা সামান্য তেল নুন ধার দিয়া আদায় করিবার কোন চেষ্টাও করিত না, শোধ দিতে আসিলে

অনেক সময় বলিত,—ও তুই আবার দিতে এলি ভাই ছোট বৌ; ওর আবার নেব কি? —যা,—ও তুই নিয়ে যা ভাই।

সুশীলা আপন মনে খানিকক্ষণ বকিয়া বউটির দিকে চাহিয়া বলিল—তার পর, তোর রান্নাবান্না?

বউটি বাটিটা আঁচল দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, বাহির করিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিল—সেদিনকার সেই তেল নিয়ে গিয়েছিলাম দিদি, তা আমাদের এখনও আনা হয়নি। আজ রাঁধবার নেই—একসঙ্গে দুদিনের দিয়ে যাব—সেইজন্যে—

সুশীলা বলিল—আচ্ছা, নিয়ে আয় দেখি বাটি। দেখি কি আছে, আমাদের বুঝি তেল আনা হয়নি।

পাত্রে যতটুকু তেল ছিল সুশীলা সবটুকু এই কুণ্ঠিতা দরিদ্রা গৃহলক্ষ্মীটিকে ঢালিয়া দিল। বউটি চলিয়া যাইবার সময় মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—লক্ষ্মী দিদি, দাও রান্না চড়িয়ে—

সুশীলা বলিল—তুই পালা দেখি—আমি ওদের মজা না দেখিয়ে আজ আর কিছুতে ছাড়চিনে—

বেলা ১২টার সময় মোক্ষদা ঠাকরুণ আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া হৈ চৈ বাধাইয়া দিলেন—প্রকৃতই ইহাতে রাগ হইবারই কথা। একটু পরে রামতনু আসিলেন, তিনি ব্যাপার দেখিয়া দালানে গিয়া আপন মনে তামাক টানিতে শুরু করিলেন। ঝগড়া ক্রমে খুব চাগাইয়া উঠিল, মোক্ষদা উচ্চৈঃস্বরে সুশীলার কুলজি গাহিতে লাগিলেন—সুশীলাও যে খুব শান্তশিষ্ট, এ অপবাদ তাহাকে শত্রুতেও দিতে পারিত না, কাজেই ব্যাপার যখন খুব বাধিয়া উঠিয়াছে এমন সময় কোথা হইতে কিশোরী আসিয়া হাজির হইল—যদিও আজ তাহার ফিরিবার কথা ছিল না, তবুও কাজ মিটিয়া যাওয়াতে সে আর সেখানে অপেক্ষা করে নাই। মোক্ষদা ছেলেকে পাইয়া হাঁকডাক আরও বাড়াইয়া দিলেন। কিশোরী এত বেলায় বাড়ী আসিয়া এ অশান্তির মধ্যে পড়িয়া অত্যন্ত চটিয়া গেল—তাহার সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল স্ত্রীর উপর। হাতের গোড়ায় একখানা শুক্‌না চেলা-কাঠ পড়িয়াছিল, সেইটা লইয়াই লাফাইয়া সে রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠিল—সুশীলা তখনও বসিয়া বাটনা বাটিতেছিল—স্বামীকে শুকনা কাঠ হাতে লইয়া বীরদর্পে রান্নাঘরে লাফাইয়া উঠিতে দেখিয়া ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল—আত্মরক্ষার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া হাত দুটো তুলিয়া নিজের দেহ আড়াল করিবার চেষ্টা করিল—কিশোরী প্রথমতঃ স্ত্রীর খোঁপা ধরিয়া এক হেঁচকা টান দিয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল, তাহার পর তাহার পিঠে কয়েক ঘা চেলা-কাঠের বাড়ি মারিয়া তাহার গলা ধরিয়া প্রথমে এক ধাক্কা মারিল রান্নাঘরের দাওয়ায় এবং তথা হইতে এক ধাক্কা মারিল একেবারে উঠোনে। ধাক্কার বেগ সামলাইতে না পারিয়া সুশীলা মুখ থুবড়িয়া উঠানে পড়িয়া গেল—মার আরও চলিত, কিন্তু রামতনু তামাক খাইতে খাইতে ছেলের কাণ্ড দেখিয়া হাঁ হাঁ করিয়া আসিয়া পড়িলেন।

পাশের বাড়ীর বউটি তখন শ্বশুর ও স্বামীকে খাওয়াইয়া সবে নিজে খাইতে বসিতেছিল, হঠাৎ এ বাড়ীর মধ্যে মারের শব্দ শুনিয়া সে খাওয়া ফেলিয়া সুশীলাদের খিড়কীতে ছুটিয়া আসিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল—সুশীলা উঠানে দাঁড়াইয়া আছে; সর্ব্বাঙ্গে ধূলা, বাটনার পাত্রের উপর পড়িয়া গিয়াছিল, কাপড়ে চোপড়ে হলুদের ছোপ, মাথার খোঁপা এক ধারে খুলিয়া কতক চুল মুখের উপর, কতক পিঠের উপর পড়িয়াছে; গাঙ্গুলীবাড়ী হইতে দুটো ছেলে ব্যাপার দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছে, আরও দু-একজন পাড়ার মেয়ে সামনের দরজায় উঁকি মারিতেছে—ওদিকে পাঁচীলের উপর দিয়া মুখ বাড়াইয়া তাহার নিজের শ্বশুর রামলোচন মজা দেখিতেছেন।

চারিদিকের কৌতূহলদৃষ্টির মাঝখানে, সর্ব্বাঙ্গে হলুদের ছোপ ও ধূলিমাখা, বিস্রস্তকুন্তলা, অপমানিতা দিদিকে অসহায়ভাবে উঠানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার বুকের মধ্যে কিরকম করিয়া উঠিল—কিন্তু সে একে ছেলেমানুষ তাহাতে অত্যন্ত লজ্জাশীলা, শ্বশুর ভাসুর এবং এক-উঠান লোকের মধ্যে বাড়ীর ভিতর ঢুকিতে না পারিয়া প্রথমটা সে খিড়কীর বাহিরে আকুলিবিকুলি করিতে লাগিল, কিন্তু গাঙ্গুলীবাড়ীর প্রৌঢ় গাঙ্গুলী মহাশয়ও যখন হুঁকা-হাতে—কি হে রামতনু বলি ব্যাপারখানা কি

শুনি, বলিয়া বাড়ীর মধ্যের উঠানে আসিয়া হাজির হইলেন, তখন সে আর থাকিতে না পারিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল এবং সুশীলার হাত ধরিয়া খিড়কী-দোর দিয়া বাহিরে লইয়া গিয়াই হঠাৎ ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—কেন ও রকম করতে গেলে দিদিমণি, লক্ষ্মীটি, তখনই যে বারণ করলাম?—

তার পরদিন দুপুরবেলা সুশীলা রান্নাঘরে রাঁধিতেছিল। কিশোরী খাইতে বসিয়াছে, মোক্ষদা ঠাকরুণ কি প্রয়োজনে রান্নাঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, সুশীলা পিছন ফিরিয়া ভাত বাড়িতে বাড়িতে স্বামীর ডালের বাটিতে কি গুলিতেছে, পাশে একটা ছোট বাটি। মোক্ষদার কিরকম সন্দেহ হইল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—বউমা, তোমার বাটিতে কি? —কি মেশাচ্ছ ডালের বাটিতে?

সুশীলা পিছন ফিরিয়াই শাশুড়ীকে দেখিয়া যেন কেমন হইয়া গেল, তাহার চোখমুখের ভাব দেখিয়া মোক্ষদার সন্দেহ আরও বাড়িল—তিনি বাটিটা হাতে তুলিয়া লইয়া দেখিলেন তাহাতে সবুজ মত কি একটা বাটা।

তিনি কড়াসুরে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বেটেছ এতে?

তিনি দেখিলেন পুত্রবধূ উত্তর দিতে পারিতেছে না, তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে।

ইহার পর একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটিল। মোক্ষদা ঠাকরুণ বাটি হাতে—ওমা কি সর্ব্বনাশ। আর একটু হ'লে হয়েছিল, গো—বলিয়া উঠানে আসিয়া চীৎকার করিয়া হাট বাধাইলেন।

কিশোরী দালান হইতে উঠিয়া আসিল, রামতনু আসিলেন, গাঙ্গুলী বাড়ীর মেয়েপুরুষ আসিল, আরও অনেকে আসিল।

মোক্ষদা সকলের সামনে সে বাটিটা দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন—দ্যাখো তোমরা সকলে, তোমরা ভাব শাশুড়ী মাগী বড় দুষ্টু,—নিজের চোখে দেখে' নাও ব্যাপার, কি সর্ব্বনাশ হ'য়ে যেত এখুনি, যদি আমি না দেখতাম—দোহাই বাবা তারকনাথ, কি ঠেকানই আজ ঠেকিয়েছ—

এক-উঠান লোক—সকলেই শুনিল রামতনুর দুরন্ত পুত্রবধূ স্বামীর ভাতে বিষ না কি মিশাইয়া খাওয়াইতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে। কেউ অবাক হইয়া গেল, কেউ মুচকি হাসিয়া বলিল—ওসব আমরা অনেককাল জানি, আমরা রীত্ দেখলেই মানুষ চিনি, তবে পাড়ার মধ্যে বলে'—এতদিন—

কে একজন বলিল—জিনিষটা কি তা দেখা হয়েছে?—

মোক্ষদা ঠাকরুণের গাল-বাদ্যের রবে সে কথা চাপা পড়িয়া গেল।

গাঙ্গুলী মহাশয় রামতনুকে বলিলেন—গুরু রক্ষা করেছেন! এখন যত শীগ্‌গীর বিদেয় করতে পার তার চেষ্টা করো, শাস্ত্রে বলে, দুষ্টা ভার্য্যে! আর একদিনও এখানে রেখো না।

সমস্ত দিন পরামর্শ চলিল।

সন্ধ্যার সময় ঠিক হইল কাল সকালেই গাড়ী ডাকিয়া আপদ বিদায় করা হইবে আর একদিনও এখানে না, কি জানি কখন কি বিপদ ঘটাইবে। বিশেষতঃ পাড়ার মধ্যে ও-রকম দজ্জাল বউ থাকিলে পাড়ার অন্য বউঝিও দেখাদেখি ঐরকমই হইয়া উঠিবে।

সেদিন রাত্রে সুশীলাকে অন্য একঘরে শুইতে দেওয়া হইল—ইহা মোক্ষদা ঠাকরুণের বন্দোবস্ত, কাল সকালেই যখন যেখানকার আপদ সেখানে বিদায় করিয়া দেওয়া হইবে, তখন আর তাহার সঙ্গে সম্পর্ক কিসের?

রাত্রে শুইয়া শুইয়া কত রাত পর্য্যন্ত তাহার ঘুম আসিল না। ঘরের জানালা সব খোলা, বাহিরের জ্যোৎস্না ঘরে আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার মনে কাল ও আজ এই দুইদিন অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে—সে স্বভাবতঃ নির্ব্বোধ, লাঞ্ছনা ভোগের অপমান সে ইহার পূর্ব্বে কখনও তেমন করিয়া অনুভব করে নাই, যদিও মারধর ইহার পূর্ব্বে বহুবার খাইয়াছে। তাহার একটা কারণ এই যে আজ ও কালকার দিনের মত শ্বশুর শাশুড়ী ও এক উঠান লোকের সামনে এভাবে অপমানিতাও সে কোনদিন হয় নাই। তাই আজ সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার চোখের জল বাঁধ মানিতেছে না—কাল মার খাইয়া পিঠ কাটিয়া গিয়াছে। ও হাত দিয়া ঠেকাইতে গিয়া হাতের কাঁচের চুড়ি ভাঙ্গিয়া হাতও ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। তাহার সেই স্বামী, যে স্বামী ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে এমন সব রাতে তাহাকে সমস্ত রাত ঘুমাইতে

দিত না, সে পান খাইতে চাহিত না বলিয়া কত ভুলাইয়া পান মুখে গুঁজিয়া দিত—সেই স্বামী এরূপ করিল?

পান খাওয়ানোর কথাটিই সুশীলার বার-বার মনে আসিতে লাগিল। রাত্রের জ্যোৎস্না ক্রমে আরো ফুটিল। তখন চৈত্রমাসের মাঝামাঝি, দিনে তখন নতুন-কচি-পাতা ওঠা গাছের মাথার উপর উদাস অলস বসন্ত-মধ্যাহ্ন ধোঁয়া ধোঁয়া রৌদ্রের উত্তরীয় উড়াইয়া বেড়ায়, দীর্ঘ দীর্ঘ দিনগুলো প্রস্ফুট-প্রসূন-সুরভির মধ্য দিয়া চলিয়া চলিয়া নদীর ধারের সিমুলতলায় সন্ধ্যার ছায়ার কোলে গিয়া ঢলিয়া পড়ে, পাড়াগাঁয়ের আমবনে বাঁশবনে জ্যোৎস্না-ঝরা বাতাসে সারারাত কত কি পাখীর আনন্দ-কাকলী, বসন্তলক্ষ্মীর প্রথম প্রহরের আরতির শেষে বনের গাছপালা তখন আবার নূতন করিয়া টাটকা ফুলের ডালি সাজাইতেছে।

শুইয়া শুইয়া সুশীলা ভাবিল, জগতে কেউ তাহাকে ভালবাসে না—কেবল ভালবাসে তাহার মৌরীফুল। মৌরীফুল পত্র লিখিয়াছে, তাহার কথা মনে করিয়া সে রোজ রাত্রে কাঁদে, তাহাকে না দেখিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া তাহার কষ্ট হইতেছে। সত্য সত্য যদি কেউ তাহাকে ভালবাসে তো সে ওই মৌরীফুল—আর ভালবাসে ওই ছোট বউটা। আহা, ছোট বউ-এর বড় কষ্ট! ভগবান দিন দিলে সে ছোট বউ-এর দুঃখ ঘুচাইবে। কিন্তু স্বামী যে তাহাকে বিদায় করিয়া দিতেছে? ও কিছু না, অভাবে পড়িয়া উহার মাথা খারাপ হইয়া যাইতেছে, নইলে সেও কি এমন ছিল? মৌরীফুলের বর তো কত জায়গায় বেড়ায়, মৌরীফুলকে একখানা পত্র লিখিয়া দেখিলে কেমন হয়, যদি উহার কোন চাকরী করিয়া দিতে পারে। চাকরী হইলে সে আর তার স্বামী একটা আলাদা বাসায় থাকিবে, আর কেহই সেখানে থাকিবে না, ...মাঠের ধারের ছোট ঘরখানি সে মনের মত করিয়া সাজাইয়া রাখিবে, উঠানে কুমড়ার মাচা বাঁধিবে, বাজার-খরচ কমিয়া যাইবে। লোকে বলে সে গোছাল নয়, একবার বাসায় যাইলে সে দেখাইয়া দিবে যে গোছাল কিনা. আচ্ছা ওই বাড়ীখানায় যদি আগুন লাগে! না—আগুন দিবে কে? ছোট বউ? উঁহু, দিতে তাহার শাশুড়ী ঠাকরুণই দিবে, যেরকম লোক!

জানালার বাহিরে জ্যোৎস্নায় ওগুলা কি ভাসিতেছে? সেই যে তাহার স্বামী গল্প করিত জ্যোৎস্না-রাত্রে পরীরা সব খেলা করিয়া বেড়ায়, তাহারা নয় তো? তাহার বিবাহের রাত্রে কেমন বাঁশী বাজিয়াছিল, কেমন সুন্দর বাঁশী, ওরকম বাঁশী নদীর ধারে কত পড়িয়া থাকে... আচ্ছা পিওনে মৌরীফুলের একখানা চিঠি দিয়া গেল না? লাল চৌকা খাম, খুব বড়, সোনার জল দেওয়া, আতর না কি মাখান...

পরদিন সকাল বেলা পুত্রবধূর উঠিবার দেরী হইতে লাগিল দেখিয়া মোক্ষদা ঠাকরুণ ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিলেন পুত্রবধূ জ্বরের ঘোরে অঘোর অচৈতন্য অবস্থায় ছেঁড়া মাদুরের উপর পড়িয়া আছে, চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল।

সেদিন সমস্ত রাত একভাবেই কাটিয়া গেল, তাহার দিকে বিশেষ কেহ নজর করিল না, তার পরদিন বেগতিক বুঝিয়া রামতনু ডাক্তার আনিলেন। দুপুরের পর হইতে সে জ্বরের ঘোরে ভুল বকিতে লাগিল—সত্যি মৌরীফুল তা নয়, ওরা যা বলছে—আমি অন্য ভেবে—

সন্ধ্যার কিছুপূর্ব্বে সে মারা গেল।

তাহার মৃত্যুতে গাঙ্গুলী-পাড়ার হাড় জুড়াইয়া গেল, পাড়ার কাকচিলগুলাও একটু সুস্থির হইল। কিছুদিন পরেই কিশোরীর দ্বিতীয় পক্ষের বউ মেঘলতা ঘরে আসিল। দেখিলে চোখ জুড়ায় এমন সুন্দর মেয়ে, কর্ম্মপটু হুসিয়ার, গোছাল। দ্বিতীয়বার বিবাহের অল্পদিন পরেই যখন কিশোরী পালেদের ষ্টেটে ভাল চাকরীটা পাইল, তখন নতুন বৌ-এর লক্ষ্মীভাগ্য দেখিয়া সকলেই খুব খুশি হইল।

সংসারের অলক্ষ্মীস্বরূপা আগের পক্ষের বউ-এর নাম সে সংসারে আর কোনদিন কেহ করে নাই।

২৩ বর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৩০



পাগলের কথা

কাঞ্চনমালা বন্দ্যোপাধ্যায়

লোকে বলে আমি পাগল হইয়াছি, আমার বন্ধুরা বলিয়া থাকেন যে আঘাত লাগিয়া আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে, বাড়ীতে মেয়েরা বলিয়া থাকেন যে অধিক বিদ্যালাভ করিয়া আমার ভারাক্রান্ত মস্তিষ্ক একেবারে খারাপ হইয়া গিয়াছে। আমি নিজে দেখিতে পাইতেছি যে আমার কিছুই হয় নাই, আমার মস্তিষ্ক বেশ সবল এবং সুস্থ আছে। এমন কিছু অধিক বিদ্যালাভ করি নাই বা এমন কিছু অধিক আঘাত লাগে নাই যাহার জন্য আমি উন্মাদ হইয়া যাইব। আঘাত লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু সে অনেক পূর্ব্বে, এখন সে কথা মনে হইলে একটু কষ্ট হয় মাত্র। আমি শ্রীযুক্ত মণিলাল চট্টোপাধ্যায় এম-এ-বি-এল, সাধারণের মতানুসারে উন্মাদ-রোগগ্রস্ত হইবার পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একটি উজ্জ্বল রত্ন ছিলাম। হাঁ, আর একটি কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, মা এবং বড় বৌদিদিকে আমি বরাবরই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি যে আমার মনের কোনও বিকার হয় নাই, যাহা কিছু হইয়াছিল সে অনেকদিন পূর্ব্বে সারিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদিগকে আমি কোনমতেই বুঝাইতে পারিলাম না যে আমার শরীর সুস্থ এবং নীরোগ।

আমার এই কাল্পনিক রোগের কারণ সুরেন। সুরেন আমার বাল্যবন্ধু, সহপাঠী এবং প্রতিবেশী। বাল্যকাল হইতে আমরা উভয়ের সাথী। আমাদের বন্ধুত্ব গ্রামে উদাহরণ স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। স্কুলে এবং-কলেজে আমরা এক সঙ্গে পড়িয়াছি এবং বরাবরই একসঙ্গে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ সম্মান লাভ করিয়া আসিয়াছি। সুরেন এখনও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একটি উজ্জ্বল রত্ন, এবং তাহারই জন্য তাহারই দোষে আমি এখন পাগল। সুরেনকে দেখিলে আমি এখন বড়ই চটিয়া যাই, সেইজন্য সেও আর বড় একটা আমার সহিত দেখা করিতে আসে না। বাড়ীর লোকে বলে যে তাহাকে দেখিলে আমার রোগ আরও বৃদ্ধি হয়, সেইজন্যই সে আর আসে না; মা এবং বড় বৌদিদি এইজন্য মধ্যে মধ্যে আক্ষেপ করিয়া থাকেন। মেজদার ছোটমেয়ে সুধা আমাকে একদিন বলিয়াছিল যে, সুরেন কাকা কাছারী হইতে ফিরিবার পথে প্রত্যহ আমার সন্ধান লইয়া যায়। সুরেনকে দেখিলে এমন কি সুরেনের নাম শুনিলে বা মনে করিলে আমার কি মনে হয় জান? কোথা হইতে একটা অমানুষিক শক্তি আসিয়া আমার চোখের সম্মুখ হইতে কলিকাতা, বাসগৃহ, বিদ্যুতালোক এবং বর্ত্তমান সরাইয়া লইয়া যায়। মুহূর্ত্তের জন্য আমি সাত বৎসর পিছাইয়া যাই, দেখিতে পাই কীর্ত্তিনাশা-বক্ষে প্রবল ঝটিকাঘাতে তরঙ্গমালার উদ্দাম নৃত্য। দেখিতে পাই মাঝিরা পানসী রাখিতে পারিতেছে না, প্রবল বায়ুর সম্মুখে পড়িয়া অন্ধকার ভেদ করিয়া নৌকা কোন দিকে যাইতেছে তাহা কেহ বলিতে পারিতেছে না। ঝড়ের শ্রবণভেদী শব্দের মধ্য হইতে পরিচিত স্বরে কে যেন বলিতেছে "ভয় নাই" "ভয় নাই"। যখন চড়ায় লাগিয়া নৌকা খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল, নগদ দশ সহস্র মুদ্রা এবং অর্দ্ধ লক্ষের অধিক মূল্যের অলঙ্কার জড়িত নববধূকে যখন কীর্ত্তিনাশা গ্রাস করিল, তখনও দূর হইতে কে যেন জড়িত স্বরে বলিতেছিল "ভয় নাই" "ভয় নাই"। বস্তুতঃ যখন বিবাহের যৌতুক সমেত আমার নববধূ পদ্মার গর্ভে আশ্রয় পাইতেছিল তখন আমার মনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভয়ের উদয় হয় নাই। তখন আমি কি ভাবিতেছিলাম জান? যে আমাকে অভয় দিতেছে সে যেন আমার পরিচিত, সে যেন আমার প্রিয়, সে যেন আমাকে অনেক দিন পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। নৌকা যখন ডুবিল তখন পিতার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী নুটুবিহারী মুখোপাধ্যায় অলঙ্কারের বাক্স এবং সুরেন নববধূকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কি জানি কেন আমি তখন কাহাকেও বাঁচাইবার চেষ্টা করি নাই, নিজেও বাঁচিবার চেষ্টা করি নাই। যে আমাকে অভয় দিতেছিল, সে যেন ক্রমশঃ নৌকার নিকটে আসিয়া বলিতেছিল, "ভয় নাই" "ভয় নাই"। নৌকা যখন ডুবিল তখন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, অলঙ্কারের ভারে মুখোপাধ্যায় তলাইয়া গেল, পর্ব্বতপ্রমাণ একটা তরঙ্গ আসিয়া সুরেনের হাত হইতে নববধূকে ছিনাইয়া লইয়া

গেল। তখন আমার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল সে স্বর লীলার। লীলার কণ্ঠস্বর চিনিতে পারি নাই এই ভাবিয়া লজ্জায় ঘৃণায় মরমে মরিয়া গেলাম, জীবন-মরণের কথা তখন স্মরণ ছিল না। কিন্তু কীর্ত্তিনাশা আমাকে গ্রাস করিল না, কে যেন আমার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে লইয়া চলিল, সে করস্পর্শ বড় মধুর, আমার চির পরিচিত। একাদশ বর্ষ পূর্ব্বে নব বসন্তের পূর্ণিমা রজনীতে প্রথম সে করস্পর্শ করিয়াছিলাম, এই কথা মনে পড়িয়া গেল। তখন ঝড়, নৌকা ডুবি, কীর্ত্তিনাশা, জীবন, মরণ, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ভুলিয়া গিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

একটা বড় সুন্দর স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। গ্রীষ্মের সিত পক্ষে লীলার অঙ্কে মস্তক রক্ষা করিয়া ছাদে শুইয়া আছি। লীলা বলিতেছে "দেখ, আমি বোধ হয় আর অধিক দিন বাঁচিব না।" তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য মুষ্টি উত্তোলন করিতেছি, এমন সময় নীচে কে আমাকে ডাকিল। শুনিলাম মা বলিতেছেন "কে, সুরেন এলি? মণি ছাদে আছে।" ব্যস্তসমস্ত হইয়া লীলা তাহার অঙ্ক হইতে আমার মস্তক নামাইয়া দিয়া দূরে সরিয়া গেল। আমার নিকটে আসিয়া সুরেন যেন আমায় ডাকিল। তখন হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। লীলা যতদিন বাঁচিয়া ছিল মাঝে মাঝে এমনই করিয়া সে আমাকে জ্বালাইত।

চাহিয়া দেখিলাম বারিকণাসিক্ত বালুকাসৈকতে শয়ন করিয়া আছি, সুরেন আসিয়া আমাকে ডাকিতেছে, আর দূরে আর্দ্র শুভ্র বসন পরিধান করিয়া আমার লীলা আমার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। তখন বুঝিলাম আমি বর্ত্তমানে, ভবিষ্যতে নহি। যে কোন উপায়ে হউক লীলাকে ফিরিয়া পাইয়াছি। তখন উন্মত্তের ন্যায় "লীলা" "লীলা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম, ঝড়ের সমস্ত শব্দ ডুবাইয়া আমার কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। লীলা তাহা শুনিতে পাইল, হস্ত দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া সে যেন আমাকে ডাকিল। আমিও "যাই" বলিয়া তাহার দিকে ছুটিলাম, কিন্তু সুরেন আমাকে যাইতে দিল না। অকস্মাৎ কোথা হইতে তাহার দেহে অসুরের বল আসিল, তাহাকে মিনতি করিয়া পায়ে ধরিয়া, অবশেষে বল প্রয়োগ করিয়া গালি দিয়া প্রহার করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিতে কহিলাম, কিন্তু সে কিছুতেই শুনিল না। আমার জন্য লীলা অনেকক্ষণ আর্দ্রবসনে পদ্মা-সৈকতে দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রমে ঝড়ের বেগ মন্দ হইয়া আসিতে লাগিল, পূর্ব্বদিকে আলোকের ক্ষীণ রেখা দেখা দিল, হতাশ্বাস হইয়া লীলা বলিল "ওগো তুমি আসিবে না। আমি তবে যাই।" বড় করুণস্বরে লীলা কথাগুলি বলিল. তাহার কথায় আমার হৃৎপিণ্ড যেন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। আর একবার সুরেনের পায়ে ধরিয়া লীলার কাছে যাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলাম, সে আমার কথা বিশ্বাস করিল না, হাসিয়া উঠিল, কিন্তু হাসির সহিত তাহার দুইটি অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িল। লীলা আবার বলিল "তবে যাই।" ধীরে ধীরে তাহার দেবদুর্লভ মূর্ত্তি পদ্মাগর্ভে বিলীন হইয়া গেল, আমি ক্রোধে ক্ষোভে অধীর হইয়া সুরেনের হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিলাম, না পারিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলাম। সেই অবধি আমি পাগল, সেই অবধি আমি সুরেনকে দেখিলে চটিয়া যাই, বাল্যবন্ধুর দর্শনে ক্রোধে ধৈর্য্যহারা হই। কিন্তু ইহার জন্য লোকে আমাকে পাগল বলে কেন, আমি তাহা বুঝিতে পারি না।

জ্ঞান হইলে চাহিয়া দেখিলাম রৌদ্র উঠিয়াছে, সুরেন আমার পার্শ্বে বসিয়া আছে, তাহার সিক্ত বসন রক্তাক্ত শতধা ছিন্ন, সে তাহা গ্রন্থি দিয়া পরিধান করিয়াছে। উঠিয়া বসিলাম। লীলার কথা মনে পড়িয়া গেল। তাহার যাতনাক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখখানি মনে পড়িয়া গেল, তাহার শেষ বিদায়ের কথাগুলি মনে পড়িল, অবশেষে যে কঠিন শয্যায় তাহাকে শয়ন করাইয়া তাহার শীর্ণ ওষ্ঠ দুটিতে প্রজ্বলিত অগ্নি প্রদান করিয়াছিলাম সে কথা মনে পড়িল, তাহার ক্ষুদ্র জীবন অবসান হইলেও সে যে আমাকে বিস্মৃত হয় নাই, আসন্ন মরণ হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়া সে যে আমাকে ডাকিতে আসিয়াছিল, সে কথা মনে পড়িল। তখন আর স্থির থাকিতে পারিলাম না; সহস্র সহস্র বৃশ্চিক যেন আমায় দংশন করিতেছিল, হঠাৎ যেন দিগন্ত রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিলাম। দেখিলাম কিয়দ্দূরে মুখোপাধ্যায়ের দেহ তরঙ্গাঘাতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। নন্টুবিহারী পিতার

বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী, সে মরণেও বিশ্বাসঘাতক হয় নাই, তখনও তাহার প্রাণহীন দেহ অলঙ্কারের বাক্স আকর্ষণ করিয়া ভাসিতেছিল। নুটুবিহারী আমাকে বড় ভালবাসিত, শৈশবে আমাকে কোলেপিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল, আমিও তাহাকে বড় ভালবাসিতাম। একবার ভাবিলাম সে হয়ত বাঁচিয়া আছে, তাহাকে চেতন করিবার চেষ্টা করি, কিন্তু তাহা পারিলাম না। চারিদিক আবার লাল হইয়া উঠিল, আমার শরীর জ্বলিয়া উঠিল, ছুটিয়া পলাইয়া গেলাম। কোথায় দিয়া কোন দিকে যাইতেছিলাম মনে নাই। অকস্মাৎ দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিল, সূর্য্যের তেজ তখন প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। দূরে উত্তপ্ত বালুকারাশির উপরে লাল চেলী পরিয়া একটি বালিকা শয়ন করিয়া আছে। ভাবিলাম অগ্নিবৎ তপ্ত বালুকা কি তাহার দেহ দগ্ধ করিতেছে না? তাহার নিকটে সরিয়া গেলাম, দেখিলাম সে যেন কাহার নব পরিণীতা বধূ। বহুমূল্য মণিমুক্তাগুলি সুবর্ণের আসনে বসিয়া তাহার দেহের চারিদিক হইতে হাসিয়া উঠিল, আমাকে ব্যঙ্গ করিতে লাগিল, কিসের জন্য তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। মৃণাল-কোমল বাহুমূলে মস্তক রক্ষা করিয়া বালিকা ঘুমাইতেছিল, আমি তাহার দেহ স্পর্শ করিয়া ডাকিলাম, স্পর্শে বুঝিলাম সে ঘুম ভাঙ্গিবার নহে। আবার পূর্ব্ব স্মৃতি ফিরিয়া আসিল, কীর্ত্তিনাশার শত শত তরঙ্গ তাহার সীমন্ত হইতে সিন্দূর-রেখা দূর করিতে পারে নাই, কপালের স্থানে স্থানে তখনও চন্দন-রেখা স্পষ্ট রহিয়াছে, সে যে আমার নব-বিবাহিতা, কাল সন্ধ্যাকালে তাহার বৃদ্ধ পিতা যে তাহাকে আমার হাতে সঁপিয়া দিয়াছিলেন। ভাবিলাম বুড়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে, আর মনে করিতেছে তাহার কন্যা নির্ব্বিঘ্নে শ্বশুরগৃহে পৌঁছিয়াছে। তাহার বহুমূল্য অলঙ্কাররাশি দেখিয়া লোকে হয়ত আশ্চর্য্য হইতেছে। এই কথা ভাবিয়া হাসি পাইল। হঠাৎ দেখিতে দেখিতে চেলীখানা যেন ঘোর লাল হইয়া উঠিল, পদ্মার জল লাল হইয়া উঠিল, শুভ্র বালুকা-সৈকত লাল হইয়া গেল, আকাশ লাল হইয়া উঠিল, জ্ঞানহীন হইয়া আবার ছুটিলাম। অনেকক্ষণ পরে মনে হইল কোথা হইতে শীতল বাতাস আসিয়া আমার কপাল স্পর্শ করিতেছে, আমি ধীরে ধীরে নদীতীরে চলিয়া বেড়াইতেছি, তখন সূর্য অস্তমিত হইয়াছে। পশ্চাতে কাহার পদশব্দ শুনিলাম, উদ্ভ্রান্ত হইয়া ডাকিলাম "লীলা!" ফিরিয়া দেখিলাম ছায়ার ন্যায় সুরেন আমার পশ্চাতে আসিতেছে।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যখন কলিকাতায় পড়িতে গিয়াছিলাম তখন হইতেই সঙ্কল্প করিয়া গিয়াছিলাম যে নিজে না দেখিয়া বিবাহ করিব না। পিতা আমার বিবাহ দিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু আমার মত না থাকায় বিবাহ হইয়া উঠে নাই। ক্রমে একে একে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষা-সমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া গেলাম, বিবাহের বাজারে আমার দর বাড়িল, অনেক কন্যাভারগ্রস্ত আমার হাতে ধরিয়া অনুরোধ করিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া গেল, কিন্তু কিছুতেই আমার মন টলিল না। অবশেষে সুরেনই আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিল। কথার ছলে আমার অন্তরে লুক্কায়িত প্রতিজ্ঞা বাহির করিয়া লইয়া আমাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিল। কলিকাতার মেসে থাকি—কলেজে পড়ি, আত্মীয় স্বজনের অত্যন্ত অভাব, এই অবস্থায় হঠাৎ একদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ পাইয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম। নিমন্ত্রণকর্ত্তা আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। সুরেন বলিল তিনি তাহার আত্মীয়। পরে শুনিয়াছিলাম সুরেনের বংশে কেহ কখনও তাহার নামও শুনে নাই। আহারের সময় মলিন-বস্ত্র-পরিহিতা একটি বালিকা আসিয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে আমাদিগকে পরিবেষণ করিয়া গেল। মেসে ফিরিয়া সুরেন আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "মেয়েটি কেমন?" আমি সংক্ষেপে উত্তর করিলাম "মন্দ নয়।" কয়েক সপ্তাহ পরে শুনিলাম আমার বিবাহ। সুরেন এমনভাবে সুবন্দোবস্ত করিয়াছিল যে আর আপত্তি করিবার সুবিধা পাইলাম না। বসন্তোৎসবের দিনে মহাসমারোহে লীলাকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিলাম। বড়ই সুখে বিবাহিত জীবনের তিন বৎসর কাটিয়াছিল, এখনও সে কথা মনে করিলে স্বপ্নের মত বোধ হয়। লীলাকে দেখিলে যূথিবন বলিয়া ভ্রম হইত। ভাবিতাম স্পর্শ করিলেই ঝরিয়া পড়িয়া যাইবে। যাহা ভয় করিয়াছিলাম তাহাই হইল, প্রথম প্রসব-বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া আমার যূথিবন সত্য সত্যই ঝরিয়া গেল। যাইবার সময় সে বলিয়া গেল "আমি তোমার

কাছে থাকিতে পারিলাম না, তুমি কিন্তু আমায় ভুলিও না।" আমার বাক্য হইবার পূর্ব্বে সে চলিয়া গেল।

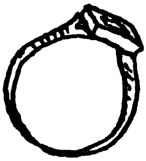
এই তিন বৎসরের মধ্যে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উকীল হইয়াছিলাম, লীলার সহিত আশা ভরসা সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম, সুতরাং ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে পারিলাম না। কিছুদিন পরে পুনরায় বিবাহের জন্য প্রস্তাব আসিতে লাগিল, আমার উপর রীতিমত উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। এইরূপে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। পিতার কাতরতা, মাতার অশ্রুজল, ভ্রাতৃবধূগণের সবিনয় অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া বিবাহ করিতে স্বীকার করিলাম। যেদিন মাতার নিকট বিবাহ করিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হইলাম সেই দিন রাত্রিকালে লীলার শয়নকক্ষে একাকী শুইয়াছিলাম। মহানগরীর কলরব তখন থামিয়া আসিয়াছে, কৃষ্ণপক্ষের মধ্যভাগে নিশীথে ক্ষীণচন্দ্রালোক দেখা দিয়াছে, গ্রীষ্মকাল, গৃহের দরজা জানালাগুলি খোলা রহিয়াছে। কোথা হইতে একটা দমকা বাতাস আসিয়া দীপ নিভাইয়া দিয়া গেল, সেই সময় দূরে কে যেন হা-হা-হা করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, আমি শিহরিয়া উঠিলাম। লীলা চলিয়া যাইবার পরে আমার চিন্তার শেষ ছিল না, নূতন বিবাহের প্রস্তাব হইয়া সে চিন্তা আরও বাড়িয়া উঠিয়াছিল। একটু তন্দ্রা আসিয়াছে সেই সময়ে ঘরের ভিতর কে যেন আবার হা-হা—করিয়া উঠিল। তন্দ্রা ভাঙ্গিল না, মনে হইল সে ঘরে সে হাসি যেন নূতন নহে, তাহার কণ্ঠস্বর যেন চির-পরিচিত। ধীরে ধীরে অন্ধকার ভেদ কবিযা শুভ্রবসন-পরিহিতা রমণীমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল, যেন স্পষ্ট দেখিলাম অবগুণ্ঠনাবৃতা নারী কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার অর্গলবদ্ধ কবিযা দিল। তখন আমি সুপ্ত কি জাগ্রত বলিতে পারি না, কিন্তু তাহার আকার, চলনের ভঙ্গী সমস্তই আমার পরিচিত, তাহার কেশাগ্র হইতে পদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত সমস্ত অবয়ব যেন আমার চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে। সে লীলা, আমারই, অপর কেহ নহে। লীলা ঘরে ঢুকিয়া মুখ খুলিয়া হাসিয়া উঠিল, আমি চিরদিন তাহাকে যেমন ভাবে ডাকিতাম তেমন ভাবেই ডাকিয়াছিলাম কিন্তু সে যে ভাবে আমার নিকট আসিত সে ভাবে যেন আসিল না। সে আসিল বটে কিন্তু দূরে রহিল, ভাবে বুঝাইয়া দিল যে এখন আমাদের মধ্যে একটা ব্যবধান পড়িয়া গিয়াছে, মিলনের একটা বাধা হইয়াছে, তখন আমার মনে ছিল না যে লীলা আর আমার নাই। রজনীর অধিকাংশ লীলার সহিত কথায় কাটাইয়াছিলাম। যখন জানালা দিয়া রৌদ্র আসিয়া আমাকে স্পর্শ কবিল তখন আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল, দেখিলাম অতি সন্তর্পণে শয্যার একপার্শ্বে শুইয়া আছি। একবার ভাবিলাম স্বপ্নে লীলাকে দেখিয়াছি, আবার ভাবিলাম স্বপ্নের তো সকল কথা মনে থাকে না, কিন্তু গত রাত্রির প্রত্যেক ঘটনাটি স্পষ্ট মনে রহিয়াছে। সে বলিয়া গিয়াছে আমি তাহারই, আর কাহারও নহি, বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে আমি তাহারই থাকিব, আর কেহ আমাকে অধিকার করিতে পারিবে না। লীলার কথাগুলি আমার কানে বাজিতেছিল, তখনও যেন লজ্জায় ঘৃণায় মরমে মরিয়া যাইতেছিলাম, সেই আমি অপরের হইতে চলিয়াছি। লীলা বলিয়া গিয়াছে সে ছায়ার মত অনুসরণ করিবে, আমি তাহারই সম্পত্তি থাকিব, সহস্র বার বিবাহ করিলেও তাহার সহিত সম্বন্ধ লোপ হইবে না। আমি ত তাহাকে ভুলিয়াছি কিন্তু মরিয়াও সে আমাকে বিস্মৃত হয় নাই।

তাহার কথা বলিতে গেলে ঐ রকম করিয়া চারিদিক লাল হইয়া আসে, চারিদিক কেন লাল হইয়া যায় বলিতে পারি না, আমার শিরায় শিরায় কেন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তাহা জানি না। সব বুঝিতে পারি, সমস্তই দেখিতে পাই, কিন্তু সময় সময় লালের হাত হইতে পরিত্রাণ পাই না। তবুও বলিতেছি তোমরা যাহা মনে করিয়া থাক তাহা সত্য নহে, আমি তখনও পাগল হই নাই। কি বলিতেছিলাম বিবাহের কথা? নগদ দশ সহস্র রজত খণ্ড ও অর্দ্ধলক্ষাধিক মূল্যের অলঙ্কার-মণ্ডিতা দশম বর্ষীয়া বালিকার পরিবর্ত্তে আত্মবিক্রয় করিতে পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছিলাম। নূতন শ্বশুরালয়ে যাইতে হইলে গোয়ালন্দ হইতে ষ্টীমারে গিয়া লৌহজঙ্গ হইতে নৌকা গ্রহণ করিতে হয়। যাইবার সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল, টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল। অশনি গর্জ্জনের মধ্যে সম্প্রদান কার্য্য সুসম্পন্ন

হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু বাসরে উল্লসিতা রমণীবৃন্দ যখন আনন্দোৎসবে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন আমি যেন কাহার কলহাস্য শুনিতেছিলাম, কে যেন ঘরের চুতষ্পার্শে অন্তরালে থাকিয়া আমাকে ব্যঙ্গ করিতেছিল, যেন বলিতেছিল সহস্র সহস্র বিবাহ করিলেও তুমি আমার থাকিবে, অপরের হইতে পারিবে না। বাসর-শয্যায় চন্দন-মাল্য-চর্চ্চিত হইয়া যেন আমি লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া উঠিতেছিলাম। আমি ভাবিতেছিলাম হয়ত লীলা অন্তরাল হইতে আমাদের দেখিতেছে, সে আমার লীলা, কতবার শপথ করিয়া তাহাকে বলিয়াছি যে, ইহপরকালে আমি তাহারই, অপরের নহি।

বর বধূ যখন বিদায় লইল তখনও আকাশ পরিষ্কার হয় নাই। বিলম্ব হইবার ভয়ে সুরেন নৌকা ছাড়িয়া দিল, যখন ঝড় উঠিল তখন ক্ষুদ্র নৌকা কীর্ত্তিনাশার মধ্যস্থলে। তাহার পর যাহা হইল তাহা বলিয়াছি। পিতার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী, মাতার সাধের বধূ, দশ সহস্র অখণ্ড মণ্ডলাকার কীর্ত্তিনাশার চরে রাখিয়া আসিয়াছি। কিন্তু আমি তাহারই অপরের নহি।

১৩ বর্ষ, বৈশাখ ১৩২০



স্পর্শমণি

সীতা দেবী

ভাত খাওয়া শেষ করিয়া, তাড়াতাড়ি আঁচাইয়া ফেলিয়া, ফুলবালা সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। সিঁড়ির মাঝামাঝি আসিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল "এই মরেছে, রান্না-ঘরটায় শিকল তুলে দিয়ে আসতে ভুলে গেছি। পোড়া কপাল, যত তাড়াতাড়ি করতে যাই, ততই কাজ বাড়তে থাকে।"

নিজের অমনোযোগিতায় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সে দুপ্ দুপ্ করিয়া সিঁড়ি কটা নামিয়া আসিল। সশব্দে রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করিয়া এবার ধীবেসুস্থে দোতলায় উঠিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরখানি বেশ ফিটফাট, সন্তানহীনা তরুণী বধূর ঘর যেমন হইয়া থাকে। কাঁচের আলমারীতে চীনামাটির খেলনা ও সাগরের কড়ি ও শাঁখ সাজানো। আলনাতে মিহি করিয়া কোঁচানো একখানি লালপেড়ে ও একখানি খয়েরী রঙের শাড়ি ঝুলিতেছে, তার তলায় একটি গোলাপী জ্যাকেটের আভাস পাওয়া যাইতেছে। খাটের উপরের বিছানাটি তকতক করিতেছে, তবে বালিশে অস্পষ্টরকমের কেশতেলের ছোপ। কোণের দিকে একটি ড্রেসিং টেব্‌ল, তাহার উপর পানের ডিবা, আলতার শিশি, চিরুণী প্রভৃতি অনেক জিনিসেরই মেলা বসিয়া গিয়াছে।

ডিবা খুলিয়া গোটা দুই পান মুখে পুরিয়া ফুলবালা খাটের উপর শুইয়া পড়িল। দিবানিদ্রাটি বোধ হয় শয়নের উদ্দেশ্য ছিল না, কারণ মিনিট পাঁচ আলনার দিকে চাহিয়া শুইয়া থাকিয়াই সে উঠিয়া পড়িল। আয়নাব সামনে দাঁড়াইয়া, নিজের তাম্বুলরাগরঞ্জিত অধরোষ্ঠের শোভা খানিকক্ষণ মন দিয়া দেখিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

পাশের ঘরের খোলাদরজার সামনে দাঁড়াইয়াই সে ঘাড় কাত করিয়া গালে হাত দিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "ওমা, এই বুঝি তোমাদের তৈরী হওয়া? আমি বলে তাড়াতাড়ি কাজ সারতে গিয়ে হাঁপিয়ে মরলাম, আর তোমরা এই করছ?"

ঘরের অধিবাসিনীদের মধ্যে চারজন তাস খেলিতেছিলেন, একজন একখানা উপন্যাস বুকের উপর রাখিয়া অগাধ নিদ্রা দিতেছিলেন এবং একজন প্রৌঢ়া বিধবা, নাকে চশমা আঁটিয়া হরেক রকমের সুতা লইয়া কাঁথা সেলাই করিতে বসিয়া গিয়াছিলেন। ঘরের আর এক কোে একটি মেয়ে চুপ করিয়া দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়াছিল।

ফুলবালার কণ্ঠস্বরের মহিমায় সব যেন গোলমাল হইয়া গেল। ক্রী ড়ানিরতা চারজন প্রায় একই সঙ্গে হাতের তাস্ ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া পড়িল। একটি গৌরাঙ্গী কিশোরী হাত নাড়িয়া বলিল, "বাপ্ রে বাপ্, মামীর সব তাতে তাড়াতাড়ি, এই ত সবে একটা বেজেছে, সেজদা ত নিতে আসবে সেই আড়াইটার সময়। এই দেড় ঘণ্টায়ও তোমাদের সাজ শেষ হবে না, এতই কি সাজবে গা মামী?"

মামী ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, যত সাজ ত আমিই সাজব। তখন দেখব কার জন্যে দুঘণ্টা গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকে। সেবার হরিবাবুর মেয়ের বিয়েতে যাবার বেলা কে মাথায় ফিতে বাঁধতে আধঘণ্টা করেছিল শুনি? বলবার বেলা মামীকে বললেই হল।"

মুখরা কিশোরী আর-একটা কি উত্তর দিতে যাইতেছিল, তাহাকে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া তাহার পার্শ্বস্থিতা যুবতী বলিল, "নে বাপু চারু চুপ্ কর, আর কথা বাড়াস নে। তোর যে ইস্কুলে পড়ে কি মেজাজ হয়েছে, সব তাতেই মুখে মুখে জবাব। চল্ সেদিনকার মত আমার একটা এলোচুলের খোঁপা বেঁধে দিবি।" বলিয়া চারুকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

নিদ্রিতা মহিলা এই অকস্মাৎ কোলাহলে জাগিয়া উঠিয়া বিরক্তিপূর্ণকণ্ঠে চেঁচাইয়া উঠিলেন, "এ ঘর ছাড়া ছুঁড়ীদের হাট বসাবার আর জায়গা হয় না। দিলে আমার কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে! যা

বেরো, সব এখান থেকে! বড় ঠাকুরঝি তুমিই বা কেমন, বসে বসে দেখ্‌চ, একটু বারণ করতে পার না, এখন সারা সন্ধ্যে আমার মাথাটা ধরে থাকুক।"

বড় ঠাকুরঝি কাঁথা হইতে মুখ তুলিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "নিজের মান নিজের কাছে বউ, আমি কেন বলে ছোট হতে যাব? আমাকে ওরা ভারি গেরাহ্যি করে কি না? কোথাকার কে দাসী বাঁদী আমি, হাততোলায় পড়ে রয়েছি। তোমার ধন, তোমার জন, তুমি বরং বলতে পার।"

বড়বউ নিজের ধনমানের বর্ণনা শুনিয়া একটু যেন খুশি হইয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। তাঁহার ননদিনী নিজের তল্পিতল্পা গুটাইয়া ঘর ছাড়িয়া প্রস্থান করিলেন। কেবল যে মেয়েটি দেয়ালে ঠেশ দিয়া বসিয়া ছিল, সে ঠিক তেমনিভাবেই বসিয়া রহিল।

খানিক পরে দরজার কাছে আবার নারীকণ্ঠস্বর শোনা গেল, এবার আর উচ্চসপ্তকে নয়, অতি মৃদু গুঞ্জনে। ফুলবালা বলিতেছিল "দেখ একবার কাণ্ড, এ বাপু ইচ্ছে করে বাদ সাধা। কোনো দিন দিদিমার বাড়ী যায় না, আজ অমনি বুড়ীর উপর ভালবাসা উথলে উঠল। এখন কে বা ঝিকে ঘর খুলে দেবে, কে বা ভাঁড়ার বের করে দেবে। আমার দেখছি যাওয়া কপালে নেই, দশদিন বিশদিন নয়, বছরে একটা দিন যে একটু থিয়েটার দেখতে যাব, তাও অদৃষ্টে নেই।"

চারু ছোটোমামীর প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া বলিল "তাই ত, বড়মাসীর যেন কি এক রকম, যাতে আমাদের যাওয়া না হয় তাই ইচ্ছে করে এমনটা করল। দেখছ না সকাল থেকে আমাদের যাওয়ার কথা শুনে অবধি মনে মনে কেমন গজ্‌রাচ্ছিল। আচ্ছা, বড়মামীকে তুলে দেব?"

ফুলবালা শিহরিয়া উঠিয়া বলিল "বাপ্ রে, কাজ নেই আমার অমন থিয়েটার দেখায়, আমার তা হ'লে এখুনি চৌদ্দপুরুষের শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা হবে। তা হবে না, একজনকে থাকতে হবে।"

সকলের মুখই আঁধার হইয়া উঠিল, প্রত্যেকেই থিয়েটারে যাইবার ও সখীসম্মিলনের আশায় উৎফুল্ল হইয়া সযত্নে সাজিয়া, টিপ পরিয়া পান খাইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এখন কি না থাকার কথা? এ যে একেবারে হৃদয়বিদারক প্রস্তাব! খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া চারুর মাথায় হঠাৎ বুদ্ধির আবির্ভাব হইল। সে বলিল "এক কাজ করা যাক না, নীরিকে নীচে নামিয়ে রান্নাঘর খুলে বসিয়ে দিয়ে যাই চল। ভাঁড়ারের চাবী তার হাতে দিয়ে গেলেই হবে, বামুনঠাকরুণ ত জানেই যে কি কি বের করতে হয়, নিজেই নেবে এখন বের করে; কেমন?"

তরুণীদের মুখের আঁধার একনিমেষে কাটিয়া গেল। চারু না হইলে কি এমন বুদ্ধি কাহারও মাথায় আসে? চারু নিজের বুদ্ধির প্রাখর্য্যে নিজেই উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া পা টিপিয়া আবার বড়মামীর ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। নীরি তখনও দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া ছিল, তাহার কানে কানে কি বলিয়া, তাহার হাত ধরিয়া বাহিরে টানিয়া আনিল।

নীরির বয়স কত তাহা আন্দাজ করা শক্ত, শরীর দেখিলে মনে হয় দশ এগারো বছরের মেয়ে, মুখ দেখিলে মনে হয় উনিশ কুড়ি। সে গৃহকর্ত্তার মৃতা ভগিনীর কন্যা, চারুর মাসতুতো বোন। তাহার অতি শৈশবে, সে একবার দোতলা হইতে নীচে পড়িয়া যায়, তাহার ফলে তখন হইতে তাহার শরীরের বাম অংশ একেবারে পক্ষাঘাতগ্রস্ত। সমতল জায়গায় খোঁড়াইয়া কোন রকমে চলিতে পারে, সিঁড়ি ওঠা নামা করিতে হইলে ধরাধরি করিয়া লইয়া যাইতে হয়। কথা কহিবার শক্তিও অতি অল্প, অস্ফুটভাবে, থামিয়া থামিয়া দুই চারিটা কথা বলিতে পারে।

নীরিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া সকলে মিলিয়া একসঙ্গে তাহাকে বুঝাইতে লাগিয়া গেল যে কি কর্ত্তব্যের জন্য তাহাকে ডাকিয়া আনা হইয়াছে। ফুলবালা একগোছা চাবী আনিয়া তাহার হাতে দিয়া, বার বার করিয়া একটা চাবী দেখাইয়া, ভাঁড়ারের তালার চাবী চিনাইয়া দিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এই সমবেত চেষ্টার ফলে সে কিছুই না বুঝিয়া, চাবীর তাড়া হাতে করিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাহাদের দিকে তাকাইতে লাগিল।

নীচে কে একজন কড়া নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "এই চারু, তোরা সব ঠিক হয়ে থাক, আমি গাড়ী আনতে যাচ্ছি, দেরী করলে কিন্তু ঠিক ফেলে রেখে যাব।"

চারু রেলিং ধরিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল "না না, দেরী এখানে হবে না, দেরী তোমাদের বাড়ী গিয়ে কত হয় তাই দেখো। মেজ কাকীর যা টিকিয়ে টিকিয়ে কাজ করা স্বভাব।"

মেয়ের দল তখনও নীরিকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে। চারু খরখর করিয়া আসিয়া তাহার ঘাড়টা ধরিয়া দুই নাড়া দিয়া বলিল, "এইটুকু আর মাথায় ঢুকছে না? কেবল গিলতেই জন্মেছ, এই চাবী দিয়ে ভাঁড়ার-ঘরের তালা খুলতে হবে, বামুন ঠাকরুণকে দিও। ন্যাও ছোটমামী নীচে চল ওকে নিয়ে, বোঝেনি আবার, সব বুঝেছে।"

নীরিকে ধরাধরি করিয়া নীচে নামাইতে না নামাইতেই বাহিরে ভাড়াটে গাড়ীর ঘড়ঘড় শব্দ শোনা গেল। একজন যুবক একলাফ দিয়া সদর দরজা পার হইয়া ভিতরে ঢুকিয়াই বলিয়া উঠিল, "ও কি রে চারু, তোদের নির্ম্মলাদিদিকেও নিয়ে যেতে চাস নাকি? আচ্ছা লোক ত তোরা!"

চারু পিঁড়া পাতিয়া নির্ম্মলাকে বসাইতে বসাইতে বলিল, "হ্যাঁ, তা না ত আর কি, তোমার যেমন কথা! ওকে এমনি নীচে বসিয়ে রেখে যাচ্চি। নীরি, এই নে সেই বইখানা, ছবি দেখিস্।" নির্ম্মলার কোলে ধপ্ করিয়া একখানা ইংরেজি ছবির বই ফেলিয়া দিয়া চারু ছুটিয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। মেয়ের দলও গল্প করিতে করিতে তাহারই অনুসরণ করিল।

নির্ম্মলা বই কোলে করিয়া বসিয়া কম্পিত হাতে পাতা উল্টাইতে লাগিল। এ সব ছবিই তার হাজার বার দেখা. বাড়ীতে ছবির বইয়ের সংখ্যা প্রচুর নয়, এবং এই এক ছবি দেখানো ছাড়া নির্ম্মলার মনোরঞ্জনের আর কোনো উপায় ভাবিয়া বাহির করার কষ্ট স্বীকার এ বাড়ির লোক কোনো দিনই করে নাই। এক চারু মাঝে মাঝে দয়া করিয়া তাহাকে গল্প শুনাইতে বসিত, দয়া এবং নির্দ্দয়তা দুইই বেশ পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত করা এই মেয়েটির স্বভাবসিদ্ধ ছিল। নির্ম্মলাকে সামনে বসাইয়া হাত নাড়িয়া সে অনর্গল বকিয়া যাইত, রাজরাণীর গল্প, রাক্ষসখোক্কসের গল্প হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার স্কুলপাঠ্য ইংরেজী ইতিহাসের গল্প অথবা চুরি করিয়া পড়া প্রেমের কাহিনী. কিছুই বাদ দিত না। সব কথা খুব সম্ভব নির্ম্মলার বোধগম্য হইত না, তাহার মুখের ভাবে সেরূপ কোনো চিহ্ন প্রকাশ পাইলেই চারু রাগ করিয়া উঠিয়া পড়িত, নাক মুখ সিঁটকাইয়া বলিয়া উঠিত "কেবল গিলতেই আছ, একটা কথা যদি মাথায় ঢোকে!" বাড়ীর অন্য সকল লোক অপেক্ষা নির্ম্মলা যে বেশী গিলিত, এ কথা মনে করিবার কোনো কারণ ছিল না, তবুও তাহাকে খোঁটা দিতে হইলে এ ছাড়া আর কোনো অপরাধ যখন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তখন বাধ্য হইয়া চারুকে ঐ এক কথাই প্রত্যেকবার উল্লেখ করিতে হইত।

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে বসিয়া বসিয়া নির্ম্মলার মন কেবলি সেই গল্পের রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার কতক সে বুঝিয়াছে, কতক না বুঝিয়াও মনগড়া অর্থের সাহায্যে বুঝিয়াছে। সব মিলিয়া তাহার মনে একটি বিচিত্র মায়ালোক গড়িয়া উঠিয়াছে, সেখানকার মানুষ তাহার মত সংসারের ভারবোঝা জড়পিণ্ডমাত্র নয়, তাহারা হাসে খেলে, কাজ করে, ভালবাসে! সেখানকার নারীর রূপ পুরুষের মুগ্ধমন টানিয়া নেয়, আবার পুরুষের বলবীর্য্য নারীকে আকর্ষণ করে। সেখানে প্রেমাস্পদের জন্য কুসুমকোমলা যে নারী সেও বহ্নিশিখার ন্যায় দীপ্তিময়ী হইয়া ওঠে, বজ্রের ন্যায় কঠোর-প্রকৃতি পুরুষও তৃণের ন্যায় নত হইয়া আসে।

বাহিরের দরজার শিকলটা ঠিন্ ঠিন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। এইবার বোধহয় ঝি কিম্বা বামুনঠাকরুণ আসিতেছে। নির্ম্মলা উৎসুকভাবে মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। সামনে একটি যুবক দাঁড়াইয়া, তাহার সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া ঘাম ঝরিতেছে, গৌরবর্ণ মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। হাঁটু অবধি ধূলায় ভরিয়া উঠিয়াছে, আঙুলের কাছে রক্তের দাগ. গায়ের পাঞ্জাবীর একটা হাতা ছিঁড়িয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া সে ব্যাধভীত হরিণের মত চঞ্চলচোখে চারিদিকে তাকাইতেছিল। ভয়ে নির্ম্মলার মুখ হইতে একটা অস্ফুট কাতরধ্বনি বাহির হইয়া পড়িল।

যুবকের কানে সে শব্দ পৌঁছিবামাত্র সে একলম্ফে রান্নাঘরের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। নির্ম্মলার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল "তুমি আমাকে বাঁচাও, তা না হলে আমার

আর রক্ষা নেই। আমার ভয়ানক বিপদ, আমাকে পুলিশে তাড়া করেছে, ঐ শোনো বাইরে তাদের চীৎকার। তোমাকে আমি বেশী কিছু করতে বলছি না, আমি বাসন রাখা ঐ চৌকীখানার আড়ালে লুকচ্ছি, তুমি কেউ এলে আমাকে যেন ধরিয়ে দিও না।"

নির্ম্মলা একটি কথাও বলিতে পারিল না, যুবক হেঁট হইয়া চৌকীর তলায় ঢুকিয়া পড়িল। বাহিরে একটা প্রচণ্ড কোলাহল শোনা গেল। নির্ম্মলা ভয়ে মৃতপ্রায় হইয়া বসিয়া রহিল, যদি পুলিশের দল বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়ে, তাহা হইলে সে কি করিয়া ঐ সুন্দর ছেলেটিকে বাঁচাইবে? সে যে নির্ম্মলার কাছে আশ্রয়ভিক্ষা করিয়াছে। নির্ম্মলা সকলের অবজ্ঞাতা, সংসারের গলগ্রহ, জড়পিণ্ড মাত্র, কিন্তু ছেলেটি যে তাহারই দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কি একটা ভাব, কেবলি নির্ম্মলার বুকের মধ্যে ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল, চোখ দিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। সে এই যুবককে বাঁচাইবেই, যেমন করিয়া হোক, ভগবান তা না হইলে এত লোক থাকিতে তাহার কাছেই বা ইহাকে পাঠাইবেন কেন? এতদিন থাকিতে আজিকার দিনেই বা সে আসিবে কেন? কোনোরকমে টলিতে টলিতে উঠিয়া সে অনেকক্ষণ ঠেলাঠেলি করিয়া রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

বাহিরের গোলমালটা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছিল, খানিক পরে তাহা একেবারেই থামিয়া গেল। যুবক ধীরে ধীরে চৌকীর তলা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া রান্নাঘরের কপাটটা খুলিয়া দিল। তারপর নির্ম্মলার দিকে ফিরিয়া বলিল, "তুমি আমার যা উপকার করলে, এ জন্মে তেমন আর কেউ করবে না। আর একটু দয়া কর, আমাকে গোটা দুই টাকা দেও, আমার দেশ কাছেই, আমি আজই সেখানে পালিয়ে যাই। ভগবানের নামে শপথ করে বলছি, আমি যত শীগগির পারি তোমার টাকা ফিরিয়ে দেব।"

নির্ম্মলা টাকা কোথায় পাইবে? অথচ ইহাকে "দিব না" বলিবার ক্ষমতা তাহার নাই। এ ত শুধু এই যুবকটিকে সাহায্য করা নয়, ইহারই উপর যে তার ব্যর্থ নারীজন্মের সার্থকতা নির্ভর করিতেছে। তাহার সমস্ত মনপ্রাণ ব্যাকুল হইয়া কেবলি সন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিল কোথায় টাকা পাওয়া যায়। দুইটি মাত্র টাকা, যাহা লোকে পথেও কুড়াইয়া পায়। কিন্তু হায় ভিক্ষুক, তুমি আজ এমন দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছ যেখানের রিক্ততার আর তুলনা নাই! হঠাৎ নির্ম্মলা দেয়াল ধরিয়া উঠিয়া পড়িয়া কোনো রকমে রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সিঁড়ির কাছে আসিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল, উপরে উঠিবার সাধ্য ত তাহার নাই! যুবক তাহার অবস্থা দেখিয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। নির্ম্মলা কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর ফুলবালার চাবীর গোছা তাহার দিকে বাড়াইয়া দিল। যুবক চাবী লইয়া উপরে উঠিতে উঠিতে ইঙ্গিত করিতে লাগিল। যুবক ব্যাপার বুঝিয়া লইল, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া তরতর করিয়া দোতলায় উঠিয়া গেল। উপরে কোন সাড়াশব্দ নাই, বড়বউ তখনও গভীর নিদ্রায় মগ্ন। ফুলবালার ঘরে ঢুকিয়াই যুবক তাড়াতাড়ি ড্রেসিং টেব্‌লের সামনে গিয়া দাঁড়াইল, দেরাজের চাবী সহজেই বাছিয়া বাহির করিয়া দেরাজ খুলিয়া ফেলিল। ছোটখাটো হাজার জিনিসের মেলার মধ্যে একটি চামড়ার মনিব্যাগও আছে। ক্ষিপ্রহস্তে তাহার ভিতর হইতে গোটাদুই টাকা বাহির করিয়া লইয়া সে তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিল।

নির্ম্মলা তখনও সিঁড়ির নীচে দাঁড়াইয়া ব্যাকুলভাবে উপর দিকে চাহিয়া আছে। যুবক তাহার কাছে আসিয়া টাকা দুইটি দেখাইয়া বলিল "এর বেশী আর কিচ্ছু আমি নিইনি। তোমাকে কি বলে ধন্যবাদ দেব জানি না। যত শীগ্‌গির সম্ভব আমি তোমাকে টাকা ফিরিয়ে দেব, আমার এই আংটিটা তুমি রাখ, এটা দেখলে তোমার তবু এক একবার মনে হবে যে একটা হতভাগ্যকে তুমি জীবনদান করেছিলে।"

নির্ম্মলার অবশ হাতে আংটিটা গুঁজিয়া দিয়া চারিদিক আর-একবার ভাল করিয়া দেখিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

নির্ম্মলা আংটিটা হাতে করিয়া আবার রান্নাঘরে আসিয়া বসিল। আংটিটা কোথায় রাখিবে সে যেন ভাবিয়াই পাইতেছিল না, অথচ হাতে করিয়া ত রাখা যায় না, যদি কেহ দেখিয়া ফেলে?

এমন সময় অনর্গল গল্প করিতে করিতে ঝি এবং বামুনঠাকরুণ একসঙ্গে আসিয়া প্রবেশ করিল। নির্ম্মলা চকিত হইয়া উঠিয়া, কম্পিত হাতে আংটিটা সেমিজের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিল। ঝি চারিদিকে বিক্ষিপ্ত এঁটো বাসনের রাশ একত্রে জড় করিতে করিতে বলিল, "তোমাকে বসিয়ে বুঝি সব গেছে থিয়েটার দেখতে? কি যে সব কাণ্ড! সদর দরজা হাঁ করে খোলা, যদি একটা বিপদ আপদ কিছু হত?" বামুনঠাকরুণ কাঁধের গামছাখানা দরজার উপর ঝুলাইতে ঝুলাইতে বলিল, "বল কেন বাছা, আজকালকার বউ ঝিরা যা সব হয়েছে। সে গিয়েছে বটে একদিন আমাদের, উঠতে বসতে শাশুড়ী ননদের ঝাঁটালাথি খেয়েছি, কিন্তু কেউ কখনো গলার স্বরও শোনে নি। দাও বাছা চাবী দাও, মাসী মাগীও বুঝি তোমায় ফেলে বেড়াতে বেরিয়েছে? মানুষের চামড়া কি এদের গায়ে নেই গা!" নির্ম্মলা যে তাহাদের কথা কাহারও কাছে লাগাইয়া দিতে পারে না, তাহার এই অক্ষমতায় বাড়ীর পরিচারিকা দুইটি বিশেষ আরাম বোধ করিত এবং তাহার সম্মুখেই এ বাড়ীর লোক সম্বন্ধে আপনাদের মতামত খুব অবাধ স্বাধীনতাসহকারে প্রচার করিত।

রাত্রিতে তরুণীর দল যখন থিয়েটার দেখিয়া ফিরিয়া আসিল, তখনও নির্ম্মলা জাগিয়া বসিয়া আছে। চারু বলিল, "ও ভাই দেখ, নীরি এখনও জেগে বসে আছে। গল্প শুনবার লোভটি ষোলআনা, অথচ কি যে বোঝে মাথামুণ্ডু তার ঠিকানা নেই।"

সকলে তখন আপন আপন উৎসব উপভোগের বর্ণনায় ব্যস্ত, নির্ম্মলার দিকে দৃষ্টি দিবার তাহাদের সময় কোথায়? ফুলবালা যখন আপনার ঘরে চলিয়া গেল তখন নির্ম্মলার অসাধারণ চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া একজন বলিল "হয়েছে কি বাপু তোর? অমন ছটফট করছিস কেন? অসুখ করেছে?"

নির্ম্মলা মাথা নাড়িয়া বলিল "না।" কিন্তু যতক্ষণ না বাড়ীর সকলে খাইয়া-দাইয়া ঘুমাইয়া পড়িল, ততক্ষণ তাহার অস্থিরতা দূর হইল না। শুইবার পরেও একবার ফুলবালার ঘরের দরজা খুলিবার শব্দে সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

বাঙালী সংসারে দিন যেমন কাটে, তেমনি ভাবেই কাটিতে লাগিল। ফুলবালার যত্ন-সঞ্চিত পুঁজি হইতে যে চোরে চুরি করিয়াছে তাহা কেহই লক্ষ্য করিল না, সে নিজেও না। কালেভদ্রে মনিব্যাগ খুলিয়া সে দুচার পয়সা রাখিত বা বাহির করিত, অনেক সময় চার পাঁচ মাস ব্যাগের খোঁজও রাখিত না।

কিন্তু চোরের আগমন শুধু মনিব্যাগের মধ্যেই আপনার চিহ্ন রাখিয়া যায় নাই। নির্ম্মলার মনে তাহার মূর্ত্তি এমনভাবে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল যে সে আর তাহাকে ভুলিতে পারিল না। সমস্ত জগৎজোড়া দৃশ্যপটের গায়ে ঐ একটিমাত্র তরুণমুখ তাহার চোখের সামনে ফুটিয়া রহিল। জগৎও যেন চেহারা বদলাইয়া ফেলিয়াছে। আগে সে নির্ম্মলারই মত জড় ছিল, তাহার না ছিল রূপ, না ছিল কথা, না ছিল স্পর্শ। এখন সে বিচিত্র শোভায় ঝলমল করিয়া ওঠে, থাকিয়া থাকিয়া সেই যেন পাখীর গলায় ডাকিয়া ওঠে "বউ কথা কও!" তাহার বাতাস নির্ম্মলাকে দুই হাতে আলিঙ্গন করিয়া ধরে, কানে কানে কত কি কথা বলিয়া চলিয়া যায়। তাহার বুকের কাছে যে স্পর্শমণির পরশ দিনরাত লাগিয়া থাকিত সেই যেন তাহার চোখে সোনার অঞ্জন পরাইয়া দিয়াছিল।

কিন্তু টাকা ত কৈ আসিল না? ফুলবালার টাকা ফিরাইয়া দিতে না পারিয়া নির্ম্মলা ভিতরে ভিতরে পীড়িত হইয়া উঠিতেছিল। তাহার মানসচিত্রের গায়ের এটুকু কলঙ্ক তাহাকে যেন কাঁটার মত বিঁধিতেছিল। কেন সে টাকা ফিরাইয়া দিল না? তাহার কি কোনো বিপদই ঘটিল? সে কি তবে মিথ্যা ভান করিতে আসিয়াছিল? না না নির্ম্মলাকে ভগবান কি অমন পরিহাস করিতে পারেন? যার অমন সুন্দর মুখ, সে কি মিথ্যা বলিতে পারে? মাঝে মাঝে আংটিটি বাহির করিয়া সে নিজের মাথায় কপালে ছোঁয়াইত, এইটিই যে তারা মায়ারাজ্যের চাবী।

সে দিন সকালে আসিয়া বড়বউ সবে হাই তুলিতে তুলিতে শয্যাত্যাগের উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার বড় ননদিনী মুখখানা অতিরিক্ত পরিমাণে গম্ভীর করিয়া আসিয়া বলিলেন "বড়বউ, নীরির রাত থেকে ভারি জ্বর, মাথা তুলতে পারে না, সারারাত ছটফটিয়ে আমাকে ঘুমতে দেয় নি।

ডাক্তার বদ্যি কি দেখাবে দেখাও, আমি বাপু বলে খালাস।"

ঘুম ভাঙিতেই এমন সুখবর শুনিলে কার না রাগ হয়? বড়বউ চীৎকার করিয়া বলিলেন, "সবাই বলে খালাস, আর আমিই চোরের দায়ে ধরা পড়েছি; মাগীরা মরবে, তা ছেলে মেয়ে নিয়ে মরে না কেন? যাই এখন বলি গে ওকে, ভাগ্নীর কি বিহিত করবে করুক। যে আজকাল অনাছিষ্টি জ্বরের ঘটা, আমার খোকাটার না ছোঁওয়াচ লাগে।"

নির্ম্মলার জ্বরের খবরে সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠিল, ছোঁওয়াছুই বাঁচাইবার জন্য বাড়ীর অন্য ছেলে-মেয়েদের দূরের ঘরে চালান করা হইল। ডাক্তার অবশ্য একবার আসিলেন, তিনি রোগনির্ণয় করিয়া ও সাবধান থাকিতে উপদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

নির্ম্মলার বড়মামার কি কারণে জানি না এই হতভাগ্য জীবটার প্রতি একটু মমতা ছিল, অবশ্য সেটা পত্নীর শাসনে প্রায়ই প্রকাশ পাইত না। তিনি আফিস হইতে ফিরিয়া প্রায়ই রোগিণীর ঘরে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিতেন। নির্ম্মলা সারাক্ষণই ছটফট করিত, মাঝে মাঝে অস্ফুটকণ্ঠে প্রলাপ বকিত। তাহার সব কথা সব সময় বোঝা যাইত না, কিন্তু একদিন হঠাৎ "টাকা টাকা" করিয়া সে একটু বেশী জোরে চেঁচাইতে লাগিল। তাহার মামা পকেট হইতে চারিটি টাকা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন "এই নাও টাকা, নীরু, আরও নেবে?"

টাকা হাতে পাইয়া নির্ম্মলার ছটফটানি হঠাৎ থামিয়া গেল, সে স্থির হইয়া চোখ বুজিয়া শুইল। তাহার বড়মামা আস্তে আস্তে উঠিয়া গেলেন।

রাত্রে ফুলবালা যখন তাহাকে খাওয়াইতে গেল, তখন নির্ম্মলা হঠাৎ বালিশে ভর দিয়া উঠিয়া বসিল। ফুলবালা কাছে আসিতেই তাহার হাতখানা টানিয়া আনিয়া দুইটা টাকা তাহার হাতে গুঁজিয়া দিল। চারু পিছনে দাঁড়াইয়া ছিল, সে বলিল, "ওরে বাবা, আবার দান করা হচ্ছে। বড় মামা যে টাকা দিলেন তাই বুঝি? ছোট মামীর বরাত ভাল, আমি যে কতবার খাওয়াতে আসি, আমাকে কিচ্ছু কিন্তু দেয় না।"

নির্ম্মলার অদৃষ্টে বেশীদিন রোগযন্ত্রণা ছিল না, নয় দশ দিনেই তাহার তুচ্ছ জীবননাট্যের শেষ অঙ্কে যবনিকা পড়িয়া গেল।

ফুলবালাদের পাশেই একটা মস্ত তেতলা বাড়ী, সেটা ছেলেদের মেস্। কান্নার রোল এবং হরিবোলের শব্দে একদল ছেলে বারাণ্ডায় বাহির হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া ব্যাপার দেখিতে লাগিল। একজন বলিল, "ওহে পাশের বাড়ির সেই paralysis ওয়ালা মেয়েটি মারা গেল। যাক্ অমন মানুষের বাঁচার চেয়ে মরাই ভাল।"

একজন গৌরবর্ণ যুবক পিছন হইতে ঠেলিয়া আসিয়া বলিল "তাই না কি? আহা! ওরই সাহায্যে আমি সেদিন জিতেনের সঙ্গে বাজিতে জিতেছিলাম। রোজই ভাবি টাকা দুটো ফিরিয়ে দিয়ে আসব, হয়েই ওঠে না। যাক্ মনিঅর্ডার করে ওদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেব।"

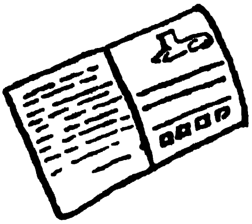
যুবকদল "কিসের বাজি? কি হয়েছিল?" বলিয়া সকলে তাহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "আরে কিছু না, জিতেন আমায় বললে, 'এই যে সব উপন্যাসে পড়া যায় যে পুলিশে তাড়া করল আর ভাগ্যবান নায়ক ছুটে গিয়ে এমন একটি সুন্দরী নায়িকার সামনে পড়লেন যে সে অমনি সর্ব্বস্ব পণ করে তাঁকে বাঁচাতে বসে গেল, এ সব স্রেফ গাঁজাখুরি। বাস্তবিক কেউ যাও দেখি, নায়িকা হয় হাঁতা বেড়ী ছুড়ে মারবেন, নয় চোখ কপালে তুলে এয়সা চীৎকার দেবেন যে লালবাজার থানাসুদ্ধ ছুটে আসবে। কেউ যদি সত্যি অমনি করে নভেলি ভাবে নায়িকার সাহায্যে উদ্ধার লাভ করতে পারে আমি তাকে নগদ দশ টাকা দেব, দুদিন বিজুতে বায়োস্কোপ দেখাব।' আমি বললাম, "বহুত আচ্ছা, চলা আও; আমি রাজি আছি। এই সামনের বাড়ীতেই ঢুকব, অবশ্য দিনক্ষণ, দেখে।" তখন থেকে ওদের বাড়ীর কাণ্ডকারখানা সব study করতে লাগলাম, কজন পুরুষ, কজন মেয়ে, ঝি চাকর কখন আসে যায়, সদর দরজায় তালা থাকে কি না, ইত্যাদি। একদিন দেখলাম বাড়ীর অল্পবয়সী মেয়েরা সব বেরিয়ে চলল, দুটি প্রৌঢ়ার মধ্যেও একটি চললেন। বাবুরা ত অফিসেই,

ঝি-রাঁধুনীর আসতে তখনও দেরী। সুযোগ বুঝে ঢুকে পড়লাম। বাজি জিতে ফিরে এলাম। জিতেন আর নসু অবশ্য পুলিশের চীৎকারের পালা অভিনয় করে আমায় কিঞ্চিৎ সাহায্য করেছিল। নায়িকাটি যদিও নভেলের বর্ণনা মাফিক ছিলেন না, তবুও নায়িকা ত বটে, তাঁকে একটা তিন আনা দামের পিতলেব আংটিও দিয়ে এসেছিলাম। তার বদলে দশ বিশ টাকা লাভ।"

তিন আনা দামের আংটিও যে অমূল্য হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার ইতিহাস একটি স্পন্দনহীন বক্ষে লুকাইয়া রহিল।

"বল হরি, হরিবোল" রবে পাড়া কাঁপাইয়া শ্মশানের যাত্রীর দল বাহির হইয়া পড়িল। যুবকদল একবার ফিরিয়া তাকাইয়া, পরমুহূর্তেই আবার বাজি জেতার গল্পে মজিয়া গেল।

১৯ শে. জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬



জালিয়াৎ

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১

হায়, পল্লীর দুলারী—সে আজ কলিকাতার বধূ। বোধ হয় ভাবে—

হায় রে রাজধানী পাষাণ কায়া!
বিরাট মুঠিতলে চাপিতে দৃঢ় বলে,
ব্যাকুল বালিকারে, নাহিকো মায়া!
প্রাণ তাহার কাঁদে—
কোথা সে খোলা মাঠ উদার পথঘাট,
পাখীর গান কই, বনের ছায়া!

কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত; ইহার বেশী আর কবিবরের মানসী প্রতিমার শীর্ণ এই মেয়েটির কিছু মেলে না। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, প্রত্যেক ব্যাপারেই ইহার নিজস্ব মতামত খুব দৃঢ় এবং সুস্পষ্ট। যাহা ভাল লাগে তাহা চাই-ই, যাহা লাগে না ভাল তাহা চাই না। সিঁদুরে আমের লোভে যেদিন গাছের মগডালে উঠিয়া জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াছিল সেদিনও ছিল এই কথা আর আজ, ভাল না লাগার দরুণ, কলিকাতা ছাড়া চাই বলিয়া যে-সব ফন্দি-ফিকির মনে মনে আঁটিতেছে, তাহারও মূলে সেই একই কথা।

মেয়েটির নাম চপলা। যখন রাখা হইয়াছিল সে সময় সকলের দৃষ্টি ছিল ওর মা'র কাঁচা সোনার মত রংটির দিকে, এবং কাহারও আর সন্দেহ ছিল না যে এমন মা'র মেয়ের দেহলতাটির মধ্যে একদিন বিদ্যুতের চপলদীপ্তি শান্তশ্রীতে ফুটিয়া উঠিবে। মেয়েটি যেন তাহার স্বভাবসিদ্ধ অবাধ্যতার বশেই সবাইকে এই দিক দিয়া নিরাশ করিয়া দিল। কিন্তু তবুও নামটা রহিল সার্থক। —আকাশের বিদ্যুৎ কেমন করিয়া সত্যই যেন ওর শ্যাম দেহটুকুর মধ্যে আটক পড়িয়া গিয়াছে; তাই ওর মিহি ভ্রূ দুটি কথায় কথায় অত কুঞ্চিত হইয়া ওঠে, কালো চোখের তারা অত চঞ্চল, ঠোঁটের কোণে আচমকা হাসি ফুটিয়া একটু রেশ না রাখিয়াই হঠাৎ মিলাইয়া যায়।

ক'নে দেখানোর সময় বাপ পরিচয় দিয়েছিলেন—বড় শান্ত লক্ষ্মীমেয়ে আমার, এ কিছু বড়াই করে বলচি না। বাড়ির বাইরে পা দেয় না—কলকাতায় বিয়ে হবার জন্যে যেন তোয়ের হ'য়ে জন্মেছে...'

আগাগোড়া বানানো কথা। ওর বাড়ি ছিল সদর রাস্তা, বনবাদাড়, দীঘির ধার। এখন সেখান থেকে তাহারা সর্ব্বদাই ওকে যেন কান্নার সুরে ডাকিতে থাকে।

আদুরে দুষ্টু মেয়ের যত অত্যাচারের দাগ স্নেহের পরতে পরতে আঁকা, আসন্ন বিচ্ছেদের সময় সেগুলো রাঙাইয়া ওঠে। তবু মেয়ের বাপ—তাহাকে বলিতেই হয়—'বুঝেচেন। কিনা, আমার মা'র মতন শান্ত মেয়ে দুটি পাবেন না; এ কিছু নিজের মেয়ে বলেই যে বলচি তা নয়....'

প্রবঞ্চনা ধরা পড়িতে অবশ্য দেরি লাগে নাই। শ্বশুর আপিস হইতে ফিরিয়া বাড়ির চৌকাঠ ডিঙাইবার সঙ্গে সঙ্গেই ডাকেন—"কই গো, আমার শান্ত, শিষ্ট মা-টি কোথায় গেলে?"

চপলা যেমন ভাবে যেখানেই থাকুক, লঘুগতিতে আসিয়া হাজির হয়। ...লঘুগতি কথাটা মোলায়েম ভাবেই বলা গেল, আসলে শ্বশুরের এই ডাকটিতে কলিকাতার এই অষ্টাবক্র বাড়িখানি হঠাৎ চপলার পক্ষে ঋজু, সরল হইয়া যায়, কঠিন বিলিতি মাটির মেঝে বেলপুকুরের দেশী মাটির মত পায়ের নীচে নরম, স্নিগ্ধ, মিঠে হইয়া ওঠে; সে এক রকম গোটাকতক লাফেই শ্বশুরের নিকট আসিয়া পৌঁছায়, আব্দারের ভর্ৎসনায় চক্ষের তারকা নাচিতে থাকে, চাবির গোছাসুদ্ধ আঁচলটা মাটি হইতে তুলিতে তুলিতে বলে—"মা বাবা; আজ আপনি বড্ড দেরি করেছেন, তা বলে দিচ্চি, হ্যাঁ..."

দেরি যে রোজ হয়ই এমন নয়। তবে এই মিলনটুকুর মূল্য অনেক; তাই উৎকণ্ঠার বশে পুত্রবধূর রোজই মনে হয় বড় দেরি হইয়া গেছে। তারই রোজ অনুযোগ।

শ্বশুর রোয়াকে নির্দিষ্ট ইজিচেয়ারটিতে দেহখানা এলাইয়া দেন। বধূ পাখা আনিয়া হাওয়া করে, পায়ের কাছে বসিয়া জুতার ফিতা খুলিয়া পা দুখানি খড়মের উপর বসাইয়া দেয়, চাদর খুলিয়া, নামাইয়া ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া রাখে।

ধীরে ধীরে এই সব চলে, আর গল্প হয়—"ঠিক হ'ল বাবা? বড্ড যেন দেরি হ'য়ে যাচ্চে; আমার আর মোটেই ভাল লাগচে না তোমার এই কলকাতা, হ্যাঁ।'

'আর কিছু দেরি নেই মা, একটা বাড়ি খালি হ'লেই আমরা উঠে যাব।'

শ্বশুর-বৌয়ের পরামর্শ পাকা হইয়া গেছে—কলিকাতায় আর থাকা হইবে না। কলিকাতার বাহিরে, বেশ পাড়াগাঁ দেখিয়া বাড়ি দেখা হইতেছে, ঠিক হইলেই সব উঠিয়া যাইবে।

বধূকে শ্বশুর কোলের কাছে টানিয়া লন, মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলান, করতল হইতে স্নিগ্ধ আশীর্ব্বাদ করিতে থাকে। বাৎসল্যের প্রবঞ্চনায় মুখে শান্ত হাসি ফোটে, ভাবেন—এই দীর্ঘীকৃত আশার মধ্য দিয়া পাড়াগাঁয়ের স্বপ্ন কাটিবে, ক্রমে এই বাড়িরই ইটকাঠের সঙ্গে মনটা মায়ায় মায়ায় গাঁথিয়া যাইবে।

স্বপ্ন কাটে না, বরং মনটা এদিকে বিরূপ হইয়া সেই স্বপ্নকেই মায়ার পাকে পাকে জড়াইয়া ধরে—

অনামধেয় একটা জায়গা; কিন্তু কেমন করিয়া যেন মনের পটে তাহার একটা স্পষ্ট ছবি আঁকিয়া গিয়াছে। বেলপুকুরের সঙ্গে অনেকটা মেলে, ভিজে ভিজে কালচে মাটি, এখানে-ওখানে গাছপালার ঘন সবুজ দিয়া ঢাকা, ওপর আকাশের নীল আস্তরণখানি উবুড় হইয়া পড়িয়াছে। পাশাপাশি দুটি কোঠাঘর, সামনে পাকা রোয়াক—বিকালের পড়ন্ত রোদটি সেখানে জ্বল জ্বল করিতে থাকে। . . .ওদিক পানে রান্নাঘর, সকাল সন্ধ্যায় তাহার গোলপাতার ছাউনি ফুঁড়িয়া ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওঠে। .....পাকা ঘরের পাশ দিয়া রাস্তা। সেটা সদর দুয়ারের চৌকাঠ ডিঙাইয়া বাহিব হইয়া গিয়াছে। ডাহিনে জামরুল গাছের নীচু দিয়া, বাঁয়ে কাহাদের পুকুবে, তাহার পুরাণ ঘাটের শেষ বাণায় কাহাদের ঘোমটা টানা বৌ বাসন মাজে—তাহার শাড়ীর রাঙাপাড় আর ছোট রাঙা ঠোঁটের মাঝখানে নোলকটি দুল দুল কবে—কে সমবয়সী আসিল—বৌ হাতের উলটা দিক দিয়া ঘোমটা উঁচু করিয়া কথা হয়। আর একটু দূরে লতাজড়ান পুবাণ আমগাছের দুপাশ দিয়া রাস্তাটা ফিরিয়া দু-দিক দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে....আমগাছের শিকড়েব কাছে ইঁট, নুড়ি, খোলামকুচি, রাংচিত্রের পাতার ছড়াছড়ি, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট পায়েব মেলা দাগ। ...মনটি এইখানে আটকাইয়া যায়—যেন নিজেকেই দেখা যায়—গাছের তলায় লুব্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

অনামনস্কতা থেকে হঠাৎ সজাগ হইয়া বধূ হাসিয়া বলে, তা বলে আপনি যেন ভাববেন না বাবা যে আমি সেখানে কঁচি মেয়েদের মত পাড়ায় পাড়ায় খেলাঘর রচে কাটাব—সে ভয় আপনার একটুও নেই ব'লে দিচ্চি। কিন্তু দেরি করলে হবে না, হ্যাঁ।'

মন ভুলাইবার দিকে স্বামীর চেষ্টারও ক্রটি নাই। ছোট বোন ক্ষান্তমণির ওপর হঠাৎ অত্যধিক স্নেহপ্রবণ হইয়া পড়িয়াছে। বলে—"ক্ষেন্তী চিড়িয়াখানায় একটা নতুন জন্তু এসেছে, যাবি না কি দেখতে?"

ক্ষান্তমণি উৎসাহের সহিত বলে—"হ্যাঁ যাব।" তাহার পব হঠাৎ একটু সঙ্কুচিত হইয়া মিনতি করে—"একটি কথা রাখবে দাদা?"

"কি কথা আবার?"

"বৌদিকেও..." আর শেষ করিতে সাহস করে না।

"হ্যাঃ, অত লোকের ঝক্কি বওয়া,—সে আমার কুষ্টীতে লেখেনি।"

এই করিয়া চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হইয়া গিয়াছে। রাত্রে স্বামী

উৎসাহভরে বলে 'এইবার কি দেখবে বল,—ডালহৌসী স্কোয়ার, হাওড়া ষ্টেশন?"

বধূ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলে—"কিচ্ছু না।" —বলিয়া ফিরিয়া শোয়।

অনেক সাধাসাধি চলে। "কলকাতায় এত দেখবার জিনিষ রয়েচে, দেশবিদেশ থেকে লোক আসচে দেখতে—গড়ের মাঠ, গঙ্গার জাহাজ, কত বড় বড় বাড়ি—ওপরে চাইতে গেলে ঘাড় উলটে পড়ে..."

"পড়ুক গিয়ে ঘাড় উলটে যার সাধ আছে, আমার কলকাতার কিচ্ছু ভাল লাগে না, আমায় বাড়ি দিয়ে এসো।"

"কলকাতার কিচ্ছুই ভাল লাগে না? —আমরাও তো কলকাতার—আমিও তো..."

ঝাঁঝিয়া উত্তর হয়—"তোমাদের কাউকেও ভাল লাগে না; যারা কলকাতা ভালবাসে তাদের দু-চক্ষে দেখতে পারি না।"

দারুণ নিরাশার কথা।

পরের দিন ভগ্নীস্নেহে আবার জোয়ার আসে। প্রশ্ন হয়, "কই রে ক্ষেন্তী, শিবপুরে রামরাজাতলার মেলা ফুরিয়ে এল, একদিনও তো গেলিনি? দিব্যি পাড়াগেঁয়ে পাড়াগেঁয়ে জায়গাটি—আমার তো বড্ড ভাল লাগে।"

আজ তিন বৎসর দাদার খোসামোদ করিয়া ফল হয় নাই; বলিলেই—"অজ পাড়াগাঁ, এঁদো ডোবা"—বলিয়া নাক সিঁটকাইয়াছে। আজ বিধি এত অনুকূল!

ক্ষান্তমণি হাতের কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া হাজির হয়। "হ্যাঁ দাদা, যাব। আর একটি কথা দাদা শুনবে? —বৌদিদিকেও নিয়ে চল দাদা, আমার দিব্যি। আহা, বেচারী গো, পাড়াগাঁয়ের কথা বলতে বলতে আত্মহারা হয়ে ওঠে..."

দাদা রাগিয়া বলে—"ওঃ-ই, আপনি পায় না আবার শঙ্করাকে ডাকে... এই জন্যে কোথাও তোকে নিয়ে যেতে ইচ্ছে হয় না।"

২

রামরাজা কি ব্যাতাইচণ্ডী তলা হইতে ফিরিয়া ফল হয় উল্টা। পিঁজরার পাখী একবার ছাড়া পাইয়া আবার পিঁজরায় বদ্ধ হইলে যেমন অতিষ্ঠ হইয়া ওঠে, মেয়েটির অবস্থা হয় সেই রকম। প্রাণটা আইঢাই করে। প্রতি মুহূর্তে বেলপুকুরের কোন না কোন একটা ছিন্ন দৃশ্য চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে; কথায় কথায় ভুল হয়—ঝিকে ডাকিতে বাপের বাড়ির দাসী 'পদীপিসীর' নাম মুখে আসিয়া পড়ে, ননদকে ডাকিতে বাহির হইয়া পড়ে—"সই!"

ননদ দু-একবার ভুলটা ভুলের হিসাবেই ধরে, শেষে—"এই যে আসি সই"—বলিয়া হাসিতে হাসিতে সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। বলে—"মরণ! —বলি, তোমার হয়েচে কি আজ? দাদা এলেই বলব—তোমার বুনো হরিণকে বনে ছেড়ে দিয়ে এসো।"

বন্য মৃগ নিজেই সে ব্যবস্থায় তৎপর হইয়া ওঠে। কলিকাতায় থাকা চলিবে না, কোনমতেই নয়।

শ্বশুরকে বলে—"আমি বলছিলাম বাবা...."

"হ্যাঁ মা, বল।"

"এই বলছিলাম—মাস তিনেক পরেই তো আপনি কাজ নিয়ে ক'মাসের জন্যে ঢাকা চলে যাবেন? এর মধ্যে আমাদের আর নতুন বাসা করে কাজ নেই। আপনারও অসুবিধে বাবা, আর বাসা-বদলির একটা হিড়িকও তো কম নয়—খরচও এতগুলি, এই মাগ্‌গি গণ্ডার দিন..."

শ্বশুর নিজের চিকিৎসার এক রকম আশু সাফল্যে উল্লসিত হইয়া ওঠেন, শুধু পাড়াগাঁয়ের নেশা কাটিয়া যাওয়া নয়, সঙ্গে সঙ্গে গৃহিণীপণার গাম্ভীর্য্য আসিয়া পড়া। বধূর মাথাটি নিজের বুকে চাপিয়া বলেন—"ঠিকই তো মা। দেখ ত কথাটা আমার মাথায়ই ঢোকেনি। ...আর বুড়ো হ'তে চললাম,

এইবার মা-ই আমাদের বুদ্ধি দেবে কি-না। আমি তাহ'লে ওদের খোঁজাখুঁজি করতে বারণ করে দোব। ঢাকা থেকে ফিরে আসি, তখন বরং একটা পাকা রকম ব্যবস্থা করা যাবে, কি বল?"

"হ্যাঁ।" —বলিয়া শ্বশুরের বুকে মাথাটি আরও গুঁজিয়া দেয়। ক্ষণেকের জন্য বোধ হয় একটু দ্বিধা আসে, সেটুকু কাটাইয়া ধীরে ধীরে আরম্ভ করে—"তাই বলছিলাম বাবা..."

"হ্যাঁ মা, বল, বল—"

"এই বলছিলাম ততদিন পর্য্যন্ত না-হয় আমাকে একেবারে বেলপুকুরেই রেখে আসুন না..."

রোগটা মজ্জাগত; এমনভাবে নিরাশ হইয়া চিকিৎসক হাসিবেন কি কাঁদিবেন স্থির করিতে পারেন না। চিকিৎসার নূতন নূতন প্রণালী আবিষ্কার করিতে হয়। এই করিয়া দিন চলে। শ্বশুরের পাঠানর যে সে-রকম গা নাই একথাটা ক্রমেই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হইয়া উঠে।

শাশুড়ীর কাছে চালাকি করিতে সাহস হল না; কারণ শাশুড়ী বেটাছেলে নয়, এবং সেই জন্য তাহার মতে, বোকা নয়, সোজাই কথাটা পাড়ে—বাপ, মা, ভাই, ছোট বোনটি এদের অনেক দিন দেখে নাই, তাই...

শাশুড়ী চোখ কপালে তুলিয়া বলেন—"ওমা, অমন কথা বলো না বৌমা। এই তো মোটে ক'টা মাস এসেচ... আমি সেই মোটে ন'বছরের মেয়েটি শ্বশুরঘর করতে এলাম—আর ঝাড়া তিনটে বছর কাটিয়ে..."

চপলারও আশ্চর্য্যের সীমা থাকে না। বলে—'এই কলকাতায় মা?'

"পোড়া কপাল! —কলকাতা কোথায়? তাহ'লে তো বাঁচতাম। শ্বশুর থাকতেন ডাহা পাড়াগাঁ, মাঝের পাড়া নাইবে—সেই আধক্রোশ ভেঙে ইচ্ছেমতী, খাবার জল চাই—সেই আধক্রোশ ভেঙে ইচ্ছেমতী, গা ধোবে—সেই আধক্রোশ..."

"ঐঃ, বেড়ালটা বুঝি কি ফেললে গো।" —বলিয়া হয়ত হঠাৎ সে স্থান ত্যাগ করে।

স্বামীর উপর উপদ্রব হয়। সে বেচারী জর্জ্জরিত হইয়া অভিমান করিয়া বলে—"বেশ তো বাবাকে মাকে রাজী করাও; আমার রেখে আসতে কি? ...আমায় যখন ভালই বাস না, মিছিমিছি এখানে থেকে কষ্ট পাও কেন?"

অবাধে মিথ্যা চলে, একেবারে নির্জ্জলা মিথ্যা—"বাবা মা তো খুবই রাজী। বাবা বলেন—'আমার তো ছুটি নেই। অজিতকে বললেই বলবে পড়ার ক্ষতি হবে; না হয় আসুক না রেখে'...মা বলেন—'আমার আর কি অমত মা—আহা এতদিন এসেচ—তবে আজকালকার ছেলের মত আগে। তা তুমি ঠিক এই রকম ক'বে মাকে বলো তো, বলো—'মা, অত ঘ্যান ঘ্যান করছে যখন, রেখেই আসি নয়, দিনকতকের জন্যে; বাবাকে বলে দিও আমার কলেজের ক্ষতি হবে না..." স্বামী অতটা বোকা নয়, এ ফন্দি খাটে না।

কয়েকদিন আবার মুখ অন্ধকার হইয়া থাকে; কথাবার্ত্তাও বন্ধ। যত সব বেয়াড়া আব্দার ভাবিয়া স্বামীও কয়েকদিন বেপরোয়া ভাবটা জাগাইয়া রাখে, তাহার পর তাহাকেই মাথা নোয়াইতে হয়। বলে—'যা হবার নয় তাই ধরে বসে থাকলে চলবে কেন। বরং চল দক্ষিণেশ্বর দেখিয়ে নিয়ে আসি—পাড়াগাঁকে পাড়াগাঁও, কলকাতা থেকে অনেক দূরও; বালী হয়ে গেলে বরং নৌকাও চড়া হবে। রাজী?" পরামর্শ আঁটা হয়; দুপুরে ক্ষান্ত যখন স্কুলে থাকিবে, চপলা গিয়া শাশুড়ীর আদেশ চাহিয়া লইবে—মিউজিয়াম দেখিবার নাম করিয়া।

বধূ জিজ্ঞাসা করে—"তোমারও তো কলেজ আছে?"

"আমার ঘণ্টাখানেক মাথা ধরবে তারপর ক্ষেন্তি চলে গেলে ভাল হয়ে যাবে।"

কথাটা বুঝিতে একটু দেরি হয়, চপলা স্বামীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে, শুধু ভ্রূ জোড়াটি অল্প অল্প স্ফুরিত হইতে থাকে। তাহার পর হঠাৎ খিল খিল করিয়া হাসিয়া ওঠে, বলে—"ও বুঝেছি, বাব্বাঃ, তোমার দুষ্টুবুদ্ধি কম নয় তো!"

প্রশস্ত, শান্ত গঙ্গায় নৌকা চড়িয়াই চপলার মনটা প্রসারিত হইয়া পড়ে। ও-পারে, প্রকাণ্ড

ঘাটের নীচে গিয়া নৌকা লাগে। নামিয়াই একহাঁটু করিয়া কাদা, এত বড় বিলাসিতা অনেকদিন তাহার ভাগ্যে জোটে নাই। পা টানিয়া টানিয়া চলিতে চলিতে স্বামীর হাতটা চাপিয়া ধরে; বলে—"উঃ, বড্ড মজা না?"

সিঁড়ি বাহিয়া সুবিস্তীর্ণ চত্বর, যেদিকটা ইচ্ছা হন্ হন্ করিয়া অনেকটা চলিয়া যায়, —পায় পাঁয় কত দিনের শৃঙ্খল যেন খসিয়া পড়িতেছে। ....মন্দিরে ওঠে—সুগঠিত সৌম্য মূর্ত্তির আসনে মাথা নোয়াইয়া পড়িয়া থাকে—অনেকক্ষণ; কিছুই প্রার্থনা করে না—পড়িয়া থাকার মুক্ত অবসর তাই পড়িয়া থাকে।... গঙ্গার ধারে ধারে পরিষ্কার চওড়া রাস্তা, ঘন আমগাছের মস্ত বাগান—পাতার গাঢ় সবুজে সবুজে যেন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে... পিছনে আয়ত পুষ্করিণী—বেলপুকুরের দীঘির মত একটু ছোট এই যা... ক্রমাগত ঘোরে একটি মুক্ত বেগচঞ্চল প্রাণ প্রতি মুহূর্ত্তে দেহতটে আসিয়া উচ্ছলিত হইয়া পড়ে, চপল অঙ্গবিক্ষেপে, প্রগলভ হাসিতে, কথার অসংযত স্বরে, মাঝে মাঝে পিছন ফিরিয়া চাহিয়া বলিয়া উঠে—"কই গো! ওমা, এখনও ওখানে! পুরুষের পা না?"

পুকুরের ঘাটে আসিয়া বসিল। পা দুলাইতে দুলাইতে পাশের লতাগুল্মের সঙ্গে স্বামীকে পরিচিত করিয়া দিতে লাগিল—"ওটা ঘেঁটু—ঘেঁটুফুল মহাদেব খুব ভালবাসেন—সত্যিকারের মহাদেব নয় খেলাঘরের মহাদেব। আচ্ছা, এর মধ্যে অমূললতার গাছ কোথায় দেখাও দিকিন, কত বুদ্ধিমান দেখি... পারলে না তো? —ঐ দেখ, কলকে ফুলের গাছটার মাথার ওপর ওই হলদে হলদে—ভয়ঙ্কর বিষ মশাই! একটু যদি গেল পেটে তো বাড়তে বাড়তে-বাড়তে....ওগো! কুঁচকম্বলের চারা! নিশ্চয়ই একেবারে, নিয়ে আসি তুলে।"

উৎসাহের সঙ্গে নামিয়া ক্ষিপ্রগতিতে পুকুরপাড়ের জঙ্গলের দিকে চলিল। ঝিরঝিরে পাতা ছোট চারাগাছটি, হাওয়ায় নধর ডগাটি একটু একটু দুলিতেছে। কাছে গেল তুলিবার জন্য, ঝুঁকিয়া কি ভাবিয়া থামিয়া গেল, তাহার পর ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিয়া আবার শানের বেঞ্চিটার উপর বসিয়া পড়িল।

স্বামী হাসিয়া বলিল—"কি হ'ল আবার?—খেয়ালী মেয়ে!"

"নাঃ থাক; কলকাতার সেই টবে তো? —আমার মতন দুর্দ্দশা হবে বেচারীর।"

দু-জনেই খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

একটু পরে চপলা স্বামীর হাতটা নিজের কোলে লইয়া বলিল—"এক কাজ করলে হয় না? বলছিলাম... বলছিলাম—আমায় এই দিক থেকেই বেলপুকুরে রেখে আসবে?"

অজিত হাসিয়া দুষ্টামীর সহিত বলিল—"বেশ তো... টাকা?"

"আমার দু-হাতের দু-গাছা চুড়ি দিচ্ছি।"

স্বামী কি ভাবিয়া আবার একটু চুপ করিয়া রহিল; তাহার পর বলিল—"সে মন্দ কথা নয়; মাকে কিন্তু কি বলব?"

"সে আমি ভেবে রেখেছি, বলবে—নাইতে গিয়ে ডুবে গিয়েছে।"

আবার একটু চুপচাপ। চপলা তাগাদা দিল—"কই কি বলছ?"

স্বামীর হঠাৎ একটি দীর্ঘশ্বাস পড়িল; কিন্তু মনের ভাবটা গোপন করিয়া হাসিয়া বেশ উৎসাহের সঙ্গে বলিল—"উঃ, খাসা হয়; কিন্তু তারপর?"

"তারপর অনেক দূর গিয়ে ভেসে উঠব—আমায় একজন মাঝি তুলবে—একটু চোখ খুলে বেলপুকুরের নাম করব... নভেলে যেমন হয় গো..."

"নভেলে মিউজিয়ামের কোঠাবাড়িতে কেউ ডুবে মরে না—চল ওঠ, অনেক বেলা হয়েচে।" বলিয়া স্বামী উঠিয়া পড়িল।

শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী সবাইকেই বোঝা যায়। চপলা মনে মনে বলে—"খুব চালাক সব, আচ্ছা, আমিও কম সেয়ানা নয়, দেখি...."

বাবার কাছে গোপনে পত্র যায়; কাঁদুনিতে মিথ্যা কথায় ভরা... 'এরা সব মারে—ঘরে চাবি

দিয়ে রাখে—দু-চক্ষের বিষ হয়ে আছি।' ...কখনও কখনও এমনও থাকে—'পাড়ার মেয়েদের কাছে আর আমার মুখ দেখাবার জো নেই; যে-ই দেখে, বলে —ওমা, কেমন পাষাণ বাপ মা গো! —এতদিন হল মেয়েকে পাঠিয়েচে একবার নিয়ে যাবার নাম করে না! ঐ দুধের মেয়ে...'

চিঠি যা আসে তাহাতে এ সবের উত্তর হিসাবে কিছুই থাকে না; একরাশ উপদেশ থাকে মাত্র। চপলা মনে মনে বলে—'চপীর ভাগ্যে সব সমান; আচ্ছা—বেশ...'

৩

দুপুরবেলা। শ্বশুর আপিসে, স্বামী কলেজে, ননদ স্কুলে। চপলা শাশুড়ী আর পিস্‌শাশুড়ীকে রামায়ণ পড়িয়া শুনাইতেছিল, তাঁহারা একে একে ঘুমাইয়া পড়িলেন। একটু পরে বই বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিল। রামায়ণে তিনজনে আসিয়া পঞ্চবটী বনে আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছেন। ঠিক এই জায়গাটিতে শাশুড়ীরা ঘুমাইয়া পড়িলে চপলা বিন্ধ্যকাননের সেই অপূর্ব্ব বর্ণনা শেষ না করিয়া উঠিতে পারে নাই। অযোধ্যার রামচন্দ্রের চেয়ে পঞ্চবটীর রামচন্দ্রকে বেশী ভাল লাগে। কাননচারিণী সীতার উপর একটা ঈর্ষামিশ্রিত সহানুভূতি জাগিয়া উঠিয়া মনটাকে তৃপ্তি আর অস্বস্তি দুইয়েই ভরিয়া তোলে।

বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। চাওয়া যায় না; মনে হয় সারা কলিকাতাটায় যেন আগুন লাগিয়াছে—উঁচু নীচু লক্ষ বাড়ির দেওয়াল বাহিয়া ছাদ ফুঁড়িয়া শিখা লক্ লক্ করিয়া উঠিতেছে—কি এক রকম সাদাটে নীল আগুনের—যাতে এতটুকু ধোঁয়ার স্নিগ্ধতা নেই। এই সময়ে বেলপুকুরের কথা বেশী করিয়া মনে পড়ে—দীঘির পাড়ে সেই অন্ধকার সপ্তপর্ণী গাছের তলা—কালো জলের উপর তরতর ঢেউ...

"চিঠি আছে!" সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজায় পিয়নের মুঠির ঘা পড়িল। চপলা তাড়াতাড়ি নামিয়া যাইতে যাইতে দরজার ফাঁক বাহিয়া একখানি পোস্টকার্ড উঠানে আসিয়া পড়িল।

বাবার চিঠি শ্বশুরকে লেখা।

পড়িল। —মামুলি চিঠি, তাহার উল্লেখও নাই। "আশা করি বাড়ীর সর্বাঙ্গীন কুশল"—এবই মধ্যে সে যতটুকু আসিয়া পড়ে।

স্বামীর পড়িবার ঘরে গিয়া বসিল। এটা-সেটা লইয়া খানিকটা নাড়াচাড়া করিয়া আবার বাবার চিঠিটা লইয়া পড়িল। বাবার চমৎকার লেখা! এদের বাড়িতে কাহারও লেখা এমন নয়। বলিতে নাই গুরুজন—কিন্তু শ্বশুরের লেখা ত একেবারে বিশ্রী! স্বামীর লেখাটা অত খারাপ নয় বটে, তা বলিয়া বাবার লেখার সামনে ঘেঁষিতে পারে না।...

স্বামীর গানের খাতাটা টানিয়া লইয়া তুলনা করিতে লাগিল—কিসে আর কিসে! ডাগর ডাগর ছাপার মত অক্ষর, ওপরে ঢেউখেলান মাত্রা—এ এক জিনিষই আলাদা!

স্বামী বলে—'একটু কাঁচা লেখা'—কি সব পাকা লেখা রে নিজেদের!

লেখার দিকে বাবার ঝোঁক ছিল বড্ড; চপলাকে লইয়াও অনেকটা চেষ্টা করিয়াছিলেন। একেবারে বাবার মত লেখা হওয়া বরাতের কথা, তাহা হইলেও স্বামীকেও সে খুবই হারাইয়া দিতে পারে।

লেখার কথাতেও বেলপুকুর আসিয়া পড়ে। বাবা-মার মধ্যে তর্ক হইতেছে। বাবা বলিতেছেন—"চপীর লেখা দেখেই তো ওর শ্বশুর পছন্দ করে ফেললে।"

মা বলিতেছেন—"আহা, আর ওর অমন চোখ, মুখ, গড়ন বুঝি কিছু নয়?"

আজকাল শ্বশুরবাড়িতে নানা মুখে প্রশংসা শুনিয়া মা'র অত গুমরের 'চোখ মুখ গড়ন' সম্বন্ধে একটু কৌতূহল হইয়াছে—একটা সজ্ঞানতা আসিয়া পড়িয়াছে। টেবিলের উপর হইতে হাত-আরশিটা তুলিয়া লইয়া প্রতিচ্ছায়ার দিকে চাহিল—হাসি হাসি সলজ্জ—যেন অন্য কাহার চোখ। বাপের বাড়ির আরশিতে এ-রকম ছায়া পড়িত না—যত চায় চোখদুটো যেন লজ্জায় ভরিয়া আসে...

'ছাই চোখ মুখ, ছাই গড়ন'—বলিয়া আরশিটা রাখিয়া দিল। অন্যমনস্ক হইয়া কলমটা লইয়া

পোষ্টকার্ড দেখিয়া লিখিতে লাগিল—'অনেক দিন যাবৎ আপনাদের কোন সংবাদ না পাইয়া'...ঘাড় নাড়িয়া নাড়িয়া মিলাইতে লাগিল। বেশ একটু আদল আসে। তবুও অনেক দিন অভ্যাস ছাড়িয়া গিয়াছে।

কি রকম একটা ঝোঁকের বশে লিখিতে লাগিল—'অনেক দিন যাবৎ—অনেক দিন যাবৎ'—দুইবার চারবার—আটবার—দশবারেরটা অনেকটা মেলে। এখনও আছে তফাৎ, তবে বাপের মেয়ের লেখা বলিয়া দিব্য চেনা যায় বটে।

হঠাৎ কথাটা যেন মাথায় পাক দিয়া ঘুরিতে লাগিল—'বাপের মেয়ের লেখা.....বাপের মেয়ের লেখা...'

চপলা আস্তে আস্তে কলমটা রাখিয়া দিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া দাঁতে নখ খুঁটিতে লাগিল। দৃষ্টি স্থির, ভ্রূ-দুটি কুঞ্চিত হইয়া খয়েরের টিপের কাছে একসঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে। ক্রমে তাহার বুকের টিপটিপানিটা বাড়িয়া গেল, সমস্ত মুখটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং ঠোঁটের কোণে নিতান্ত অল্প একটু হাসির আভাস ফুটিয়া উঠিল।....'বাপের মেয়ের লেখা'—আর যদি ওটুকু তফাৎও মিলাইয়া ফেলা যায়!

মাথার মধ্যে একটি মতলব জাঁকিয়া উঠিতেছে—চপলা একমনে সেটিকে বেশ ভাল করিয়া পরিস্ফুট করিয়া তুলিল। একবার উঠিয়া একটু ঘুরিয়া আসিল—শাশুড়ীরা অকাতরে ঘুমাইতেছেন; শ্বশুরের ঘড়িতে মোটে একটা বাজিয়াছে। স্বামীর কলেজ বোধহয় আজ চারটে পর্য্যন্ত—এখনও ঢের সময়।

ঘরে আসিয়া পোষ্টকার্ডটি সামনে—বইয়ের তাড়ার গায়ে হেলান দিয়া রাখিল, তাহার পর কতকগুলা কাগজ লইয়া ইস্তক 'শ্রীশ্রী দুর্গা সহায়' থেকে 'শ্রী অখিলচন্দ্র দেবশর্ম্মণ' পর্য্যন্ত সমস্তখানি নকল করিতে লাগিয়া গেল।

দুইটা বাজিয়া গেল—আড়াইটা—তিনটা। কপালের ঘাম মুছিয়া মুছিয়া আঁচলখানি ভিজিয়া গিয়াছে। তা যাক্; ওদিকে প্রত্যেক অক্ষরের বাঁক, কোণকাণ, মাত্রা একেবারে বাবার লেখার মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে—মেয়ে লিখিয়াছে বলিয়া চিনুক দেখি কে চিনিবে!

তাহার পর আসল কাজ—যার জন্যে এত মেহনৎ। বাপের চিঠি থেকে অক্ষর বাছিয়া বাছিয়া একটা আলাদা কাগজে সন্তর্পণে লিখিল—"পুনশ্চ। আর বৈবাহিক মহাশয়, আপনার বেহান কয়দিন থেকে একেবারে শয্যাধরা। একবার চপুকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছেন। শ্রীমান অজিত বাবাজীবনের সহিত অতি সত্বর পাঠাইয়া দেন তো ভাল হয়। ইতি

শ্রীঅখিলচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ"

কাগজখানি পোষ্টকার্ডের পাশে একেবারে সাঁটিয়া ধরিল। অবিকল বাবার লেখা! চপলা লেখাটুকু আরও আট-দশবার ভাল করিয়া মক্স করিয়া লইল, তাহার পর সর্ব্বসিদ্ধিদাতৃ দুর্গাকে স্মরণ করিয়া সমস্তটুকু বাবার পোষ্টকার্ডে, ঠিকানা লেখার দিকে খালি জায়গাটুকুতে সাবধানে লিখিয়া ফেলিল।

লিখিয়াই তাহার মুখটা শুকাইয়া গেল; কলমটা রাখিয়া দিয়া বলিল—"ঐ যা!"

ঠিকানার কালির সঙ্গে এ কালি মোটেই মিস খায় না। উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া দুই পিঠ তুলনা করিতে লাগিল। না, এ স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে আজকের সদ্য লেখা। এ চিঠি দিলেই তো সর্ব্বনাশ; না-দেওয়াও বিপজ্জনক,—এখন উপায়?...

ভাবিতে ভাবিতে সে নিতান্তই বিচলিত হইয়া উঠিল এবং তাহার কাজটা ক্রমে একটা অপরাধের আকারেই তাহার মনে প্রতীয়মান হইয়া উঠিতে লাগিল। ব্যাকুল হইয়া বলিল—"এ কি করলে মা দুর্গা? —তাহলে লেখাতে গেলে কেন?"

চপলার এখন পর্য্যন্ত বিশ্বাস মা-দুর্গা নিজের অন্যায়টুকু বুঝিতে পারিয়া হঠাৎ তাহার মাথায় আর একটু বুদ্ধি আনিয়া দিলেন। সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়া বাক্স খুলিয়া একটি চিঠি বাহির

করিল—কাল দুপুরে বসিয়া সইকে খানিকটা লিখিয়াছিল, এখনও শেষ হয় নাই। কম্পিত বক্ষে চিঠিটার ভাঁজ খুলিয়া পোষ্টকার্ডে বাবার লেখার পাশে ধরিল। —একেবারে এককালি!

আশ্বস্ত হইয়া নিজের মনে বলিল—"মা যে বলেন—ভাল কাজে বিঘ্নি অনেক, তা মিছে নয়। যাক কেটে গেল।"

বিকালে আসিয়া শ্বশুর অভ্যাসমত জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ কোন চিঠি ফিটি এসেছিল গা শান্ত-মা?"

চপলা একটুও দ্বিধা না করিয়া উত্তর দিল—"কই, না তো বাবা।"

দু-রকম কালির গরমিল মিটাইয়া চিঠিটা আসিল তাহার পরদিন; উঠানের একপাশেই পড়িয়া ছিল, শাশুড়ী তোলেন। শ্বশুর বালিশের নীচে আপিসের চাবি রাখিতে গিয়া আপনিই পাইলেন; চপলা সেদিন বাড়িতে ছিল না তখন।

পাশের বাড়ি হইতে বেড়াইয়া আসিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। কেমন যেন শ্বশুরের সামনে আসিতে পা উঠিতেছে না, বুকটা ধড়াস ধড়াস করিতেছে।

ডাক পড়িল—"কই গো, চঞ্চলা-মাকে আজ দেখতে পাচ্ছি না কেন?"

যতটা সম্ভব সহজ ভাবেই আসিয়া দাঁড়াইল। "কি বাবা!" বলিয়া মুখ তুলিতেই চোখের পাতা কিন্তু নামিয়া আসিল।

"অমন শুকনো কেন মা? —আজ ঘুমোও নি, না? —এঃ—ই, দেখেচ—দুষ্টু পাড়া-বেড়ানী মেয়ের কাণ্ড!"

কাছে টানিয়া লইলেন—"অসুখ করবে যে... বাবার চিঠি এসেচে, দেখেচ?"

"কই না"—চোখ তুলিতেই আবার সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া পড়িল। মুখটাও একটু রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। শ্বশুর দেখিলেন, পাগলী মেয়ে—বাপ লইয়া যায় না বলিয়া চিঠির নামেই অভিমান; কটা দিনই বা সে আসিয়াছে তাহা তো হিসাব করিয়া দেখিবে না।

বলিলেন—"এসেচে। আর তোমায় একবার যেতে লিখেচেন বেহাই মশাই।"

আসল কথাটি জানাইবেন কিনা ভাবিতে লাগিলেন—"কদিন থেকে শয্যাধরা—বেশ ভাবনার কথা।" বলিলেন—"বেয়ান ঠাকরুণের একটু অসুখ লিখেচেন। কিন্তু কেমন যেন একটু খাপছাড়া খাপছাড়া,—হঠাৎ শেষের দিকে পুনশ্চ দিয়ে একটু লেখা। আর, এই সেদিন চিঠি এল, কিচ্ছু তো লেখেন নি!... যাই হোক, অজিত গিয়ে একবার তোমায় রেখে আসুক।"

সফলতার আনন্দে শরীর মনের সঙ্কোচটা কাটিয়া যাইতেছে; বুদ্ধিও খুলিতেছে। —চপলা বলিল—"খাপছাড়া যে বলচেন বাবা—বোধ হয় মনটা সুস্থির নেই। আর আগে লেখেন নি...."

বাপের অসঙ্গতির জন্য কন্যার দুশ্চিন্তা লক্ষ্য করিয়া এবং অদ্ভুত জবাবদিহি শুনিয়া শ্বশুর হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন—"বাপ নিশ্চয় গাঁজা-টাজা খায়, উল্টা সোজা জ্ঞানগম্যি নেই।"

যাক, কথাটা চপলা পূর্ব্বে অত খেয়াল করে নাই। বাবার গাঁজাখুরির অপবাদে যদি আপাতত ওটা চাপা পড়ে তো তাহার আপত্তি নাই।

মনে মনে খুশী হইয়া হাসিয়া বলিল—"যান, ঠাট্টা করছেন আপনি।"

মনে পড়িল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, যাহা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। প্রশ্ন করিল—"মার কি খুব অসুখ না-কি বাবা? —আমার তো ভয়ে হাত পা যেন অবশ হয়ে আসচে—হঠাৎ যেতে বলা কেন রে বাপু!" —মুখটা বিমর্ষ করিবারও চেষ্টা করিল। সরল আনন্দকে কৃত্রিম বিষাদে চাপা দিতে পারিল না। সেটুক শ্বশুরের লক্ষ্য এড়াইল না; তবে, বাৎসল্য না-কি নিজেকেই নিজে প্রবঞ্চিত করে তাই ভাবিলেন—আহা, বড় ছেলেমানুষ, বাড়ি যাওয়ার আহ্লাদেই ও এখন আত্মবিস্মৃত; —ভালই, যত ভুলিয়া থাকে....

উত্তর দিলেন—"না, এই সামান্য একটু জ্বর। তবে, দেখতে চাইচেন, দেখে এস একবার।" —মুখে সহজ প্রফুল্লতা ভাবটা টানিয়া রাখিবার চেষ্টা।

বধূরও লক্ষ্য এড়াইল না। শ্বশুরকে প্রবঞ্চনা করার জন্য একটু অনুতাপও বোধ হয় হইল—আহা বুড়া মানুষ তাঁর গুরুজন! ...কিন্তু তখনই মনে পড়িল—আর একটু প্রবঞ্চনা করা দরকার—উচিত হিসাবেও, আবার এই গোলমেলে চিঠিটা হস্তগত করিয়া ফেলিবার জন্যও। বলিল—"কই চিঠিটা তো দেখলাম না বাবা; কি লিখেচেন দেখি না একবার।"

শ্বশুর বলিলেন—"হ্যাঁ, এই যে—"

এ-পকেট সে-পকেট খুঁজিলেন। বলিলেন—"কোথায় যে রাখলাম... দেব'খন খুঁজে... ভালই আছেন, এমন কিছু নয়। যাও, একবার পাঁজিটা নিয়ে এস দিকিন।"

ভাবিলেন—একেবারে 'শয্যাধরা' লেখা রহিয়াছে, চিঠিটা দেখান ঠিক নয়। আহা নিতান্ত ছেলেমানুষ, এক্ষেত্রে একটু প্রবঞ্চনা করাই ভাল।

করিলেনও।

বাক্সপত্র গুছাইতে গুছাইতে আবার হঠাৎ একটা কথা মনে উদয় হইয়া চপলার সর্ব্বশরীর যেন শিথিল করিয়া দিল—শ্বশুর যে বাবাকে চিঠির উত্তর দিবেন! তাহা হইলেই তো সব কথা ফাঁস হইয়া যাইবে! আর, তাহার পর যে লাঞ্ছনা, যে-কেলেঙ্কারি তাহা ভাবিতেও যে গা শিহরিয়া ওঠে!...

এমনই অসহায় অবস্থা যে মা-দুর্গাকে খোশামোদ করিলেও কোন সুরাহা হইবার নয়। মরিয়া হইয়া ধিক্কার দিল—"এই ছিল তোমার মনে মা, শেষকালে? তোমারও তো বাপের বাড়ি আছে, পাগলের মত ছুটে আসতে হয়..."

যুক্তিটা নিশ্চয় মা-দুর্গার মর্ম্মে লাগিল। ...প্রথম ঘোরটা কাটিয়া গিয়া চপলার মাথাটা একটু পরিষ্কার হইল। শ্বশুরের কাছে গিয়া বলিল—"বাবা বলছিলাম যে..."

"হ্যাঁ মা, বল...."

"এই বলছিলাম—আপনি বাবাকে চিঠিটা লিখে আমায় দিয়ে দেবেন; আমিও তার ওপর দুটো কথা লিখে ডাকে..."

"চিঠি লিখে তো কোন ফল হবে না মা; তোমরা তো কাল সকালেই যাচ্ছ। তাই ভাবছি..."

"হ্যাঁ বাবা, থাক।" একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়িয়া বুকটি হালকা হইল।

"ভাই ভাবছিলাম একটা না-হয় টেলিগ্রাম..."

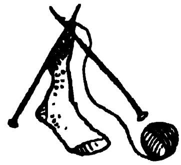
সর্ব্বনাশ! চপলা একেবারে কপালে চোখ তুলিয়া বলিল—"টেলিগ্রাম!"

"হ্যাঁ মা, তাই ভাবছিলাম; কিন্তু হিসেব ক'রে দেখচি—সেও তো তোমাদের গাঁয়ে তোমাদের আগে পৌঁছুবে না।"

আর একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস—বাবাঃ, ফাঁড়া যেন কাটিয়াও কাটে না। তাড়াতাড়ি বলিল—"হ্যাঁ বাবা, আর মিচিমিচি পয়সা খরচও—এই মাগ্‌গী গণ্ডার দিন...."

বুদ্ধির জোয়ার নামিয়াছে। একটু থামিয়া বলিল—"আর এও তো ভেবে দেখতে হবে বাবা-মা'র অমন অসুখ, এর মধ্যে খুট করে এক টেলিগ্রাম! —শেষকালে কি হ'তে কি হয়ে পড়বে; আপনি-ই বলুন না? ....তার চেয়ে আমার হাতে বরং ভাল করে একটা চিঠি লিখে দেবেন—আমি গিয়েই বাবাকে দিয়ে দোব।"

৩৩ বর্ষ, শ্রাবণ ১৩৪০



ফাঁকি

মণীন্দ্রলাল বসু

দাদামশাই!

এখনও ঘুমোস্‌নি সুধা, কি কষ্ট হচ্ছে মা?

না, দাদামশাই কোন কষ্ট নয়, তুমি এবার ঘুমোতে যাও, কোন দর্‌কার হ'লে ডাকবো'খন।

সে ঘুমের ওষুধটা—

না, দাদামশাই, ওষুধ খেলেও আমার ঘুম হবে না, তার চেয়ে তুমি একটু গল্প করো, আমি গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি।

মাতৃহারা ক্ষুদ্র বালিকা সুধাকে কত রাত, কত গল্প বলিয়া দাদামশাই ঘুম পাড়াইয়াছেন, কিন্তু আজ এ মৃত্যুপথযাত্রিণী যক্ষ্মারোগাক্রান্তা নারীকে তিনি কি গল্প বলিয়া ভুলাইয়া ঘুম পাড়াইবেন! তাঁহার হৃদয় কত সুখ-দুঃখের স্মৃতিতে ভারী হইয়া চোখে দুইটি জলে ভরিয়া আসিল, ভাঙা গলায় তিনি বলিলেন, দেখ সুধার—তারপর আর কিছু বলিতে পারিলেন না, শুধু দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বেদনায় স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অদূরে সমুদ্রের একটানা করুণ কল্লোল-ধ্বনি তাঁহার ভগ্ন জীবনের দীর্ঘ হুতাশ্বাসের মত কানে আসিয়া বাজিতে লাগিল, বাহিরে মৃদু জ্যোৎস্না থম্ থম্ করিতে লাগিল।

এঘরের অন্ধকারময় স্তব্ধতা পাষাণ-ভারের মত দাদামশায়ের বুকে যেন চাপিয়া ধরিল, তিনি ধীরে ধীরে পাশের ঘরে গিয়া বলিলেন, সুধা এখন একটু বেদানার রস খাবে?

আচ্ছা দাও দাদু,—কটা বেজেছে এখন?—

এখন প্রায় দশটা।

মোটে দশটা? আমার মনে হচ্ছে কত রাত হয়েছে, যেন এ রাতের আদি নেই—শেষও হবে না—হ্যাঁ, দাদামশাই, আলোটা এঘরে নিয়ে এস, ওই কোণে রাখ,—

চোখে লাগবে যে—

না, লাগবে না, বাইরে বড় জ্যোৎস্না, চোখ দু'টো যেন জ্বালা করছে, ঘরে আলো থাকলে বাইরেটা তবু অন্ধকার হবে—

দাদামশাই আলোটা মাথার দিকে জানলার পাশে রাখিলেন। তারা-ভরা আলোছায়াময়ী রাত্রি এতক্ষণ মৃত্যুর মত স্তব্ধ-রহস্যময় নিঃশব্দ-চরণে শিয়রে দাঁড়াইয়াছিল, ঘরে আলো আসাতে ঘর হইতে একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

বেদানার রস খাইয়া সুধা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দেওয়ালে ঘরের নানা জিনিষের অদ্ভুত ছায়াগুলি দেখিতে লাগিল। দাদামশাই ভাবিলেন, সুধার এবার ঘুম আসিতেছে।

সহসা সে বলিয়া উঠিল—আচ্ছা দাদামশাই তুমি কি দুপুরে ওঁর চিঠিটা পড়ে শুনিয়েছিলে? —আমার ঠিক মনে পড়ছে না—

চিঠির কথা হইতেই দাদামশাইয়ের বুকের পাঁজর যেন অসহনীয় বেদনায় কাঁপিয়া উঠিল, আপনাকে দমন করিয়া তিনি বলিলেন—হাঁ, তোমাকে ত বললুম—

হাঁ, ঠিকই ত তুমি বললে, উনি এক জরুরী মকদ্দমায় ব্যস্ত, শেষ হ'লেই আসবেন দেখ আমার সব এলোমেলো হয়ে যায়, আমি বলছিলুম কি ওঁর যদি বিশেষ কাজ থাকে উনি এখন নাই বা এলেন, আমি ত একটু সেরে উঠেছি—

না, আমি লিখে দিয়েছি শীগগির আসতে, এ বুড়ো কি তোর সেবা করতে পারবে, নাতজামাইয়ের সেবায় দুদিনেই সেরে উঠবি—শেষের কথাগুলি পরিহাসের সুরে বলিলেন বটে, কিন্তু কথাগুলি ব্যঙ্গের মত শোনাইল, শ্লেষবাক্যগুলিতে নিজেই মর্ম্মাহত হইয়া স্তব্ধ হইলেন।

কিন্তু কথাগুলি সুধার বুকে বিশেষ আঘাত করিল না, তাহার হৃদয় যেন অসাড় হইয়া গিয়াছে, বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া সে ধীরে বলিল—আমি বলছিলুম কি দাদু, খোকাকে শুধু যদি পাঠিয়ে দিতে পারে, একদিনের জন্য, কত দিন আমি তাকে দেখিনি, মনে হচ্ছে যেন কত বছর, কতদিন হবে?

প্রায় একমাস হবে—

একমাস—আচ্ছা ঠাকুরপো'র এখন ছুটি, ওরা যদি খোকাকে একবার পাঠায়, দুদিনের বেশী আমি তাকে রাখব না—আমি শুধু একবার দেখব—আচ্ছা দাদামশাই, খোকা এখানে এলে তার কি কোন ভয় আছে, তা যদি থাকে—

না, মা, সে আমি ঠিক ব্যবস্থা করব—

আচ্ছা, আমি কোলে নিতে পারব ত তাকে?

কোন ভয় নেই, তোমার খোকা তোমার কাছে এলে তার কোন রোগ হবে না—

তুমি কাল ডাক্তারবাবুকে একবার জিজ্ঞেস কোরো—ওরা কবে আসবে লিখছে—কাল?

দু'-একদিন দেরী হবে, মকদ্দমাটা শেষ না হলে—

হাঁ, ঠিক, মকদ্দমার কথাটা আমি ভুলে গেছলুম—আচ্ছা, ডাক্তার-বাবুকে জিজ্ঞেস কোরো আমি এখন একটু বেড়াতে পারি কিনা, তা হ'লে কাল সকালে কতকগুলো ঝিনুক কুড়িয়ে নিয়ে আসি—

সে আমি নিয়ে আসব'খন।

না, তোমার কষ্ট হবে, খোকা ঝিনুক পেলে নিশ্চয় খুব খুসি হবে। আর সেই মুচিটাকে একবার আসতে বোলো তো—হরিণের চামড়ার কি সুন্দর জুতো নিয়ে এসেছিল, খোকার পায়ে বেশ মানাবে, নয় দাদামশাই? —

হাঁ, বেশ মানাবে।

আচ্ছা, চিঠিটা কি তোমার কাছে আছে?

আর এখন চিঠি শোনে না মা, তা হ'লে রাতে একেবারে ঘুম হবে না—

এ ক'-রাতে আমার একটুও ঘুম হয়নি জান, একটু ঘুম আসে হঠাৎ চমকে উঠি, মনে হয় যেন খোকার পায়ের মিষ্টি শব্দ—কিন্তু চোখ চাইলেই কোথায় মিলিয়ে যায়—আচ্ছা ও ত সমুদ্রের ডাক—

না, বাতাসে ঝাউগাছগুলোর শব্দ হচ্ছে।

ও, মাঝে মাঝে মনে হয় যেন গাড়ীর শব্দ শুনছি, যেন গাড়ী করে আমার খোকা আসছে; সব এমন গুলিয়ে যায়। —দাদামশাই।

কি মা!

সেই চিঠিটা একবার, না, তোমায় পড়তে হবে না, আমায় শুধু দাও আমি হাতে করে'—

সেটা কোথায় যেন রাখলুম মনে পড়ছে না তো, দেখি বোধ হয় ওঘরে—

দাদামশাই আলো লইয়া পাশের ঘরে গেলেন এবং আলোটি সে ঘরে রাখিয়া দিয়া যেন কোন অজানা অন্ধকার পথে একা দিশাহারা হইয়া অসাড়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সুধার সকরুণ জীবনের মত চিঠিটাও একটা মস্ত ফাঁকি। প্রায় একমাস হইল দাদামশাই সুধাকে তাহার মাতাল স্বামীর ঘর হইতে জোর করিয়া লইয়া আসিয়াছেন, এই এক মাসের মধ্যে সুধার স্বামীর কোন চিঠিই আসে নাই। দাদামশাই যখন সুধাকে লইয়া আসেন তখন স্বামী কিছু আপত্তি করিলেও শাশুড়ী বিশেষ কিছু আপত্তি করিলেন না। সুধা যখন সুস্থ, সবল ছিল তখন তাহাকে দিয়া সংসারের সমস্ত কাজ করাইয়া লওয়া চলিত, কিন্তু এখন এ রুগ্না, অকর্ম্মণ্যার জন্য শুধু ঝির খরচ নয়, ডাক্তারের খরচও বাড়িয়াছে, একটা যন্ত্র ভাঙ্গিয়া গেলে যেমন সেটাকে দূর করিয়া লোকে নূতন যন্ত্রের অর্ডার দেয়, সুধার শাশুড়ী তেমনি সুধাকে ঘর হইতে বিদায় দিয়া তাঁহার এক নূতন কর্ম্মপরায়ণা

বধূর দরকার একথা ঘটকী-মহলে জানাইয়া দিলেন। তবে দাদামশাইয়ের আদিক্ষেতা বা দরদটা যে তিনি পছন্দ করিলেন না তাহা লোক-সমাজে জানাইবার জন্য তিনি সুধার চার-বছরের খোকাকে নিজের কাছে আটকাইয়া রাখিলেন, বলিলেন—তোমাদের মেয়ে তোমরা নিয়ে যেতে পার, আমার নাতিকে আমি দেবো না। অপ্রেম-অনাদর নির্য্যাতনের মধ্যে স্বামীর ঘরে সুধা এই খোকাকে বুকে করিয়া সকল দুঃখ সহজে বহিয়াছে, খোকাকে আবার দেখিতে পাইবে এই ভাবিয়া তাহার মন দুলিতেছিল।

দাদামশাই সুধার স্বামীকে আসিবার জন্য কয়েকখানা চিঠি লিখিয়াছিলেন, কিন্তু কোন উত্তরই পান নাই, শুধু মাঝে স্বামী কিছু টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিল, আর মনিঅর্ডার কুপনে দু'লাইন লেখা ছিল, এখন আদালতে বড় বেশী কাজ, মক্কেলরা কিছুতেই ছাড়ে না, যাবার সময় নেই—বার-বার চিঠি লিখে' বিরক্ত করবেন না।

দাদামশাই! খুঁজে পাচ্ছ না বুঝি, আচ্ছা থাক—

এই যে মা—

আচ্ছা কাল দিও, আমি কি ভাব্‌ছিলুম জান?

কি রে?—

কি আশ্চয্যি আমার এতদিন কখনও মনেও হয়নি—

কি মা?

আচ্ছা দাদু, মার মুখ তোমার মনে আছে তো?

তোর মা!

মা'র সত্যিকার মুখ আমার খুব অস্পষ্ট মনে আছে, তবে সেই যে ফোটোটা আছে—দেখ দাদু খোকার মুখ ঠিক মায়ের মুখের মত হয়েছে, চোখ দু'টো তো ঠিক সেইরকম টানা টানা—আমি কি করে' বুঝলুম জান, আমার মনে হল, মা যেন ওই জানলার কোণ থেকে আমার দিকে চেয়ে আছেন, ঠিক তাঁর মত একখানা মুখ—হঠাৎ সে মুখ মিলিয়ে গেল, আবার ভেসে উঠল, দেখি, সে তো মার মুখ নয়, খোকার, কিন্তু ঠিক মায়ের মুখের মত—কৈ চিঠিটা?

দাদামশাই তাঁহার পকেট হইতে একখানা আফিসের চিঠি বাহির করিয়া কম্পিত-হস্তে সুধাকে দিলেন। সুধা ইংরেজী জানে না এই ভরসা।

বাহিরের মেঘে চাঁদ ঢাকা পড়িয়াছে, বাতাস উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে, সাগরের ডাক ডমরুধ্বনির মত বাজিতেছে। কাশিয়া কাশিয়া বুকের যে পাঁজরগুলিতে ব্যথা হইয়াছে তাহাদের উপর রোগশীর্ণ হাতে চিঠিটা ধরিয়া সুধা শান্ত হইয়া শুইল। অন্ধকার রাত্রির তারাগুলি মাতার করুণ ব্যাকুল অনিমেষ চাউনির মত তাহার রোগ-শয্যার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। দাদামশাই ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া সম্মুখে বালির উপর বসিয়া অন্ধকারময় অনন্ত সমুদ্রের দিকে শূন্যনয়নে চাহিয়া রহিলেন। কিছু ভাবিবার, কাঁদিবারও তাঁহার যেন শক্তি নাই।

(২)

দুপুরবেলা ইজি-চেয়ারে শুইয়া খোকার জন্য রেশমের মোজা বুনিতে-বুনিতে শ্রান্ত হইয়া সুধা একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। দাদামশাই ধীরে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন, ধীরে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন, চুল কত উঠিয়া গিয়াছে, মাথাটা যেন শুকাইয়া ছোট হইয়া গিয়াছে। কয়েকটা মাছি মুখে উড়িয়া বসিতেছে দেখিয়া তিনি ধীরে ধীরে পাখার মৃদু বাতাস করিতে লাগিলেন, শীর্ণ মুখখানি রোগের আভা-মণ্ডিত হইয়া কি করুণ।

সুধা একটু উসখুস করিয়া জাগিয়া উঠিল; দাদামশাই পাখার বাতাস করিতেছেন দেখিয়া মিটিমিটি চাহিয়া করুণ-মধুর হাসিল। তার পর দাদামশাইয়ের হাত হইতে পাখাটি লইয়া বলিল—দাও না দাদামশাই, তোমায় একটু হাওয়া করি—

আমি এই জানালাটা খুলে' দিচ্ছি, তা হ'লে খুব হাওয়া আসবে—

আচ্ছা দাও, আজ কত তারিখ দাদামশাই?

আজ বোধ হয় ১২ই—

ও! তা হ'লে তিন দিন আছে, জান ষোলই হচ্ছে খোকার জন্মদিন, ও এখনও মোজাটা কত বাকি, কিছু বোনা হয়নি, খালি ঘুমিয়ে পড়ি—

এখন তোমার যে পরিপূর্ণ বিশ্রাম দরকার।

না, এ আমায় বারণ করতে পারবে না, এ-তিনদিনে এটা আমায় শেষ করতেই হবে, আচ্ছা, ষোলই-এর মধ্যে খোকা নিশ্চয়ই এসে পড়বে—জানো আমি কি স্বপ্ন দেখছিলুম? আমি দেখছিলুম, খোকা এসেছে, আমি তাকে এই মোজাটা পরিয়ে দিলুম, তার পর হরিণ-চামড়ার সুন্দর জুতো— কি সুন্দর দেখাচ্ছিল—আমার গলা জড়িয়ে চুমো খেয়ে বললে,—ভারি দুষ্টু মা, আমায় ফেলে' এসেছিলে, আমার মন কেমন করে যে—দাদু, আচ্ছা আন্‌লাটায় তো তোমার কাপড় আর পাঞ্জাবী রয়েছে ত? —হাঁ, ঠিক মনে হচ্ছিল খোকার সেই লাল জরিপাড় ধুতিটা আর সিল্কের পাঞ্জাবীটা ঝুলছে—খোকা,—খ্যা!—

সহসা সুধার এক কাশির বেগ আসিল, কাশিতে কাশিতে খানিকটা রক্ত মুখ দিয়া উঠিল, কিছুক্ষণ বসিয়া মৃদু আর্ত্তনাদ করিয়া শ্রান্ত হইয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার হাতে-বোনা রেশমের মোজা পরা খোকার কচি পা-দু'টি মুদ্রিত নয়নের অন্ধকার পটে বারবার ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। সেই জুতোমোজা পরিয়া খোকা যেন দস্যিপনা করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার দুরন্ত পায়ের শব্দের মত সাগরের তরঙ্গধ্বনি তাহার কানে আসিয়া বাজিতে লাগিল।

৩

গভীর রাতে সুধা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ভাবিয়া দাদামশাই নিঃশব্দ চরণে তাহার ঘরে ঢুকিয়া তাহার শয্যার পাশে বসিলেন। সুধা কিন্তু জাগিয়াছিল, সে ধীরে বলিয়া উঠিল—কে, দাদামশাই? তোমায় আজ সারাদিন দেখিনি কেন?

দাদামশাই শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার চোখ দিয়া যে টস্‌টস্ করিয়া জল পড়িতেছে তাহা সুধা অন্ধকারে বুঝিতে পারিল না।

আচ্ছা, দাদু কাল ত সকালে ওরা আসবে, দেখ, আমি ভোরে প্রায়ই ঘুমিয়ে পড়ি, আমায় কিন্তু কাল ভোরে জাগিয়ে দিও, ভোরবেলাই তো ট্রেন আসে—

দাদামশাই গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—মা গো!

তাহার স্বামী ও পুত্র কাল সকালে আসিবে এই স্বপ্নমাধুরীতে সুধা নিমগ্ন ছিল, স্নেহসুধায় তাহার হৃদয় কানায়-কানায় ভরা। ধীরে সে বলিল—আচ্ছা, আজ কোন চিঠি আসেনি?

চিঠি সত্যই সেদিন একখানা আসিয়াছিল। সেটা সুধার স্বামী লেখে নাই, তাহার দেবর দাদামশাইকে লিখিয়াছে। সে লিখিয়াছে, খোকার কয়েকদিন হইতে খুব জ্বর, বৌদির জন্য ভয়ঙ্কর কাঁদে। দাদা খোকার কান্নার জন্য বিরক্ত হইয়া আর রাতে বাড়ীই আসেন না, তিনি আগে মাঝ-রাতে বাড়ী ফিরিতেন, এখন সমস্ত রাতই বাহিরে থাকেন। বৌদিকে দেখিবার জন্য তাহার ভয়ঙ্কর ইচ্ছা করে, কিন্তু তাহার দাদা শাসাইয়াছেন, যে, সে যদি দেখিতে আসে তবে তাহাকে আর বাড়ী ঢুকিতে দিবেন না। এদিকে খোকার চিকিৎসার কিছুই হইতেছে না, সে যে কি করিবে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। বৌদি কেমন আছেন তা যেন তাহাকে নিশ্চয় জানানো হয়। তরুণমনের অনেক ব্যথার কথাই সে লিখিয়াছে। তাহার চিঠিখানি পাইয়া দাদামশাই আজ দিশাহারা হইয়া গিয়াছেন।

সুধা বলিল, মোজাটা কিন্তু একটু বোনা বাকী আছে, তা তার জন্য খোকা রাগ করবে না,

কালই আমি শেষ করে' দেবো—কিন্তু তুমি এলে, আর মনটা কেমন হু হু করছে—এতক্ষণ আমি আকাশের দিকে চেয়ে যেন খোকার মুখ দেখছিলুম—তারাগুলো যেন তার সুন্দর চাউনি—না, আমার কেমন ভাল লাগছে না... মনে হচ্ছে, খোকার যেন ভয়ঙ্কর অসুখ করেছে, সে মা, মা বলে কাঁদছে—অন্ধকার হাৎড়ে বেড়াচ্ছে, আমাকে খুঁজে' পাচ্ছে না—দাদামশাই!

দাদামশাই আর আপনাকে দমন করিয়া রাখিতে পারিলেন না, এ মিথ্যার মায়া-জালে ভারাক্রান্ত হইয়া ছটফট করার চেয়ে সত্যে মুক্তি ভাল,—সে মুক্তি যতই নির্ম্মম ক্রূর বেদনাময় হোক!

তিনি ভাঙা-ভাঙা গলায় বলিয়া উঠিলেন—ওরে সব ফাঁকি, তোকে সব মিথ্যা—

সহসা তিনি থামিয়া গেলেন। সুধার কাশির বেগ আসিয়াছে। কাশিতে কাশিতে সে উঠিয়া বসিল, ঝড়ে দোলা লতার মত কাঁপিতে লাগিল, বিছানা রক্তে ভাসিয়া গেল।

কাশি থামিয়া গেলে, সুধা যখন একটু শান্ত হইল, দাদামশাই আর তাহাকে কিছু বলিতে পারিলেন না। অশ্রুসিক্তকণ্ঠে ডাকিলেন, মা!

না, দাদু, কষ্ট না, কিছু কষ্ট না, আমি এখন একটু ঘুমোতে চেষ্টা করি, আমায় কিন্তু ভোরে জাগিয়ে দিও।

৪

পরদিন বিকেল-বেলায় সমুদ্রতীরের সম্মুখে বারান্দায় বসিয়া সুধা তাহার খোকার ফোটোটি দেখিতেছিল। এ ফোটোটি তাহার দেবরের এক বন্ধু তুলিয়া দিয়াছিল। খুব ভালো ওঠে নাই, তবু এই অস্পষ্ট ছবিখানি সে খোকার রূপমাধুরী দিয়া ভরিয়া দুই চোখ দিয়া পান করিতেছিল। ঘরের ভিতর দাদামশাইয়ের পায়ের শব্দ শুনিয়া সে ধীরে ডাকিল—দাদামশাই!

অপরাধীর মত দাদামশাই তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তোমায় এমনি ডাকলুম দাদামশাই, বোসো না চেয়ারটায়।

দাদামশাই, তোমার পাকাচুলগুলো তুলি এস ত—

ওরে আমার সব চুলই যে পাকা!

দেখ তো কানে কি ময়লা—বলিয়া সুধা আঁচল দিয়া কান পরিষ্কার করিয়া দিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু একটা কান পরিষ্কার করিয়াই পরিষ্কার করিবার উৎসাহ চলিয়া গেল। দাদামশাই তাহার মাথায় ধীরে হাত বুলাইয়া বলিলেন—কেমন আছিস, সুধা?

মন্দ কি, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে কি জান, আমি যেন নেই, আমি থাকা না-থাকার বাইরে গেছি—তুমি অমন করে' চেও না—হাঁ, আমার এখন কিরকম মনে হচ্ছে জান? —আমরা সব ছায়া, সব ফাঁকি, বাস্তব কিছু নেই—এই সামনে বালির পাড়, ওই যে সমুদ্দুর, ঠিক যেন ছবির মত আমার চোখে লাগছে, এই যে তুমি বসে' আছ, ওই যে লোকজন চলেছে, সব যেন ছবির মত ভেসে চলেছে—ওই যে খোকাব ফোটোটা আর এই যে বাইরের ঘর-বাড়ী জিনিষপত্তর লোকজন আমি কোন তফাৎ বুঝতে পারিনে—সব ছায়াবাজীর মত মনে হয়—মাঝে-মাঝে আমি নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখি সত্যি আমি আছি কিনা—ফাঁকা সব ফাঁকা, এই ঘর, এই মন, এই আকাশ, সব ফাঁকা, তার মধ্যে সবাই ছায়ার মত ঘুরছি—তোমার কি এরকম মনে হয়—

সত্যিইরে ফাঁকি সব ফাঁকি, আমি মিথ্যা দিয়ে একটু সুখস্বর্গ তোর জন্যে রচনা করছিলুম—কিন্তু ফাঁকি দিয়ে—ওরে—

তুমি কেঁদো না দাদামশাই, আমি জানি, আমি ঠাকুরপোর চিঠি পড়েছি!

দাদামশাইয়ের সমস্ত দেহ রিম্‌ঝিম করিয়া উঠিল, তিনি চারিদিকে অন্ধকার দেখিলেন। দুই চোখ দিয়া টস্‌টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

তুমি কাঁদছ, কিন্তু আমার চোখে ত জল আসে না দাদামশাই, আমার কাছে সব মায়া, মিথ্যা

মনে হচ্ছে, কে এল কে না এল, কাকে দেখলুম, কাকে দেখলুম না, সব মিথ্যা—এ হাসি মিথ্যা, এ কান্না মিথ্যা, এ সুখ মিথ্যা, এ বেদনা মিথ্যা, সমস্ত সংসার যে ফাঁকি—তুমি কেঁদো না দাদু—ওঃ!—উঃ!—

সুধার চোখে অশ্রু উৎসারিত হইয়া উঠিল না বটে, কিন্তু কাশির বেগ আসিল এবং বুক হইতে চাপ চাপ রক্ত উঠিতে লাগিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, আকাশে কয়েকটি তারা ফুটিয়া উঠিয়াছে, সুধা বারান্দা হইতে উঠিয়া চুপ করিয়া বিছানায় শুইয়াছিল।

সহসা সে বলিয়া উঠিল, দাদামশাই, তুমি ভেবো না, তারা আসবে, খোকার আসার সময় কাছে আসছে আমি বুঝতে পারছি, আসছে তারা—

দাদামশাই দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

আচ্ছা, সবই যদি মিথ্যা হয় তো ঠাকুরপোর ও-চিঠিও তো মিথ্যা, তবে খোকা আসবে না কেন? মাঝে মাঝে অন্ধকার দেওয়ালের গায়ে আমি কি দেখতে পাই জান? —খোকার কাপড়, জামা, খেলনা, বাসন—তার ইঞ্জিন গাড়ীটা একনিমিষের জন্য দেওয়ালের গা দিয়ে চলে' কোথায় অন্ধকারে পাড়ি দিলে—ওই তার পদ্মকাটা রেকাবখানা, দেওয়াল দিয়ে গড়িয়ে পড়ল—তার দুধের বাটি তার সন্ধানে ঘুরে' বেড়াচ্ছে—ওরে বাছা—

সুধা, চুপ কর!

চুপ করব কি, আমি যে শুনতে পাচ্ছি সে আসছে—উনিও আসছেন—আসবেন তিনি—তখন হয়ত আমার জ্ঞান থাকবে না, তখন হয়ত আমি তাঁকে চিনতে পারব না, কিন্তু তাঁর পায়ের ধুলো একটু আমার মাথায় দিও।

রাত্রি আরও গভীর হইয়াছে, আকাশ তারায়-তারায় ভরিয়া গিয়াছে; মৃদু চাপা আর্ত্তনাদের মত সমুদ্রের ডাক বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে।

না দাদামশাই, আমার কোন দুঃখ নেই, কারুর ওপর আমার রাগ নেই, তোমার কাছে আজীবন যে স্নেহ পেয়েছি তা ত ফাঁকি নয়। আমার যাবার সময় আসছে কিন্তু তোমাকে আমি ছাড়ব না—আর জন্মে তুমি নিশ্চয় আমার ছেলে হয়ে জন্মাবে—তুমি আর ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারবে না—

না, মা তোকে আমি ফাঁকি দেবো না—

হাঁ দাদামশাই, এজন্মে তুমি আমার যা করেছ তার কিছু আমি শোধ দেবো, ছেলেবেলায় কবে যে বাপ-মা হারিয়েছি কিন্তু তাঁদেব অভাব কোনদিন আমায় বুঝতে দাওনি—এবার তোমাকে আমি বুকে করে' মানুষ করব।

হাঁ, মা, আমাকে তুই ছাড়িসনে—তুইও যদি যাস ত আমাকে নিয়ে চল।

কিন্তু তুমি ভাবছ দাদামশাই, আমি মিথ্যে বলছি—না, খোকা আসছে, আমি যে দেখতে পাচ্ছি, সেই ছোট ঘরের কোণে ম্লান প্রদীপের আলো, ময়লা বিছানায় সে এতক্ষণ ছটফট করছিল, ঠাকুর-পো তাকে কোলে করে' বসেছিল—সে কাঁদছিল, আমার জন্যে গুমরে মরছিল—তার কান্না থামল, হৃদয়ের বেদনা শেষ হ'ল, এবার সে যাত্রা করেছে—

সুধা!

হাঁ, এবার আমাকে তৈরী হ'তে হবে তার জন্যে, তার মোজাটা আমার হাতে দাও ত, কিন্তু ঝিনুক, তুমি কিছু ঝিনুক কুড়িয়ে নিয়ে এস—ঝিনুক নিয়ে আমার সঙ্গে খেলা করবে—

মা!

কার সঙ্গে সে আসছে জান, সে মিথ্যা নয়, সে ফাঁকি নয়, সে মৃত্যু, সে স্বয়ং যম।

৫

—বৌদি!

দেখ সুধা কে এসেছে

কে? মা, যাই মা, একটু দাঁড়াও, এখনও যে খোকা—

বৌদি! বৌদি কেমন আছেন দাদামশাই?

ও ত আজ সন্ধ্যে থেকে ভুল বকছে, জ্ঞান নেই। খোকা কৈ?

খোকা ত নেই দাদামশাই, তাঁকে বাঁচাতে পারলুম না, তাই ছুটে এলুম বৌদিকে যদি বাঁচাতে পারি।

তোমার মা আসতে দিলেন?

মাকে বলে' এসেছি, মা, তোমাদের আমায় তাড়াতে হবে না, আমি তোমাদের ছেড়ে চললুম।

ওগো, কি মদের গন্ধ তোমার গায়ে, কত মদ খাও তুমি—উঃ কেমন জ্বর-জ্বর লাগছে, কত বাসন মাজব—

ভুল বকছে—

ভুল, ভুল সব ভুল—ওগো, চললে, কটা রাত হবে—শরীরে যে কিছু নেই তোমার—আজ নাই বা গেলে—

বৌদি, আমি এসেছি—

এসেছিস, আয়, আয় বাছা, কোলে আয়—তোর মা তোর জন্যে মরতে পারছে না—উঃ—উঃ—ওঃ—

প্রবল কাশির বেগ আসিল। রক্তবমন করিয়া সুধা বিছানায় লুটাইয়া পড়িয়া দীর্ঘশ্বাস টানিতে লাগিল।

অকূল অন্ধকারে সাগর হইতে ঝোড়ো বাতাসে ঘরের আলোর শিখা কাঁপিতে লাগিল, দাদামশাইয়ের চোখে সমস্ত সংসার অন্ধকার ফাঁকি মনে হইল, তিমিরাবগুণ্ঠিতা রহস্যময়ী স্তব্ধ স্নিগ্ধ রাত্রির মত মৃত্যু নিঃশব্দচরণে ঘরে প্রবেশ করিল।

২য় বর্ষ, ভদ্র ১৩৩১



ট্যারা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

এই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে এমন বিশেষত্বহীন অবজ্ঞাত দৃশ্যপটের সংখ্যার হিসাব নাই। বর্ণ নাই, বৈচিত্র্য নাই, সমারোহ নাই, নিতান্ত নগণ্য পার্শ্বদৃশ্য! কিন্তু এগুলিকে বাদ দেওয়া চলে না। বাদ দিলে বিরাট নাটক হইবে অসম্পূর্ণ। তবু রঙ্গালয়ের ইতিকথার মধ্যে ইহাদের উল্লেখ থাকে না।

দরিদ্র পল্লীর মধ্যে একখানি কুঁড়েঘর। সেই পটভূমির সম্মুখে ছোট একটি পরিবার—নয়ানের বুড়ী মা, নয়ান, নয়ানের স্ত্রী আর নয়ানের ন-দশ বছরের ছোট ছেলে ট্যারাকে দেখা যায়। এই পরিবারটির সঙ্গে গ্রামের ইতিহাসের নগণ্য একটু যোগ আছে। বুড়ী নয়ানের মা গ্রামের গৃহস্থ পরিবারে আত্মীয়তার বার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া যায় গ্রাম-গ্রামান্তরের আত্মীয়-কুটুম্বদের বাড়ি। সেখানকার বার্ত্তা বহন করিয়া আনে এখানে। বুড়ীর মত খুঁটিনাটি সমস্ত সংবাদ পরিপাটি করিয়া আদান-প্রদান করিতে কেহ পারে না।

নয়ান খাটে দিনমজুর। নয়ানের বউ—সেও গৃহস্থ বাড়িতে খাটে; বাসন মাজে, ক্ষারে সিদ্ধ কাপড় কাচে, ঢেঁকিতে ধান ভানে। ছোট ট্যারা অদূরস্থ গাঁজা আফিঙের দোকানের সম্মুখে সারাটা দিনমান গুলিদাঁড় খেলে। সঙ্গী না থাকিলে সে একাই দু-জনের ভূমিকা অভিনয় করে—গুলিটাকে পিটাইয়া নিজেই দাঁড় লক্ষ্য করিয়া গুলি ছোঁড়ে। আবার দাঁড়হাতে গুলি পিটাইয়া দাঁড় মাপিয়া চলে—বালি—দুলি—তাল—তম্পা—দেক্—নক্কা।

ট্যারা প্রকৃতির খেয়ালের সৃষ্টি। একটা চোখ ট্যারা, আর অতি ক্ষুদ্র—দেখিয়া মনে হয় কাণা। তাহার উপর আছে জিহ্বার জড়তা।

কত গৃহস্থবধূ ট্যারাকে দেখিয়া করুণা করিয়া নয়ানের বৌকে বলে—আহা বাউরীবৌ ছেলেটি তোর কাণা!

ক্ষুদ্র চোখটা যথাসাধ্য বিস্ফারিত করিয়া জড়-জিহ্বায় ট্যারা বলে—না গো—ডেক—ডেকটে—পেছি আমি।

* * *

অকস্মাৎ জীবনে আসিল একটা উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্য।

সেদিন প্রভাতে তখন রজনীর কাল-পট ধীরে ধীরে অপসারিত হইতেছিল, নয়ানের মায়ের বুকফাটা কান্নার সহিত দিবসের অভিনয় শুরু হইল। নয়ান গিয়াছিল কুটুম্ববাড়ি। সেখান হইতে কলেরা লইয়া ফিরিয়াছিল রাত্রে। প্রত্যূষে তাহার ভূমিকার শেষ হইয়া গেছে। তাহার পর সন্ধ্যায় প্রস্থান করিল নয়ানের বৌ। পরদিন সন্ধ্যায় গেল বুড়ী নয়ানের মা। পুরাতন পটভূমির সম্মুখে সংক্রামতার সকল প্রকোপ ব্যর্থ করিয়া ছোট্ট হাবা ট্যারা যে শুধু কেমন করিয়া রহিয়া গেল কে জানে!

* * *

ট্যারার জীবনের পশ্চাতের পটভূমির পরিধি বাড়িয়া গেল। ক্ষুদ্র ঘরখানি ভাঙে নাই। কিন্তু সে-ঘর মমতা করিয়া কথা কয় না, আহার দেয় না—সে শুধু দেয় স্মৃতিকে পীড়া। ট্যারা ঘর ছাড়িয়া গ্রাম্যপথখানির উপর আসিয়া দাঁড়াইল। গাঁজার দোকানটির সম্মুখেই সে আর গুলি-দাঁড় খেলে না, গুলি পিটাইয়া পিটাইয়া সম্মুখ দিকেই চলে—আর মাপে—তাল—তম্পা—দেক্—নক্কা।

যখনই প্রয়োজন অনুভব্ করে তখনই সম্মুখের গৃহস্থের দুয়ারে গিয়ে বলে—থাকরুণ!

—কে—রে?

হাসিমুখে ট্যারা বলে—তেরা গো আমি। সেই যে মা আমার কাদ করতো! —আঁচলে মুড়ি লইয়া চিবাইতে চিবাইতে আবার খেলিয়া চলে। দ্বিপ্রহর পার হইলেই গ্রামপ্রান্তের দেবায়তন হইতে

ভোগের ঘণ্টা বাজে। ট্যারা যেখানে থাক ছুটিতে ছুটিতে গিয়া হাজির হইয়া এক পাশে পাতা পাড়িয়া বসিয়া যায়।

স্থানটি হিন্দুর খ্যাতনামা একটি তীর্থস্থল, একান্ন মহাপীঠের এক মহাপীঠ। অট্টহাসে দেবী ফুল্লরা—বিশ্বেশ ভৈরব বিরাজমান। গদীয়ান মহান্ত পশ্চিম-দেশীয় সন্ন্যাসী। আবক্ষ শ্বেত শ্মশ্রু, অনাবৃত বিশাল দেহ, বাহুতে, পঞ্জরে কয়টা ক্ষতচিহ্ন দেখা যায়। এগুলি যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন। তিনি পূর্বে ছিলেন সৈনিক—এখন লইয়াছেন সন্ন্যাস।

এই স্থানটির সহিত পরিচয় ট্যারার পূর্ব্ব হইতেই ছিল। কতদিন নয়ানের মা তাহাকে সঙ্গে লইয়া এখানে প্রসাদ পাইয়া গেছে।

সেদিন সন্ন্যাসী বলিলেন—আরে তুমি রোজ রোজ আসো। তুমি—কে—রে?

ট্যারা ঘাড় বাঁকাইয়া ছোট চোখটি পিট পিট করিয়া বলিল—আমি ত্যারা গো গোঁছাই বাবা!

দেবীর পুরোহিত ভূমিবৃত্তিভোগী স্থানীয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ স্বল্প হাস্যসহকারে বলিলেন—মায়ের দরবারে প্রসাদ পাবার যোগ্য পাত্র বাবা!

অনাথ। নয়ানের মায়ের নাতি—নয়ানের ছেলে।

সন্ন্যাসী বলিয়া উঠিলেন—আ-হা-হা-হা বাচ্ছারে! 'আদার বুঢ়ী' 'পাথর ঢিপির' বিচার নেহি কোনো।

জঙ্গলের মধ্যে দেবী বিরাজিতা, তাই আদর করিয়া সন্ন্যাসী বলেন, বেটি আদার বুঢ়ী। আর পাষাণময়ী দেবী—এই নাম 'পাথর ঢিপি'। তারপর সন্ন্যাসী ট্যারাকে বলিলেন—তুমি থাক হিঁয়া এ বেটা। থোড়াথুড়ি কাম করবি—মায়ীর পরসাদ পাবি—কাপড় ভি মিলবে। বুঝলি এ বাচ্চা!

ট্যারা ছোট চোখটি উপরে তুলিয়া মিট্ মিট্ করিয়া চাহিয়া রহিল। পুরোহিত বুঝাইয়া বলিলেন—ওরে গোঁসাই-বাবা বলচেন—তুই এখানেই থাক। খেতে পাবি দু-বেলা, কাপড় পাবি। গরু চরাতে পারবি?

প্রবল উৎসাহে ট্যারা বলিল—হিঁ—হ্যোৎ—ত্যা—ত্যা। —ইদিকেই—ইদিকেই থালার গরু! খুব পারবো।

মুহূর্ত্ত কয় পরেই সে আবার বলিয়া উঠিল—একতা দামা দিয়ো গো আমাকে—বেশ! গায়ে দোব আমি!

ট্যারার জীবনে পশ্চাতের পটভূমি আবার পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। এবার পটভূমিতে রহিল নিবিড় বন-বেষ্টনীর শান্ত উদাসীনতার মধ্যে সুউচ্চ দেবভবন, নাটমন্দির, তাহার সম্মুখে পুষ্করিণী। মন্দিরের পিছনে আশ্রম—মহান্তের পঞ্চমুণ্ডীর আসন, ভোগমন্দির, গোশালা। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া মহান্তজী দেওয়ালে ঝুলান ঘণ্টায় ঘা মারেন। ট্যারার ঘুম ভাঙিয়া যায়, সে চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে সন্ন্যাসীর অদূরে গিয়া দাঁড়ায়।

সন্ন্যাসী বলেন—জটা কোথা? আসে নাই উ আভি?

ছোট মাথাটি নাড়িয়া ট্যারা ইঙ্গিতে বলে—না।

—তব তুমি যাও। গরু বাহার কর। লেফ্ টারন্ কুইক মাচ! বাঁয়ে ঘুমো—জলদি যাও।

সন্ন্যাসী হাসিতে হাসিতে কুস্তির আখড়ায় চলিয়া যান। এ অভ্যাসটুকু এখনও তাঁহার যায় নাই।

ট্যারা কিন্তু গরু বাহির করিতে যায় না—সে চেষ্টা করে ঐ ঘণ্টাটা বাজাইতে। উঁচুতে ঝুলান ঘণ্টাটা বেচারা নাগাল পায় না। অবশেষে আবিষ্কার করে সে একটা আঁকশী। সেই আঁকশীতে ঘণ্টার হাতুড়ীর দড়িটা লাগাইয়া ঘণ্টাটা বাজায় ঢং—ঢং।

শেষে আপন মনেই খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠে।

প্রভাত হইতেই মহাপীঠে লোকসমাগম হয়। প্রথমেই আসে কয়জন নিত্যযাত্রীস্থানীয় ভক্ত

লক্ষ্মীকান্ত, শূলপাণি, চন্দ্রনাথ। লক্ষ্মীকান্ত প্রবেশ করে—মায়ী রাজা করো, রাজা করো। আরে ভেইয়া ভোলা—চা চড়াও রে দাদা।

দেবীর সম্মুখ পর্য্যন্ত সে আর যায় না। বোধ করি মনে মনেই মাকে প্রণতি জানাইয়া ভাণ্ডার-ঘরের দাওয়ায় মাদুর বিছাইয়া বসিয়া পড়ে।

ভোলা মহান্তের সেবাশুশ্রূষা করে, দেবীর ভোগ রান্না করে। সে জ্বলন্ত ধুনিটার উপর বড় একটা মাটির হাঁড়িতে চায়ের জল চাপাইয়া দেয়।

লক্ষ্মীকান্ত হাঁকে—জটা—জটা—ওরে বেটা হারামজাদা, দুধ নিয়ে আয়।

অভ্যাসমত ঘাড় বাঁকাইয়া ট্যারা মানুষটিকে দেখিতেছিল। সে বলিল—উ এখনও আথে নাই গো।

পকেট হইতে ছোট একটা আয়না বাহির করিয়া লক্ষ্মীকান্ত দেখিয়া দেখিয়া সিঁথির সম্মুখের পাকাচুল তুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সে বলিল—তুই বেটা আবার কোথা থেকে এলি? যত মড়া কি গাঙের ঘাটেই আসে রে বাবা!

ভোলানাথ হাসিয়া কহিল—ও হ'ল বাবার নতুন চেলা গো দাদা! তোমাদের গাঁয়ের নয়ানের মায়ের নাতি।

বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে অদ্ভুত মুখভঙ্গী করিয়া লক্ষ্মীকান্ত বলিল—লে বাবা! বাউরী হ'ল গোঁসাইয়ের চেলা! লে বাবা! এ বেটা শেয়ালমারা গোঁসাইকে নিয়ে ত জাত ধরম কিছু রইল না।

রাখালের হাতে শালগেরামের মরণ—শেয়ালমারা বসল মহাপীঠের গদীতে! তাড়াও হে বেটাকে—আজই তাড়াও।

জঙ্গলের বাহির হইতে শব্দ আসিতেছিল শঙ্করী—শঙ্করী! হর হর বোম্—হর হর বোম্।

এবার আসিল শূলপাণি। কাপড়-গামছা মাদুরের উপর রাখিয়া শূলপাণি বলিল—কি হ'ল? কা'কে তাড়াবে?

—গোঁসাইকে। বেটা শেয়ালমারা কি কখনও সাধু হয়? বেটা—শূলপাণি চীৎকার করিয়া উঠিল—তুম কৌন হ্যায়? গদীয়ান মহন্ত হ'ল সেবাইত জমিদারদের অধীন। বাজে লোকের বলবার কোন অধিকার নাই।

শূলপাণি শতখণ্ডে বিভক্ত 'পুরাতন জমিদার-বংশের সন্তান। লক্ষ্মীকান্তও চীৎকার করিয়া উঠিল—আমার মামাও জমিদার।

ব্যঙ্গ করিয়া শূলপাণি জবাব দিল—মামা—তুমারা মামা হ্যায়। বাবা নাহি হ্যায়।

লাফ দিয়া লক্ষ্মীকান্ত উঠিয়া পড়িল।

সন্ন্যাসী ইতিমধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি লক্ষ্মীকান্তকে ধরিয়া বলিলেন—কি হ'ল ভাগ্‌না, কি হুল ভেইয়া? মান যাও ভেইয়া, মান যাও।

লক্ষ্মীকান্ত সরোষে কহিতেছিল—মা কি জমিদারদের দাসী-বাঁদী রে বাপু? সাধু-সন্ন্যাসীর আচার-বিচার খারাপ হ'লে বলতে পাবে না লোকে?

মহান্ত বলিলেন—আলবৎ। রাগ মৎ করো ভাই। বৈঠো বৈঠো ভাগ্‌না। চা খাও। এহি লেও গাঁজা ত খাও।

লক্ষ্মীকান্ত শান্ত হইল। সে ফিরিয়া গাঁজার পুরিয়াটা শূলপাণির সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিল। কোন কথা কহিল না। শূলপাণি গাঁজার সরঞ্জাম পাড়িয়া বসিল।

তারপর চা খাওয়া হয়, গাঁজার কলিকায় আগুন চড়ে।

গাঁজার কলিকাটা হাতে হাতে ফিরিতেছিল। ভোলানাথ শূলপাণিকে বলিল—দাও দাও—এ ভাই রাজাদাদা—বাবার নতুন চেলা বেটাকে এক দম দাও।

পূরা দমের ধোঁয়া বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া নির্ব্বিকার ভাবে শূলপাণি কলিকাটা আগাইয়া দিল।

ছোট ট্যারা ছোট চোখটি উপরে তুলিয়া সবিস্ময়ে বাবুদের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। শূলপাণি একটু একটু ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে ধূম-নিপীড়িত কণ্ঠে বলিল—নয়ানের মায়ের নাতি নয়? লে—লে—বেটা লে।

লক্ষ্মীকান্ত কলিকাটা হাত হইতে লইয়া কহিল—আর দিনকতক যাক্ দাদা। একটু বড় হোক। তারপর কত জোগাবে জুগিয়ো। তারপর আরম্ভ হয় আলাপ—

লক্ষ্মীকান্ত আপন মনেই বলে—মায়ের গদী হ'ল সাধু পুরুষের গদী। সন্ন্যাসী কি হ'লেই হ'ল?

ভোলানাথ শূলপাণিকে বলিতেছিল—কাল যে তোমাদের গাঁয়ের ইন্দ্র চৌধুরী একটা মাছ মেরেছে রাজাদাদা। ইয়া! শালা দশ-বার সেরের তো কম নয়।

লক্ষ্মীকান্ত বলিতেছিল—সন্ন্যাসী মুখের কথা নয়, বাবা। বাবা—ফলের পরখ শাঁসে রসে, সোনার পরখ হয় কঁষে, সাপের পরখ তার বিষে, সন্ন্যাসীর পরখ হয় কিসে?

শূলপাণি ভোলানাথের হাতটা ধরিয়া বলে—আজ তো এ আসছে—ও আসছে—সে আসছে। কিন্তু মায়ের সেবার বন্দোবস্ত কে করেছে শুনি? তিনশো পঁয়ষট্টি বিঘে নাখরাজ ক'রে দিয়েছে কে?

ভোলা এবার লক্ষ্মীকান্তকে বলে—সে মাছের রং কি দাদা? লাল-সেরাক্!

লক্ষ্মীকান্ত বলিতেছিল—আরে বাবা—দাড়ি রাখলে যদি সন্ন্যাসী হয়, তবে তো সকল মুসলমানই সন্ন্যাসী। চুল রাখলে যদি সন্ন্যাসী হয় তবে তো সকল স্ত্রীলোকই সন্ন্যাসী। ফল খেলে যদি সন্ন্যাসী হয় তবে তো সকল বানরই—

বলিতে বলিতে সে চট্ করিয়া উঠিয়া পড়িল। তাহার নজরে পড়িল দেবীর সম্মুখে কয়জন যাত্রী এদিক-ওদিক ঘুরিতেছে। বোধ হয় প্রণামীও দিয়া থাকিবে।

শূলপাণি বলে—শ্যামাচরণ রায় নবাব-দরবারে ছিলেন নায়েব—তারই হ'ল এই কীর্ত্তি। তিন-শো পঁয়ষট্টি দিনের জন্যে তিনশো পঁয়ষট্টি বিঘে নাখরাজ জমি। তাতেই তার নবাব-সরকারে চাকরি গেল। নবাব বলেছিল—শ্যামাচরণ রায় নিমখারাম—হারামজাদ, কিন্তু কলম জিন্দা। সে নাখরাজ আর রদ্ হ'ল না।

ভোলাও এবার উঠিয়া পড়িল। লক্ষ্মীকান্তের উঠিয়া যাওয়ার উদ্দেশ্য সে বুঝিয়াছিল। সে জানে ধরিতে পারিলেই এখানে আধা বখরা বন্দোবস্ত পাকা।

শ্রোতা না পাইয়া শূলপাণি উঠিয়া গেল মহান্তের নিকট। ধূনির সম্মুখে বসিয়া মহান্ত ভস্ম মাখিতেছিলেন। শূলপাণি পাশে বসিয়া কহিল—লক্ষ্মীকান্ত কে? ও কথা কয় কেন?

মহান্ত বলিলেন—সচ্ কথা ভাই। ওর এক্তিয়ার কি?

ভাণ্ডার-ঘরের শূন্য দাওয়ার উপর ট্যারা একা বসিয়া রহিল।

সহসা তাহার কোন্ খেয়াল হইল কে জানে—শূন্য গাঁজার কলিকাটা তুলিয়া লইয়া সজোরে এক দম দিল।

দিবসের অগ্রগতির সঙ্গে যাত্রীর ভিড় বাড়ে. সমারোহে কোলাহলে নির্জ্জন বনভূমি মুখরিত হইয়া উঠে। ট্যারা এদিক-ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়। বনের মধ্যে গাছতলায় দাঁড়াইয়া ভোলা অম্বলশূলের ঔষধ দেয়—বাবার ধূনির ভস্ম। বলে—খাওয়ার পর এক কাঁকর-ভোর চুণ—আর এই ভস্ম। ব্যাস্—ভাল হতেই হবে। খাওয়া বারণ—শাক, অম্বল, গুড়, ডাল। দাও মায়ের প্রণামী সওয়া দশ আনা।

ওদিকে লক্ষ্মীকান্ত দেয় মাদুলী। আদায় করে সওয়া পাঁচ আনা।

ট্যারা পিছন হইতে বলে—পয়থা পড়ে গেল গো টোমার।

ঘাসের ভিতর হইতে সে তুলিয়া ধরে একটা সিকি।

ওদিকে বলিদানের বাজনা বাজিয়া উঠে। সকলের সঙ্গে ট্যারা আসিয়া দাঁড়ায়। শূলপাণি

কাপড় সাঁটিয়া হাড়িকাঠে আবদ্ধ পশুটার ঘাড় দলিয়া সরু করিবার চেষ্টা করে। ভোলা ও লক্ষ্মীকান্ত পা ধরিয়া টানে। যাত্রীরা করজোড়ে সভয়ে চীৎকার করে মা—মা।

বলিদান হইয়া যায়। রক্তাক্ত প্রাঙ্গণ-তলে আঙুল চুবাইয়া লইয়া শূলপাণি লক্ষ্মীকান্ত ললাটে আঁকে ত্রিপুণ্ড্রক। ট্যারাও রক্তে তাহার ছোট আঙুল একটি ডুবায়। সে আশ্চর্য্য হইয়া যায়—রক্তটা গরম রহিয়াছে!

অপরাহ্নের দিকে আবার দেবস্থলে জনসমাগম হয়। এখন আসেন স্থানীয় ভদ্রলোকের দল। লক্ষ্মীকান্ত, শূলপাণিও আসে! ভবানীরঞ্জন রায় জমিদার-বংশের সন্তান—সে আসে একখানা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র লইয়া। মজলিস করিয়া যুদ্ধের সংবাদ পড়া হয়।

পশ্চাৎপদ জার্ম্মানী—মিত্রপক্ষের অগ্রগমন—আকাশ হইতে বোমাবর্ষণ। প্রৌঢ় মহান্ত খাড়া হইয়া বসিয়া সাদা দাড়ির গোছায় গালপাট্টা বাঁধেন। শুনিতে শুনিতে বলিয়া উঠেন—মরদ্‌কা কাম হ্যায়। গুলী ছুটে সাঁই সাঁই। কামান গর্জ্জাতা দনা ন-ন-ন।

ভবানীচরণ জিজ্ঞাসা করে—আপনি কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন যুদ্ধে?

মহান্ত আপনার ক্ষতচিহ্নগুলি দেখিতে দেখিতে বলেন—ইজিপ্ট, মণিপুর, কাবুল। ইজিপ্টমে খুব জোর লড়াই হইয়েছিল। তাঁবু গাড়কে বৈঠ রইলাম হামি লোক সাত দিন। দুষমনকে পতা মিলল না। কাপ্তেনসাব হুকুম করলো কি—চলো পথ তৈয়ার করনে হোগা। লেও কুলাড় আও পানিকে বর্ত্তন। হাবিলদার বললো—হুজুর, বন্দুক সাথমে লেই লিই। কাপ্তেনসাব আঁক পাকায়কে বোলা—নেই। হামি লোক গেলাম এক মাইল। হুঁয়া জঙ্গল কাটকে পথ বনানে লাগলাম। এক ঘণ্টেকে বাদ ভাই—কোথাসে কে জানে আসিয়ে গেলো উঁটকে পর দুষমন। বিশঠো উঁট আর এক এক উঁটকে পর ছ-সাত আদমী। চারি দিক্‌সে তো ঘের কর লিয়া উ লোক। বাস্—বন্দুক চালায়া দাঁই দাঁই-দনা-দন্। কাপ্তেনসাব তো ঘোড়াকে পর ছুটা। হামরা ছুটলো পায়দলমে। বহুৎ আদমী হামাদের মর্ গেলো। তাঁবুমে আয়কে এক সিপাহী বন্দুক লে কে গোলী কর দিয়া কাপ্তেন কো।

ট্যারা এক পাশে বসিয়া অবাক হইয়া শোনে। বড় ভাল লাগে তাহার গোঁসাই-বাবার গল্প। বিশেষ করিয়া কামানের আওয়াজের ওই শব্দটি দনা-ন-ন-ন-ন। সে আপন মনেই মুখস্থ করে দনা—ন-ন-ন-ন, দনা-ন-ন-ন-ন।

* * *

তিন বৎসর পর।

দৃশ্যপটের পরিবর্ত্তন বিশেষ কিছু হয় নাই। একটা বড় শিরীষ গাছ মরিয়া শুকাইয়া গেছে। তেঁতুল গাছগুলার ডাল কাটা হইয়াছে। নিবিড় বনশোভা যেন ঈষৎ শীর্ণ হইয়া আসিয়াছে।

পরিবর্ত্তন হইয়াছে ট্যারার। আকারে সে অনেকটা বড় হইয়াছে। মাথার কোঁকড়ান চুলগুলি ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া হইয়া বড় হইয়াছে। চলে সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া।

লক্ষ্মীকান্ত বলে—ওরে বেটা এত গাঁজা খাস নে। শেষে রক্তবমি ক'রে মরবি। গাঁজা খেয়ে বেটার পায়ের শিরায় টান ধরেছে দেখ।

ট্যারা হি হি করিয়া হাসে।

লক্ষ্মীকান্ত সেদিন বলিল—বেটা যদি গাঁজাই খাবি ত একটু করে দুধ খাস। ছাগল-টাগল দুইয়ে নিয়ে—চোঁ করে এক ঢোক বুঝলি! বলিয়া সে নিজেই হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। ঘরের ভিতর হইতে ভোলা বলিল—বেটা দিনরাত গাঁজা খাচ্ছে দাদা—দিন রাত। এখানে ত খায়ই আবার কিনেও খায়। আজকাল মায়ের পেণ্যামীর পয়সা চুরি করছে বেটা।

ট্যারা হাসিতে হাসিতে বলিল—ভাগে টোর কম পড়ছে নয়?

—আ—হা—হা!

ভোলানাথ চটিয়া উঠিয়া বলিল—দেখ, দাদা দেখ, বেটা বাউরীর আস্পর্দ্ধা দেখ।

ট্যারা বলিয়া উঠিল—ডোব ব'লে সেই কথাটি। সে-ই।

ভোলা এবার অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া বলিল—মরবি—মরবি—বামুনের অভিশাপে মরবি তুই।

ট্যারা হাসিয়া উঠিল, বলিল—টোকে না লিয়ে লয়। টোকে লোব টবে যাব। টোর মট সাটটা বামুন জলপান করি আমি।

ওদিক হইতে মহান্তের আগমন-ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছিল। স্নানান্তে তিনি ফিরিতেছিলেন—মায়ী হামার আদার বুঢ়ী গো—কিরপা কর মায়ী গো—পাথরঢিপি গো! দয়াময়ী গো!

ট্যারা ছুটিয়া পলাইয়া গেল। কহিল—গোঁথাই বাবা আচ্চে বাবা। বেটা ছেয়ালমারা রাগলে রক্ষে ঠাকবে না বাবা!

ভোলা কহিল—দিচ্ছি বলে দাঁড়া, গোঁসাই বাবাকে—গাল দাও তুমি। পলায়নপর ট্যারা ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—সেই কথাটি—সেই। —বলিয়াই সে বনান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

লক্ষ্মীকান্ত বলিল—যানে দেও ভেইয়া। বেটা বড় বদমাস্। চায়ের দেরি কত দেখ।

ভোলা বলিল—চা তো হ'ল দাদা, দুধের হয়েছে টানাটানি। গরুতে দুধ দিচ্ছে না ভাল। মায়ের ভোগ হবে, না চা হবে?

—কেন? গরুতে দুধ ছাড়ালে না কি?

—না দাদা, এই সবে কচি বাছুর। কে জানে কেন যে দুধ দেয় না। ঐ বেটা শালা ট্যারার হাতে পড়ে সব মাটি হল। খেতেই দেয় না হারামজাদা। গরু চরাতে যাবে—তাও হাতে এক বাঁশী।

মহান্ত আসিয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন,—কেয়া রে ভোলা?

লক্ষ্মীকান্ত বলিয়া উঠিল—আপনার যেমন কাণ্ড—ট্যারাকে রেখেছেন গরুর সেবা করতে। ও বেটাকে তাড়ান, আজই তাড়ান। বেটা গাঁজাল বদ্‌মাস্। গরুকে খেতে দেয় না—গরুতে দুধ দিচ্ছে না।

ভোলা কহিল—বেটা মায়ের পেণামী চুরি করছে আজকাল। আপনাকে গাল দেয়, বলে শেয়ালমারা! বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞাসা করুন এই দাদাকে।

মহান্ত ক্রোধভরে বলিলেন—ভাগা দেও হারামজাদ সয়তানকে! টে—ঢ়া—এ টেঁ—ঢ়া। কোথায় ট্যারা!

দ্বিপ্রহরে বলির বাজনা বাজিয়া উঠিল। ট্যারা ঠিক আসিয়া হাজির হইয়াছিল। বলি হইয়া গেল। লক্ষ্মীকান্ত, শূলপাণি ললাটে রক্তের ত্রিপুণ্ড্রক আঁকিয়া লইল। ট্যারাও পড়িল লাফ দিয়া। বুকে মুখে সে বীভৎসভাবে রক্তের ছাপ মারিতেছিল। উষ্ণ রক্ত বাতাসের শৈত্যে জমাট বাঁধিয়া আসিতেছিল। তাহারই খানিকটা তুলিয়া লইয়া ট্যারা ঘাটে গিয়া পরম তৃপ্তি সহকারে চাটিয়া চাটিয়া খাইতে বসিল। ভোলানাথ আসিয়াছিল ঘাটে। সে শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—রাক্ষস—বেটা রাক্ষস রে!

ট্যারা হি-হি করিয়া হাসিয়া কহিল—টোর রকটও এমনি ক'রে খাব আমি।

ভোলা ক্রোধে তাহাকে তাড়া করিল। ট্যারা ঝাঁপ দিয়া পড়িল জলে। সাঁতার দিয়া গভীর জলে মুখ ফিরাইয়া ভোলাকে বলিল—কচ্ কচ্ করে টোর হাড় মাস রক্ট খাব আমি।

- দারুণ ক্রোধে ভোলা একটা ঢেলা তুলিয়া ছুঁড়িয়া মারিল।

সঙ্গে সঙ্গে টুপ্ করিয়া ট্যারা জলে ডুব দিল। উঠিল গিয়া প্রায় মধ্যস্থলে। মাথা নাড়িয়া জলসিক্ত ঝাঁকড়া চুল ঝাড়া দিয়া সে আবার বলিল—কচ্ কচ্ করে খাব।

ভোলাও আবার প্রাণপণ শক্তিতে ঢেলা ছুঁড়িল। ট্যারাও সঙ্গে সঙ্গে ডুব দিল। এবার উঠিল সে ওপারের কাছাকাছি। পাড়ে উঠিয়া সিক্ত বস্ত্রে সিক্ত দেহেই সে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল।

দারুণ ক্রোধে ভোলানাথ আশ্রমে ফিরিয়া শুনিল—বনমধ্য হইতে ভাসিয়া আসিতেছে বাঁশের বাঁশীর সুর।

ভোলা মহন্তকে গিয়া বলিল—বাবা, হয় আমাকে রাখুন—নয় আপনার ট্যারা থাকুক।

এই সময়ে জটাধারী আসিয়া বলিল—বাবা, ট্যারা আজ গরু খোলে নাই।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মহান্ত বলিলেন—যাও তুমি গরু লিয়ে যাও। টেঁড়ার জবাব হো গিয়েসে।

ভোগের ঘণ্টা বাজিল। ট্যারা কোথা হইতে আসিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে পাতা পাড়িয়া বসিয়া গেল। ভোলা মহান্তকে গিয়া বলিল—ওই দেখুন বাবা—খাবার সময় বেটা ঠিক হাজির হয়েছে।

মহান্ত চুপ করিয়া রহিলেন—কোন কথা বলিলেন না। খাওয়া শেষ হইয়া গেলে ট্যারাকে গম্ভীরভাবে ডাকিলেন—টেঁড়া—এখানে শুন্।

ট্যারা মাথা নীচু করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। মহান্ত বলিলেন—তুমি সয়তান বন্ গিয়েছ। তুমি মায়ীর পরণামী পয়সা চুরি কর। গরুর যতন কর না। গাঁজা খাও তুমি হরদম। তুমার জবাব হইল। কাম্ তুম্‌সে নেহি চলে গা।

ট্যারা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় গোশালার দিকে কোলাহল শুনিয়া মহান্ত ডাকিলেন—জটা—জটা—এ জটা!

জটাধারী আসিয়া বলিল—আজ্ঞে বাবা ট্যারা মহা হাঙ্গামা আরম্ভ ক'রে দিয়েছে।

প্রবল রোষে মহান্ত বলিলেন—মারো হারামজাদকে।

জটা বলিয়া গেল—ভোলাবাবা বললেন ওর জবাব হয়েছে তুই গরুগুলোকে ঘরে বাঁধ। গরু খুলতে গেলাম তো ট্যারা আমাকে মারতে আসছে—বলছে আমার কাজ তুই করবি কেন? আমি বললাম, তোর যে জবাব হয়েছে। বেটা বজ্জাত—বলে কি বাবা—জবাব দিয়েছে কে? মায়ের গরু মা ত জবাব দেয় নাই আমাকে। আমি যাব কেন?

মহান্ত হাঁকিলেন—টেঁড়া—এ টেঁড়া।

গোশালা হইতে উত্তর আসিল—ডাই গো বাবা, গরু বাঁডছি আমি।

কিছুক্ষণ পরই সে আসিয়া দাঁড়াইল। মহান্ত বলিলেন—সয়তান বদ্‌মাস!

ট্যারা নীরব। মহান্ত আবার বলিলেন—চিম্‌টাকে মারে হাড্ডি তোড় দেগা হাম।

তবুও ট্যারা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভোলা কহিল, কাণা-খোঁড়ার আশী দোষ বাবা। ও বেটা কাণা খোঁড়া দুই-ই।

মহান্ত বলিলেন—যাও সয়তানী করবি না। গাঁজা খাবি না। মন লাগাকে কাম করবি। ধর্ বেটা, ভোলাদাদাকে পায়ে ধর।

টিপ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া ট্যারা লাফাইতে লাফাইতে চলিয়া গেল। গোশালার প্রাঙ্গণে আপন মনেই আরম্ভ করে—লেফ—টারন্—কু'ক্ ম্রাচ!

দিন দুই পর দ্বিপ্রহর রাত্রে ভোলা আসিয়া মহান্তের দ্বারে মৃদু করাঘাত করিয়া ডাকিল—বাবা বাবা!

—কে—কৌন হ্যায়?

—আমি—ভোলা।

—কেয়া রে, এত্‌না রাতে।

—একবার উঠে আসুন।

দরজা খুলিয়া মহান্ত বলিলেন—কি?

আসুন একবার আমার সঙ্গে। চুপি-চুপি একটু।

গোশালায় গিয়া দেখা গেল, ঘরের দরজা খোলা। ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া ভোলা ফস্ করিয়া একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়া ফেলিল। সচকিত আলোকে দেখা গেল—ট্যারা একটি গাইয়ের পেটের তলে শুইয়া শান্ত সন্তানটির মত স্তন-লেহন করিতেছে। দেশলাইয়ের কাঠিটা নিবিয়া গিয়াছিল। পুনরায় একটা কাঠি জ্বালিয়া ভোলা দেখিল—বিশালদেহ মহান্তের হাতের মুঠার মধ্যে ট্যারা নির্জ্জীবের মত ঝুলিতেছে। বাহিরের প্রাঙ্গণে ট্যারাকে নিক্ষেপ করিয়া মহান্ত বলিয়া উঠিলেন—সয়তান—হারামজাদ!

পর মুহূর্তেই লাফ দিয়া উঠিয়া সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে ট্যারা কোথায় ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

* * *

তিন চার বৎসর পর আবার ট্যারাকে একদিন দেখা গেল এই দৃশ্যপটের মধ্যে। তাহার পরণে গেরুয়া, মাথার ঝাঁকড়া চুলে দুই চারিটা জটাও দেখা দিয়েছে, কাঁধে ঝোলা, হাতে একটা আঁকাবাঁকা লাঠি।

অতি প্রত্যূষে সে মহাপীঠে প্রবেশ করিল। হাত-পা ধুইয়া প্রথমেই সে ঘা মারিল সেই ঘণ্টাটায়। আশ্রমে প্রবেশ করিয়া হাঁকিল—শিবরাম—শিবরাম। বম্—বম্ শঙ্ক—র!

ভোলা সবে তখন উঠিয়াছে। মহান্তের দরজাটা বন্ধ। ট্যারা মহান্তের দরজার সম্মুখে গিয়া ডাকিল—বাবা—গোঁছাই বাবা!

পিছন হইতে ভোলা প্রশ্ন করিল—কে—কে—কে হে তুমি?

মুখ ফিরাইয়া ট্যারা হাসিয়া বলিল চিন্‌টে পারছ না—ভোলা গোঁছাই।

সাশ্চর্যে ভোলা বলিল—আরে তুই বেটা কোত্থেকে রে? এ যে একেবারে সন্ন্যেসীর সাজ—এঁ্যা?

ট্যারা হাসিয়া বলিল—টোকে আর পেনাম করব না।

তারপর আবার প্রশ্ন করিল—গোঁছাই বাবা কোটা গো?

—বাবার বড় অসুখ রে।

ট্যারা ডাকিয়া উঠিল—গোঁছাই বাবা!

বাধা দিয়া ভোলা বলিল—ডাকিস্ না—ডাকিস্ না!

ভিতর হইতে গম্ভীর কণ্ঠের দুর্বল সাড়া উঠিল—ভোলা!

ভোলা দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। মহান্ত বলিলেন—জল—মুখ ধোনেকা জল দে বেটা। কৌন্ রে—উ-কৌন্ রে?

দরজার পাশ হইতে ট্যারার মুখ উঁকি মারিতেছিল। সে হাসিয়া বলিল—আমি গোঁছাই বাবা।

ভোলা কহিল—সেই বেটা ট্যারা। কোথা থেকে সন্ন্যেসী সেজে সকালবেলাতেই এসে হাজির।

মহান্ত বলিলেন—টেঁড়া? আরে এতনা রোজ কাঁহা ছিলিরে বেটা? আও—আও—সামনে আও বেটা—একবার দেঁখে।

সন্তর্পণে ট্যারা আসিয়া ঘরের একপাশে দাঁড়াইল। ভোলা জল আনিতে চলিয়া গেল বোধ হয়। ট্যারাকে দেখিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—আরে বাচ্চা একদম্‌সে সন্ন্যাসী হো গেয়া!

অল্পক্ষণ নীরবতার পর আবার তিনি বলিলেন—ছোড় দেও, ছোড় দেও—এ মতলব ছোড় দে বাচ্চা। সাদী কর—বিয়া কর—সন্‌সার পাতাও। রহ যাও সন্‌সার মে—রহ যাও বেটা।

ট্যারা গম্ভীরভাবে বলিল—টাই করব বাবা। আর ডাব না।

কয়টি কথা বলিয়াই সন্ন্যাসী পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। চোখ মুদিয়া তিনি নীরবে শুইয়া রহিলেন। ট্যারা বাহিরে আসিয়া ভোলাকে বলিল—ডাও, বাবাকে ডল দিয়ে এছো!

ভোলা চড়াইয়াছিল চায়ের জল, সে বিরক্তিভরে কহিল—তু বেটা বস্ ঐখানে। বেটা আমার সোহং স্বামী এলেন। দোব, জল দোব। শুধু কি জল দিলেই হবে? বেটা বুড়ো দিন-রাত ঘরদোর কাপড় ময়লা করছে।

বকিতে বকিতে সে এক ঘটি জল মহান্তের কাছে নামাইয়া দিয়া আসিল। সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর পাওয়া গেল—কাপ্‌ড়া কৌপীন বদল্ দে ভোলা।

বাহির হইতেই ভোলা উত্তর দিল—দোব গো দোব! চানের সময় দোব। ভাঁড়ারের কাজ সারি, দাঁড়াও।

এদিকে চায়ের আসর জমিয়া উঠিল। সেই শূলপাণি—লক্ষ্মীকান্ত সকলেই আসিয়াছিল। ট্যারাও আজ মজলিসের একজন সভ্য। আজ সমস্ত কথাই হইতেছিল ট্যারাকে লইয়া। সে গল্প করিতেছিল—কট ডায়গা গেলাম বাবা, হরিড্ডার, কাচী, বড্ডিনাথ, কামরূপ, অডুচ্যা, ডারকা—কট ডায়গা বলে। কট টপস্যা করলাম বলে।

শূলপাণি ঘুরিয়াছে অনেক, সে প্রশ্ন করে—কোথা কি দেখলি বল দেখি?

লক্ষ্মীকান্ত গিয়াছিল কাশী, সে বলিল,—আচ্ছা কাশীর কথাই বলুক ত আগে।

ট্যারা হি-হি করিয়া হাসিতেছিল। কহিল—বিঠ্যনাথ—বড্ডিনাথ কট ঠাকুর, ঠব কি মনে থাকে?

ভোলা বলিল—বেটা পয়লা নম্বরের মিথ্যাবাদী। কই বল দেখি বদ্যিনাথের ক'টা হাত?

গম্ভীর ভাবে ট্যারা বলিল—টা—চার পাঁচটা হবে। কে ডানে বাবা—ডে অণ্ডকার মণ্ডির!

মহান্ত ডাকিতেছিলেন—ভোলা—ভোলা!

ভোলা বিরক্তি ভরে বলিল দাদা, জ্বালালে বেটা বুড়ো, মরেও না বাঁচেও না। দাও এখন কাপড় ছাড়িয়ে দাও—ময়লা পরিষ্কার ক'রে দাও।

লক্ষ্মীকান্ত পরামর্শ দিল—সাড়া দিস্ না তুই।

কিছুক্ষণ পর দেখা গেল ট্যারা মহান্তের ঘর পরিষ্কার করিতেছে।

ভোলা খুশী হইয়া বলিল—বেশ করেছিস। রোজ করবি। বুড়ো মলেই আমি মহান্ত হব—তোকে চেলা বানাব। বুঝলি!

ট্যারা ভেঙাইয়া কহিল—ডা-ডা বেটা চোর বামুন টোর চেয়ে আমি বড় সাঢু। টোর চেলা কে হবে—ডাঃ!

স্বার্থের খাতিরে ভোলা কথাগুলো হজম করিয়া যায়।

অপরাহ্নের দিকে পূর্বের মতন ভদ্রজন আসেন সব। ভবানীরঞ্জন এখনও তেমনি সংবাদপত্র লইয়া আসেন। মহান্তের ঘরে প্রবেশ করিয়া ভবানীরঞ্জন বলেন,—আজ কেমন বাবা?

মহান্ত কি একটা লইয়া দেখিতেছিলেন, সেটা পাশে রাখিয়া দিয়া বলিলেন—মায়ী হামার পাথরটিপি দয়া করছেন নাই ভাই। জীউ যায় না দাদা।

প্রসঙ্গটা পরিবর্ত্তন করিবার জন্য ভবানীরঞ্জন বলিলেন—কি দেখছিলেন কি? ওটা কি?

বস্তুটি তুলিয়া ধরিয়া মহান্ত নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে বলিলেন—মেডিল। লড়াইসে মিলেয়ে ছিল ভাই।

* * *

বাহিরে ক্রমশঃ সংবাদপত্রের আসর জমিয়া উঠে। হাস্যপরিহাসেব কলরবের মাঝে মাঝে রুগ্ন মহান্তের কণ্ঠস্বর পাওয়া যায়—ভোলা ভোলা!

অবশেষে ডাকেন—টেঁড়া!

সঙ্গে সঙ্গে আশ্বস্ত-কণ্ঠের সাড়া পাওয়া যায়—ধরো তো বেটা থুক্‌দানীটো ধরো তো।

মাঝে মাঝে ট্যারার তম্বী শোনা যায় ভোলার উপর—সে বলে, ডাও না বেটা বামুন। টোমার কাড আমি করব কেন? ডেকবি কাল চলে যাব আমি গাঁয়ে।

ভোলা বলে—ওরে বেটা বাউরী, গোঁসাইয়ের সেবা করতে পাওয়া তোর ভাগ্যি।

ট্যারা রাগিয়া আগুন হইয়া উঠে। বলে—ডোব বামুনের নেটার মেরে। জাট টুলে কটা কও টুমি টোর বামুন! ডোব বলে টোমার বিড়ো?—তারপর সে আপন মনেই বকে—মহাণ্ট হ'ল টো আমার কি—আমাকে কি রাডা করে ডেবে? পুণ্যি—পুণ্যি—টাই না আমার পুণ্যি। মরুক আর ঠাকুক—আর আমি ডাব না।

দ্বিপ্রহর রাত্রে মহান্ত ডাকেন—ভোলা—ভোলা!

ট্যারা সাড়া দেয়—বাবা—গোঁসাই-বাবা কি বল্‌টেন?

দিন-কয় পরে সত্য সত্যই ট্যারা গ্রামের মধ্যে চলিয়া গেল। স্বজাতির মধ্যে তাহার সমাদর হইয়াছে। পুরাতন ভিটিতে সে নূতন ঘরের বনিয়াদ সুরু করিয়া দিল। খায় কিন্তু মহাপীঠে।

ভোলা বলে—এদিকে খাবার সময় তো আছ দিব্যি। মহান্তের সেবা করতে বুঝি মাথা ধরল?

ট্যারা বলে—টু কি করবি টু? মহান্ট বুঝি অমনি হবি?

খাওয়া-দাওয়ার পর সে একবার মহান্তের দুয়ারে উঁকি মারিয়া বলে—বাবা—গোঁছাই বাবা!

ক্ষীণকণ্ঠে মহান্ত বলে—টেঁড়া।

—হুঁ বাবা। ঘর আরম্ভ করলাম বাবা। ডেয়াল ডিটে লেগেছি।

মহান্ত বলেন—বানাও, ঘর বানাও। সাদী করো।

এক মুখ হাসিয়া ট্যারা বলে—করব বাবা, নোটনের মেয়ে পরীকে। ছব ঠিক হ'য়ে গিয়েঠে বাবা। খুব ছোন্দর।

* * *

দিন-কয় পর প্রভাতে সংবাদ রটিয়া গেল, মহাপীঠের সাধুবাবা গত রাত্রে দেহ রাখিয়াছেন।

দলে দলে গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে লোক ছুটিয়া আসিতেছিল। খোল-করতালের ধ্বনির সহিত হরিনাম আকাশ স্পর্শ করিতেছিল। সাধু-বাবার সৎকার হইবে।

মহাপীঠের জঙ্গলের ওপ্রান্তে নির্জ্জন প্রান্তরে তখন কাঁদিতেছিল একজন। সে ট্যারা। একটা কাটা গাছের গুঁড়ির উপর বসিয়া সে আকুলভাবে কাঁদিতেছিল—গোঁছাই বাবা—গোঁছাই বাবা গো!

এই গাছটার তলে বসিয়া সে গরু চরাইত। গরুগুলি দ্বিপ্রহরে আসিয়া এরই ছায়াতলে দাঁড়াইয়া নিমীলিত চোখে রোমন্থন করিত। নদীর কূল হইতে বকের সারি দূরান্তর যাইবার পথে এই গাছটির উপর বসিত।

সেদিনও তখন কয়টা বক এই শূন্য স্থানটায় কয়টা পাক মারিয়া শূন্যপথে রব করিতে করিতে চলিয়া গেল।

কোন্ অদৃশ্য অন্তরালে বসিয়া মঞ্চ-শিল্পী আলোকধারার রূপ পরিবর্ত্তন করিতেছিলেন। গাঢ় ছায়ালোকের নিবিড়তার মধ্যে সেই প্রান্তরের বুকে ট্যারা অদৃশ্য হইয়া গেল।

৩২ বর্ষ, মাঘ ১৩৯০

অশরীরী

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরাতন উই-ধরা ডায়েরিখানি সাবধানে খুলিয়া বরদা বলিল—'অদ্ভুত জিনিষ, কিন্তু আগে থাকতে কিছু বলব না। আমাদের আবদুল্লা কুঁজড়াকে জান ত? সাহেবদের কুঠি থেকে পুরনো বই সের-দরে কিনে বিক্রি করতে আসে? তারি কাছ থেকে এটা কিনেছি, ঝাঁকায় করে এক গাদা বই নিয়ে এসেছিল, বইগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে দেখি একটা বাংলায় লেখা ডায়েরি। নগদ দু-পয়সা খরচ করে তৎক্ষণাৎ কিনে ফেললুম।'

অমূল্য দৈবক্রমে আজ ক্লাবে আসে নাই, তাই বাক-বিতণ্ডায় বেশী সময় নষ্ট হইল না। বরদা বলিল—'পড়ি শোনো। বেশী নয়, শেষের কয়েকটা পাতা খানিক পড়ে শোনাব। আর যা আছে তা না শুনলেও কোন ক্ষতি নেই। একটা কথা, এ ডায়েরির লেখক কে তা ডায়েরি পড়ে জানা যায় না। তবে তিনি যে কলকাতা হাইকোর্টের একজন অ্যাডভোকেট ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।'

ল্যাম্পটা উস্কাইয়া দিয়া বরদা পড়িতে আরম্ভ করিল, —৭ ফেব্রুয়ারী। আজ মুঙ্গেরে আসিয়া পৌছিলাম। ষ্টেশন হইতে পীর-পাহাড় প্রায় মাইল-তিনেক দূরে—শহরের বাহিরে। মুঙ্গের শহরের যতটুকু দেখিলাম, কেবল ধূলা আর পুরাতন সেকেলে ধরণের বাড়ি। যা হোক, আমাকে শহরের মধ্যে থাকিতে হইবে না ইহাই রক্ষা। ষ্টেশন হইতে আসিতে পথে কেল্লার ভিতর দিয়া আসিলাম। কেল্লাটা মন্দ নয়। পুরাতন মীরকাশিমের আমলের কেল্লা, —গড়খাই দিয়ে ঘেরা। প্রাকারের ইটপাথর অনেক স্থানে বসিয়া গিয়াছে। বড় বড় গাছ উচ্চ প্রাচীরের উপর জন্মিয়া শুষ্ক গড়খাইয়ের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। একদিন এই গড়ের প্রাচীরে সতর্ক সান্ত্রী পাহারা দিত, প্রহরে প্রহরে দুর্গদ্বারে নাকাড়া বাজিত, সন্ধ্যার সময় লোহার তোরণ-দ্বার ঝনৎকার করিয়া বন্ধ হইয়া যাইত,—কল্পনা করিতে মন্দ লাগে না।

পীর-পাহাড়ের বাড়িখানি চমৎকার। এমন বাড়ি যাহার, সে চিরদিন এখানে থাকে না কেন এই আশ্চর্য্য। যা হোক, পাহাড়ের উপর নির্জ্জন প্রকাণ্ড বাড়িখানিতে একাকী একমাস থাকিতে পারিব জানিয়া ভারি আনন্দ হইতেছে। বন্ধু কলিকাতায় থাকুন, আমি এই অবসরে তাঁহার বাড়িটা ভোগ করিয়া লই।

কলিকাতা হাইকোর্টে প্রায় দেড়মাস ধরিয়া প্রকাণ্ড দায়রা-মোকদ্দমা চালাইবার পর সত্য সত্যই বিশ্রাম করিতে হইলে এমন শান্তিপূর্ণ স্থান আর নাই। আমার শরীর যে ভাঙিয়া পড়িয়াছে তাহার কারণ শুধু অত্যধিক পরিশ্রম নয়—মানুষের সহিত অবিশ্রাম সংঘর্ষ। যে-লোক মিথ্যা কথা বলিবে বলিয়া দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছে তাহার পেট হইতে সত্য কথা টানিয়া বাহির করা এবং যে-হাকিম বুঝিবে না তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা যে, কিরূপ বুকভাঙা ব্যাপার তাহা যিনি এ পেশায় ঢুকিয়াছেন তিনিই জানেন। মানুষ দেখিলে এখন ভয় হয়, কেহ কথা কহিবার উপক্রম করিলেই পলাইতে ইচ্ছা করে। তাই একেবারে নিঃসঙ্গ ভাবে চলিয়া আসিয়াছি, বামুন-চাকর পর্য্যন্ত সঙ্গে লই নাই। ইক্‌মিক্ কুকার সঙ্গে আছে, তাহাতেই নিজে রাঁধিয়া খাইব।

কি সুন্দর স্থান! পাহাড়ের ঠিক মাথার উপর বাড়িটি চারিদিকের সমতলভূমি হইতে প্রায় তিন-চার শ' ফুট উচ্চে। ছাদের উপর দাঁড়াইলে দেখা যায়, একদিকে দিগন্ত রেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত গঙ্গার চর, তাহার উপর এখন সরিষা জন্মিয়াছে—সবুজ জমির উপর হলুদ বর্ণ ফুলের স্ফুলিঙ্গ, চাহিয়া চাহিয়া চক্ষু স্নিগ্ধ হইয়া যায়। অন্যদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় অগণ্য অসংখ্য তালগাছের মাথা জাগিয়া আছে, আরও কত প্রকারের ঝোপঝাড় জঙ্গল; তাহার ভিতর দিয়া গেরিমাটি-ঢাকা পথটি বহু নিম্নে গোলাপী ফিতার মত পড়িয়া আছে। এ যেন কোন্ স্বর্গলোকে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। বাড়িতে

একটা মালী ছাড়া আর কেহ নাই, সে-ই বাড়ির তত্ত্বাবধান করে এবং দু-চারটা মৃতপ্রায় গোলাপ গাছে জল দেয়। জল পাহাড়ের উপর পাওয়া যায় না, পাহাড়ের পাদমূলে রাস্তার ধারে একটি কুয়া আছে সেখান হইতে আনিতে হয়। মালিটার সহিত কথা হইয়াছে আমার জন্য দু-ঘড়া জল রোজ আনিয়া দিবে, তাহাতেই আমার স্নান ও পান দুই কাজই চলিয়া যাইবে।

মালীটাকে বলিয়া দিয়াছি, পারতপক্ষে যেন আমার সম্মুখে না আসে। আমি একলা থাকিতে চাই।

৮ ফেব্রুয়ারি। কাল রাত্রে এত ঘুমাইয়াছি যে, জীবনে বোধ হয় এমন ঘুমাই নাই। রাত্রি নয়টার সময় শুইতে গিয়াছিলাম, যখন ঘুম ভাঙিল তখন বেলা সাতটা—ভোরের রৌদ্র খোলা জানালা দিয়া বিছানায় আসিয়া পড়িয়াছে।

গোছগাছ করিয়া সংসার পাতিয়া ফেলিয়াছি। সঙ্গে কিছু চাল ডাল আলু ইত্যাদি আনিয়াছিলাম, তাহাতে আরও তিন-চার দিন চলিবে। ফুরাইয়া গেলে মালীকে দিয়া শহরের বাজার হইতে আনাইয়া লইব। ট্রাঙ্কগুলা খুলিয়া দেখিলাম প্রয়োজনীয় দ্রব্য সবই আছে। দাড়ি কামাইবার সরঞ্জাম সাবান তেল আয়না চিরুণী কিছুই ভুল হয় নাই। এক বাণ্ডিল ধূপের কাঠিও রহিয়াছে দেখিলাম, ভালই হইল। এখনও অবশ্য একটু শীত আছে, কিন্তু গরম পড়িতে আরম্ভ করিলে মশার উপদ্রব বাড়িতে পারে। চাকরটার বুদ্ধি আছে দেখিতেছি, কতকগুলা বই ও কাগজ পেনসিল ট্রাঙ্কের মধ্যে পুরিয়া দিয়াছে। যদিও এই একমাসের মধ্যে বই স্পর্শ করিব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তবু হাতের কাছে দু-একখানা থাকা ভাল।

বইগুলা কিন্তু একেবারেই বাজে। পরলোক ও ভূতদর্শন, উন্মাদ ও প্রতিভা—এই সব বই আমি পড়ি না। চাকরটা বোধ হয় ভাবিয়াছে আইন ছাড়া অন্য যে কোনো বই পড়িলেই আমি ভাল থাকিব। সে একটু-আধটু লেখাপড়া জানে—সাধে কি বলে, স্বল্পা বিদ্যা ভয়ঙ্করী।

বন্ধুর এখানেও একটা ছোটখাট লাইব্রেরী আছে দেখিতেছি। একটা ক্ষুদ্র আলমারীতে গোটাকয়েক পুরাতন উপন্যাস, অধিকাংশই সম্মুখের ও পশ্চাতের পাতা ছেঁড়া। যা হোক পড়িবার যদি কখনও ইচ্ছা হয়—বইয়ের অভাব হইবে না।

দুপুর বেলাটা ভারি আনন্দে কাটিল। শূন্য বাড়িময় একাকী ঘুরিয়া বেড়াইলাম। পাহাড়ের উপর এই বৃহৎ বাড়ি কে তৈয়ার করিয়াছিল—ইহার কোনো ইতিহাস আছে কি? কলিকাতায় ফিরিয়া বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিব।

বাড়ি যে-ই তৈয়ার করুক তাহার রুচির প্রশংসা করিতে হয়। যে-পাহাড়ের উপর বাড়িটি প্রতিষ্ঠিত তাহা দেখিতে একটি উল্টানো বাটির মত—কবি হইলে আরও রসাল উপমা দিতে পারিতাম—হয়ত সাদৃশ্যটাও আরও বেশী হইত,—কিন্তু আমার পক্ষে উল্টানো বাটিই যথেষ্ট। শাদা বাড়িখানা তাহার উপর মাথা তুলিয়া আছে। বাড়িখানা যেমন বৃহৎ তেমনি মজবুত—মোটা মোটা দেওয়ালের মাঝখানে বিশাল এক একটা ঘর, নিজের বিশালতার গৌরবে শূন্য আসবাবহীন অবস্থাতেও সর্ব্বদা গম্‌গম্ করিতেছে। বাড়ির সম্মুখে খানিকটা সমতল স্থান আছে, তাহাতে গোলাপ বাগান। গোলাপ বাগানের শেষে ফটক, ফটকের বাহিরেই নীচে যাইবার ঢালু পাথরভাঙা পথ বাঁকিয়া বাড়ির নীচে দিয়া নামিয়া গিয়াছে। ফটকের সম্মুখে কিছুদূরে একটা প্রকাণ্ড কূপ, গভীর হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহার তল পর্য্যন্ত দৃষ্টি যায় না। কূপের চারিপাশে আগাছা জন্মিয়াছে, একটা শিমুলগাছ তাহার মুখের বিরাট গর্ত্তটার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। কূপের ভিতর এক খণ্ড পাথর ফেলিয়া দেখিলাম, অনেকক্ষণ পরে একটা কাঁপা আওয়াজ আসিল। কূপটা নিশ্চয় শুষ্ক।

সন্ধ্যার সময় কূপের কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। নীচে বেশ অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, দূরে দূরে দু-একটা প্রদীপ মিটমিট করিয়া জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু উপরে এখনও বেশ আলো আছে। পশ্চিম দিকটা গৈরিক ধূলায় ভরিয়া গিয়াছে। দেখিতে ভারি চমৎকার। এই বাড়িতে আমার দুই দিন কাটিল।

হঠাৎ কাঁধের উপর স্পর্শ অনুভব করিয়া দেখি, এক ঝলক রক্ত সেখানে পড়িয়াছে। কিন্তু তখনই বুঝিতে পারিলাম, রক্ত নয়—ফুল। শিমুল গাছটায় দু-চারটে ফুল ধরিয়াছিল, ইতিপূর্ব্বে লক্ষ্য করি নাই।

ফুলটি হাতে লইয়া ফিরিয়া আসিলাম। মনে হইল, এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ফুল দিয়া আমাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন।

৯ ফেব্রুয়ারি। আজ শরীরটা ভাল ঠেকিতেছে না; বোধ হয় একটু জ্বরভাব হইয়াছে। মাথার মধ্যে কেমন একটা উত্তাপ অনুভব করিতেছি। মোকদ্দমা লইয়া যে অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করিয়াছি তাহার কুফল এখনও শরীরে লাগিয়া আছে; অকারণে স্নায়ুমণ্ডল উত্তেজিত হইয়া উঠে। আজ উপবাস করিয়াছি, আশা করি কাল শরীর বেশ ঝরঝরে হইয়া যাইবে।

১০ ফেব্রুয়ারি। প্রাচীন গ্রীসে সংস্কার ছিল, প্রত্যেক গাছ লতা নদী পাহাড়ের একটি করিয়া অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছে। আধুনিক বিজ্ঞানশাসিত যুগে কথাটা হাস্যকর হইলেও উপদেবতা অধিষ্ঠিত গাছপালার কথা কল্পনা করিতে মন্দ লাগে না। সাঁওতালদের মধ্যেও এইরূপ সংস্কার আছে শুনিয়াছি। যাহারা বনে জঙ্গলে বাস করে তাহাদের মধ্যে এই প্রকার বিশ্বাস হয়ত স্বাভাবিক। মানুষ যেখানেই থাকুক, দেবতা সৃষ্টি না করিয়া থাকিতে পারে না। আমরা সভ্য হইয়া ইট-পাথরের মন্দিরের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, যাহারা বনের মানুষ তাহারা গাছপালা নদী-নালাতেই দেবতার আরোপ করিয়া সন্তুষ্ট থাকে। আত্মবিশ্বাসের যেখানে অভাব সেইখানেই দেবতার জন্ম। মানুষ সহজ অবস্থায় ভূত প্রেত উপদেবতা, এমন কি দেবতা পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারে না; ও সব বিশ্বাস করিতে হইলে রীতিমত মস্তিষ্কের ব্যাধি থাকা চাই। কিন্তু সে যাহাই হোক, উপদেবতার কথা কল্পনা করিতে বেশ লাগে। আমার ঐ শিমুল গাছটার যদি একটা দেবতা থাকিত তাহাকে দেখিতে কেমন হইত? কিংবা অতদূর যাইবার প্রয়োজন কি, এই পাহাড়টারও ত একটা দেবতা থাকা উচিত—তিনিই বা কিরূপ দেখিতে শুনিতে? তিনি যদি হঠাৎ একদিন আমাকে দেখা দেন তবে কেমন হয়?

১১ ফেব্রুয়ারি। দিনের বেলাটা পাহাড়ের উপরেই এধার-ওধার ঘুরিয়া এবং রান্নাবান্নার কাজে বেশ একরকম কাটিয়া যায়। কিন্তু সন্ধ্যার পর হইতে শয়নের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই তিন-চার ঘণ্টা সময় যেন কিছুতেই কাটিতে চায় না। এখন কৃষ্ণপক্ষ যাইতেছে, সূর্য্যাস্তের পরই চারিদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার হইয়া যায়। তখন পৃথিবীপৃষ্ঠে সমস্ত দৃশ্য লেপিয়া মুছিয়া একাকার হইয়া যায়, কেবল আকাশের তারাগুলা যেন অত্যন্ত নিকটে আসিয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া থাকে। আমি ইক্‌মিক কুকারে রান্না চড়াইয়া দিয়া লণ্ঠন জ্বালিয়া ঘরের মধ্যে নীরবে বসিয়া থাকি। লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয় ঘরটা সম্পূর্ণ আলোকিত হয় না—আনাচে-কানাচে অন্ধকার থাকিয়া যায়।

প্রকাণ্ড বাড়িতে আমি একা।

১২ ফেব্রুয়ারি। মনটা অকারণে বড় অস্থির হইয়াছে। সন্ধ্যার পর হইতে কেবলি মনে হইতেছে যেন কাহার অদৃশ্য চক্ষু আমাকে অনুসরণ করিতেছে, বার বার ঘাড় ফিরাইয়া পিছনে দেখিতেছি। অথচ বাড়িতে আমি ছাড়া কেহ নাই। স্নায়বিক উত্তেজনা—তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু বড় অস্বস্তি বোধ হইতেছে—নার্ভের কোনো ঔষধ সঙ্গে থাকিলে ভাল হইত।

১৩ ফেব্রুয়ারি। কাল রাত্রে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছে। আমার স্নায়ুগুলা এখনও ধাতস্থ হয় নাই—কিংবা—

না, না, ও সব আমি বিশ্বাস করি না।

ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, অনেক রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া গেল। কে যেন আমার সর্ব্বাঙ্গে অতি লঘুস্পর্শে হাত বুলাইয়া দিতেছে! কি অপূর্ব্ব রোমাঞ্চকর সে স্পর্শ তাহা বলিতে পারি না। মুখের উপর হইতে আঙুল চালাইয়া পায়ের পাতা পর্য্যন্ত লইয়া যাইতেছে, আবার ফিরিয়া আসিতেছে। ঘর অন্ধকার ছিল, এই শারীরিক সুখস্পর্শের মোহে কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন থাকিয়া ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলাম। মনে হইল, কে যেন নিঃশব্দে শয্যার পাশ হইতে সরিয়া গেল।

এতক্ষণে ঘুমের আবেশ একেবারে ছুটিয়া গিয়াছিল, ভাবিলাম—চোর নয় ত? কিন্তু চোর গায়ে হাত বুলাইয়া দিবে কেন? তাহা ছাড়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়াছি। আমি উচ্চকণ্ঠে ডাকিলাম—কে? কোনো সাড়া নেই। গা ছম্‌ছম্ করিতে লাগিল। বালিশের পাশে দেশলাই ছিল, আলো জ্বালিলাম। ঘরে কেহ নাই, দরজা পূর্ব্ববৎ বন্ধ। ভাবিলাম, ঘুমাইয়া নিশ্চয় স্বপ্ন দেখিয়াছি। এমন অনেক সময় হয়, ঘুম ভাঙিয়াছে মনে হইলেও ঘুম সত্যই ভাঙে না—নিদ্রা ও জাগরণের সন্ধিস্থলে মনটা অর্দ্ধচেতন অবস্থায় থাকে।

দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিলাম, খোলা বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম এক আকাশ নক্ষত্র জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে। ঘরের বদ্ধ বায়ু হইতে বাহিরে আসিয়া বেশ আরাম বোধ হইল। একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বাড়ির চারিদিকে যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বেড়াইতেছে। কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক পায়চারি করিবার পর একটু গা শীত শীত করিতে লাগিল, আবার ঘরে ফিরিয়া দরজা বন্ধ করিয়া শুইলাম। আলোটা নিবাইলাম না, কমাইয়া দিয়া মাথার শিয়রে রাখিয়া দিলাম।

এটা কি সত্যই স্বপ্ন?—রাত্রে আর ভাল ঘুম হইল না।

১৪ ফেব্রুয়ারি। কাল আর কোন স্বপ্ন দেখি নাই। আধ-আশা আধ-আশঙ্কা লইয়া শুইতে গিয়াছিলাম—হয়ত আজ আবার স্বপ্ন দেখিব; কিন্তু কিছুই দেখি নাই। আজ শরীর বেশ ভাল বোধ হইতেছে।

চাল ডাল কেরোসিন তেল ইত্যাদি ফুরাইয়া গিয়াছিল, মালীকে দিয়া বাজার হইতে আনাইয়া লইয়াছি। মালীটা জাতে গোয়ালা হইলেও বেশ বুদ্ধিমান লোক, সেই যে তাহাকে আমার সম্মুখে আসিতে মানা করিয়া দিয়াছিলাম তারপর হইতে নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে আমার কাছে আসে না। কখন জল দিয়া যায় আমি জানিতেও পারি না। আমিও আসিয়া অবধি পাহাড় হইতে নীচে নামি নাই, সুতরাং মানুষের সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎ এ-কয়দিন হয় নাই বলিলেই চলে। নীচে রাস্তা দিয়া মানুষ চলাচল করিতে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু এতদূর হইতে তাহাদের মুখ দেখিতে পাই নাই।

আজ বাড়িতে চিঠি দিয়াছি, লিখিয়াছি বেশ ভাল আছি। কিন্তু তাহাদের চিঠিপত্র দিতে বারণ করিয়া দিয়াছি। আমার এই বিজন বাসের মাধুর্য্য চিঠিপত্রের দ্বারাও খণ্ডিত হয় ইহা আমার ইচ্ছা নয়। বাহিরের পৃথিবীতে কোথায় কি ঘটিতেছে না-ঘটিতেছে তাহার খোঁজ রাখিতে চাই না।

১৫ ফেব্রুয়ারি। আজ আবার মনটা অস্থির হইয়াছে। কি যেন হইয়াছে, অথচ ঠিক বুঝতে পারিতেছি না। শরীর ত বেশ ভালই আছে। তবে এমন হইতেছে কেন?

কাল ভাবিতেছি একবার শহরটা দেখিয়া আসিব। শুনিয়াছি নবাবী আমলের অনেক দ্রষ্টব্য স্থান আছে।

কাছেই কোথায় নাকি সীতাকুণ্ড নামে গরম জলের একটা প্রস্রবণ আছে, বন্ধু বলিয়া দিয়াছিলেন সেটা দেখা চাই। অতএব সেটাও দেখিতে হইবে।

১৬ ফেব্রুয়ারি। কাল রাত্রে আবার সেইরূপ ঘটিয়াছে। স্বপ্ন নয়—এ স্বপ্ন নয়! স্পষ্ট অনুভব করিলাম, কে আমার পাশে বসিয়া অতি কোমল হস্তে ধীরে ধীরে আমার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে। অনেকক্ষণ চোখ বুজিয়া নিস্পন্দ বক্ষে শুইয়া রহিলাম। বালিশের তলায় ঘড়িটা টিক্ টিক্ করিতেছে শুনিতে পাইলাম, সুতরাং এ ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন হইতেই পারে না।

অদৃশ্য হাতটা কতবার আমার আপাদমস্তক বুলাইয়া গেল তাহা বলিতে পারি না। একবার হাতখানা যখন আমার বুকের কাছে আসিয়াছে তখন হাত বাড়াইয়া আমি সেটা ধরিতে গেলাম। মনে হইল আমার মুঠির মধ্যে হাতটা গলিয়া মিলাইয়া গেল। হাত-বুলানোও বন্ধ হইল। অনুভবে বুঝিলাম, সে শয্যার পাশে দাঁড়াইয়া আছে, এখনও যায় নাই। আমি চোখ চাহিয়া শুইয়া রহিলাম—সেও দাঁড়াইয়া রহিল। ঘর অন্ধকার, কিছুই দেখিতে পাইতেছি না,—চোখ খুলিয়া থাকা বা বুজিয়া থাকার কোন প্রভেদ নাই। উৎকর্ণ হইয়া শুনিবার চেষ্টা করিলাম, কোনো শব্দ হয় কিনা। দরজার কোথাও ঘুণ ধরিয়াছে—তাহারই শব্দ শুনিতেছি। আর কোনো শব্দ নাই।

অতীন্দ্রিয় অনুভূতি দ্বারা বুঝিলাম, সে আস্তে আস্তে চলিয়া গেল; আজ আর আসিবে না। ঘুমাইয়া পড়িলে হয়ত থাকিত। আমি যখনই ঘুমাই, তখনই কি সে আমার সুস্থ শরীরের উপর পাহারা দেয়?

কিন্তু আশ্চর্য্য! আজ আমার একটুও ভয় করিল না কেন?

১৭ ফেব্রুয়ারি। আমার শিমুল গাছ রক্তরাঙা ফুলে ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে। গাছে পাতা নাই, কেবলই ফুল।

সেদিন যে আমার কাঁধের উপর এক ঝলক রক্তের মত ফুল পড়িয়াছিল—সে কি স্বাভাবিক? এত স্থান থাকিতে আমার কাঁধের উপরই বা পড়িল কেন? তবে কি কোনো অদৃশ্য হস্ত গাছ হইতে ফুল ছিঁড়িয়া আমার গায়ে ফেলিয়াছিল? কে সে? বৃক্ষদেবতা? না, আমারই মত কোন মানুষের দেহবিমুক্ত আত্মা? তাই কি? একটা দেহহীন আত্মা! সে আমাকে পাইয়া খুশী হইয়াছে তাহাই কি আকারে ইঙ্গিতে জানাইতে চায়?

সে আমার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে চায় তাই কি সে-দিন ফুল দিয়া আমার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল?

তবে কি সত্যই প্রেতযোনি আছে? দেহমুক্ত অশরীরী আত্মা! বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু there are more things in heaven and earth.

একটা বিষয়ে ভারি আশ্চর্য্য লাগিতেছে—ভয় করে না কেন? এই নির্জ্জন স্থানে একলা আছি, এ অবস্থায় ভয় হওয়াই ত স্বাভাবিক!

১৮ ফেব্রুয়ারি। আনমনে দিন কাটিয়া গেল। শূন্য বাড়িময় কেবল ঘুরিয়া বেড়াইলাম।

পশ্চিমা হাওয়া দিতেছে—খুব ধূলা উড়িতেছে। গঙ্গার চরের দিকটা বালুতে অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না।

আজ কিছু ঘটে নাই। মনটা উদাস বোধ হইতেছে।

১৯ ফেব্রুয়ারি। দিনটা যেন রাত্রির প্রতীক্ষাতেই কাটিয়া গেল। দিনের বেলা কিছু অনুভব করি না কেন?

সন্ধ্যার সময় দেখিলাম, পশ্চিম আকাশে সরু একটি চাঁদ দেখা দিয়েছে—যেন অসীম শূন্যে অপার্থিব একটু হাসি! অল্পক্ষণ পরেই চাঁদ অস্ত গেল, তখন আবার নীরন্ধ্র অন্ধকার জগৎ গ্রাস করিয়া লইল।

ইক্‌মিক্ কুকারে রান্না চড়াইয়া অন্যমনে বসিয়া ছিলাম। আলোটি সম্মুখের ভাঙা টেবিলে বসানো ছিল। অদূরে কতকগুলা ধূপ জ্বালিয়া দিয়াছিলাম, তাহারই সুগন্ধ ধূমে ঘরটি পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

বসিয়া বসিয়া সহসা স্মরণ হইল, বাক্স হইতে সেই প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে বইখানা বাহির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম। গল্প—নেহাৎ গল্প! সত্য অনুভূতির ছায়া মাত্র এ সব কাহিনীতে নাই। আমি যেমন করিয়া তাহাকে অনুভব করিয়াছি, চোখে না দেখিয়াও সর্ব্বাঙ্গ দিয়া তাহার সামীপ্য উপলব্ধি করিয়াছি—সেরূপ ভাবে আর কে প্রত্যক্ষ করিয়াছে?

ইহারা লিখেতেছে, চোখে দেখিয়াছে। চোখে দেখা কি যায়? যে আমার কাছে আসে সে কেমন দেখিতে? আমারই মত কি তার হস্ত পদ অবয়ব আছে? মানুষের চেহারা না অন্য কিছু!

বই হইতে চোখ তুলিয়া ভাবিতেছি এমন সময় আমার দৃষ্টির সম্মুখে এক আশ্চর্য্য ইন্দ্রজাল ঘটিল। ধূপের কাঠিগুলি হইতে যে ক্ষীণ ধূমরেখা উঠিতেছিল তাহা শূন্যে কুণ্ডলী পাকাইতে পাকাইতে যেন একটা বিশিষ্ট আকার ধারণ করিতে লাগিল। অদৃশ্য কাচের শিশিতে রঙীন জল ঢালিলে যেমন তাহা শিশির আকারটি প্রকাশ করিয়া দেয়, আমার মনে হইল ঐ ধোঁয়া যেন তেমনি কোনো অদৃশ্য আধারে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে তদাকারত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। আমি রুদ্ধনিঃশ্বাসে দেখিতে লাগিলাম। ক্রমে ধূসর রঙের একটি বস্ত্রের আভাস দেখা দিল। বস্ত্রের ভিতর মানুষের দেহ ঢাকা রহিয়াছে,

বস্ত্রের ভাঁজে ভাঁজে তাহার পরিচয় পাইতে লাগিলাম। ...ধূমকুণ্ডলী মূর্ত্তি গড়িয়া চলিল, আবছায়া মূর্তির ভিতর দিয়া ওপারের দেয়াল দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু তবু তাহার ডৌল হইতে বেশ বুঝা যায় যে, একটা বিশেষ কিছু! ধূম পাকাইয়া পাকাইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে ক্রমে মূর্ত্তির গলা পর্য্যন্ত পৌঁছিল। এইবার তাহার মুখ দেখিতে পাইব!... কি রকম সে মুখ? বিকট, না ভয়ানক? কিন্তু ঠিক এই সময় সহসা সব ছত্রাকার হইয়া গেল। জানালা দিয়া একটা দমকা হাওয়া আসিয়া ঐ ধূমমূর্ত্তিকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল। মুখ দেখা হইল না।

প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম যদি আবার দেখিতে পাই। কিন্তু আর সে মূর্ত্তি গড়িয়া উঠিল না।

২০ ফেব্রুয়ারি। সে আছে, তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা আমার উষ্ণ মস্তিষ্কের কল্পনা নয়। দিনের বেলা সে কোথায় থাকে জানি না, কিন্তু সন্ধ্যা হইলেই আমার পাশে আসিয়া দাঁড়ায়, আমার মুখের দিকে চোখ মেলিয়া চাহিয়া থাকে। আমি তাহাকে দেখিতে পাই বটে, কিন্তু যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না তাহাই কি মিথ্যা? বাতাস দেখিতে পাই না, বাতাস কি মিথ্যা? শুনিয়াছি একপ্রকার গ্যাস আছে যাহা গন্ধহীন ও অদৃশ্য অথচ তাহা আঘ্রাণ করিলে মানুষ মরিয়া যায়। সে গ্যাস কি মিথ্যা?

না সে আছে। আমার মন জানিয়াছে সে আছে।

২১ ফেব্রুয়ারি। কে সে? তাহার স্পর্শ আমি অনুভব করিয়াছি, কিন্তু তাহাকে স্পর্শ করিতে পারি না কেন? ছুঁইতে গেলেই সে মিলাইয়া যায় কেন, সে দেখা দিতে চেষ্টা করে জানি, কিন্তু দেখা দিতে পারে না কেন? রক্তমাংসের চক্ষু দিয়া কি ইহাদের দেখা যায় না?

আমি এখন শয়নের পূর্ব্বে ডায়েরি লিখিতেছি, আর সে ঠিক আমার পিছনে দাঁড়াইয়া আমার লেখা পড়িতেছে। আমি জানি। আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু মুখ ফিরাইলে দেখিতে পাইব না—সে মিলাইয়া যাইবে।

কেন এমন হয়? তাহাকে কি দেখিতে পাইব না? দেখিবার কী দুর্দ্দম আগ্রহ যে প্রাণে জাগিয়াছে তাহা কি বলিব। তাহার এই দেহহীন অদৃশ্যতাকে যদি কোনো রকমে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে পারিতাম!

কোনো উপায় কি নাই?

২২ ফেব্রুয়ারি। কাল রাত্রে সে আসে নাই। সমস্ত রাত্রি তার প্রতীক্ষা করিলাম, কিন্তু তবু সে আসিল না। কেন আসিল না? তবে কি আর আসিবে না?

নিজেকে অত্যন্ত নিঃসঙ্গ মনে হইতেছে। আমার প্রতি রজনীর সহচর সহসা আমাকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে! আর যদি না আসে?

২৩ ফেব্রুয়ারি। জানিয়াছি—জানিয়াছি! সে নারী।

একি অভাবনীয় ব্যাপার, যেন ধারণা করিতে পারিতেছি না। আজ সকালে স্নান করিয়া চুল আঁচড়াইতে গিয়া দেখি, একগাছি দীর্ঘ কাল চুল চিরুণীতে জড়ানো রহিয়াছে। এ চুল আমার চিরুণীতে কোথা হইতে আসিল! বুঝিয়াছি—বুঝিয়াছি। এ তাহার চুল। সে নারী! সে নারী!

কখন তুমি আমার চিরুণীতে কেশ প্রসাধন করিয়া এই অভিজ্ঞানখানি রাখিয়া গিয়াছ? কি সুন্দর তোমার চুল! তুমি আমায় ভালবাস তাই বুঝি আমার চিরুণীতে কেশ প্রসাধন করিয়াছিলে? আমার আরসীতে মুখ দেখিয়াছিলে কি? কেমন সে মুখ? তাহার প্রতিবিম্ব কেন আরসীতে রাখিয়া যাও নাই? তাহা হইলে তো আমি তোমাকে দেখিতে পাইতাম।

ওগো রহস্যময়ী, দেখা দাও। এই সুন্দর সুকোমল চুলগাছি যে-তরুণ তনুর শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল সেই দেহখানি আমাকে একবার দেখাও। আমি যে তোমায় ভালবাসি। তুমি নারী তাহা জানিবার পূর্ব্ব হইতে যে তোমায় ভালবাসি।

কেমন তোমার রূপ, যে-শিমুল ফুল দিয়া প্রথম আমায় সম্ভাষণ করিয়াছিলে [illegible]ই মত দিক আলো-করা রূপ কি তোমার? তাই কি নিজের রূপের প্রতিচ্ছবিটি সেদিন আমার কাছে পাঠাইয়াছিলে? অধর কি তোমার অমনই রক্তিম বর্ণ, পায়ের আলতা কি উহারই রঙে রাঙা?

কেমন করিয়া কোন ভঙ্গীতে বসিয়া তুমি আমার চিরুণী দিয়া চুল বাঁধিয়াছিলে? কেমন সে কবরীবন্ধ! একটি রক্তরাঙা শিমুল ফুল কি সেই কবরীতে পরিয়াছিলে?

আমার এই ছত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কখনও আমি নারীর মুখের দিকে চোখ তুলিয়া দেখি নাই। আজ তোমাকে না দেখিয়াই তোমার প্রেমে আমি পাগল হইয়াছি। ওগো অশরীরিণি, একবার রূপ ধরিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াও।

২৪ ফেব্রুয়ারি। তাহার প্রেমের মোহে আমি ডুবিয়া আছি। আহার নিদ্রায় আমার প্রয়োজন কি? আমার মনে হইতেছে এই অপরূপ ভালবাসা আমাকে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিতেছে, আমার অস্থি-মাংস-মেদ-মজ্জা জীর্ণ করিয়া জঠরস্থ অন্নরসের মত আমাকে পরিপাক করিয়া ফেলিতেছে। এমন না হইলে ভালবাসা?

২৫ ফেব্রুয়ারি। আজ সকালে হঠাৎ মালীটার সঙ্গে দেখা হইয়া গেল, তাহাকে গালাগালি দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি। মানুষের মুখ আমি দেখিতে চাই না।

সমস্ত দিন কিছু আহার করি নাই। ভাল লাগে না—আহারে রুচি নাই। তা ছাড়া রান্নার হাঙ্গামা অসহ্য।

গরম পড়িয়া গিয়াছে। মাথার ভিতরটা ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে। কাল সারারাত্রি জাগিয়া ছিলাম।

কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। সে কাল আমার পাশে আসিয়া শুইয়াছিল। স্পষ্ট অনুভব করিয়াছি, তাহার অস্পষ্ট মধুর দেহ-সৌরভ আঘ্রাণ করিয়াছি। কিন্তু তাহাকে ধরিতে গিয়া দেখিলাম শূন্য—কিছু নাই। জানি, সে আমার চোখে দেখা দিবার জন্য, আমার বাহুতে ধরা দিবার জন্য আকুল হইয়াছে। কিন্তু পারিতেছে না। তাহার এই ব্যর্থ আকুলতা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছি।

মধ্যরাত্রি হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত খোলা আকাশের তলায় পায়চারি করিয়াছি, সেও আমার পাশে পাশে বেড়াইয়াছে। তাহাকে বার-বার জিজ্ঞাসা কবিয়াছি, কি করিলে তাহার দেখা পাইব? সে উত্তর দেয় নাই—কিংবা তাহার উত্তর আমার কানে পৌঁছায় নাই।

সকাল হইতেই সে চলিয়া গেল। মনে হইল, ঐ রক্তরাঙা শিমুল গাছটার দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

চর্ম্মচক্ষে তাহাকে দেখিতে পাওয়া কি সম্ভব নয়?

২৬ ফেব্রুয়ারি। না, রক্তমাংসের শরীরে তাহাকে দেখিতে পাইব না। সে সূক্ষ্মলোকের অধিবাসিনী। স্থূল মর্ত্ত্যলোক হইতে আমি তাহার নাগাল পাইব না। আমার এই জড়দেহটাই ব্যবধান হইয়া আছে।

২৭ ফেব্রুয়ারি। আহার নাই, নিদ্রা নাই। মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিতেছে। আয়নায় নিজের মুখ দেখিলাম। একি, সত্যই আমি—না আর কেহ?

আমি তাহাকে চাই, যেমন করিয়া হোক চাই। স্থূল শরীবে যদি না পাই—তবে—?

২৮ ফেব্রুয়ারি। হাঁ সেই ভাল। আর পারি না।

শিমুল গাছের যে-ডালটা কূপের মুখে ঝুঁকিয়া আছে তাহাতে একটা দড়ি টাঙাইয়াছি। আজ সন্ধ্যায় যখন তাহার আসিবার সময় হইবে—তখন—

সখি আর দেরি নাই, আজ ফাগুনের সন্ধ্যায় যখন চাঁদ উঠিবে, তুমি কবরী বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিও। তোমার রক্তরাঙা ফুলের থালা সাজাইয়া রাখিও। আমি আসিব। তোমাকে চক্ষু ভরিয়া দেখিব। আজ আমাদের পরিপূর্ণ মিলনরাত্রি...

*　　　*　　　*

বরদা আস্তে আস্তে ডায়েরি বন্ধ করিয়া বলিল,—এইখানেই লেখা শেষ।

৩৩ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০



গল্প

সজনীকান্ত দাস

পর পর পাঁচটি মেস ও হোটেলের রান্নাঘরের দরজায় কিম্বা ম্যানেজারের নোটিশবোর্ডে মাথা ঠুকিয়া শেষে নিজে আলাদা একটা বাড়ী নেওয়াই ঠিক করিলাম। দৈনিক কাগজের নিজস্ব সংবাদদাতা রূপে মাসিক ৭০।৭৫ টাকা মাত্র আয় করিতাম বটে, কিন্তু পিতার কনিষ্ঠ পুত্র হওয়ার যে সুবিধা তাহা পুরোপুরি ভোগ করিতেছিলাম। পোষ্য বিলতে আমার কেহ ছিল না। বাবা গবর্ণমেন্টের দৌলতে বেশ দু'পয়সা আয় করিতেন; তাঁহাকে মাসিক কিছু সাহায্য করার কথা মনেও হইত না। দুই বৎসর হইল বিবাহ করিয়াছি কিন্তু পত্নীটি ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত বৎসরের কিছুকাল কলিকাতায় বাগবাজারস্থিত তাহার পিতৃগৃহে এবং কিছুকাল আমার পিতৃগৃহে দোল খাইয়া ফিরিতেছিল। তাহাকে পত্নীহিসাবে-প্রাপ্য কিছু দিতে কেমন যেন লজ্জা করিত। সুতরাং যাহা আয় করিতাম তাহা ব্যয় করিবার অধিকারও মনে মনে অর্জ্জন করাতে ৩০ টাকা দিয়া বাড়ী ভাড়া নিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিলাম না। একটি চাকর রাখিলাম সে একাধারে আমার চাকর, ঠাকুর ও মুরুব্বি ছিল। মোটের উপর ওই সামান্য টাকায় ঘরভাড়া এবং গোবিন্দের মাহিনা দিয়াও দুজনের খাইবার উপযুক্ত টাকা থাকিত এবং উদ্বৃত্ত টাকা দিয়া বন্ধুদের চা ও সিগারেট সরবরাহ করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না।

আমারই একটি বন্ধু তাহাদের বাড়ীর নীচের তলাটা আমাকে ভাড়া দিয়াছিল। বাড়ীটা একটা নোংরা পল্লীর মধ্যে হইলেও আমার তেমন কিছু অসুবিধা হইত না। সকাল ন'টার সময় ভাত খাইয়া বাহির হইয়া যাইতাম এবং পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার সময় প্রায়ই বাড়ী ফিরিতাম; মাসের মধ্যে ত্রিশদিনই প্রায় সে সময় এক বা একাধিক বন্ধু আমার সঙ্গে জুটিত। চা ও চুরুটে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত হুল্লোড় করিয়া কাটাইয়া দিতাম। তারপর গোবিন্দের কৃপায় যাহা জুটিত তাহা তৃপ্তির সঙ্গে আহার করিয়া ইজিচেয়ার প্যাসেজে (Passage) রাখিয়া তাহাতে চিৎ হইয়া পড়িয়া সামনে একটা মোড়ায় পা তুলিয়া দিতাম আর চুরুট টানিতে থাকিতাম। মাঝে মাঝে আমার কাংস্য-বিনিন্দিত-কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গানের পোঁ ধরিতেও ছাড়িতাম না। বস্তুতঃ এই নিঃসঙ্গ রাত্রিগুলিতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ, কালিদাসের গ্রন্থাবলী আর শেলীর 'Complete Works' আমার সঙ্গী ছিল। আমি চেয়ারের পিছনে লণ্ঠন রাখিয়া উচ্চকণ্ঠে কখনও বা মেঘদূত পড়িতাম; কখনও বা মহোল্লাসে 'বর্ষশেষ' আবৃত্তি করিতাম এবং ইংরেজীতেও আমি কম যাই না এই গর্ব্ব ছিল বলিয়া নিঝুম নিশীথ রাত্রে শেলীর 'Spint of Solitude' কিম্বা 'Hymn to Intellectual Beauty' পাঠ করিতাম। আমার ওই বাড়ীওয়ালা বন্ধু যতীন প্রায়ই ওই সময়টা আমার কাছে বসিয়া একটু সঙ্কোচ ও শ্রদ্ধা সহকারে আমার দিকে চাহিয়া থাকিত। কাব্য পাঠের অবকাশে আমাদের সংসারের অনিত্যতা ও বিবাহিত জীবনের নিদারুণ বন্ধন-সম্বন্ধে আলোচনা চলিত।

যখন বাড়ীভাড়া লইলাম তখন সরমা (আমার স্ত্রী) হাজারীবাগে তাহার দাদা-মহাশয়ের কাছে থাকিত, সুতরাং রাত্রিতে প্রত্যহই গৃহবাস করিতে হইত। মেসে অবস্থানকালে আমার স্ত্রী কলিকাতায় থাকিলে আমি নামমাত্র 'মেসের বাবু' থাকিতাম; খাওয়া ও শোওয়া প্রায়ই শ্বশুর-গৃহে করিতে হইত। কিন্তু এখন গোবিন্দের দৌলতে স্ত্রীর অবর্তমানেই home comforts পাইতেছিলাম বলিয়া চায়ের দোকান, বায়োস্কোপ বা গড়ের মাঠে কিম্বা কোথায়ও পরনিন্দা বা কুৎসা করিয়া সময় কাটাইতে হইত না। অবশ্য বাড়ীতে থাকার অসুবিধা যে কিছু ছিল না তাহা নয়; রাত্রি দুই প্রহরে সামনের খোলা বাড়ীগুলির কোনোটায় মাতালের চীৎকারে কিম্বা উৎপীড়িতা কোনো নারীর আর্ত্তক্রন্দনে ঘুম ভাঙিয়া যাওয়াতে যে-সব কদর্য গালাগালি ও আলোচনা শুনিতে হইয়াছে, তাহাতে মধ্যে-মধ্যে স্থানত্যাগ করিবার বাসনা হইয়াছে তবু মোটের উপর শান্তিতে ছিলাম বলিয়া অন্য চেষ্টা করি নাই। প্রতিবেশীদের

বাড়ীতে কচি ছেলেমেয়ের কাঁদুনি কিম্বা পাশের হরিহরবাবুর স্ত্রীর সহিত নিত্য কলহ আমার গা-সহা হইয়া গিয়াছিল।

আমি ওপাড়ায় বাসা নেওয়ার পরদিন হইতে সেখানে বেশ একটু সোরগোল পড়িয়াছিল। প্রথম যেদিন বাড়ীতে উঠিয়া আসিলাম আমার সঙ্গের আসবাব বিশেষতঃ দুই গাড়ী বই অনেকেই বেশ উৎসুক হইয়া দেখিয়াছিল দেখিয়াছি। যতক্ষণ বাড়ীতে থাকিতাম আমার নিজস্ব পেটেণ্ট সুরে চেঁচাইয়া গান গাহিয়া, কবিতা আওড়াইয়া পাড়া সরগরম করিয়া রাখিতাম। বিশেষতঃ বৈকালে অফিস ফেরত যখন ইজিচেয়ারটা সামনের গলিতে পাতিয়া বসিয়া বসিয়া সিগারেট টানিতাম আর কুড়ি পঁচিশ মিনিট অন্তর হাঁকিতাম, 'গোবিন্দ চা' তখন আমার প্রতিবেশীরা আমাকে এক ভিন্ন রাজ্যের জীব বলিয়া কল্পনা করিত। তাছাড়া আমার বাড়ীতে যে-পরিমাণ বন্ধু সমাগত হইয়া যে-পরিমাণ চা ও সিগারেট ধ্বংস করিত ও যে-পরিমাণ চীৎকার করিত তাহাতে পাড়ার অন্তরালবর্ত্তিনীদের প্রাত্যহিক কর্ম্মবন্ধনের অবকাশে দেখিবার বা শুনিবার বিষয়াভাব ঘটিত না। বিশেষতঃ যেদিন হৃদয়দা আসিয়া রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত তাঁহার হাসি গল্প ও গানে আসর জাঁকাইয়া তুলিতেন সেদিন এই ভয় লইয়া শুইতে যাইতাম যে পরদিন প্রাতেই যতীনের বাবা বাড়ী ছাড়িবার নোটিশ দিবেন।

এমনি করিয়া দিন মন্দ কাটিতেছিল না। যে দিন নূতন কোনো কবিতা বা গল্প লিখিতাম, বন্ধুরা দল বাঁধিয়া শুনিতে আসিত, আমি মনে মনে লেখক-জনসুলভ গর্ব অনুভব করিয়া বেশ শান্ত নির্ব্বিকার ভাব দেখাইয়া বসিয়া থাকিতাম; চা জোগাইতে জোগাইতে গোবিন্দের প্রাণান্ত হইত।

ইতিমধ্যে একদিন যতীনের স্ত্রী বাপের বাড়ি হইতে শ্বশুরবাড়ি আসিল। যতীনের একটি মেয়ে লিলি, চমৎকার ফুটফুটে পুতুলের মতন মেয়েটি। আধো-আধো কথা ফুটিয়াছে—'না' আর 'আবার' কথা দুইটি বিরক্তির সময় এমন জোর দিয়া উচ্চারণ করিত যে মনে হইত সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথই বা হুকুম করিতেছেন। লিলির, বয়স দেড় কি দুই বৎসর। প্রথম ক'দিন লিলি আমার পারিপাট্যহীন বিশাল বপু ও গোঁফ দেখিয়া ভয়ে কাছে ঘেঁসিল না, কিন্তু কখন যে ভয়ের ও সঙ্কোচের বাঁধন কাটিয়া গিয়া মেয়েটি একেবারে আমাকে আত্মসমর্পণ করিল লক্ষ্য করি নাই। একদিন হঠাৎ দেখিলাম লিলি আমাকে পাইয়া বসিয়াছে। যতক্ষণ বাড়ীতে থাকি সে আমার কাছে কাছে 'কাকা কাকা' করিয়া ফিরিত আর আমার অবর্তমানে কাঁদিয়া কাটিয়া বাড়ীশুদ্ধ সকলকে জ্বালাতন করিয়া মারিত। যতীন আমার কাজের ক্ষতি হইতেছে দেখিয়া সত্য সত্যই বড় লজ্জিত হইত। যতীনের স্ত্রীরও লজ্জার অন্ত ছিল না। সে লিলিকে কিছুতেই আমার কাছে আসিতে দিতে চাহিত না—তাহাকে মারিয়া ধরিয়া একাকার করিত।

যতীনদের বাড়ীতে যতীনের বাবা, মা, বড় দাদা ও তাঁহার স্ত্রী ও তাঁদের একটি ছেলে, যতীনের একটি ছোট ভাই, যতীনের স্ত্রী, লিলি আর যতীন এই ক'জন মাত্র লোক। লিলি যতদিন ছিল না আমি বাহিরেরই লোক ছিলাম, বাহিরে বাহিরে ফিরিতাম, যতীনদের বাড়ীর ভিতরের সন্ধান কিছুই পাই নাই। বরঞ্চ হরিহরবাবুর বাড়ী আমার খাওয়ার ঘরের ঠিক সামনেটিতে থাকাতে তাঁদের জীবন-যাত্রার সঙ্গে অনেক বেশি পরিচিত ছিলাম। যতীনদের বাড়ীর সঙ্গে গোবিন্দর ঘনিষ্ঠতা কিছু বেশি ছিল—কাজে অকাজে বাড়ীর ভিতর তা'র ডাক পড়িত। কিন্তু লিলি তার অকারণ সৌহৃদ্য আর ঘনিষ্ঠতা দিয়া তাহাদের বাড়ীর সহিত আমার দূরত্বটুকু ঘুচাইয়া দিতে লাগিল।

আমি খুব ভোরে উঠিতাম। ভোরে উঠিয়াই অভ্যাসমত গান ধরিতাম। লিলি আমার সাড়া পাইয়া নীচে আসিবার জন্য কাঁদিয়া উঠিত; আমাকে দেখিতে পাইয়া দোতালার বারান্দার রেলিং ধরিয়া নীচে ঝুঁকিয়া দেখিত আর ঘন ঘন ডাকিত 'কাকা।' উপরে মুখ তুলিয়া চকিতে দেখিতে পাইতাম লিলির জ্যাঠাইমা রেলিঙের ধার হইতে লিলিকে সরাইবার জন্য তাহার হাত ধরিয়া টানাটানি করিতেছেন। আমাকে দেখামাত্র অন্তরালে সরিয়া যাইতেন; অথচ লিলিকে বলিতেন 'কই কাকা' —। লিলি আর তার কাকার পরিচয়ের মধ্যে এই জ্যাঠাইমাটির কিছু হাত ছিল। মাঝে-মাঝে কদাচিৎ

শুনিতে পাইতাম ভুলাইয়া ভুলাইয়া লিলিকে জামা পরাইবার বা দুধ খাওয়াইবার সময় জ্যাঠাইমা তাহাকে তাহার কাকার সম্বন্ধে নানা গবেষণামূলক কথা বলিতেছেন।

লিলিকে পাইয়া আমি বাহিরের বন্ধুবান্ধব একে একে প্রায় ছাড়িয়া দিলাম। অফিস আর বাড়ী এ-ছাড়া অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করিতাম না—রিপোর্ট সংগ্রহ করিতেও নয় কারণ সে কাজটা ঘরে বসিয়াই শৃঙ্খলার সহিত করা যাইত। এর বাহিরে মনের যতটুকু খোরাক দরকার হইত পত্নীর ঘনঘন চিঠিতে তাহার পূরণ হইত। মোটের উপর আমার মত নামজাদা বোহেমিয়ান্ একজন ধীরে ধীরে domesticated হইয়া পড়িতেছিল!

বাহিরে যাইতাম না বলিয়া আমার বাড়ীতেই আড্ডা জমিতে লাগিল কারণ আমাকে বাদ দিলে নাকি বন্ধুদের আসরটা তেমন জমিত না। আমি সমানে চা এবং সিগারেট সাপ্লাই করিতাম এবং বাদলার দিন হইলেই খিচুরী ও ডিমভাজা অর্ডার করিতে এতটুকু ইতস্ততঃ করিতাম না।

পেয়ালার ঠন্‌ঠন্ যত দ্রুততর এবং সিগারেটের ধোঁয়া যত নিবিড়তর হইতে লাগিল, মাসিক ৭০।৭৫ টাকা কোথায় ফুকিয়া গিয়া দেনার অঙ্ক ততই ভারী হইতে লাগিল এবং একদিন নিতান্ত অসহায় অবস্থায় বোধোহয় হইল। ভাবিলাম এ লাটীয় চাল চলিবে না—পুনর্মূষিক হইতে হইবে, মেস ভিন্ন গত্যন্তর নাই। শ্বশুরের কাছে টাকা ধার করিতে গেলাম। তিনি শুধু একচোট ধমকাইয়া লইয়া বাড়ী এবং চাকর ছাড়িয়া দিয়া বাগবাজারে তাঁহার কেয়ারে থাকিতে আদেশ দিলেন। আমি সেইটাই সুবিধা ও লাভজনক ভাবিয়া যতীনকে নোটিশ দিলাম। গোবিন্দকেও অন্যত্র চাকরির চেষ্টা করিতে বলিলাম।

দেখিলাম, বাড়ীর সামনে আবার বাড়ী ভাড়ার বিজ্ঞাপন ঝোলানো হইল; পাড়ায় আবার একটা গোল পড়িল। লোকে পথ চলিতে চলিতে একবার করিয়া নোটিশ পড়িয়া জিজ্ঞাসুনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া চলিয়া যায়—আমার চিত্ত ব্যথিত হইতে থাকে। এই যে পাঁচ মাস এখানে হাসি-গান-গল্প দিয়া পাড়াটিকে সজীব করিয়া রাখিয়াছিলাম, আজিকার বিদায় দিনে কোথাও কি এতটুকু ব্যথা বাজিবে না? দমকা হাওয়ার মতো যে আসিয়াছিলাম কোনো চিহ্নই কি রাখিয়া যাইব না? লিলির কথা বড় বেদনার সঙ্গে বুকে বাজিতে লাগিল। কাল বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইব, অভ্যস্ত সময়ে 'কাকা' বলিয়া সে ডাকিবে কিন্তু কাকাকে না পাইলে সে কি দিনের হাসি খেলা ভুলিয়া থাকিবে? আরো কোথাও এতটুকু কাঁটা কি নাই?

আমি জোর গলায় পাড়া শুদ্ধ সকলকে শুনাইয়া গোবিন্দকে বলিলাম—'কাল বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইব—তুমি আজই জিনিষপত্র লইয়া যেখানে চাকরি পাইয়াছ সেখানে যাও।' লিলি কাছে আসিল। তাহাকে বলিলাম—আমি চলিয়া যাইতেছি—বলিয়াই চকিতে যেন কি দেখিবার প্রত্যাশায় দূরের বারান্দার পানে চাহিলাম; শুধু সদ্য-মেলা একটা ভিজাকাপড়ের উপর বসিয়া একটা কাক 'কা কা' করিতেছে দেখিলাম।

সেদিন স্নানের সময় কান পাতিয়া শুনিলাম জেঠীমার সহিত লিলির কথা হইতেছে। জেঠিমা বলিতেছেন, 'লিলি, তোর কাকা যে চলিল।' লিলি বলিল, 'আবার!' অর্থাৎ যাও অমন মিথ্যা কথা বলিও না। জেঠিমা বলিলেন, 'কাকাকে বল্, কাকা যেও না।' লিলি আত্মগত ভাবেই বলিল, 'বল্ কাক যেও না।'

চরিতার্থ হইলাম। কে বলিল বন্ধন নাই? কোথায় কোন্ অজানা মৃত্তিকায় যে মানুষ পরিচয়ের শিকড় চালায়, কোন্ অদৃশ্য আকাশ হইতে প্রেমের বাণী পরিচয়ের বাণী সে শুনিতে পায়, কে বলিবে? চারিদিকে যখন উষর মরু দেখিয়া ব্যথিত ও ক্লিষ্ট হইতেছিলাম তখন এই অনির্দিষ্ট স্থানে কে শীতল সরসী রচনা করিল?

শেষবারটির মত ইজিচেয়ারটি পাতিয়া চুরুটের টিন লইয়া বসিলাম। কত কথাই একে একে মনে আসিতে লাগিল! এই যে শৈবালের মতন ভাসিতে ভাসিতে এই জলভাগে আসিয়া পড়িয়াছিলাম, বন্যার স্রোতে আপনার সমস্ত পরিচয় বিলুপ্ত করিয়া দিয়া অন্য কোথায়ও ভাসিয়া যাইব ভাবিয়াছিলাম,

কিন্তু তাই কি হইবে? মানুষ এমনি করিয়া কি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হইতে পারে? পরিচয়ের অসংখ্য বীজ নিরন্তর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে—দৈনন্দিন জীবনযাত্রার হাসি আনন্দে ও বেদনায়, সামান্য দুটি কথা কিম্বা ক্ষণিকের একটি চাউনি কখন কোথায় জীবন পাইয়া কেমন করিয়া অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও ফলফুলশোভিত হইতেছে, মানুষের সাধারণ ন্যায়শাস্ত্রে ত এ প্রশ্নের সমাধান নাই। এই বাড়ী ঘর-দুয়ার সবই ত যেমন ছিল তেমনি থাকিবে;—একবার চুণ ফিরাইয়া লইলেই হয়ত পরিচয়ের কালিমাটুকু নিঃশেষে বিলুপ্ত হইবে, কিন্তু সহরের একপ্রান্তে এই যে এখানে ক্ষণিকের খেলাঘর রচনা করিয়াছিলাম তাহা কি একেলা আমারই জিনিষ? তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আজ যে চলিয়া যাইতেছি, সে ভাঙনের ব্যথা কি শুধু আমাকেই লাগিবে? আমার প্রাণ এই ক্ষণিকের খেলাঘরের স্মৃতি লইয়া যে দীর্ঘশ্বাস ফেলিবে—তাহার সাথে আর কোনো উত্তপ্ত শ্বাস কি মিলিত হইবে না?

চুরুটের ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাক খাইতে খাইতে শূন্যে মিলাইতে লাগিল; আমি নির্লিপ্ত বৈরাগীর মতন তাহা দেখিতে লাগিলাম। আমার মাথায় কল্পনার প্রবাহও অমনি পাক খাইতে লাগিল। আমি ভুলিয়া গেলাম, কাল আমাকে যাইতে হইবে, ভুলিয়া গেলাম আমি শ্রী অমুকচন্দ্র অমুক, খবরের কাগজের অফিসে রিপোর্টার। যুগে যুগে যে সকল বিরহী দেবতার শাপে ব্যথিত নিশ্বাস ফেলিয়াছে। আমি তো তাহাদেরই একজন—তাহাদের সঞ্চিত অশ্রুভার যে আমারই বুকে আসিয়া জমিয়াছে।

রোজ যেমন যায়; একটি দুটি করিয়া তেমনি লোক সামনের গলিতে যাতায়াত করিতে লাগিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল, —আজ গোবিন্দ নাই। আলো জ্বালা হইল না—চায়ের আওয়াজ আর শুনা গেল না। বন্ধুরা আজ কেহ আসিল না। পথিকেরা প্রতিদিনের অভ্যস্ত আলোটি জ্বালা হইল না দেখিয়া কি ভাবিল জানি না। আমার মন বলিতে লাগিল—এ ঠিক হইতেছে না। আলোটি জ্বালাইয়া ঠিক জায়গাটিতে রাখিলাম, তার পর আবার ধোঁয়ার খেলা আর মনের খেলা চলিতে লাগিল।

কত অপূর্ণ কামনা, কত হতাশ্বাস, কত সুতীব্র বেদনা আমার মনে জমাট বাঁধিয়া রূপ পরিগ্রহ করিতে লাগিল, আবার ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকাইয়া কোথায় মিলাইয়া গেল। আমি চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিলাম।—

* * *

ঘন মেঘে চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে—আকাশ বাতাস চারিদিক থমথম করিতেছে। মনে হইতেছে এখনই যেন বিশ্বপ্রকৃতি ফাটিয়া পড়িয়া বজ্র বিদ্যুৎ আর জলধারে ধরণীবক্ষ প্লাবিত করিবে। অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে, এই দুর্যোগে আমি একমাত্র পথিক, গৃহহারা হইয়া আশ্রয় খুঁজিতে বাহির হইয়াছি। কুটিরে-কুটিরে দ্বার বন্ধ হইয়াছে; মনে হইল এ যেন আমার অভিসার। 'ঘোর তবধ সব তিমিন মগন ভব'—আমি একেলা অজানার অভিসারে চলিয়াছি।

কেমন করিয়া জানিনা আশ্রয় পাইলাম। ঘরে প্রবেশ করিয়া বাতায়ন খুলিয়া দিয়া দেখিলাম, আসন্ন দুর্য্যোগ আশঙ্কায় সব ঘরের বাতায়ন বন্ধ। জনসঙ্কুল নগরীর উপর যেন জনশূন্য মরুর প্রেতাত্মা হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে।

চকিতের মতো তাহাকে দেখিলাম—আলুলায়িতকুন্তলা নিকষকৃষ্ণমেঘের পানে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তন্ময় হইয়া কি দেখিতেছিল—বিশ্বপ্রকৃতির এই তাণ্ডবলীলায় তাহার ক্ষুদ্রমনে কি কামনা ঘনাইতেছিল জানি না। আমাকে দেখিয়া সে লজ্জিত হইল। সরমকুণ্ঠিত নয়নে পলাইতে গিয়া লজ্জিত হইয়া মুহূর্ত্তকাল হঠাৎ ত্রস্ত হরিণীর মত থমকিয়া দাঁড়াইল; সম্মুখের দুই একটি কেশগুচ্ছ তাহার চক্ষুর উপর আসিয়া পড়িয়াছিল; অঞ্চলপ্রান্তস্থিত চাবির গোছা একটিবার মাত্র ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, তারপর দ্রুত অন্তরালে চলিয়া গেল। তাহার পিঠভরা কালো চুল আমার দৃষ্টিপথের উপর দিয়া একটি কালো জ্যোতিষ্কের মতো নৃত্য করিতে করিতে অন্তর্হিত হইল। সেই ক্ষণিকের দেখা, তবু মনে হইল আমারই কারণে চারু-চরণ দুটি লজ্জিত, মৃণাল বাহু দুটি কুণ্ঠিত, নয়ন দুটি ত্রস্ত আর হৃদয়টি যেন ফুলের ভিতরকার লুকানো মধুটুকুর মতো মধুর—শিশিরটুকুর মতন করুণ।

ভাবিলাম অভিসার সার্থক হইয়াছে, প্রার্থিতের দর্শন পাইয়াছি।

দুর্য্যোগ কাটিয়া গেল। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা শুরু হইল, কিন্তু তাহাকে আর দেখিলাম না। দিনের পরে দিনের ব্যর্থ আশায় ধীরে ধীরে তাহাকে ভুলিয়া গেলাম, এবং আবার দিবসের কর্ম্মগ্লানির অবকাশে অপরিচিতা প্রেয়সীকে খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিলাম।

এমনি করিয়া দিন যায়, বাড়ীর আনাচে-কানাচে romance-এর গন্ধ শুঁকিয়া ফিরি। কল্পিত নায়িকাকে কখনো পেছনের বাড়ীর ছাদে দেখিতে পাই, কখনো সামনের বাড়ীর জানলায় চকিতে তাহার আভাস পাই; কিন্তু এই ধোঁয়াটে পরিচয় ছাড়া তাহার আর কোনো নিরেট পরিচয় জোটে না।

প্রথম কিছুদিন হরিহর-বাবুর মেয়েকে লইয়া কাব্য শুরু করিলাম। তাহার ঘুম হইতে জাগরণ, ছেলে ঠেঙ্গান, স্নান, চুল আঁচড়ান, বাহিরে যাওয়ার পোষাক পরা, রিক্স করিয়া বাহিরে যাওয়া, বৈকালিক ছাদ-বিহার, কালোয়াতী গান ও মা'র সহিত ঝগড়ার মধ্যে বেশ কয়েকদিন দোল খাইয়া ফিরিলাম; ভাবিলাম এই ত মিলিয়াছে, এই আমার নায়িকা! ইহাকে লইয়াই ত আমার কাব্য—! কিন্তু মাঝে মাঝে মনটা কেমন বিগড়াইয়া যাইত—সে তাহার মায়ের বা বাবার সহিত ঝগড়া করিবার সময় বা ছেলেকে মারিবার সময় যে কথাগুলি ব্যবহার করিত তা মোটেই নায়িকাদের মুখে শোভা পায় না। বিশেষতঃ প্রাতে ও সন্ধ্যায় যখন কেহ দরজায় ঘা দিত তখন সে যেভাবে "কে গা!" বলিয়া হাঁক দিয়া উঠিত তাহাতে আমার নায়কের মন অতিশয় পীড়িত হইত। অবশেষে একদিন এই মেয়েটির স্বামী আসিল এবং আমি অবিলম্বে তাহাকে নায়িকার আসন হইতে বরখাস্ত করিলাম।

বসিয়া বসিয়া ভাবিতাম, হায়রে আজ এতকাল কলিকাতার পথে-পথে কাকের অত্যাচার আর মোটরের কাদা সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া ফিরিয়াছি কিন্তু কই চোখের সামনে একটি গাড়ীও ত উল্টাইল না—বিনয়ের মতো যে কোনো সকন্যা বৃদ্ধকে দুদণ্ড ঘরে বসাইয়া চিরস্থায়ী আলাপের ব্যবস্থা করিব সে সুযোগও ত মিলিল না। সুচরিতা ললিতা না হয় নাই জুটিল নিদেনপক্ষে একটা সাবিত্রী কি একটা চন্দ্রমুখীই কি ভগবান জুটাইয়া দিতে পারিলেন না?

এমনি করিয়া অনিশ্চিতের পিছনে আমার মন যখন কাঁদিয়া ফিরিতেছে তখন কে জানিত আমার শঙ্কিতা বিরহিনী আমারই অতি নিকটে তাহার হৃদয় মেলিয়া বসিয়া আছে; আমি তাহার উত্তপ্ত নিশ্বাসের স্পর্শ পাইয়াছি, কিন্তু লক্ষ্য করি নাই। আমি যখন বাহিরে ছুটিবার জন্য ব্যস্ত তখন কে জানিত একটি ব্যগ্র হৃদয় আমার প্রতীক্ষায় ব্যাকুল আগ্রহে আমারই ঘরে পথ চাহিয়া আছে। সেই দুর্য্যোগদিনে যাহাকে চকিতের মতো দেখিয়াছি আমার সেই 'অধরা স্বপন' যে আমাকে লইয়াই স্বপ্ন রচনা করিতেছিল তাহা ত ভাবিতে পারি নাই। আমি কল্পনায় অনেক শৈবলিনী ও আয়েষার স্বপ্ন হয় ত দেখিয়াছি কিন্তু বাস্তব জীবনে এই রূপরসহীন লোকটিতে যে কাহারও প্রয়োজন ঘটিতে পারে তাহা ত পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নামোদিত শারদীয় নিশীথেও মুহূর্ত্তের জন্য স্বপ্নেও ভাবিতে পারি না। তাই আশ্চর্য হইলাম, ভাবিলাম, প্রাণের দেওয়া নেওয়া ব্যাপারে মানুষ গণিত বা ন্যায়ের পথ ধরিয়া ত চলে না; অসম্ভবের পথেই তাহার অভিযান, ভুলের মধ্যেই তাহার লীলা, এবং পৃথিবীর যাবতীয় Tragedy-র মূলেও এই অঘটন সঘটন।

যতদিন অনিশ্চিত ছিল ততদিন নায়িকা মিলনের কথা ভাবিয়া রসাপ্লুত হইয়াছি কিন্তু অনিশ্চয় যখন নিশ্চয়তার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল, আমার কল্পিতা বিরহিনী যখন অতি নিকটে চকিত চাহনী বা চঞ্চল পদক্ষেপে তাহার আভাস দিতে লাগিল তখন ভয়ে বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিলাম—ভাবিলাম এ কী হইল। এমন ত কথা ছিল না।

বেশ অলসভাবে চলিতেছিলাম হঠাৎ বাধা পাইলাম। দিনের পর দিন যখন ইজিচেয়ারে বসিয়া বাহিরে ও ভিতরে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকাইয়াছি কে জানিত একটি শঙ্কিত চিত্ত অতি মনোযোগের সহিত আমার প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গী লক্ষ্য করিয়াছে; যখন গান ধরিয়াছি কে জানিত আমার সেই অসুর-সুরে একটি 'চঞ্চল' হৃদয় আন্দোলিত হইয়াছে। সন্ধ্যা হাওয়ায় আমার উতলা ঘরের কোণে বসিয়া যখন হতাশ্বাস হৃদয়ে বাতায়ন-পথে দূর-দিগন্তে প্রেয়সীর সন্ধান করিয়াছি তখন কে জানিত

আমার অতি নিকটে তাহারই চারু চরণের ছায়া-মঞ্জীর বাজিয়াছে। যখন তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছি—

—মনে আছে সে কি সব কাজ, সখি,
ভুলাইছ বারে বারে—
বন্ধ দুয়ার খুলিছ আমার,
কঙ্কণ ঝঙ্কারে।
ইসারা তোমার বাতাসে বাতাসে ভেসে
ঘুরে ঘুরে যায় মোর বাতায়নে এসে,
কখনো আমের নব মুকুলের বেশে
কভু নব মেঘ-ভারে।
চকিতে চকিতে চল চাহনিতে
ভুলাইছ বারে বারে—

হে আমার সেই অজানা প্রেয়সী কোথায় তুমি? তোমার বিরহে নিরবধি শূন্যতার সীমাশূন্যভাবে আমার সমস্ত ভুবন মরুসম রুক্ষ হইয়া গেছে; যখন আমার গোপন অভিসারিকার উদ্দেশে পাঠ করিয়াছি—

'হে অভিসারিকা, তব বহুদূর পদধ্বনি লাগি,
আপনার মনে,
বাণীহীন প্রতীক্ষায় আমি আজ একা বসে জাগি,
নির্জ্জন প্রাঙ্গণে।
দীপ চাহে তব শিখা, মৌনী বীণা ধেয়ায় তোমার
অঙ্গুলি পরশ
তারায় তারায় খোঁজে তৃষ্ণায় আতুর অন্ধকার
সঙ্গ-সুধারস।'

তখন তাহারই চঞ্চল অঞ্চলের মদির স্নিগ্ধ হাওয়া আমায় স্পর্শ করিয়া বলিয়াছে 'ওগো অন্ধ! প্রেয়সী তোমার এত নিকটে উন্মুখ প্রতীক্ষায় অধীর, আর তুমি কোথায় ব্যর্থ হাহাকার করিয়া ফিরিতেছ?' তখন কে সেই মূক ইঙ্গিত বুঝিয়াছে! সরমার চিঠি যখন আসিত আমি কি জানিতাম যে আর একটি প্রাণী অন্তরালে থাকিয়া তাহা লক্ষ্য করিল; এবং চিঠির প্রত্যেকটি অক্ষর আমার মুখে যে—ছায়াপাত করিত তাহা আর কাহারও হৃদয়কে মথিত করিল! যখন কোনোদিন কোনো কারণে ব্যথিত চিত্তে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতাম একটি স্নেহকর-স্পর্শ দূর হইতে যে আমার কপাল ছুঁইয়া যাইত তাহা কি কখনো বুঝিয়াছি। গোবিন্দ কোনোদিন হয়ত রান্না করিয়া আমার খাবার ঢাকা দিয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে; জানিতাম না যে একজন ব্যগ্র আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে আর মনে মনে বলিতেছে—'ওগো খাও, তোমার ভাত যে শুকাইয়া চাল হইয়া আসিল।' যতক্ষণ আমি না খাইতাম সেও কিছু মুখে দিত না। রাত্রিতে আলোটি জ্বালাইয়া লইয়া যেদিন কিছু লিখিতে বসিতাম এবং ভাবের অভাবে ও মিলের অমিলে কুঞ্চিত ললাটে চুপ করিয়া অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতাম তখন যে একটি নারী-হৃদয় বাণীর দুয়ারে কাতর প্রার্থনা করিতে থাকিত তাহাও ত এতদিন বুঝি নাই; —যখন বুঝিলাম তখন শঙ্কা ও সঙ্কোচে ব্যথিত হইলাম।

প্রথম প্রথম কিছুই বুঝিতে পারি নাই হঠাৎ চমক ভাঙিল সেদিন, যেদিন দেখিলাম আমার bachelor's den-এ কোনোদিক্ দিয়া শত্রু প্রবেশ করিয়াছে। আমার ঘরে অনভ্যস্ত পারিপাট্য লক্ষিত হইল। প্রথমে মনে হইল গোবিন্দ কি সহসা আমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া উঠিল। অফিস যাইবার সময় প্রত্যহ গোবিন্দের কাছে চাবি রাখিয়া যাইতাম—সে ঘর ঝাঁট দিয়া রাখিত, কিন্তু এতকাল ত কই আমার বিছানার উপর বা টেবিলের সঞ্চিত ধূলির দিকে তার নজর পড়ে নাই; তা হইবেও

বা মনিব দিন দিন পুরানো হইতেছে ত। কিন্তু ক্রমশঃ সে ভুল ভাঙিল—দেখিলাম ময়লা চাদর পরিষ্কার হইয়াছে, মশারীর ছিন্ন অংশগুলি তালি সংযুক্ত হইয়াছে, বইগুলি বাঙলা ইংরেজী ক্রমে বেশ শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে; চিঠিগুলি letter pad-এ বা file-এ যথাস্থানে স্থান পাইয়াছে। গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা হইল না পাছে অপ্রিয় কিছু শুনিতে হয়।

কিন্তু এই চকিত আভাস ইঙ্গিতের মাঝে মাঝে কী এক অজানা সুর আমার মনের আনাচে-কানাচে গুমরিয়া ফিরিতে লাগিল; বসন্ত হাওয়া কোন্ দিক্ দিয়া যেন আমার মনে প্রবেশ-পথ পাইয়া তোলপাড় তুলিয়া দিল। যাহার আভাস আভাসে মাত্র পাইয়াছি তাহার সম্পূর্ণ পরিচয়ের জন্য মন ব্যগ্র হইল।

পরিচয় শেষে একদিন ঘটিলও—কেমন করিয়া তাহা বলিব না। মেয়েটি কে, তাহাও নাই বলিলাম। তাহার নাম উমা। সে এত নিকটে কিন্তু এতদিন আভাসে ইঙ্গিতেও তার পরিচয় পাই নাই বলিয়া নিজেকে ধিক্কার দিলাম। —বুঝিলাম কত প্রতীক্ষা, কত শঙ্কিত বিনিদ্র রজনীযাপন ওই ক্ষুদ্র প্রাণীটিকে করিতে হইয়াছে অথচ এত নিকটে থাকিয়াও তাঁহার প্রতি বিমুখ ছিলাম। ধীরে ধীরে কখন কেমন করিয়া যেন আমার গৃহটিকে সে অধিকার করিয়া বসিয়াছে এবং আমার অলক্ষ্যে নিরন্তর আমারই কল্যাণ কামনা করিতেছে। অন্তরালে থাকিয়া আমার যতটুকু পরিচয় উমা পাইয়াছে তাহাতেই এই জন্মবিরহিণী সন্তুষ্ট; সে যে এতদিন শুধু তার বাঞ্ছিতকে দেখার আশায় ব্যর্থ জীবন যাপিতেছিল—এতদিনে কি তাহার প্রিয়তম আমারই মূর্তি ধরিয়া তাহাকে উপহাস করিল। তাহার অদৃষ্টদেবতা তাহাকে উপহাস করিল কিনা জানি না কিন্তু আমার দেবতা আমার সঙ্গে নিদারুণ পরিহাস করিলেন; মনের কোণে কোণে দখিনা হাওয়া বহিতে শুরু করিলেও ত্রস্ত হইয়া উঠিলাম—ভাবিলাম, এ কী!

উমা তাহার দৈনন্দিন কাজের অবকাশে আমার ঘরটিকে পরিপাটি করিয়া সাজাইয়া রাখিত। বিছানা টেবিল ঝাড়িয়া বই গুছাইয়া কিছুতেই যেন তাহার তৃপ্তি হইত না। সে আমার আর সরমার একসঙ্গে তোলা ফোটোখানি প্রতিদিন নামাইয়া ঝাড়িয়া রাখিত। আমার কবিতার খাতা আর letter -pad-এর দিকে তার লোভ ছিল বেশী; সে কবিতার পাতা হইতে কবিজনোচিত অজানা প্রেয়সীর উদ্দেশে কবিতাগুলি নকল করিয়া লইয়া বিনিদ্র রজনীর খোরাক সংগ্রহ করিত এবং সরমার চিঠিগুলি এমন লোলুপ আগ্রহে পাঠ করিত যে দুই একদিন তার সময়-সম্বন্ধে জ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে এবং সে ধরা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গিয়াছে।

চিরবিরহিণীর ব্যর্থ জীবন এমনি করিয়া রূপেরসে ভরিয়া উঠিতেছিল; তাহার শুষ্ক মরুময় জীবন কখন অলক্ষ্যদেবতার কৃপা-বরিষণে শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিল—উমা একদিন সহসা অনুভব করিল যে, জীবন সুখের, বাঁচিয়া থাকা ভগবানের অসীম অনুগ্রহ।

বাহিরে আমার আজকাল কোনো বন্ধন নাই, বন্ধুবান্ধব সকলকে ছাড়িয়াছি; আমার বাড়ীর আসরও আর জমে না। আমি কেমন যেন অনামনস্ক হইয়া পড়িতেছিলাম। পতঙ্গভুক গুল্মেরা যেমন আগে তাহাদের শিকারকে বেশ করিয়া লালাসিক্ত করিয়া পরে ধীরে ধীরে পরিপাক করে আমার এই আবাসভূমি আমাকে তেমনি সিক্ত করিয়া আনিতেছিল—আমি আপনার রচিত জালে আপনিই জড়িত হইয়া পড়িতেছিলাম।

অত্যন্ত ব্যথিত কাতর হৃদয়ে অফিস যাইতাম আর তিনটা বাজিবার পর হইতেই বাড়ী ফিরিবার জন্য মন কেমন করিত, চঞ্চল হইয়া উঠিতাম। মাঝে মাঝে মনে হইত এ কী দ্বিতীয় 'ক্ষুধিত পাষাণে'র অভিনয় নাকি? এখানকার বাড়ী পাষাণ না হইয়া না হয় চূণকাম করা ইষ্টকই হইল কিন্তু এ যে দেখি আমাকে পাইয়া বসিয়াছে। আমার অদৃশ্যবন্দিনীরা বাদশাজাদী নন—বাঙ্গালী ঘরের একটিমাত্র দুঃখিনী মেয়ে, কিন্তু হৃদয়ের খেলার আকর্ষণ বিকর্ষণে বাদশা-জাদীদের চেয়ে যে কম যান তাহা ত মনে হয় না।

বাড়ীর বাহির হইলেই আমি অহরহ কানের কাছে একটা দীর্ঘশ্বাস শুনিতে পাইতাম, বুকের কাছে কার যেন উত্তপ্ত নিশ্বাস অনুভব করিতাম। কে যেন অতি কাতর করুণ সুরে নিরন্তর বলিতে

থাকিত, "ওগো সময় যে বড় অল্প, তুমি কেন দূরে দূরে ফিরিতেছ, আমি যে পথ চাহিয়া আছি।" আমি সমস্ত কাজ ফেলিয়া প্রায় উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতাম। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাড়ীতে আসিয়া চেয়ারটি লইয়া বসিয়া ব্যাকুল আগ্রহে কাহার যেন আগমন-প্রতীক্ষা করিতাম; বসিয়া বসিয়া যতদূর সম্ভব 'দরদ' দিয়া গাহিতাম—

'ওগো সুন্দর ওগো মধুর
পথ বলে দাও পরাণ বঁধুর
সব আবরণ তোল তোল।'

তখন 'পরাণ-বঁধূ' অতি নিকটে স্তব্ধ হইয়া মনে মনে বলিত, 'ওগো এই তো আমি আছি।' আমার অপরিচিতাকে উদ্দেশ করিয়া যখন পড়িতাম—

'পথ বাকী আর নাই ত আমার চলে এলেম একা,
তোমার সাথে কই হ'ল গো দেখা—'

অমনি দ্বারান্তরালবর্ত্তিনী হয়ত বলিয়া উঠিত 'ওগো এখনো কি তোমার দেখা শেষ হয় নাই।'

এমনি করিয়া ধীরে ধীরে অলক্ষ্য যখন লক্ষ্যের মধ্যে আসিতে লাগিল, পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয় অপরিচয়ের শেষ অন্তরালটুকু যখন প্রায় সরি সরি করিতেছিল এমন সময় সহসা চমক ভাঙিল, ভাবিলাম, এ কি করিতেছি। এই লুকোচুরি এই অলক্ষ্য আবেদন-নিবেদনের শেষ কোথায়? শৃঙ্খলবদ্ধ আমি, উমাকে দিবার আমার কি আছে। আর এই যে ব্যবধান, ইহার অবকাশে হয়ত স্বপ্ন বা কাব্য রচনা করতে পারি, কিন্তু দূরত্ব যখন দূর হইয়া প্রাণের সঙ্গে প্রাণের পরিচয় ঘটিবে তখন কি পঙ্কিলতার ধিক্কারে জীবন ধিকৃত হইবে না? এই যে সামান্য ব্যবধান ইহা ঘুচাইবার অধিকার তো আমার নাই। আমি দূর হইতে অন্তরালবর্ত্তিনীকে আমার প্রাণের একান্ত অনুরাগ জ্ঞাপন করিব, কিন্তু মুখোমুখি আমার কথা তো ফুটিবে না।

আমি যেন কোনো আঘাত পাইয়া মূর্চ্ছাহত হইয়া পড়িয়াছিলাম—মূর্চ্ছাভঙ্গে আঘাতের বেদনায় পীড়িত হইতে লাগিলাম। নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়া থাকিয়া আর একটি ব্যথিত অসহায়া প্রাণীর অন্তরের গোপনবারতা পাইতেছিলাম। আমার সমস্ত দেহ-মন শিহরিয়া উঠিতেছিল। আমি তাহাকে উদ্দেশ করিয়া মনে মনে বলিলাম—'ওগো আমি যে নিরুপায়, আমাকে যে যাইতেই হইবে। তোমার স্নেহ-বন্ধন আমাকে দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়াছে এবং এই বন্ধন অটুট রাখিবার জন্যই আমাকে দূরে যাইতে হইবে, তুমি এই অসহায়কে ক্ষমা করিও—'

পরদিন সকালে বাড়ী ছাড়িবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলাম, উমা কি কাজে যাইতেছিল তাহার হাত হইতে ঝন্-ঝন্ করিয়া কি যেন পড়িয়া গেল। আমি বুঝিতে পারিলাম—সে বজ্রাহতের মতো বসিয়া আছে, সকলের খাওয়া হইল কি না সে দেখিল না, দিনের কাজে আজ আর সে কাহাকেও সাহায্য করিতে ছুটিল না। সে মনে-মনে বিনাইয়া-বিনাইয়া বলিতে লাগিল, 'ওগো কৃপণ, এতটুকু দিতেও তুমি কুণ্ঠিত হইতেছ! দিনান্তে শুধু তোমাকে একবার দেখিতাম তাহাও কি তোমার সহিল না। ভীরু আমি কি জানি না তুমি কেন যাইতেছ, এই দুর্ব্বল নারীর কাছ হইতে পলায়ন করা ছাড়া কি তোমার কোনো পথ ছিল না! ওগো আমি তোমার কাছ হইতে দূরে দূরে থাকিব, আমার অস্বস্তিটুকু পর্য্যন্ত তুমি কোনোদিন অনুভব করিতে পারিবে না, শুধু তুমি থাকিয়া যাও!' হায় অসহায়া নারী!

প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। বই গুছাইতে গুছাইতে আমার কবিতার খাতা হইতে একটি চিঠি মাটিতে পড়িল। দেখিলাম আমাকেই লেখা চিঠি—উমা লিখিয়াছে। ভিতরে শুধু একটি লাইন লেখা—'ওগো তুমি যেও না'—কোনো স্বাক্ষর নাই। জিনিষ গোছানো, বাঁধা ছাঁদা আমার কাছে বিষবৎ মনে হইতে লাগিল, কিন্তু তবু যাইতে হইবে। শঙ্কিত হস্তের তিনটি অক্ষরে হৃদয়ের যে ভাষা ওই অসহায়া আমাকে নিবেদন করিয়াছে—তাহা আমাকে কতখানিই না বলিল। জল-স্থল, আকাশে, বাতাসে আমি ওই করুণ আর্ত্তসুর শুনিতে লাগিলাম—'ওগো তুমি যেও না'।

ধরণী নিরন্তর ব্যগ্রবাহু মেলিয়া মানুষকে ধরিয়া রাখিতে চায়—যুগে-যুগে প্রণয়িনীজন তাহাদের প্রেমাস্পদকে ধরিয়া রাখিতে চাহিয়াছে শুধু এই তিনটি কথা বলিয়া—'ওগো তুমি যেও না।' কিন্তু কেহ কি ধরিয়া রাখিতে পারে? সব বন্ধন পিছনে পড়িয়া থাকে, ব্যর্থ নয়ন-সলিলে ভাসিয়া প্রেমিকা শূন্য হৃদয়ে চাহিয়া থাকে, যে যাইবার সে চলিয়া যায়।

আমাকেও যাইতে হইল।

আবার সোরগোল পড়িল। গাড়ীবন্দী করিয়া জিনিসপত্র লইয়া উঠিয়া গেলাম; অন্তরালবর্ত্তিনী উমার বিমর্দ্দিত বুকে আর আমার ছিন্ন হৃদয়ের কোণে কি ঘটিল সে ইতিহাস নাই বলিলাম।

আবার নূতন ভাড়াটে আসিল, উমা একবারমাত্র তাহার শান্ত আয়ত চোখ দুটি মেলিয়া দেখিল, তারপর—

* * *

আমার গল্প আরো কতদূর চলিত বলিতে পারি না, হঠাৎ সামনের খোলার বাড়ীতে একটা হৈ চৈ রব উঠাতে চমকিয়া উঠিলাম। দেখিলাম, রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে, অতি প্রত্যূষে বাড়ী ছাড়িতে হইবে বলিয়া স্বপ্ন ও বাস্তব ভুলিয়া ঘুমের চেষ্টা দেখিতে লাগিলাম।

১২ বর্ষ, পৌষ ১৩৩২



ফুল-দোল

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

এক

শুনিয়াছি, পূর্ব্বে নাকি সেখানে নীলের চাষ-আবাদ চলিত। এখন সেস্থান শাল, তমাল, মহুয়া, হরিতকী, পলাশ ইত্যাদি নানাপ্রকার বৃক্ষলতাদি-পরিপূর্ণ নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। স্মৃতিচিহ্নের মধ্যে, শীর্ণা সিঙ্গারণ নদীটি পূর্ব্বে যেমন ছিল, এখনও তেমনি বনের মাঝে ধীরে ধীরে বহিতেছে। নীল-কুঠীর যে-সব প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় বল-দর্পী বড়-সাহেব বাস করিতেন, সেগুলা এখন জীর্ণ পঞ্জরাস্থি-সম্বল অবস্থায় নতশিরে ধূলায় মিশিতেছে। এবং সাহেবের পরিবর্ত্তে সম্প্রতি সেখানে বহু শৃগালের দল তাহাদের অপ্রতিহত রাজত্ব বিস্তার করিতেছে। উৎপীড়িত এবং উৎপীড়ক, উভয় সম্প্রদায়ের পদধূলি বক্ষে ধরিয়া লাল কাঁকরের যে প্রশস্ত পথখানি তাহারই পাশে নির্ব্বিকার মহাদেবের মত ধূলিশয্যা রচনা করিয়া পড়িয়াছিল,—সে যদিও আজ প্রকৃতির করুণায় আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তথাপি কচি দূর্ব্বাঘাসগুলি তাহার রক্ত-রাঙা বুকের উপর বাঁচিয়া থাকিতে পারে নাই। কত শত নিরীহ শ্রমজীবীর রক্তে রাঙা এই পথরেখা,—নীলকুঠির বহুবিধ অনাচার-অত্যাচারের কাহিনী আজিও স্মরণ করাইয়া দিবার নিমিত্ত সবুজের গায়ে রক্ত-নিশান উড়াইয়া বাঁচিয়া আছে!

সেদিন অপরাহ্নে এক সাঁওতাল যুবক পুন্‌কা, এবং এক সাঁওতাল-যুবতী সুখী, ফুল তুলিবার জন্য এই বনে আসিয়া প্রবেশ করিল। নিকটস্থ একটা কয়লা-কুঠীর কুলি-ধাওড়া হইতে তাহারা আসিয়াছে। আগামীকল্য তাহাদের বসন্তোৎসব আরম্ভ হইবে এবং সেইজন্য তাহারা আজ হইতে পুষ্প-চয়নে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সম্মুখে নীল-কুঠীর ভাঙ্গা দেওয়াল বাহিয়া নাম-না-জানা কি একটা বন-লতার গাছ উঠিয়াছে এবং ফুলে-ফুলে সারা দেওয়ালটাকে ছাইয়া ফেলিয়াছে,—এমন কি, গাছের পাতাগুলি পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না। সেদিকে সুখীর নজর পড়িতেই, সে তাড়াতাড়ি সেইখানে ছুটিয়া গিয়া, হাত হইতে প্রথমে তাহার বাঁশের ঝুড়িটা নামাইল এবং মুগ্ধনেত্রে সেই গোলাপী রঙের ফুলগুলির পানে কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। এদিকে ঠিক এই সময়টায় পশ্চিমদিগন্ত হইতে সূর্য্যাস্তের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা গাছের ফাঁকে ফাঁকে এই পুষ্প শোভিত ভগ্ন প্রাচীরেব উপর প্রতিফলিত হইয়া স্থানটাকে আরও মনোরম করিয়া তুলিয়াছিল। সসঙ্কোচে ফুলের একটি গুচ্ছ তুলিয়া লইয়া, ধীরে-ধীরে সুখী তাহার খোঁপায় গুঁজিল। ভাবিল, সব ফুলগুলা তুলিয়া এখনই তাহার ঝুড়িটা ভর্ত্তি করিয়া লইবে কিনা। নিষ্ঠুরভাবে তাহাদিগকে ছিঁড়িয়া লইয়া গাছটাকে একেবারে হতশ্রী করিয়া দিতে সে যেন একটুখানি সঙ্কোচবোধ করিতেছিল। যৌবন-বেদনাময় সুন্দরীর বুকের তলায় কোথায় যেন ব্যথা বাজিতেছিল।

ডানদিকের ঝোপের ভিতর পাতার ভিড় ঠেলিয়া, পুন্‌কা তখন অন্য ফুলের সন্ধানে প্রবেশ করিয়াছে। সুখী একবার সেইদিক পানে তাকাইয়া দেখিল, ঘন পত্র পল্লবের ভিতর সে যে কোন্‌খানে অদৃশ্য হইয়া গেছে, দেখিতে পাওয়া যায় না। ভাবিল, পুন্‌কা ফিরিতে না ফিরিতে এই সুন্দর ফুলগুলি দিয়া সে যদি তাহার ঝুড়িটা ভর্ত্তি করিয়া লইতে পারে, তাহা হইলে সে হয়ত অবাক হইয়া যাইবে।

সুখী একটি একটি করিয়া ফুলগুলি তুলিয়া তাহার ঝুড়িতে ফেলিতে লাগিল। কিন্তু একটা মধুমক্ষিকা ফুলের থোপার ভিতর কোথায় লুকাইয়াছিল,—পট করিয়া তাহার হাতের একটা আঙুলে হুল বিঁধিয়া দিতেই সুখী চমকিয়া উঠিল।

উঃ। বলিয়া হাতের আঙুলটা চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল, পুন্‌কা, ও পুন্‌কা।...

পুন্‌কা বেশী দূরে যায় নাই। অনতিদূরে একটা ঝুম্‌কা গাছে ফুল ফোটে নাই বলিয়া তাহার তলার মাটিটা খুঁড়িয়া দিয়া সেখানে জল দিবার ব্যবস্থা করিতেছিল। ইহা তাহাদের উৎসবের একটা রীতি। আজ ফুল তুলিতে আসিয়া যদি কোনও বন্ধ্যা গাছ কাহারও নজরে পড়ে,—যদি দেখা যায় কোনও অযত্ন-বর্দ্ধিত গাছে ফুল ফুটে নাই, ফল ধরে নাই, তাহা হইলে তাহার তলার মাটি ভালো করিয়া খুঁড়িয়া দিয়া, তাহাতে জল সেচন করিতে হয়।

হঠাৎ সুখীর ব্যাকুল আহ্বান কানে যাইতেই, হাতের কাজ ফেলিয়া পুন্‌কা বৃক্ষ-লতাদির অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিল।

অস্ত-সূর্য্যের কনক-কিরণপাতে সুখীর নিটোল-সুন্দর কালো মুখখানি হিঙুল-বরণ হইয়া উঠিয়াছিল। বনফুল সৌরভের স্নিগ্ধ আমেজে স্থানটা একেবারে মশগুল হইয়া উঠিয়াছে। পুন্‌কা আনন্দাতিশয্যে কহিয়া উঠিল, ই রে বাপ্‌!... ই যে মেলা ফুল সুখী! ...বাঃ! ...অ্যাঁ! ই কি, তুঁই অমন করছিস যে? হাতে তোর কি হ'ল? বলিয়া পুনকা তাড়াতাড়ি তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিতেই সুখী বলিল, মোধ্‌ মাছিতে বিঁধে' দিলেক্‌। —উঃ!

কই দেখি? বলিয়া পুনকা ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিল, ডান হাতের একটা আঙুল সঙ্গে সঙ্গে ফুলিয়া উঠিয়াছে।

পায়ের তলার একমুঠা দুর্ব্বাঘাস ছিঁড়িয়া লইয়া পুন্‌কা জোরে-জোরে সুখীর বেদনার্ত্ত অঙ্গুলির উপর ঘসিয়া দিয়া বলিল, বাস্‌! আর কিছুই করতে হবেক্‌ নাই—এখনই ভাল হঁয়ে যাবেক্‌! —লে, বোস্‌ এইখানে।

ধীরে-ধীরে সুখীর গলা জড়াইয়া একটা গাছের তলায় ঘাসের উপর তাহারা পাশাপাশি বসিয়া পড়িল।

সুখী তাহার মাথাটা পুন্‌কার বুকের উপর এলাইয়া দিয়া মুখ ভার করিয়া বলিল—হুঁ, বড় জ্বলছে যে!

সুখীর হাতখানা তখনও পুন্‌কা দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়াছিল। এইবার আঙুলটা নিজের ঠোঁটের উপর চাপিয়া ধরিয়া কহিল, না, না,—জ্বলবেক নাই, দ্যাখ তুঁই!

এই বসন্ত সন্ধ্যায় মনে হইতেছিল যেন সমগ্র বনানীর নব যৌবন ফিরিয়াছে! বৃক্ষ চূড়ায় কচি কিশলয়ের উপর সূর্য্যরশ্মি ঝিকমিক করিতেছিল।

নানাবর্ণে চিত্র-বিচিত্র কয়েকটি ছোট পাখী অস্পষ্ট কলরব করিতে করিতে তাহাদের চোখের সম্মুখে উড়িয়া গেল।

পুন্‌কা হঠাৎ বলিয়া উঠিল, ভাল হ'ল!

সুখী তাহার বুকে মাথা রাখিয়া তরুণের বক্ষ-স্পন্দন অনুভব করিতেছিল। কহিল, হুঁ,—আর একটুকু।

কিয়ৎক্ষণ পরে পুন্‌কা সসঙ্কোচে ডাকিল, সুখী!

সুখী ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া কহিল, উঁ।

—কাল ফুল-পরব; লয়?

—হুঁ।

—কাল আমরা খুব ফুর্ত্তি করব, কি বল সুখী? বলিয়া পুন্‌কা ঝুঁকিয়া সুখীর মুখের নিকট নিজের মুখখানা লইয়া গেল।

সুখী ঈষৎ হাসিল মাত্র।

বনের ভিতর হইতে আম্রমুকুল এবং ঘাস-ফুলের তীব্র গন্ধ দম্‌কা বাতাসে ভাসিয়া আসিল।

পুন্‌কা আর একটু বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়া সুখীর হাত দুইটা সজোরে চাপিয়া ধরিল।

ধেৎ। বলিয়া সুখী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। আড়চোখে তাহার দিকে একবার কটাক্ষ

হানিয়া তাড়াতাড়ি তাহার পরিত্যক্ত ফুলের ঝুড়িটার নিকট ছুটিয়া গিয়া বলিল, আয়, পুন্‌কা, ফুল তুলি—না হ'লে রাত হঁয়ে যাবেক।

—হোক কেনে। জোস্তা রাত বেটে। বলিয়া পুনকা ধীরে ধীরে উঠিয়া তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া বলিল, তুই ভারি দুষ্টু। মাত্‌লা হ'লে হয়ত কিছুই বলথিস নাই।

মাত্‌লা তাহাদের স্বজাতি এবং প্রতিবেশী। বয়স বেশী হইলেও তাহার অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল, এবং সেই জন্য সুখীর বাবা তাহারই সহিত সুখীর বিবাহ দিবে স্থির করিয়াছিল কিন্তু সুখীর ইচ্ছা নিঃস্ব হইলেও পুন্‌কাকেই বিবাহ করে, তাই মাত্‌লার নাম শুনিয়া সুখী রাগিয়া উঠিল। একটা ফুলের থোপা পুন্‌কার গায়ে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, হাঁরে, খাল্‌ভরা!—উহার নাম করবি ত' এই আমি চল্লম্।

সুখী সত্যসত্যই অভিমান করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। পুন্‌কা বলিল, যা কেনে, তুখে কে লেহর্ করছে।

সুখী কিয়ৎদূর চলিয়া গেলে, পুন্‌কা জোরে বলিল, একা যাস না সুখী, ভালয় ভালয় বলছি—শিয়াল খেপেছে, কামড়াঁই দিবেক্।

সুখী পিছন ফিরিয়া বলিল, আমাকে কামড়াবেক, বেশ করবেক, —তুর কি?

না, না, মিছে করে' বললম সুখী, আয়—রাগ করিস না, ছি! বলিয়া পুন্‌কা দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে ধরিল। সুখী তাহার হাতখানা ছাড়াইয়া লইয়া অভিমানভরে কহিল, যা তুকে আব ভাল লাগে নাই। আমি যাব।

পুন্‌কা আবার তাহাকে চাপিয়া ধরিল। সুখী জোর করিয়া ছাড়াইবাব চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না।

পুন্‌কা হাসিয়া বলিল, তুঁই আমার জোর্‌কে লারবি সুখী, কেনে মিছে টানাটানি করছিস। চল চল আর বলব নাই।

সুখী একবার ঈষৎ হাসিয়া বলিল, হঁ—কিস্‌কে!

তাহার পর উভয়ে আসিয়া তাড়াতাড়ি ফুলে ফুলে ঝুড়িটা বোঝাই করিয়া লইল। সুখীর মাথায় ঝুড়িটা দিয়া বনপথ ধরিয়া তাহারা ধাওড়ার দিকে ফিরিল।

নির্ম্মেঘ নির্ম্মুক্ত নীল আকাশ বাহিয়া পূর্ণিমা সন্ধ্যায় জ্যোৎস্নার ধারা গলিয়া গলিয়া পড়িতেছিল। ...পশ্চাতে তন্দ্রাভিভূত বনানী পড়িয়া রহিল।

বন পার হইয়া কতকগুলা বাঁশ ঝোঁপের ধারে ধারে তাহারা পাশাপাশি চলিয়াছে।

পুন্‌কা বলিল, আমার ভয় লাগে সুখী, কাল তুর বাবা হয়ত মাত্‌লাব সাথে তুর বিয়ার ঠিক করবেক। উয়ার চাষ আছে, পাঁচ-ছ বিঘা জমি আছে, পঁচিশটা মুরগী আছে। আমার ত উ সব কিছুই নাই। আমি যে বড় গরীব সুখী, তাপেই ভয় লাগে।

সুখী কিছুই বলিল না। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস তাহার বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল। কথাটা চাপা দিবার জন্য দূরে একটা শৃগাল দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, —হঁ দ্যাখ্ একটা শিয়াল।

তাহার পর উভয়েই নীরবে পথ চলিতে লাগিল।

নিস্তব্ধ প্রান্তরের উপর দুই জোড়া পদশব্দ ব্যতীত আর কিছুই শোনা যায় না। রহিয়া রহিয়া দূরে কুলি-ধাওড়া হইতে একটা মাদল বাজিয়া উঠিতেছিল।

একটা পথের বাঁকে আসিয়া পুন্‌কা বলিল, তা হলে আমি যাই।...

—হঁ, যা।

—কাল ঠিক আসব।

—হঁ, আসিস।

দু'জনা দুই পথ ধরিল।

কয়েক পা অগ্রসর হইয়া, পুনকা মুখ ফিরাইতেই দেখিল, সুখীও তাহারই দিকে তাকাইতেছে! উভয়েই ফিকফিক করিয়া ঈষৎ হাসিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া চলিয়া গেল। আর কেহ কাহারও পানে তাকাইল না।

দুই

পুনকা ধাওড়ায় ফিরিয়া যে ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করিল, তাহা বেশ ভাল বোধ হইল না। দেখিল, তাহাদের কুটীরের দরজায় তাহার বৃদ্ধ পিতা চুপটি করিয়া বসিয়া আছে,—তাহার ডান-পায়ের হাঁটুর উপর কি একটা গাছের কতকগুলা পাতা বাঁধিয়া পুরু করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং পুন্‌কার বৃদ্ধ মাতা তাহার পার্শ্বে বসিয়া আহতস্থানে ধীরে ধীরে আগুনের সেক দিতে সুরু করিয়াছে। ইহারই মধ্যে এমন কি ব্যাপার ঘটিয়া গেল, জানিবার জন্য কৌতূহল জাগিতেই তাহার মা বলিয়া উঠিল—তুর দায়ে বুড়া বাপ মার খেঁয়ে খেঁয়ে মরুক, আর তুঁই যা খুসী তাই কর।

—কেনে, কি হল?

পুন্‌কার পিতা তাহার দিকে তাকাইয়া কহিল—সেই কাবলিওয়ালা এসেছিল—চারটি টাকা পাবেক, তাথেই—

—তাথেই তুখে ঠেঁঙাই দিয়ে গেল নাকি।

—হঁ কি করব বল। তুঁই ঘরে ছিলি নাই।

পুন্‌কা বিষণ্ণবদনে চৌকাঠের নিকট দাঁড়াইয়া সেই নিষ্ঠুর কাবুলিওয়ালার এই নির্ম্মম ব্যবহার দেখিয়া মনে মনে গর্জ্জিতে লাগিল। সে ঘরে থাকিলে হয়ত এই শক্তিসামর্থহীন বুড়ার গায়ে হাত দিতে সে পিশাচের সাহস হইত না।

পুন্‌কাকে এইরূপভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বুড়া বলিল,—ভেবে আর কি হবেক্ পুন্‌কা, যা খাগা যা।

ঘরের এককোণে একটা হাঁড়িতে ভাত রাখা ছিল। পুন্‌কার মা ভাতগুলা একটা বড় থালায় ঢালিয়া দুই ভাগ করিল।

পুন্‌কা বলিল—তুর্ ভাত কই?

—আমার আছে। লে তুরা এগুতে খেঁয়ে লে।—তুর বাবাকে ডাক্। —বলিয়া তাহাদের দুই পিতাপুত্রের ভাতের থালা দুইটা আগাইয়া দিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

তাহার মায়ের তরে ভাত আছে কিনা দেখিবার জন্য পুন্‌কা হাঁড়িটা তুলিয়া দেখিতে গেল, কিন্তু তাহার মা হাঁ হাঁ করিয়া তাহাকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল,—তুরা খা, আমার আছে।

পুন্‌কা বুঝিতে পারিল যে, সে মিথ্যা বলিতেছে; কাজেই আর দ্বিরুক্তি না করিয়া নিজের ভাগের অর্দ্ধেকগুলা ভাত থালায় ফেলিয়া রাখিয়া সে উঠিতে যাইতেছিল। তাহার মা বলিল,—আমার মাথার কিরা পুন্‌কা, —তুঁই সবগুলি খা। তুর্ পেট ভরে নাই।

—হঁ ভরেছে। আমি আর খেতে লাব্‌ব।

—খুব পাববি পুনকা। আমার মাথার কিরা—আমার রক্তে চান্ করিস যদি না খাস্।

পুন্‌কা রাগের ভাণ করিয়া জোরে জোরে বলিয়া উঠিল,—তরকারী নাই, কিছু নাই, নুন দিয়ে আমি অতগলা ভাত গিলতে লারব-লারব-লারব। হ'ল? বলিয়া পুন্‌কা থালাটা সরাইয়া দিয়া উঠিয়া পড়িল।

মাতা-পুত্রের এই দুঃখময় স্নেহের লড়াই দেখিয়া, বৃদ্ধ পিতার মুখের গ্রাস পেটে যাইতেছিল না। কিন্তু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাধ্য হইয়া পেটের দায়ে ভাতগুলা গিলিতে লাগিল।

দৈন্য-প্রপীড়িত তাহাদের ক্ষুদ্র সংসারের কথা ভাবিতে ভাবিতে পুনকা সন্ধ্যা-রাত্রেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বুকভরা বেদনা লইয়া পরদিন প্রত্যূষে সে তাহার মলিন শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিতেই দেখিল, তাহার বৃদ্ধা মাতা শেষ রাত্রে উঠিয়া ইহারই মধ্যে কখন তাহাদের কুটীর এবং তাহার অঙ্গনটুকু

অতি সুন্দরভাবে ঝাঁটা দিয়া পরিষ্কার করিয়া, গোবরের নাত দিয়া তাহার উপর কয়েকটি ফুল ছড়াইয়া রাখিয়াছে।

হাঁটুর উপর হাত দুইটা সংবদ্ধ করিয়া পুন্‌কা বসিয়া বসিয়া একদৃষ্টে উঠানে ছড়ান ফুলগুলার দিকে তাকাইয়া রহিল। আজ তাহাদের উৎসবের দিন!... কিন্তু পেটে যাহাদের দু বেলা দুমুঠা অন্ন পড়ে না, তাহাদের আবার উৎসব কিসের? সে তাহার বৃদ্ধ পিতার নিকট শুনিয়াছে—তাহারা যখন সংঘবদ্ধ হইয়া বনে জঙ্গলে, পাহাড়ের ধারে বাস করিত, যখন তাহাদের পাতার কুটীরে অভাব অনটন ছিল না, তখন তাহারা এতখানি সভ্য হইতে পারে নাই, এবং যখন তাহাদিগকে সামান্য অর্থের দায়ে পড়িয়া পড়িয়া কাবুলিওয়ালার মার খাইতে হইত না, তখন তাহারা সকলে মিলিয়া নাচিত, গাহিত, উৎসব করিত। অর্দ্ধভুক্ত ক্ষুধার্ত্ত পুন্‌কার মনে হইতে লাগিল, ফুলগুলা তাহার দিকে চাহিয়া উপহাস করিতেছে। ...আজ হয়ত উৎসবে নাচিতে গিয়া তাহার ক্ষীণ দুর্ব্বল পদদ্বয় টলিয়া টলিয়া পড়িবে—গাহিতে গিয়া তাহার ক্ষুৎ-পিপাসা কাতর কণ্ঠে বাক্ করিবে না,—তবু আজ উৎসবের বিড়ম্বনা!... সঙ্গে সঙ্গে সুখীকে মনে পড়িল। আজ তাহার সেখানে যাইবার কথা।...

যদি সুখীর বাবা মাত্‌লার সহিত তাহার বিবাহের সমস্ত ঠিক করিয়া ফেলে তাহা হইলে গায়ের জোরে সুখীকে জয় করিতে হইবে।

ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত ফুলগুলাকে পা দিয়া মাড়াইয়া পুন্‌কা বাহির হইয়া যাইতেছিল। তাহার মা বলিল, —আজ উৎসবের দিনে আর খাদে যেঁয়ে কাজ নাই, পুন্‌কা। কারু কাছে চাল-ডাল ধার-ধোর করে এনে আজকার দিনটা চালাই।

ঘরের ভিতর হইতে তাহার বৃদ্ধ পিতা বলিয়া উঠিল—হাঁ, আর পরবের দিনে গুষ্টিসুদ্ধ কাবেলের মার খা।

পুন্‌কা হন্‌হন্ করিয়া সোজা খাদের দিকে চলিয়া গেল।

তিন

বেলা তখন প্রায় একটা। কিন্তু খাদের নীচে বুঝিবার উপায় নাই, বেলা একটা, কি রাত্রি একটা। চারিদিকে গভীর অন্ধকার থমথম করিতেছে—মাত্র যে-সব স্থানে কুলিরা কাজ করিতেছিল, সেই সব জায়গায় এক একটা কেরোসিনের ডিবে, মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে। উহাতে আলো হওয়া অপেক্ষা বরং পার্শ্বস্থ অন্ধকারটা বেশ ভালো করিয়া জমাট বাঁধিয়াছে।

আজ 'পরবে'র দিনে অধিকাংশ সাঁওতাল কুলি-কামিনেরা কাজ করিতে আসে নাই। কাজেই খাদের নীচে গোলমাল কিছু কম। পুন্‌কা যেখানে কয়লা কাটিতেছিল, সেখানে গোলমাল একপ্রকার নাই বলিলেই হয়। তাহার সহিত আরও দুই জন বাউরী কুলি কাজ করিতেছিল।

পুন্‌কা দেখিল, সেই সকাল হইতে প্রাণপণে কয়লা কাটিয়াও তাহার রোজ্‌গার এখনও পাঁচ আনার বেশী হয় নাই। অথচ, সকাল হইতে না খাইয়া এইটুকু পরিশ্রমেই তাহার হাত দুইটি কেমন যেন অবশ হইয়া আসিতেছে,—কাজ করিতে তেমন মন সরিতেছে না। যদি কোনও রকমে বৈকাল পর্য্যন্ত খাটিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে হয়ত একটা টাকা রোজগার করিবে—কিন্তু তাহাতেও ত তাহার কিছুই হইবে না। অতি কষ্টে তাহাদের তিনটি প্রাণীর দু'বেলা খাওয়া চলিতে পারে। কিন্তু সেই কাবুলিওয়ালা? কথাটা ভাবিতেই তাহার বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। —কাল তাহার বৃদ্ধ পিতাকে সে মারিয়া গেছে,—আজ হয়ত তাহার বুড়ী মায়ের গায়েও হাত তুলিবে। এতক্ষণ হয়ত তাহারা কাহারও বাড়িতে চারিটি চাউল ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছে কিংবা হয়ত—

আজ না উৎসবের দিন! কথাটা ভাবিতেও তাহার কষ্ট হইতেছিল। হাতের কয়লা-কাটা গাঁইতিখানা এক পার্শ্বে নামাইয়া রাখিয়া, পুন্‌কা তাহার ক্লান্ত অবসন্ন শরীর লইয়া একটা কাটা কয়লার চাপের উপর বসিয়া পড়িল। পাতাল-গহ্বরের সেই বিভীষিকাময় গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে শুষ্ক কঠিন কয়লাস্তরের গায়ে গায়ে নানা-রঙের নানা-জাতীয় ফুল যেন নিমেষেই ফুটিয়া উঠিল। বনমল্লিকা যূঁই

চামেলি চাঁপা করবী ভূমিচম্পা ঝুমকা পলাশ মহুয়া বাবলা—আরও কত কি! ...তাহার মধ্যে আর একখানা কুসুম সুকুমার তরুণীমুখের প্রতিচ্ছবি। সে হয়ত এতক্ষণ চন্দ্রমল্লিকার সাতনলী হার গলায় দোলাইয়া, চামেলী চাঁপায় কবরী বাঁধিয়া, ঝুমকা-ফুলের কর্ণাভরণ এবং বাবলা-ফুলের নাকছাবি পরিয়া, তাহারই আশা-পথ প্রতীক্ষায় অধীর চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আর সে কিনা আজ এই উৎসবের দিনে অন্ধকার মৃত্যু-গহ্বরে বিন্দু বিন্দু করিয়া প্রাণ দিতেছে। তাহার জীবনের সমস্ত সুখ শান্তি হাসি গান উৎসব আনন্দ,—পেটের দায়ে, দুর্ভিক্ষ রাক্ষুসীর প্রবল তাড়নায় কোথায় কোন্ দিক দিয়া যে অন্তর্হিত হইয়া গেছে কে জানে? এ কি বেদনা,—এ কি দুর্ভোগ!...

নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনের জন্য কয়েকটা থালায় ভাত বাঁধিয়া জন দুই-তিন বাউরী কুলী রমণী গান গাহিতে গাহিতে সেইদিকেই আসিতেছিল। অগ্রবর্ত্তিনীর হাতে একটা কেরোসিনের মগ জ্বলিতেছে। কিন্তু পুন্কার জন্য কে-ই বা আনিবে, আর কি-ই বা আনিবে? তাহার মনে হইতেছিল, এই মেয়েগুলার মাথা হইতে একটা থালা কাড়িয়া লইয়া পেট ভরিয়া খায়।

এমন সময় পশ্চাৎ দিক হইতে তাহার আবরণহীন উন্মুক্ত পৃষ্ঠের উপর একটা স-বুট পদাঘাত পড়িতেই পুন্কার স্বপ্ন টুটিয়া গেল। যন্ত্রণায় কাতর হইয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িতে পড়িতে ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিল—কুঠীর ভীমকায় ম্যানেজার সাহেব যমদূতের মত তাহার দিকে কটমট করিয়া তাকাইতেছে। মুহূর্ত্তে তাহার কল্পনার স্বপ্নরাজ্য বাতাসে মিলাইল। উৎসবের আলো-হাসি তাহার চোখের সম্মুখে নিমেষেই যেন 'ফস' করিয়া নিভিয়া গেল এবং সেই পাতালপুরীর আঁধার গুহায় কঠিন কয়লার স্তরগুলা বেশ স্পষ্টতর হইয়া ফুটিয়া উঠিল।

পুন্কা ধীরে ধীরে তাহার পরিত্যক্ত গাঁইতিটা তুলিয়া লইয়া পুনরায় কাজ করিতে আরম্ভ করিল।

সাহেব চলিয়া গেল, কিন্তু এবার তাহার গাঁইতি থামিল না। কঠিন কয়লার উপর তাহার ইস্পাতের গাঁইতিখানা 'খং' 'খং' শব্দে বারে বারে তীব্র আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, —এই খাদের ভিতরে বহুবিধ আপদ-বিপদ, নিরীহ কুলিদিগকে গ্রাস করিবার জন্য ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে, কিন্তু তাহাকে ত গ্রাস করে না! তাহার মত অনেক লোক এই পাতালপুরীতে পেটের জন্য প্রাণ দিয়াছে—এখন তাহাদের মৃত আত্মাগুলা জাগিয়া উঠিয়া, যদি তাহাকে এই অন্ধকারের মধ্যে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া, তাহাদের সঙ্গী করিয়া লয়, তাহা হইলে তাহার বেদনার্ত্ত প্রাণের শত ধন্যবাদে তাহাদিগকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানায়। ...এক মুহূর্ত্তে কি সমস্ত ওলটপালট হইয়া যাইতে পারে না? সে চাহিতেছিল, এমন একটা কিছু, যাহাতে মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রলয়ের সৃষ্টি করে। ভূমিকম্পে সমস্ত বসুধা টলমল করিয়া উঠুক, উপরের গ্রাম নগর লইয়া সমস্ত খাদের চালটা মাথার উপর খসিয়া পড়ুক, খাদের ভিতর আগুন ধরিয়া যাক, অগ্নি-বরণী নাগ-নাগিণীর মত অন্ধকার গুহার মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ ছুটিতে থাকুক! খাদের উপরে—যেখানে জাগ্রত জগতের নর-নারীর মধ্যে সভ্যতা-অসভ্যতার দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ চলিতেছে, যেখানে ধনী-নির্ধনের প্রবল এবং দুর্ব্বলের, উৎপীড়ক এবং উৎপীড়িতের সংঘর্ষ সুরু হইয়াছে,—যেখানে দুর্ব্বলের রক্তে রাঙা প্রবলের বিজয় নিশান, উৎপীড়িতের বুকের উপর প্রোথিত হইয়া আছে, সেখানে গ্রহ তারা চন্দ্র সূর্য সমস্ত নিভিয়া যাক—উল্কাপাতে অগ্নি-বর্ষণ হইতে থাকুক,—তাহার মত উপবাসী গরীবের দল যেখানে তপ্ত ধূলিশয্যায় ছটফট করিয়া তিলে তিলে মরিতেছে, তাহারা একেবারেই মরিয়া যাক!...

পুন্কার হাতের অস্ত্র ঠং ঠং খং খং করিয়া অবিশ্রান্তভাবে কয়লা কাটিয়া চলিতেছিল। মুহূর্ত্ত বিশ্রাম করিবার অবসর নাই—কথা কহিবার সময় নাই। কান দুইটা আগুনের মত গরম হইয়া উঠিয়াছে,—নাক দিয়া উষ্ণ শ্বাস বহিতেছে, সর্ব্ব শরীর ঘর্ম্মাপ্লুত হইয়া উঠিয়াছে!

এদিকে ঠিক এই সময়ে খাদের উপরে উৎসব শুরু হইয়াছিল। ঘরে-বাইরে, পথে-ঘাটে এবং পুরুষ-রমণীর সর্ব্বাঙ্গে ফুলের ছড়াছড়ি। বর্ণে গন্ধে হাসিতে গানে আমোদে আহ্লাদে, তাহারা যেন দেহ-মনের সমস্ত গ্লানি আজ ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছে। গাছে গাছে ফুলের

দোল্‌না টাঙাইয়া পুরুষ-রমণী দুলিতেছে—ছেলেমেয়েরা পুষ্পাভরণে ভূষিত হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে—সুবিন্যস্ত-কবরী যুবতীগণ ফুলের গহনা পরিয়া হেলিয়া দুলিয়া গান ধরিয়াছে। যুবকগণ কর্ণমূলে কণ্ঠে ফুলের মালা দুলাইয়া আড়বাঁশীতে বেহাগের বেদনা সাধিতেছে। সকলের নৃত্য-গীত আনন্দ-কলরব যেন সপ্তমে চড়িয়াছে,—আজ যেন তাহারা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়া পৃথিবীর সমস্ত রস সমস্ত সৌন্দর্য শোষণ করিয়া লইবে, কাহারও কোন ক্ষুধা আজ অতৃপ্ত থাকিবে না।

সুখীর বাবা আজ মাত্‌লার সহিত তাহার বিবাহের সমস্ত আয়োজন করিয়াছিল। মাত্র সুখীর একটুখানি সম্মতির অপেক্ষা। সে কিন্তু ইতস্ততঃ করিতেছিল। কারণ পুন্‌কা যে এখনই আসিয়া উপস্থিত হইবে, সে-সম্বন্ধে তাহার কোন সংশয় ছিল না। সুখী জানিত পুন্‌কা আসিয়াই মাত্‌লার হাত হইতে তাহাকে জোর করিয়া ছিনাইয়া লইয়া যাইবে,—সেও আর কোন কথা না বলিয়া তাহার সহিত উধাও হইবে। এ বিবাহ সে কখনই হইতে দিবে না। পয়সা না থাকুক, পুন্‌কার গায়ের জোর ত আছে! একটা আম-গাছের তলায় বসিয়া সুখী এইসব কথাই ভাবিতেছিল। কয়েকজন যুবতী অনেকক্ষণ হইতে তাহাকে সেখান হইতে উঠাইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু কেহই তাহাকে উঠাইতে পারিল না—গালাগালি খাইয়া সকলকে ফিরিয়া যাইতে হইল।

এদিকে সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায় অথচ পুন্‌কা আসে না। সুখী মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। এতদিন ধরিয়া তাহাদের এত কথা হইল, এত প্রতিশ্রুতি, এত ভালোবাসা, এসব কি তবে কিছুই নয়! এতকাল ধরিয়া কি পুন্‌কা তাহার সঙ্গে মিথ্যা অভিনয় করিয়া আসিয়াছে! কিন্তু সে-কথা সে বিশ্বাস করিবে কেমন করিয়া? ক্রমে পুন্‌কার উপর তাহার যেন একটু একটু রাগ হইতেছিল। মনে হইতেছিল, দুই হাত দিয়া তাহার নিজের চুলগুলা ছিঁড়িয়া ফেলে, ফুলের গহনাগুলা টানিয়া ছিঁড়িয়া পায়ে দলিয়া এখান হইতে পলাইয়া যায়! ক্ষণে ক্ষণে চারিদিকে তাহার ব্যগ্র ব্যাকুল দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া সুখী পুন্‌কার সন্ধান করিতেছিল, কিন্তু প্রতিবারেই সে দৃষ্টি মাত্‌লাব উপর পড়িয়া যেন চাবুক খাইয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। এই উৎসব-ক্ষেত্রের মধ্যে তাহার পরিচিত অপরিচিত সকলেই আছে, শুধু সে যাহাকে চায়, সে নাই!

উৎসবের উদ্দাম স্রোত ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। পুন্‌কার আসিবার আর কোন আশা ভরসা নাই। মাত্‌লা অধীর হইয়া উঠিয়াছিল,—উৎসবের আনন্দ তাহার আর ভালো লাগিতেছিল না।

সুখীর বাবা সুখীকে একবার যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া গেল।

পুন্‌কার উপর দুরন্ত অভিমানে সুখীর আকণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। সেই উত্তেজনার মুহূর্তে সে আর কোনও কথা ভাবিতে পারিল না,—ধীরে ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া মাত্‌লার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। এইবার সুখীর বাবা ঈষৎ হাসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিল এবং দশজন মাতব্বর যোগমাঝির (দলপতি) সম্মুখে মাত্‌লার হাতে তাহাকে তুলিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

সুখীর শ্বাস-প্রশ্বাস তখন অত্যন্ত দ্রুত বহিতেছে; রাগে উত্তেজনায় তাহার মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কাঁদিতে পারিতেছে না।

মাত্‌লা হাসিতে হাসিতে তাহাকে পার্শ্বস্থ গাছের তলায় বসাইয়া বলিল,—লে, মদ খাই।

মাত্‌লার সঙ্গে বসিয়া উন্মাদিনীর মত সুখী প্রাণপণে মদ গিলিতে শুরু করিল।

এই নিদারুণ দুঃসংবাদ খাদের নীচে পুন্‌কার নিকট না পৌঁছিলেও সে এইরূপ একটা কিছু অনুমান করিয়া লইতেছিল, কিন্তু সে সম্বন্ধে কিছু ভাবিতে পারিতেছিল না। সমস্ত চিন্তার পথ তাহার নিকট আজ রুদ্ধ হইয়া গেছে।

বৈকালের দিকে একে-একে সকলেই খাদ হইতে উঠিয়া যাইতেছিল। পুন্‌কা ভাবিল, তাহার উঠিয়া কাজ নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার শরীরের শেষ রক্তবিন্দুটুকু হিম-শীতল না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে কাজ করিবে!

কিয়ৎক্ষণ পরে, কি একটা কথা মনে হইতেই পুন্‌কা আর ক্ষণ-বিলম্ব না করিয়া, একহাতে

কেরোসিনের 'মগ' এবং অন্য হাতে গাঁইতিটা কাঁধের উপর তুলিয়া লইয়া, ঊর্ধ্বশ্বাসে সেখান হইতে 'চানকের' দিকে ছুটিতে আরম্ভ করিল। ছুটিতে ছুটিতে কিছুদূর গিয়া বাতিটা ফস্ করিয়া নিভিয়া গেল। পুন্‌কা কিন্তু থামিল না, সেই অন্ধকারের মধ্যেই চেনা পথ ধরিয়া আবার ছুটিল। সম্মুখে 'মেন্ গ্যালারির' লাইনের উপর একটা ফাঁকা টব-গাড়ী পড়িয়া ছিল। অন্ধকারে সেটা দেখিতে না পাইয়া পুন্‌কা হুমড়ি খাইয়া তাহার উপর পড়িতেই, ঝড়াং করিয়া গাড়িটা লাইনের উপর সরিয়া গেল। সেও মাথা গুঁজিয়া লাইনের উপর উপুড় হইয়া পড়িল। কোন রকমে ধীরে ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া পুন্‌কা আবার হাঁটিতে লাগিল। নিকটেই খাদের মুখে আলো দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। দু'তিনজন বাউরী কুলি উপরে উঠিবার জন্য 'লিফ্‌ট্-কেজে'র উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। নীচের ঘণ্টাওয়ালা 'কেজ' উঠাইবার ঘণ্টা দিতে না দিতে পুন্‌কা ছুটিয়া 'কেজে' প্রবেশ করিল, ঘণ্টা দিতেই খাদের 'চানক' বাহিয়া কেজ্‌খানা উঠিতে লাগিল।

কাঁধের গাঁইতিটা নামাইয়া, পুন্‌কা একপাশে একটা লোহার শিক্ ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। পার্শ্বস্থিত বাউরী যুবক পুন্‌কার মুখের পানে তাকাইয়া কহিল,—এই পুন্‌কা! তুর কপালে লোহু কিসের?

পুন্‌কা বাঁ-হাত দিয়া কপালটা একবার মুছিয়া লইতেই দেখিল, খানিকটা কাঁচা রক্ত হাতে লাগিয়া আসিয়াছে। বলিল,—উ কিছু লয়। টব্-গাড়ীতে কাটা গেল।

পুন্‌কা অন্যমনস্কভাবে গম্ভীরমুখে 'কেজে'র বাহিরে তাকাইয়া ছিল। কূপ-গহ্বরেব মত চানকের চারিদিকে কয়লা পাথর ও মাটির স্তর ভেদ করিয়া বর্ষাধারার মতই ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতেছে।

কিয়ৎক্ষণ সেইরূপভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবাব পর, তাহাদ্দিগকে লইয়া 'লিফট'খানা ঝড়াং কবিয়া উপবের মুখে আসিয়া লাগিল। সর্ব্বাগ্রে পুন্‌কা বাহির হইল। খাদ-সরকারেব নিকট 'টিপ্' করিয়া সে খাজাঞ্চির নিকট দৌড়িল। সমস্ত দিন অক্লান্ত পরিশ্রমের রোজগার মাত্র একটি টাকা লইয়া পুন্‌কা মাতালের মত টলিতে টলিতে ধাওড়ার দিকে ফিরিতেছিল। বেলাশেষের রক্তিম আলোটুকু ক্রমেই সন্ধ্যার অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছে!

রাস্তার দুইপাশে সাঁওতালদের কুলি-ধাওড়াগুলা দেখিলে মনে হয়, 'পরবে'র জের এখনও বোধহয় থামে নাই। দু'এক স্থানে নাচ-গান তখনও চলিতেছিল।

অদূরে একটা বাগানের পাশে, চারিটা শাল-গাছেব খুঁটি দিয়া ছানলাতলাব মত একটা উৎসব-গৃহ প্রস্তুত করা হইয়াছে। অসংখ্য ঝরাপাতা এবং শুকনা ফুলে সে স্থানটা একেবারে ভরপুর হইয়া আছে। পুন্‌কা চলিতে চলিতে সেইখানে একবাব থমকিয়া দাঁড়াইল। নিকটেই কয়েকজন বাউরী ও কোঁড়া কুলিকামিন মদ খাইয়া হল্লা করিতেছিল।

পুন্‌কা তাহাদের একজনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, —ইখানে কি হঁয়েছিল রে?

—বা, আজ তুদেব পববেব দিনে তুঁই ছিলি কোথা? খাদ্ গেইছিলি নাকি?

পুন্‌কা ঘাড় নাড়িয়া বলিল—হুঁ।

যে-লোকটা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মাতাল হইয়া পড়িয়াছিল, সে টানা টানা সুরে বলিয়া উঠিল—আ, কি আক্কেল রে? মাত্‌লা আজ মদ খাওয়াঁই খাওয়াঁই ভূত করে' দিলেক।

পাশের লোকটাব গায়েব উপর পড়িয়া সে বলিল—আর মদ আছে তো দেনে কেনে উয়াকে একটুকু।

—না, না, একদম নাই মাইরি। দ্যাখ কেনে খালি হঁয়ে গেইছে। —বলিয়া মদের হাঁড়িটা সে একবার নাড়া দিয়া দেখাইয়া দিল।

মদ না খাইয়াই পুন্‌কা টলিতেছিল। বলিল,—না, আমি মদ খাব নাই। মাত্‌লা কেনে খাওয়ালেক রে?

—বা তাও জানিস্ না! সুখীর সাঁথে যে উয়ার বিয়া হ'ল। —বলিয়া লোকটা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কিন্তু এই বিকট হাসির হা হা শব্দ পুন্‌কার বুকে ছুরি হানিল। সে আর তাহাদেব কোন

কথা শুনিল না। বাগানের পথে পথে সে চলিতে লাগিল। কিয়দ্দূর যাইতেই দেখিল, একটা গাছের তলায় আরও কতকগুলা ফুল পড়িয়া রহিয়াছে। সেদিকে তাকাইতে পুন্‌কা হঠাৎ থামিয়া গেল। এ ফুল গতকল্য সন্ধ্যায় তাহারাই নীলবন হইতে তুলিয়া আনিয়াছে!

পুন্‌কার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্মাপ্লুত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার চোখের সম্মুখে যেন বিরাট অন্ধকার থম্ থম্ করিতেছে! পথ নাই, ভাবিবার পর্য্যন্ত কোনও পথ নাই! একবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া, পুনকা ডান-হাতের তর্জ্জনী দিয়া তাহার কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিল। ঘামের সঙ্গে তাহার কপালের খানিকটা রক্ত ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত ফুলগুলার উপর ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু পুন্‌কা সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না। গোলাপী ফুলের উপর কাঁচা খুন্ জমাট বাঁধিয়া গেল। কয়েকটা ফুলের উপর দিয়া সে মাতালের মত টলিতে টলিতে চলিয়া যাইতেছিল। কোমল ফুলগুলা পায়ের নীচে কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল।

কয়েক পা অগ্রসর হইয়া গোটাকতক ঝুম্‌কা ও বাবলা ফুল পুন্‌কা কুড়াইয়া লইল। সে ভাবিল, এই ঝুম্‌কা ফুলটি সে বোধহয় কানে পরিয়াছিল, আর এই বাবলা ফুলটি নিশ্চয়ই তার নাক-ছাবি। ফুলগুলি আপন হাতের মুঠার মধ্যে বেশ করিয়া চাপিয়া ধরিয়া পুন্‌কা কিয়দ্দূর চলিয়া আসিবার পর, তাহার মনে হইতে লাগিল, হাতের মধ্যে সে যেন একমুঠা জ্বলন্ত আগুন চাপিয়া ধরিয়া আছে। ফুলগুলা সে পথের ধারে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। আবার পথ চলিতে চলিতে একটা মর্ম্মভেদী দুঃখ-নিরাশা পুন্‌কার বুকের তলে হা হা করিয়া উঠিতে লাগিল।

উৎসব শেষে সকলেই যেন অতিরিক্ত ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হইয়া চুপ করিয়াছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পুষ্পের সমস্ত সুগন্ধ দক্ষিণ-বাতাসে উড়িয়া গেছে, বাঁশীর সঙ্গীত থামিয়াছে, মাদলের শব্দ নীরব হইয়াছে, হাসির গানের আনন্দ উচ্ছ্বাস আর যেন কিছুই শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না—কাহারও মুখে কথা নাই,—নীরব বিশ্বপ্রকৃতি, আকাশ-বাতাস, সব যেন এ-উহার পানে চাওয়া-চাওয়ি কানাকানি করিতেছে!

ধাওড়ায় ফিরিয়া পুন্‌কা কাহাকেও কোন কথা বলিল না। বৃদ্ধ পিতার পায়ের নিকটে তাহার রোজগারের টাকাটা ছুঁড়িয়া দিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আকাশের পানে তাকাইয়া দেখিল, একটা বিরাট কালো মেঘে চাঁদটাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। রাহুর গ্রাস হইতে যেন তাঁহার আর মুক্তি নাই!

অন্ধকার, শুধু গাঢ় অন্ধকার যেন চারিদিক্ হইতে ছুটিয়া আসিতেছে! কোনও দিকে কোনও পথের সন্ধান পাওয়া যায় না,—এই অন্ধকার আবর্তের মধ্যে দাঁড়াইয়া প্রলয়ের সহিত মুখোমুখি দাঁড়াইয়া থাকা ব্যতীত আর কোন উপায় নাই।

খাঁচার পাখীর মত একটা অশান্ত আক্ষেপ পুন্‌কার বুকের ভিতর গুমরিয়া মরিতে লাগিল।

২৩ বর্ষ, চৈত্র ১৩৩০



রায়রায়ানের দেউল

মনোজ বসু

ক্রোশ-দশেকের ভিতর গ্রাম নাই, দিগন্ত-বিসারী পাক্‌সীর বিল। চৈত্র-বৈশাখেও এখানে-সেখানে পানাভরা জল, খানিকটা বা পাঁক—রাত্রে ঐ সব জায়গায় আলেয়া জ্বলে। তখন মানুষজন কেহ ওদিকে যায় না, যাইবার উপায় থাকে না। সুপারীকাঠের ছোট ছোট নৌকা ও তালের ডোঙা গ্রামের কিনারে ফাঁকায় পড়িয়া পড়িয়া শুকায়।

বর্ষায় ভরা-বিলের আর এক মূর্ত্তি! শোলা, কলমীলতা ও চেঁচো ঘাস জাগিয়া ওঠে; ডোঙা ছুটাছুটি করে হাজারে হাজারে। এ অঞ্চলের লোকের হামেশাই কিল্লাবাড়ির গঞ্জে যাইতে হয়; বিল ঘুলিয়া অতদূর যাইতে হাঙ্গামা অনেক। বর্ষার সময়টা সোজা বিল পাড়ি দিয়া যাওয়ার বড় সুবিধা।

গ্রাম ছাড়াইয়া ক্রোশ-দুই আগাইলে দেখিতে পাইবে, অনেক দূরে জলের মধ্যে সবুজ সুউচ্চ দ্বীপের মত খানিকটা। তার উপর বড় বড় তালের গাছ আকাশ ফুঁড়িয়া দাঁড়াইয়া আছে। আরও আগাইয়া দেখিবে, ঝোপ-জঙ্গল, ঘরের মটকার মত উঁচু মাটির স্তূপ, মানুষে নাগাল পায় না এমনি অজস্র নলবন বাতাসে বাজিতেছে। সামনে পিছনে ডাহিনে বাঁয়ে সাঁ-সাঁ করিয়া জল কাটিয়া ডোঙা ছুটিতেছে ঠক-ঠক করিয়া কাঠের উপর লগির আওয়াজ... দ্রুত গমনশীল মানুষে-মানুষে পলকের জন্য চোখাচোখি....কদাচিৎ দু-এক টুকরা আলাপন। নিঃশব্দতার অতলে কথার ধ্বনি ডুবাইয়া দেখিতে দেখিতে আরোহীগুলি মুহূর্ত্তমধ্যে নলবনের ফাঁকে ফাঁকে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

—আস্তে ভাই, সামাল—পাথরে ডোঙার তলা ফাঁসবে!

তাই তো বটে! নূতন কেহ ডোঙা চালাইতে আসিলে এমন জায়গায় পাথর দেখিয়া চমকিয়া ওঠে।

—পাহাড় নাকি?

—না, রায়রায়ানের দেউল।

বিলের সে দিকটা একেবারে ফাঁকা, একগাছি ঘাসের আগাও নাই। কিন্তু ভোরের দিকে সেখানে গিয়া পড়িলে আর চোখ ফিরাইবার উপায় থাকে না। সাদা বেগুনী লাল রঙের শাপলা ফুলের মধ্যে পথ হারাইয়া বিভ্রান্ত হইয়া যাইতে হয়। জলের মধ্যে বড় বড় পাথরে-খোদা ভাঙা-চোরা কত মূর্ত্তি.. ময়ূরে সাপ ধরিয়াছে—ময়ূরের ঠোঁট আছে, পা নাই... পদ্মফুল—পাপড়িগুলি ভাঙিয়া থ্যাবড়া হইয়া গিয়াছে....হাত ও নাক ভাঙা, উড়ন্ত অপ্সরী অল্প অল্প মাথা জাগাইয়া আছে।

—আহা-হা, এমন দেউল ভাঙল কে গো?

—রায়রায়ান নিজেই।

এই যে ভাঙা দেউল, এখান হইতে অনেক—অনেক দূরে একটি গ্রাম; সে গ্রামের নাম আজকালকার লোকে বলিতে পারে না। একদিন শেষ রাতে সুন্দরী কাঠের ভরা আসিয়া লাগিল সেই গ্রামের ঘাটে। বর্ষার দুর্গম পথ, টিপটিপ বৃষ্টি পড়িতেছে, বাতাস বহিতেছে। সকলে মানা করিল, রাতটুকু নৌকায় কাটাইয়া সকালবেলা বাড়ি যাইও। রামেশ্বর শুনিল না,—সাত দিন আজ বাড়ি ছাড়া, ঘরে তরুণী বউ। আর মা-বাপ মরা ছোট বৈমাত্রেয় ভাইটি। যাবার বেলা বধূর চোখে জল দেখিয়াছিল, অনেক রকম আবদার ছিল তার। নৌকা খুলিয়া দিয়াও সেদিন রামেশ্বর ভাবিতেছিল—কাজ নাই এই কাঠের ব্যবসা করিতে গিয়া, নামিয়া যাই। ভাবনাকুল মনে ছপ-ছপ ছপ-ছপ দাঁড় ফেলিয়া পুরা আটটি দিন ও সাত রাত্রি আগে তারা গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল।..

পিচ্ছিল পথে আছাড় খাইয়া জলকাদা মাখিয়া অনেক দুঃখে অবশেষে রামেশ্বর বাড়ি আসিল। হঠাৎ চমকাইয়া দিবে, এই মতলবে আগে কাহাকেও ডাকিল না, টিপি-টিপি খোড়ো ঘরের দাওয়ায় উঠিল। সবল দুটি বাহু দিয়া নড়বড়ে দরজায় দিবে এইবার প্রচণ্ড ঝাঁকি। ঘুম উড়িয়া গিয়া ঘরের

মধ্যে উঠিবে ভয়ার্ত্ত কোলাহল। তারপর বাহির হইতে পরিচিত উচ্চকণ্ঠের হাসি ফাটিয়া পড়িবে। তারপর দীপ জ্বলিবে। তারপর—

দরজায় ঘা দিতে রামেশ্বর হুমড়ি খাইয়া ঘরের ভিতর পড়িল। খোলা দরজা। কেহ নাই। বউকে আর কি বলিয়া ডাকিবে, অন্ধকারে ভাইটির নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল—মধুকর, মধুকর!

সে রাত্রি কাটিয়া দিন আসিল। এবং মধুকরেরও খোঁজ হইল; জ্ঞাতিসম্পর্কের এক খুড়া তাহাকে বাড়িতে লইয়া রাখিয়াছেন। খোঁজ হইল না কেবল বধূটির, যাবার দিন বড় কান্না কাঁদিয়া যে বিদায় দিয়াছিল। তারপর দু-দিন ধরিয়া গ্রামের মঙ্গলার্থীরা দলের পর দল অফুরন্ত উৎসাহে রামেশ্বরকে সমবেদনা জানাইয়া যাইতে লাগিলেন। বড় অসহ্য হইল। আবার এক রাত্রিশেষে পাঁচ বছরের ভাইটির ঘুম ভাঙাইয়া রামেশ্বর তাহাকে কাঁধে তুলিল, দীর্ঘ লাঠি গাছটি লইয়া তারার অস্পষ্ট আলোকে সাঁকোর উপর দিয়া সে চোরের মত গ্রাম-নদীটি পার হইয়া গেল। মনের ঘৃণায় দেশ ছাড়িয়া গেল।

কুড়ি বছর পরে ঘোড়ায় চড়িয়া লোকজন সৈন্যসামন্ত লইয়া ফিরিয়া আসিলেন রায়রায়ান রামেশ্বর। আজমীরের এক বৃদ্ধ সেনানীর বুকে ছুরি মারিয়া ঘোড়াটি কাড়িয়া আনা; নাম তার কুণ্ডল, —সে কি ঘোড়া!—এক তাল উঁচু, ছুটিবার সময় যেন বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে। এই কুড়ি বছর রামেশ্বর ভাগ্যের সঙ্গে অবিরাম লড়াই করিয়াছেন, কপালের উপর বঙ্কিম বলিরেখায় অবোধ্য অক্ষরে সেই সব দিনের কত কি ভয়ঙ্কর কাহিনী লেখা রহিয়াছে। রায়রায়ান জায়গীর লইয়া আসিয়াছেন. সেই জায়গীরের দখল লইয়া প্রথমেই বাধিল ভরত রায়ের সঙ্গে।

ভদ্রার দক্ষিণ পারে খালের মুখে ভরতগড়। কিল্লাবাড়ি হইতে ফৌজদারের কামান আনিয়া প্রাকারের ধারে বসানো হইয়াছে। প্রথম দু-দিন খুব তোপ দাগা হইয়াছিল। এখন চুপচাপ। ভরত রায়ের লোক প্রাকারের মুখ কাটিয়া দিয়াছে, গড়ের চারিদিক নদীর জলে কানায় কানায় ভর্ত্তি। ভিতরে কি একটা কাণ্ড চলিয়াছে, কিন্তু বাহির হইতে তাহার একবিন্দু আঁচ পাইবার যো নাই।

সে দিন বড় অন্ধকার রাত্রি। রায়বায়ানের ঘুম নাই। শিবির হইতে খানিকটা দূরে ভদ্রার কূলে আপনার মনে পায়চারি করিতেছেন। হঠাৎ খস্-খস্-খস্—রায়রায়ানের কান খাড়া হইয়া উঠিল, কেয়া-ঝাড়ের ভিতরে অতিশয় ক্ষীণ যৎসামান্য আওয়াজ। প্রবল জোয়ারের টান, তাহাতে যে ঐ শব্দটুকু না হইতে পারে এমন নয়। রামেশ্বরের তবু সন্দেহ হইল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বিসারিত করিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন—ঠিক! কেয়া-জঙ্গলের নিবিড় ছায়ার মধ্যে আগাগোড়া আবৃত করিয়া একখানা বজরা অতি চুপিচুপি উজান ঠেলিয়া যাইতেছে। কাহাকেও ডাকিলেন না, নিজের বিপদের আশঙ্কা মনে হইল না, ঐ দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তিনি আগাইতে লাগিলেন। পরিখার মুখে আসিয়া পথ আটকাইল। সেখান হইতে দেখিতে লাগিলেন, —চোখ অন্ধকারে জ্বলিতে লাগিল—দেখিলেন, নৌকা নিঃশব্দে গড়ের পিছনে সঙ্কীর্ণ নালার মুখে আসিয়া লাগিল; সঙ্গে সঙ্গেই কয়টি সাদা পুঁটলী নালায় গড়াইয়া আসিয়া নৌকায় পড়িল আর চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে নৌকা পাক খাইয়া সুতীব্র জলস্রোতে বিদ্যুতের বেগে অদৃশ্য হইয়া গেল।

রায়রায়ান ছুটিতে ছুটিতে তাঁবুর দিকে ফিরিলেন। খানিকটা দূরে একটি কেওড়া গুঁড়িতে ঠেস দিয়া মধুকর মৃদুস্বরে বাঁশী বাজাইতেছিল; বড় মধুর বাঁশী বাজায় সে। দ্রুত পদশব্দে চমকিয়া তার হাতের বাঁশী পড়িয়া গেল; নিঃশব্দে মধুকর দাদার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

—চলো—

—কোথায়?

—রাণায়ের মোহনায়।

রাণায়ের মোহনা ক্রোশ পনেরো-ষোল দূর। গাঙটা সেখানে চারিমুখ হইয়া গিয়াছে। ভরত রায়ের সঙ্গে দেবগঙ্গার চাক্‌লাদারের সম্প্রীতি খুব বেশী; নৌকা যদি সে দিকে যায় তবে রাণাই হইতে ডাহিনে মোড় ঘুরিবে। স্থল-পথে আগে গিয়া সেখানে ঘাটি দেওয়া দরকার।

মুহূর্ত্ত মধ্যে আটজন ঢালীসৈন্য প্রস্তুত হইয়া মাঠের প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। অশান্ত কুণ্ডল মাটির উপর খুর দাপাইতে লাগিয়াছে। এতক্ষণে রায়বায়ানের মুখে হাসি ফুটিল। ঘোড়ার কাঁধে করাঘাত করিয়া বলিলেন—থাম্—থাম্ বেটা, সবুর সয় না বুঝি... আচ্ছা, আমি চললাম আগে আগে, তোমরা এস শীগগির—

মাঠ ভাঙ্গিয়া কুণ্ডল ছুটিল।

নদীকূলে ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া রামেশ্বর মোহানার মুখে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মধুকরেরা পৌঁছিল যখন কৃষ্ণাদশমীর চাঁদ দেখা দিয়াছে। নিষুপ্ত জেলেপাড়া, ঘাটে অগণিত ডিঙা বাঁধা। এক একটা ডিঙার ছইয়ের মধ্যে সকলে প্রস্তুত হইয়া বসিলেন। রাত্রি শেষ হইয়াছে, ঝাপ্সা ঝাপ্সা জ্যোৎস্না—সেই সময়ে জলের উপর বজরার ছায়ামূর্ত্তি দেখা দিতেই—গুড়ুম!

বজরা হইতেও জবাব আসিল। তীরের উপর গাছে গাছে পাখীরা ত্রস্ত হইয়া কলরব শুরু করিয়াছে। অকস্মাৎ অনেকগুলি কণ্ঠের আর্তনাদ...ঝপ-ঝপ শব্দে মাঝনদীর জল ছিটকাইয়া উঠিল...বজরা চরকীর মত পাক খাইতে লাগিল। রামেশ্বর তীব্র আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—হাসিল্!

দশটি ডিঙা সকল দিক হইতে বজরা ঘিরিয়া ধরিল। জল রক্তে রাঙা হইয়া গিয়াছে। একটি শবের কাল চুল জলের টানে একবার ভাসিয়া সেই মুহূর্ত্তে অতলে তলাইয়া গেল। মাল্লা কয়জন গলুয়ে পড়িয়া কাতরাইতেছে। মধুকর লাফাইয়া ভিতরে ঢুকিল, ক্ষণপরে বাহির হইল ছোট একটি তোরঙ্গ লইয়া।

—সমস্ত এই?

মধুকর বলিল, হাঁ দাদা, তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি—আর কিচ্ছু নেই—

—এস দিকি।

রামেশ্বরও ঢুকিতে যাইতেছিলেন, ইঙ্গিতে মধুকর নিরস্ত করিল। মৃদুকণ্ঠে বলিল—ওর মধ্যে রয়েছেন ভরত রায়ের স্ত্রী-কন্যা আর গড়ের আরও জন পাঁচ-সাত মেয়েলোক—

বজ্রকণ্ঠে রামেশ্বর বলিলেন—ডাক দেও পুরুষলোক যে আছে—

মধুকর বলিল, পুরুষ কেউ নেই। ভরতের মেজ ছেলে ওঁদের নিয়ে পালাচ্ছিলেন, তিনি ঘায়েল হয়ে ভেসে গেছেন। ভয়ে সকলে এখন মড়ার মত। আপনি আর যাবেন না ওদিকে।

মুহূর্ত্তকাল ভাবিয়া রায়ারায়ান কূলে নামিয়া আসিলেন। একজনকে বলিলেন—খোল ত তোরঙ্গ; দেখি, আমাদের ছোট রায় কি নিয়ে এলেন—

ডালা খুলিতেই মণিমুক্তা ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। খুশীমুখে মধুকরের পিঠে থাবা দিয়া রামেশ্বর বলিলেন—বেশ, বেশ... এবারে তুমি নিজে রামনগর চলে যাও—তোরঙ্গসুদ্ধ দেওয়ানজীর হাতে দাও গিয়ে—গড়ের কাজে টাকার অভাব আর হবে না। আর এঁরা থাকবেন বন্দীশালায়—কোন অসুবিধা না হয়, দেখবে—

মনের আনন্দে রামেশ্বর কুণ্ডলের পিঠে গিয়া বসিলেন।

সেই দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই রায়রায়ানের গোলায় ভরতগড় ধ্বসিয়া চুরমার হইয়া গেল; সেদিক দিয়া না আসিল কোন প্রতিবাদ, না পাওয়া গেল একটা মানুষের সাড়াশব্দ। অনেক কষ্টে পরিখা পার হইয়া সৈন্যেরা গড়ে ঢুকিয়া দেখে, যা ভাবা গিয়েছিল তা-ই—সকলেই পলাইয়াছে, জিনিষপত্র কিছুই পড়িয়া নাই, বারুদখানায় পয়ঃপ্রণালী খুলিয়া দিয়া খালের জল তোলা হইয়াছে, গড়ের শূন্য কক্ষগুলি খাঁ-খাঁ করিতেছে।

বিজয়োল্লাসে রামেশ্বর রামনগর ফিরিয়া চলিলেন।

নিজ নামে নগরের পত্তন মাত্র হইয়াছে, যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে কাজ বড় বেশী অগ্রসর হইতে পায় নাই। অসমাপ্ত চত্বরের প্রান্তে অতি প্রাচীন একটা বকুল গাছ। শ্রান্ত রামেশ্বর অপরাহ্ন বেলায় প্রাসাদকক্ষ হইতে নবনির্ম্মিত নগরীর দিকে অলস দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিলেন, অকস্মাৎ

চমকিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, চত্বরের প্রান্তে বকুলের ছায়াচ্ছন্ন তলদেশে অপ্সরীর মত লঘুগামিনী বড় রূপসী একটি মেয়ে। মধুকর কি কাজে সেইখানে আসিয়াছিল, রায়রায়ান জিজ্ঞাসা করিলেন—কে ও-টি?

—ভরত রায়ের মেয়ে।

রামেশ্বর ভাইয়ের দিকে তাকাইলেন, মুখের উপর দিয়া কৌতুক হাস্য মৃদু খেলিয়া গেল। বলিলেন—বন্দীশালায় বন্দীদের রাখবার নিয়ম। —এ কি করেছ?

কিন্তু নিয়ম হইলেও এ ছাড়া অন্য উপায় ছিল না, মধুকর প্রাণপণে তাহা বুঝাইতে লাগিল। কারণ, বন্দীশালাটা ঠিক নিরাপদ নয়... তাছাড়া সেখানে থাকার অসংখ্য অসুবিধা... এমন অসুবিধা যে রাখাই চলে না...

রামেশ্বর তবু মৃদু মৃদু হাসিতেছেন দেখিয়া আরও বিব্রতভাবে মধুকর বলিল—আপনি দেখেন নি তাই। দেখতেন যদি—সে যে কি ভয়ানক কান্নাকাটি—

—কান্নাকাটি? খুব ভয়ানক? রামেশ্বর সহসা সোজা হইয়া বসিলেন, মুখের কৌতুক হাস্য নিবিল, চোখ জ্বল্-জ্বল্ করিয়া উঠিল। ম্লান অপরাহ্ন-আলোয় রহস্যাচ্ছন্ন অর্দ্ধসমাপ্ত বিস্তীর্ণ নগরী... পশ্চিমে মাঠের প্রান্তে রক্তিম আভা বিলের জলে ডগমগ করিতেছে... দূরে, আরও দূরে সীমাহীন নিবিড় অরণ্যশ্রেণী। বিশ বছর আগেকার একটি গরিব খোড়ো ঘর অকস্মাৎ রায়রায়ানের চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। ঘরের মধ্যে বিদায়যাত্রার আয়োজন, কথা নাই,—নির্ব্বাক বিদায়-চিত্র। ঘাটে সুন্দরী-কাঠ আনিবার নৌকা প্রস্তুত হইয়া ডাকাডাকি করিতেছে, ঘরের মধ্যে একটি কথা নাই, চোখ ভরিয়া গৌর গাল দুটি বহিয়া জল আসে, মুছাইয়া দিলে তখনই আবার ভরা চোখ...অফুরন্ত, বাধা দিয়া ঠেকাইবার জো নাই।...

সহসা হা-হা-হা করিয়া যেন স্বপ্ন ভাঙিয়া রায়রায়ান হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভরত রায়ের মেয়েটাকে দেখতে কেমন মধুকর?

মুখ লাল করিয়া অন্য দিকে চাহিয়া মধুকর কোন প্রকারে জবাব দিল—ভাল। তাড়াতাড়ি সে বাহির হইয়া গেল।

ভাইয়ের গমন-পথের দিকে গভীর স্নেহে তাকাইয়া রায়রায়ান মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। কিশোর বয়সের ইহাদের এই পাগলামী বড় মিঠা লাগে। মধুকর চলিয়া গেলেও অনেকক্ষণ হাসি পাইতে লাগিল।

প্রাঙ্গণের কাছাকাছি একদিন মেয়েটার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হইয়া গেল। সে একাকী দিকপ্রান্তে একাগ্র চোখে তাকাইয়া ছিল।

—তুমি কে?

গম্ভীর কণ্ঠে মুখ ফিরাইয়া থতমত খাইয়া মেয়েটি বলিল—আমার নাম মঞ্জরী।

রায়রায়ান বলিলেন—তুমি ত ভরত রায়ের মেয়ে। শুনেছ বোধ হয়, তোমাদের গড়ের ভিতর অবধি ঘুরে এসেছি। কিন্তু অদৃষ্ট খারাপ, রায় মহাশয়ের দেখা পাই নি। বলতে পার, তিনি কোথায়?

আত্ম-গৌরবে রামেশ্বর যেন ফাটিয়া পড়িতে লাগিলেন। বলিলেন—চুপ করে চোখ নীচু করে রইলে বড়। জবাব দাও। গরজ আমারই। বীরবরের ঠিকানাটা পেলে তোমাদের বোঝা নামিয়ে অব্যাহতি পাই। ভয় নেই গো—আমরা কেউ যাচ্ছি না। খালি তোমাদের পাল্কী করে পাঠাবো—

নিষ্ঠুর বিদ্রূপে মঞ্জরীর চোখ জ্বালা করিয়া জল আসিল। সুন্দরীর চোখের জল বড় পরিতৃপ্তির সঙ্গে রায়রায়ান উপভোগ করিতে লাগিলেন—বলিলেন—রাগ করো না। ভাগ্যিস আমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, না হলে কোথায় আশ্রয় পেতে বল দিকি?

—ভদ্রার জলে।

কুমারী মুখ তুলিল। অশ্রুভরা চোখ যেন জ্বলিতেছে। বলিতে লাগিল—ভদ্রার জলে আশ্রয় হত রায়রায়ান,—সে হত ভাল আশ্রয়। আগে ত বুঝতে পারি নি যে আপনি—

রামেশ্বর দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া হাসিতে লাগিলেন। ব্যঙ্গের সুরে বলিলেন—কিছুই বুঝতে পারনি? দেওড় শুনে কি ভাবলে বল ত? ভাবলে, শ্বশুরবাড়ি থেকে ঘোড়া-পাল্কী নিয়ে মানুষ এসেছে—পটকা ছুঁড়ছে না?

মঞ্জরী বলিল—ভেবেছিলাম, জোলো ডাকাত। ঘুণাক্ষরে আপনাকে সন্দেহ হয় নি। তারপর চোখ মুছিয়া দৃপ্তকণ্ঠে কহিতে লাগিল—রায়রায়ান, আপনার সমস্ত খবর দেশের লোকে জানে। চিরকাল আপনাকে একঘরে হয়ে থাকতে হবে—ভেবেছেন কি? মিছামিছি এত জাঁক করে এই সব গড় করছেন। আপনার ঐ গড়খাইয়ের জলে ডুবে মরা উচিত—

মেয়েটির দুঃসাহসে রায়রায়ান স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু তুচ্ছতম প্রতিপক্ষের সামনে হঠাৎ রাগ দেখাইবার ব্যক্তি তিনি নহেন। বরঞ্চ আঘাত যে যথাস্থানে গিয়া বাজিয়াছে, তাহাতে বড় আনন্দ হইল। সহাস্য নেত্রে তেমনি চাহিয়া বলিলেন—বটে!

মঞ্জরী বলিতে লাগিল—এই জায়গীর কেমন করে আপনি নিয়ে এসেছেন—লোকে সমস্ত জানে। চাকলাদারেরা আপনাকে ঘৃণা করে, তারা কোনও দিন আপনাকে দলে নেবে না। তারা সব চাকলা গড়েছে গায়ের জোরে, আমীর ওমরাহের ঘরে মেয়েলোক ভেট পাঠিয়ে নয়—

—ভাল, ভাল—বলিয়া মৃদু হাসিয়া নির্লিপ্তভাবে রামেশ্বর ফিরিয়া চলিলেন। কয়েক পা গিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—সুন্দরী, তোমাকেও তবে একটা সুখবর দিয়ে যাই। আমীর-ওমরাহদের ঘরে তুমিও যাবে, দুঃখ নেই, আমি কোন পক্ষপাত করি নে।

অবনতমুখী পাষাণ প্রতিমার ন্যায় শুনিতে লাগিল।

রামেশ্বর বলিতে লাগিলেন—সুখে থাকবে। বুঝলে? আগামী বুধবার যেতে হবে। প্রস্তুত থেকো।

কিন্তু ঐ মুখের কথাই। বুধবার তারপর দু-তিনটা কাটিয়া গেল, কিন্তু কোথায় বা রামেশ্বর আর কোথায় তাঁহার সেই যাওয়ার আয়োজন। ...মানুষ ও পশু পাশাপাশি খাটিয়া দিনের পর দিন নগর গড়িয়া তুলিতেছে। বড় বড় নৌকায় দেশ-বিদেশের কাঠপাথর আসিয়া জড় হইতেছে, সেই পাথর ভাঙার শব্দ, করাতে কাঠ চিরিবার শব্দ।...আজ কোথায় নূতন একটা স্তম্ভ উঠিতেছে, এই কোন্‌দিকে কি একটা ধ্বসিয়া পড়িল... লোকজন কাতারে কাতারে ছুটিতেছে—তাড়া খাইয়া আবার উল্টা দিকে ছুটিতে লাগিল।... দীর্ঘদিন কোন দিক দিয়া কাটিয়া সন্ধ্যা হইয়া যায়, রাত্রির অন্ধকার গভীর হইতে গভীরতর হয়, তখন শত শত কামারশালার জ্বলন্ত হাপরের পাশে হাতুড়ীর ঘায়ে লোহার উপর আগুনের ফুলকি উড়িতে থাকে, হাতুড়ী বাজে ঠঙ্ ঠঙ্ ঠঙ্—

দেওয়ান জীবনলালের উপর জায়গীর ও গড় তৈরির সমস্ত ভার। তাঁর তিলার্দ্ধ বিশ্রাম নাই। জায়গীরের বিধিব্যবস্থা তবু কতক কতক হইয়াছে, কিন্তু গড়ের কাজ কবে যে মিটিবে, সে এক বিশ্বকর্মা ছাড়া কেহ বলিতে পারে না। রাত্রে শুইয়া শুইয়া জীবনলালের মাথায় নূতন নূতন মতলব জাগে। পরিখা খোঁড়া হইয়াছে,—তার ওদিকে উঠিবে আকাশভেদী প্রাচীর, চারিদিকে চারিটি সিংদরজা, দুর্গদ্বার হইতে চারিটি রাস্তা সোজা সিংদরজা ফুঁড়িয়া পরিখার সেতুর উপর পৌছিবে। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত ভাবিয়া ভাবিয়া জীবনলাল মতলব খাড়া করেন; দিনের কাজকর্মের শেষে প্রসন্নচোখে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখেন, সুন্দর সুবৃহৎ রাজধানী আকাশের নীচে ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া উঠিতেছে।

নগরে ফিরিয়া কদিন অল্পকিছু বিশ্রাম লইয়া রায়রায়ানও এই-সব কাজের মধ্যে একেবারে ডুবিয়া গেছেন। খুব ভোরবেলা ঘড়াং করিয়া দরজা খুলিবার মুখে এক একদিন একটু আধটু তাঁহার গলার আওয়াজ পাওয়া যায়। বন্দিনীদের পাঠাইয়া দিবার তখনও কোন উপায় হয় নাই। মধুকর তাঁহাদের তদারক করে, সমস্ত দিন সে প্রায় এই সব লইয়া থাকে; তারপর গভীর রাত্রে সকলে শুইয়া পড়িলে অনেকক্ষণ অবধি নির্জ্জন অলিন্দে বসিয়া আপনার মনে বাঁশি বাজায়। সে সময়ে

ঘুম-ভাঙা শয্যায় রামেশ্বরেরও এক একদিন মনে হয় তাঁহার বড় যত্নে বড় কঠিন শ্রমে গড়া নগরীর উপর মধুকরের বাঁশি নিষুপ্ত রাত্রে মাঠের দিগন্ত হইতে স্বপ্নকুহকিনীদের ডাকিয়া আনিতেছে।

একদিন নির্জ্জনে রামেশ্বর হঠাৎ আসিয়া মঞ্জরীর সামনে দাঁড়াইলেন।

—শোন—

সপ্রশ্নদৃষ্টিতে মঞ্জরী চাহিল।

এক মুহূর্ত্ত থামিয়া রামেশ্বর বলিতে লাগিলেন—সেদিন আমার সম্বন্ধে তুমি মিথ্যা অভিযোগ করছিলে। ও সব শত্রুদের রটনা।

এ কয়দিনে মঞ্জরী অনেক বুঝিয়াছে, চোখের জল একেবারে মুছিয়া ফেলিয়াছে। কৌতুক-চঞ্চল চোখ দুটি নাচাইয়া সে চলিয়া যাইতেছিল। বাধা দিয়া রামেশ্বর বলিয়া উঠিলেন—বিশ্বাস করলে কি-না বলে যাও—

মঞ্জরী কহিল—এ সাফাই-এর দরকার কি রায়রায়ান, আমি ত আপনার বিচারক নই—

রায়রায়ান বলিলেন—তুমি আমায় বিয়ে কর—

খিল খিল করিয়া মঞ্জরী হাসিয়া উঠিল—অনেকক্ষণ চাপিয়াছিল, আর পারিল না।

ক্রুদ্ধ হইয়া রামেশ্বর বলিলেন—তোমাকে আজই দিল্লী পাঠাতে পারি জান? আর তার অর্থ কি, তা-ও বোধ হয় বোঝাতে হবে না—

—পারেন তা? বলিয়া চোখে মুখে হাসির দীপ্তি তুলিয়া তাঁহাকে নিতান্ত অগ্রাহ্য করিয়া প্রগল্‌ভা তরুণী চলিয়া গেল।

ইহার পর প্রায়ই দেখা হইতে লাগিল। দেখিলেই মঞ্জরী হাসিয়া পলাইত। একদিন রামেশ্বর তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। তখনই ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন—জোর করবার শক্তি আছে মঞ্জরী, কিন্তু মন তা চায় না। বলিতে বলিতে গলার স্বর ভারী হইয়া উঠিল,—এ যেন সে লোক নয়—সজলকণ্ঠে রামেশ্বর বলিলেন—আমার জীবনের খবর তুমি জান না... কিন্তু আর এই যুদ্ধবিগ্রহ ভাল লাগে না, এখন শান্তিতে একটুখানি মাথা গুঁজে থাকতে চাই—

মঞ্জরী শান্তভাবে শুনিতে লাগিল, পলাইবার চেষ্টা করিল না। রায়রায়ান বিশ বছরের কাহিনী বলিয়া চলিলেন। সমস্ত বলিয়া গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিলেন। ধীরে ধীরে মঞ্জরী চলিয়া গেল।

বিকালবেলা মঞ্জরী একখানা আয়না পাঠাইয়া দিল। সেই সঙ্গে ছোট্ট একটু চিঠি—

তারপরে যে বিশ বৎসর কেটে গেছে, রায়রায়ান। যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন, সম্ভবতঃ আয়নায় চেহারা দেখবার ফুরসৎ হয়নি। তাই একটা আয়না পাঠিয়ে দিলাম।

চিঠি পড়িয়া রামেশ্বর অনেকক্ষণ গুম হইয়া রহিলেন। ভ্রূকুটি-ভীষণ মুখে শুধু বলিলেন—আচ্ছা!

ভরতগড়ের রাণীর কানে পৌঁছিল, তাঁর দুরন্ত মেয়ে রায়রায়ানের সঙ্গে একটা কাণ্ড করিয়া বসিয়াছে। এবারে রায়রায়ানের প্রতিহিংসা। ইহা যে কি বস্তু, রামেশ্বর অল্পদিন দেশে আসিয়াছেন তবু চাক্‌লাদারের ঘরের শিশুটি অবধি তাহা বুঝিয়া ফেলিয়াছে। সকলের আহার-নিদ্রা বন্ধ হইল। কিন্তু যাহাকে লইয়া এতবড় ব্যাপার, সে দিন-রাত দিব্য হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া সেই চিঠি শতকুটি করিয়া ফেলিয়াও রায়রায়ানের রাগ মিটে না। তারপর এক সময়ে সত্যসত্যই তিনি আয়না দেখিতে বসিলেন। কুড়ি বছর ভাগ্যের সঙ্গে নিদারুণ লড়াই হইয়াছে, সর্ব্বাঙ্গে তার প্রতিটি আঘাতের চিহ্ন। সমস্ত মাথার মধ্যে একটি কালো চুল নাই, মুখের উপর যে ছায়া পড়িয়াছে তাহা দেখিয়া নিজেরই প্রাণ আতঙ্কে কাঁপিয়া ওঠে, এ তরুণী ব্যঙ্গ করিবে ছাড়া আর কি? বিশ বছর আগে বেদনাবিদ্ধ যে যুবক গৃহত্যাগ করিয়াছিল, তাহার একবিন্দু চেহারা আর খুঁজিয়া পাইবার উপায় নাই। সাদাচুলের রাশি দুই হাতে ঢাকিয়া ধরিয়া আয়নার সম্মুখে বসিয়া রামেশ্বর সেই সব দিনের কথা ভাবিতে লাগিলেন।

অকস্মাৎ সমস্ত রামনগর চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। পথে দু-জন লোক একত্র হইলেই একটিমাত্র কথা। একজন সাস্ত্রীকে হীরার আংটি বকশিস দিয়া ভরতগড়ের রাণী বৃত্তান্ত শুনিলেন। শুনিয়া বুকের রক্ত ফুল রাঙাইয়া শ্মশানকালীর পূজার জন্য গোপনে পাঠাইয়া দিলেন। ভরত রায় অগ্রবর্ত্তী, সঙ্গে আরও চারি জন চাকলাদার; সকলে মিলিয়া রামনগর ধ্বংস করিতে আসিতেছেন। সৈন্য আসিয়া দুই ক্রোশের মধ্যে ঘাঁটি দিয়া বসিয়াছে।

অলিন্দে সেদিন আর মধুকরের বাঁশি বাজিতেছে না, সেইখানে গুপ্তমন্ত্রণা বসিয়াছে।

মধুকর শত্রু-শিবির আক্রমণ করিতে চায়। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, আকাশে চাঁদ উঠে নাই; মধুকর জেদ ধরিয়াছে—এই আঁধারে আঁধারে নিঃসাড়ে দলবল লইয়া শত্রুশিবিরে ঝাঁপাইয়া পড়িবে।

রামেশ্বর মাথা নাড়িলেন। অসম্ভব, একেবারে অযৌক্তিক কথা। পাঁচ চাকলাদারের সমগ্র শক্তি সমবেত হইয়াছে, তার সামনে রায়রায়ানের নব-নিযুক্ত ঢালির দল কয়টি বানের মুখে একেবারে কুটার মত ভাসিয়া চলিয়া যাইবে।

পদশব্দ। —কে? এতক্ষণে দেওয়ান জীবনলাল আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। জীবনলাল দৌত্যে গিয়াছিলেন, হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া খবর বলিতে লাগিলেন, দেবগঙ্গার চাকলাদার বলিয়া পাঠাইয়াছেন—সকলের আগে ভরত রায়ের পুরমহিলাদের সসম্মানে পাঠাইয়া দিতে হইবে। তাঁরা গিয়া যদি বলেন, কোন দুর্ব্যবহার হয় নাই, সন্ধির বিবেচনা তারপর—

মধুকর লাফাইয়া উঠিল—কাজ নেই, দাদা। ওঁদের পাঠানো হবে না। আমি সর্দ্দারদের ডাকি।

কিন্তু ইহা কাজের কথা নয়। রামেশ্বর ভাইকে শান্ত করিয়া বসাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—দেওয়ানজী, গড়ের বাকী কত?

জীবনলাল বলিল—শেষ হতে অন্ততঃ আরও ছ-মাস। তখন পাঁচটা কেন পঞ্চাশটা চাকলাদার এলেও পিছু হটব না। কিন্তু এখন যা বলে মেনে নিতে হবে।

মধুকর গর্জ্জিয়া উঠিল—এই অপমান?

—উপায় নেই। বলিয়া জীবনলাল ম্লান হাসিল। বলিল—চোখের সামনে এই-সব ভেঙে ছারখার করবে—এ ত আমি বেঁচে দেখতে পারব না, রায়রায়ান।

মধুকর খানিক চুপ করিয়া বলিল—বেশ। কিন্তু হাঙ্গামার মধ্যে যাবার আগে গড়ের বন্দোবস্ত শেষ করে ফেলা উচিত ছিল না কি? ওরা আসবে—এ ত জানা কথা।

এবারে রামেশ্বর কথা কহিলেন। বলিলেন—জানা কথা কি বলছ মধুকর, এ ত স্বপ্নেও ভাবা যায় নি। চাকলাদারেরা চিরদিন নিজেদের মধ্যে লাঠালাঠি করে আসছে। আজকেই কেবল এক হল। এরা মতলব করেছে, সুবে বাংলায় আর নতুন জায়গীরদার ঢুকতে দেবে না।

জীবনলাল কহিল—আজ ভরত রায়ও নানা মিথ্যে রটনা করেছে। স্ত্রী-কন্যা বেইজ্জৎ হয়েছে বলে সকলের কাছে কেঁদে কেঁদে বেড়িয়েছে।

মধুকর শেষ প্রস্তাব করিল—তবে আমরা পালাই। ভরতকে জব্দ করব। মেয়েদের নিয়ে ঢাকার দিকে চলে যাই—

জীবনলালের তাহাতেও মহা আপত্তি। বলিল—সে হয় না। তাহলে মানুষ না পেয়ে আক্রোশ গিয়ে পড়বে রামনগরের উপর। সমস্ত শ্মশান হয়ে যাবে। এবারে সন্ধি হোক। আমি কথা দিচ্ছি, ছোট রায়, ছ-মাস পরে দশগুণ শোধ তুলব—

আরও অনেকক্ষণ ধরিয়া জল্পনার পর রামেশ্বর সকালবেলায় শিবিকার ব্যবস্থা করিতে হুকুম দিলেন।

চত্বরের প্রান্তে বহুপ্রাচীন শাখাবহুল সেই বকুল গাছ, ফুল ঝরিয়া বাতাসকে গন্ধমন্থর করিতেছে! তাহারই ছায়াতলে দাঁড়াইয়া রায়রায়ান নিঃশব্দে বিদায়-যাত্রা দেখিতেছিলেন। সবুজ কিংখাবে মোড়া হাঙর-মুখো মাঝের ঝালরদার শিবিকাখানি—ঐটি মঞ্জরীর। রামেশ্বর একাকী দাঁড়াইয়া

দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন, হঠাৎ নূপুরের শব্দে পিছনে তাকাইলেন। মঞ্জরী রূপে অলঙ্কারে বেশের পারিপাট্যে ঝলমল করিয়া আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

রায়রায়ানের মুখ কালিবর্ণ হইয়া গেল। ইহারা আজ বিজয়ী; তরুণীর মুখে-চোখে সেই অহঙ্কার যেন ফুটিয়া পড়িতেছে। মৃদুস্বরে মঞ্জরী বলিল—যাচ্ছি—

রামেশ্বর অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন। মঞ্জরী বলিতে লাগিল—আপনাদের যত্নে বড় সুখে ছিলাম। আপনাদের আতিথ্যের কথা বাবাকে বলব—

স্বরটা রায়রায়ানের কাছে ব্যঙ্গের মত ঠেকিল। রূঢ় স্বরে জবাব দিলেন—বেশ, বলো—একটা কথাও বাদ দিও না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। বলিতে লাগিলেন—আমার ইচ্ছে হচ্ছে কি—ডিঙায় করে তোমাদের ভদ্রার মাঝখানে নিয়ে গিয়ে দিই তলা ফুটো করে—ছটফট করে ডুবে মর। কিন্তু সে ত হবার জো নেই, মধুকর আর জীবনলালের জ্বালায়—

সহসা মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন,—হয়ত বুঝিবার ভুল হইয়াছে—মঞ্জরী দু'টি আয়ত চোখের গভীর দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চাহিয়া আছে। চোখের কোণে অশ্রু টলমল করিতেছে। ঝর ঝর করিয়া সেই অশ্রু গণ্ড বহিয়া ঝরিতে লাগিল। রামেশ্বর সেই দিকে চাহিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর ম্লান হাসিয়া বলিতে লাগিলেন—তুমি গিয়ে স্বচ্ছন্দে সব কথা বলতে পার। এই-সব অট্টালিকা জায়গীর স্বপ্নের মত এসেছে—আবার যদি চলে যায় আমার কিছু ক্ষতি হবে না।

রাজকন্যা তাড়াতাড়ি হেঁট হইয়া রায়রায়ানের পদধূলি লইল। বলিল—আমি সমস্ত শুনেছি। এই রাজ্যপাট আপনার বীরত্বের ইনাম। ইচ্ছে হ'লে এর চতুর্গুণ এখনই আজকেই আবার আপনি তৈরী করতে পারেন—

রামেশ্বর ম্লান হাসিয়া মাথায় পলিত কেশের উপর হাত বুলাইতে লাগিলেন। বলিলেন—আর পারিনে—কুড়ি বছর পরে আয়নায় দেখলাম—সত্যিই বুড়ো হয়ে গিয়েছি; দেহে বল নেই, মনেও বল নেই। ...এখন এ-সব শেষ করে গরিবের ছেলে হয়ে আবার খোড়ো ঘরে যেতে ইচ্ছে হয়। তোমায় আমি দিল্লী পাঠাচ্ছিলাম—আরও কত অত্যাচার হয়েছে হয়ত—আমার সমস্ত অপরাধ তোমার বাবাকে বলো, মঞ্জরী—

মঞ্জরী দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—মিথ্যা বলব কেন?

রামেশ্বর অবাক হইয়া চাহিলেন। মঞ্জরী বলিতে লাগিল—দিল্লীতে কখনও আপনি পাঠাতেন না, সে আমি জানি। আপনার মনের কথা সমস্ত জানি আমি। যাবার বেলায় তাই প্রণাম করতে এলাম।

বলিতে বলিতে সে থামিল। মুখের উপর এক ঝলক রক্ত নামিয়া আসিল। জোর করিয়া সঙ্কোচ কাটাইয়া বলিতে লাগিল—বাবা এবার অনেক আয়োজন করে এসেছেন, আমি না গেলে অনর্থ হবে। আমি তাই ফিরে যাচ্ছি। আপনার রাজধানী গড় নাওয়ারা—সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করে আমাকে নিয়ে আসবেন। তাই বলতে এলাম।

—নিয়ে আসবো? সম্মোহিত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া রামেশ্বর ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতে লাগিলেন। বলিলেন—তুমি কি সত্যি কথা বলছ? আমি বুড়ো হয়ে গেছি, মন বড় দুর্ব্বল মঞ্জরী।

মঞ্জরী রায়রায়ানের দুই পায়ের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া চুপ করিয়া রহিল। অশক্ত বৃদ্ধ নয়—রণশ্রান্ত মহাবিজয়ী বীর তার সম্মুখে। অনেকক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া অশ্রুভরা চোখে কুমারী হাসিল—ম্লান, কিন্তু বড় মধুর হাসি। বলিল—নিয়ে আসবেন। জন্মাষ্টমীর রাত্রে আমরা প্রতিবছর গড়ের বাইরে শ্যামসুন্দরের মন্দিরে যাই। সঙ্গে জন-পঞ্চাশ মাত্র রক্ষী থাকে। এখনও তার ছ-সাত মাস দেরি। আপনি এর মধ্যে গড় শেষ করুন। কুণ্ডলকে নিয়ে যাবেন। আমি ভদ্রার কূলে কৃষ্ণচূড়ার তলায় অপেক্ষা করব। আপনি আর আপনার কুণ্ডল আমাকে উদ্ধার করবেন।

ঝুনঝুন নূপুর বাজাইয়া মঞ্জরী ধীরে ধীরে শিবিকায় গিয়া বসিল।

গড়ের কাজে পরদিন হইতে চতুর্গুণ লোক লাগানো হইল। পুরীর সামান্য কর্মচারীটি পর্য্যন্ত বুঝিয়াছে, রায়রায়ান প্রতিহিংসার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। জীবনলাল মহিলাদের পৌঁছাইয়া দিতে গিয়াছিল, ফিরিতে রাত হইল। তারপর গভীর রাত্রে আগের দিনের মত আবার গুপ্ত পরামর্শ। চাকলাদারেরা সসৈন্যে ফিরিয়া যাইতে রাজী হইয়াছেন; কিন্তু ভূষণার মধ্যে রামেশ্বরকে এই নূতন গড় গড়িতে দেওয়া হইবে না।

জীবনলালের পরামর্শ, ইসলামাবাদের দিকে গিয়া ফিরিঙ্গীদের শরণ লওয়া। সেখানে জায়গীরের বিলিব্যবস্থা করিতে বেগ পাইতে হয় না। বাদশাহের নিকট হইতে একটি নূতন ফর্মান আনিবার অপেক্ষা মাত্র। কিন্তু রামেশ্বর ঘাড় নাড়িলেন। আর তাঁহার নূতন করিয়া ভাগ্য খুঁজিবার উৎসাহ নাই।

একদিন রামেশ্বর কিল্লাবাড়িতে ফৌজদারের সঙ্গে পরামর্শ করিতে গেলেন। তারপর অনেক দিন ধরিয়া এই রকম পরামর্শ চলিল। জীবনলাল ইতিমধ্যে ইসলামাবাদের দিকে চলিয়া গিয়াছে। গড়ের সমস্ত কাজকর্ম্ম বন্ধ; অর্দ্ধসমাপ্ত পরিখা ও নগর শ্মশানের মত খাঁ-খাঁ করিতেছে।

পাক্‌সীর বিল ইদানীং মজিয়া গিয়াছে, চৈত্র-বৈশাখে প্রায় শুকাইয়া আসে। তখন দিগন্তব্যাপ্ত নিবিড়কৃষ্ণ অবিচ্ছিন্ন জলধারা ক্রোশের পর ক্রোশ তরঙ্গিত হইত। বড় শুকনার সময়ে গোটা বিশ-পঁচিশ চর মাত্র সীমাহারা বারিসমুদ্রের মাঝখানে অসহায়ের মত মাথা উঁচু করিয়া থাকিত। ঝিলের কিনারা দিয়া কিল্লাবাড়ি যাইবার পথ। মাসাবধি পরে কুণ্ডলের পিঠে চড়িয়া একদিন রামেশ্বর ফিরিয়া আসিতেছিলেন। ফৌজদার শেষ পর্য্যন্ত কোন সুবিধাই করিতে পারিলেন না। ফিরিবার পথে বিলের প্রান্তে আসিয়া বিদ্যুৎ চমকের মত একটি সঙ্কল্প রামেশ্বরের মনে জাগিয়া উঠিল।

রামনগরবাসী এবং চাকলাদার মহলে রাষ্ট্র হইয়া গেল, পরাজিত অবমানিত রায়রায়ান মনোকষ্টে বিবাগী হইতে বসিয়াছেন, দিবারাত্রি অন্তঃপুরের মধ্যে শ্যামসুন্দরের উপাসনায় তিনি মাতিয়া থাকেন। তারপর অনেক দিন পরে একদিন কুণ্ডলের পিঠে রায়রায়ান বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সহস্র প্রজা সমবেত হইয়াছে। জীবনলালও সেইদিন ফিরিয়াছেন। সে চুপি চুপি বলিল—এ সবে কাজ নেই প্রভু, ইসলামাবাদে চলুন—

পর্টুগীজদের সঙ্গে সর্ত্ত হইয়া গিয়াছে; ইসলামাবাদে রাজ্যপত্তন করিতে আর গোল নাই। সেখান হইতে রাজ্য ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া একদিন ভূষণাকেও গ্রাস করিবে,—জীবনলাল সেই স্বপ্নে মাতোয়ারা।

কিন্তু রামেশ্বর রাজী নহেন। নিরন্ন সর্বস্বহারা হইয়া পথে পথে ঘুরিতে হইয়াছে, বিনিদ্র কত রাত্রি অজানা প্রান্তরের মধ্যে অশ্বপৃষ্ঠে কাটিয়াছে, দিন মাস বৎসরগুলি দেহের উপর পদাঙ্ক আঁকিয়া রাখিয়া দ্রুত পলাইয়া গিয়াছে। জীবনের শেষপ্রান্তে আসিয়া নূতন করিয়া তিনি আর সংগ্রামে মাতিবেন না। হাসিয়া বলিলেন—জীবনলাল, ইসলামাবাদে তুমি রাজ্য কর। আমি ফর্ম্মান এনে দেব।

জীবনলাল জিভ কাটিয়া বলিল—প্রভু, আমার কাজ রাজ্য গড়া, রাজত্ব করা নয়।

—তবে মধুকরকে নিয়ে যাও। সে দেশ অরাজক, মগ আর ফিরিঙ্গী ডাকাতদের মধ্যে আমি তিলার্দ্ধ বিশ্রাম পাব না। আমি পাক্‌সীর বিলের মধ্যে দেউল গড়ে শেষ কটা দিন শান্তিতে থাকব।

কাছাকাছি পাঁচ-সাতটা সুদীর্ঘ চর, তাদের মাঝে অল্প অল্প জল-কাদা। কুণ্ডলের পিঠের উপর বল্লম উঁচু করিয়া রায়রায়ান। প্রথম যৌবনের দুর্দ্ধর্ষ বিক্রম বুকের মধ্যে আবার নাচিয়া উঠিয়াছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার সামনের দিকে তাকাইয়া রায়রায়ান মাটিতে বল্লম ছুঁড়িয়া মারিলেন। অমনি সারবন্দী হাজার হাজার কোদাল পড়িল—ঝপ্‌পাস্‌। সেই হাজার হাত হইল দীঘির উত্তরসীমা।

বল্লম তুলিয়া লইয়া রায়রায়ান তীরবেগে কুণ্ডলকে ছুটাইলেন। কুণ্ডল উড়িয়া চলিল। একদমে আধ ক্রোশ গিয়া একলহমা ঘোড়া থামিল। রায়রায়ান বল্লম পুঁতিয়া রাখিয়া রামনগরে ফিরিয়া আসিলেন।

হাজার হাজার কোদাল দিনের পর দিন পড়িতে লাগিল। অবশেষে পোঁতা বল্লমের গোড়ায় আসিয়া দীঘি কাটা শেষ হইল। মাটির স্তূপে আকাশভেদী পাহাড় হইয়াছে। দেশ দেশান্তর হইতে বড় বড় পাথরের চাঁই আসিয়া জমিতে লাগিল। দিনরাত্রি সেই পাথর মাটিতে বসানো হইতেছে, পাথরের উপর পাথর বসাইয়া দ্রুত এক অতি বিচিত্র দেউল রচিত হইতেছে। কত স্তম্ভ, কত চূড়া, কত মনোহর কারুকার্য তাহার উপর। সমস্ত জীবনের সঞ্চিত স্বর্ণভাণ্ডার উজাড় করিয়া রামেশ্বর পাক্‌সীর বিলের মধ্যে ঢালিতে লাগিলেন।

—আকাশ আলো করে দাঁড়িয়েছে, চমৎকার! চমৎকার!

লোকে বলে, রায়রায়ানের সাধনপীঠ।

—কোন্ দেবতার প্রতিষ্ঠা হবে?

কেহ বলিতে পারে না।

ক্ষান্তবর্ষণ মেঘান্ধকার ভাদ্র-অষ্টমীর সন্ধ্যাকালে রামেশ্বর যাত্রা করিলেন। মঞ্জরী ভুলে নাই—মন্দিরের লৌহ-সম্বন্ধ সুদৃঢ় বেষ্টনীর বাহিরে কৃষ্ণচূড়ার তলে আঁচল ঝাঁপিয়া সে প্রতীক্ষা করিতেছিল, মুহূর্তে ঘোড়ায় চড়িয়া রায়রায়ানের পৃষ্ঠ-লগ্ন হইল। রক্ষীরা সচকিত হইয়া দেখিল, দস্যু কন্যাকে লইয়া পলাইতেছে। কড়কড় করিয়া মেঘ ডাকিয়া মুষলধারে জল নামিল। কুণ্ডল তীরবেগে ছুটিল। কুণ্ডলের কে অনুসরণ করিয়া পারিবে? দেখিতে দেখিতে ঘোড়া নিখোঁজ হইয়া গেল।

রামনগরে যখন পৌঁছিল তখন শেষরাত্রি। পিঠের উত্তরীয় খুলিয়া রামেশ্বর কুমারীর দেহবল্লরী ধীরে ধীরে বাহুতে ধরিয়া তুলিলেন। পদ্মের পাপড়ীর মত চক্ষু দুটি মুদিয়া মঞ্জরী ক্লান্তিতে এলাইয়া রহিয়াছে; দেহভাঙা ক্ষীণ জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে তার ঘুমন্ত মুখের উপর। গভীর স্নেহে মুহূর্তকাল রামেশ্বর সেই মুখের দিকে চাহিলেন, তারপর অতি সন্তর্পণে তাহাকে সুকোমল উষ্ণ শয্যার উপর শোয়াইয়া দিলেন।

মধুকরের ডাক পড়িল। আনন্দের প্লাবন রামেশ্বরের অন্তর ভরিয়া ছাপাইয়া বাহিরে আসিতেছে, পরাজয়ের সমস্ত গ্লানি এতক্ষণে নিঃশেষে ভাসিয়া গিয়াছে। রামেশ্বর বলিলেন—মঞ্জরী রইলেন। দিনের বেলায় নয়—কাল সন্ধ্যার পর আঁধারে আঁধারে বজরায় ওঁকে পৌঁছে দিও। আমি দেউলের দরজায় প্রতীক্ষা করব—

মধুকর বলিল—এখনই যাচ্ছেন কেন? আপনি বড় ক্লান্ত, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন।

রামেশ্বর কহিলেন—অবসর কোথা ভাই? এখনও মন্দিরের চূড়ায় সোনার কলসী বসানো হয় নি, কত কাজ বাকী—। কাল দেবীর প্রতিষ্ঠা হবে; এর মধ্যে প্রস্তুত হতে হবে ত?

হাসিয়া তখনই তিনি রওনা হইয়া গেলেন।

দীঘির জল কাকচক্ষুর মত টলমল করিতেছে; সকালের সোনার আলোয় দেউল জলের উপর ছায়া ফেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া রায়রায়ান অসমাপ্ত কাজটুকু সমাধা করিতে লাগিয়া গেলেন। লোকজন আর বেশী নাই, অনেকেই বিদায় হইয়া গিয়াছে। দেউল শীর্ষে সোনার কলসী বসানো হইল, সারচন্দনে সমস্ত প্রকোষ্ঠ অনুলিপ্ত করা হইল, সহস্র ঘৃতের দীপ সাজানো হইল—রাত্রে জ্বালান হইবে, ডিঙার পর ডিঙা ভরিয়া আসিতে লাগিল পাক্‌সী বিলের সমস্ত পদ্মফুল।

—এত ফুল?

রায়রায়ানের পূজায় লাগিবে।

রাত্রির দুই প্রহর অতীত হইয়াছে। রায়রায়ানের গুপ্ত পূজা, সেজন্য সন্ধ্যার আগেই সমস্ত লোক দেউল হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে, আর কেহ নাই। লোকালয় হইতে বহু দূরে প্রকাণ্ড বিলের নিঃশব্দ পাষাণপুরীর মাথায় অনন্ত তারকাশ্রেণী। কক্ষের দীপাবলী একের পর এক নিবিয়া আসিতেছে, হু-হু করিয়া নৈশ বাতাসে বিলের জল ছল-ছল করিয়া উঠিতেছে, রামেশ্বর ছুটিয়া জলের প্রান্তে গিয়া দাঁড়ান; বুঝি বজরা আসিয়া ভিড়িল। আবার মেঘ জমিয়া তারা ঢাকিয়া অন্ধকার নিবিড়

হইয়া আসিতেছে। সহসা রামেশ্বরের মনে হইল, মরিয়া প্রেত হইয়া তিনি যেন নির্জ্জন দ্বীপভূমিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন—কণ্ঠে ধ্বনি নাই, পদতলে মৃত্তিকা নাই, অন্ধকার ছাড়া দৃষ্টি করিবার বস্তুও কিছু নাই, প্রবল প্রবাহশীল অনন্ত বায়ুমণ্ডলে তিনি হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছেন। অন্তরাত্মা সত্য সত্যই তাঁহার কাঁপিয়া উঠিল, হা-হা-হা করিয়া অকস্মাৎ উদ্দাম হাসির সঙ্গে অমূলক ভয় ভাঙিতে চেষ্টা করিলেন। মনে হইল, দূরের মসীকৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্য দিয়া জলরাশি উত্তাল তাড়নে ভেদ করিয়া দ্রুতবেগে কি যেন আগাইতেছে। দুই চক্ষের সমস্ত দৃষ্টিশক্তি পুঞ্জিত করিয়া অন্ধকারের দিকে নির্নিমেষ চোখে চাহিয়া অধীর কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—মধুকর! মধুকর!

ফিরিয়া আসিয়া আবার দ্বারপ্রান্তে বসিলেন। দীপ নিবিয়া গিয়া অন্ধকারের মধ্যে বিশাল সৌধবক্ষ অপরূপ রহস্যাবৃত দেখাইতেছে। বাতাস উঠিয়াছে। ঝড়ের বাতাস নৈশ নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া নবনির্ম্মিত দেউলের পাষাণপ্রাচীরে আর্ত্তক্রন্দন তুলিয়া দাপাদাপি করিতে লাগিল। ...ক্রমে রামেশ্বর কোন সময়ে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

হঠাৎ বৃষ্টি-সিক্ত শীতল হস্ত আসিয়া লাগিল বাহুর উপর। মুহূর্ত্তে চমকিয়া জাগিয়া বলিলেন—এলি? চোখ মুছিয়া দেখিলেন,—মধুকর নহে—জীবনলাল। জীবনলাল নমস্কার করিল। উঠিয়া বসিয়া গম্ভীর কণ্ঠে রায়রায়ান বলিলেন—আবার ইসলামাবাদ গিয়েছিলে না? কবে ফিরলে?

জীবনলাল বলিল—আজ। সেখানে সমস্ত ঠিক করে এসেছি। ছোটখাট গড়ের পত্তন হয়েছে—

একটু বিরক্তির সঙ্গে রায়রায়ান বলিলেন—সে-কথা আমার সঙ্গে কেন দেওয়ানজী, ছোট রায়ের সঙ্গে বলো।

জীবনলাল আবার নমস্কার করিয়া বিনীত কণ্ঠে বলিল—তিনি চলে গেছেন সেখানে। আমি শুধু খবরটা দিতে এসেছি—

—মঞ্জরী তাহলে তোমার সঙ্গে এলেন? ব্যস্ত হইয়া রামেশ্বর উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

জীবনলাল বলিল—না প্রভু, তিনিও স্বামীর সঙ্গে গেছেন। ছোট রায় সেই খবর দিতে আমায় পাঠিয়ে দিলেন।

নিবিড় অন্ধকারে কেহ কাহারও মুখ দেখিতে পাইলেন না। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, দু-জনেই পাষাণ মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া আছেন। তারপর রায়রায়ান বসিলেন। হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিলেন—মধুকর কি বলে পাঠাল?

—তিনি বললেন, মঞ্জরী তাঁর বাগদত্তা বধূ—আট মাস আগে রামনগর প্রাসাদের অলিন্দে চন্দ্র-সূর্য্য সাক্ষী করে গোপনে তাঁদের মালা বদল হয়েছিল। ভরত রায়ের কঠোর শাসন থেকে তাঁকে ছিনিয়ে আনা—আপনি আর আপনার কুণ্ডল ছাড়া জগতে আর কারও সাধ্য হত না। কৃতজ্ঞ চিত্তে তিনি তাই আপনাকে প্রণাম পাঠিয়েছেন।

—বেশ, বেশ! বলিয়া বিল কাঁপাইয়া রামেশ্বর আবার হাসিয়া উঠিলেন। —আর রাণী মঞ্জরী—তিনি কিছু বললেন?

জীবনলাল বলিল—রাণী বলে পাঠিয়েছেন, বাধ্য হয়েই তাঁকে আপনার সঙ্গে একটু ছলনা করতে হয়েছিল। আপনি তাঁকে ক্ষমা করবেন।

ভোর হইয়া গেলে জীবনলাল বিদায় লইতে আসিয়া দেখিল, রামেশ্বর জলের দিকে নিবিষ্ট মনে চাহিয়া আছেন। পদশব্দে মুখ তুলিয়া চাহিলেন; বলিলেন—জলে কেমন ছায়া পড়েছে দেখ। আমারও ছায়া পড়েছে—বড্ড বুড়ো হয়ে গেছি, না?

কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, পাগলের মত।

জীবনলাল বলিল—প্রভু, বিদায় দিন এবার—ইসলামাবাদ যাব।

—এখনই?

—হাঁ। নতুন রাজ্য গড়ছি, অবসর নেই। আশীর্ব্বাদ করুন রায়রায়ান, এবার যেন সফল হই।

রামেশ্বর গভীর কণ্ঠে আশীর্বাদ করিলেন। তারপর বলিলেন—আর একটা কাজ করে দিয়ে যাও, দেওয়ান মশাই। যারা দেউল গড়তে এসেছিল, তারা রামনগরে এখনও পুরস্কারের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছে। তাদের একবার এখানে পাঠিয়ে দিয়ে যাও—কাজ আরও বাকী আছে।

লোকজন আসিয়া পড়িল। রৌদ্রোজ্জ্বল দেউল-চূড়ায় সোনার কলসী ঝক-ঝক করিতেছে, রামেশ্বর দেখাইয়া ইঙ্গিত করিলেন নামাইয়া আনিতে। কাল এমনি সময়ে কত কষ্টে কত কৌশলে কলসী ওখানে বসান হইয়াছে, গাঁইতি দিয়া খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া আবার তাহা খসাইয়া আনা হইল। কলসী উপুড় করিয়া তাহার উপর বসিয়া রামেশ্বর হুকুম দিলেন—ভাঙো দেউল।

রায়রায়ান প্রকৃতিস্থ নাই, সকলেই বুঝিল। কেহ অগ্রসর হইল না। রামেশ্বর পুনরায় বজ্রকণ্ঠে হুকুম দিলেন। কয়েকজন রামনগরে ছুটিল খবর দিতে, কাল রাত্রে পূজা করিতে গিয়া রায়রায়ান একেবারে উন্মাদ হইয়া গিয়াছেন। রামেশ্বর কলসী লইয়া ছুটিলেন কক্ষের মধ্যে; কুলুঙ্গির টানা খুলিয়া সঞ্চয়ের অবশেষ সমস্ত সুবর্ণ-মুদ্রা বোঝাই করিয়া টানিতে টানিতে বাহিরে লইয়া আসিলেন। চীৎকার করিয়া কহিলেন—ভাঙো দেউল, ভাঙো দেউল—। মুঠি মুঠি করিয়া স্বর্ণমুদ্রা সকলের কোলে ঢালিয়া দিতে লাগিলেন, স্বর্ণ মুঠি নুলি মুঠির মত ছড়াইতে লাগিলেন; বলিতে লাগিলেন—ভাঙো, ভাঙো, ভাঙো—। তারপর নিজেই গাঁইতি লইয়া উপরে উঠিলেন।

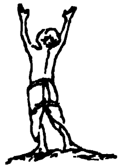
ঝুপ ঝুপ শব্দে ইট-পাথর টুকরা টুকরা হইয়া পড়িতে লাগিল। মাসের পর মাস বাটালির আঘাতে পাষাণখণ্ডগুলি জীবন্ত প্রতিমার রূপ ধরিয়াছিল। বৃদ্ধ রতনদাস শিল্পীদের সর্দার। নিজে সে গাঁইতি ধরিতে পারিল না, প্রাঙ্গণের এক ধারে দাঁড়াইয়া চক্ষু মুছিতেছিল। উন্মাদ রামেশ্বর নামিয়া আসিয়া তাহাকে দেখিলেন। দেখিয়া মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল। তাহার মুখের উপরে অতি সন্নিকটে মুখ আনিয়া রামেশ্বর বলিতে লাগিলেন—কাঁদছ কেন? চুল পেকেছে বলে? এস আমার সঙ্গে—

কেহ কিছু বুঝিবার আগেই বিশাল তরঙ্গায়িত ঘোড়াদীঘির তলহীন ঘনকৃষ্ণ জলরাশির মধ্যে রামেশ্বর ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। হায়-হায় করিয়া আকুল চীৎকার উঠিল। শত শত লোক তাঁহাকে ধরিতে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

এখন যুদ্ধ-বিগ্রহের দিনকাল নাই। সেকালের দুর্দ্ধর্ষ চাকলাদারেরা মরিয়া গিয়াছে; সুস্থ স্বচ্ছন্ন নিরুদ্বিগ্ন বাংলাদেশ। সেই অগ্নিবর্ষী তোপগুলিরও পরমগতি লাভ হইয়াছে। কামারের আগুনে পুড়িয়া কতক হইয়াছে কয়েদীর বেড়ি কিংবা রাস্তা তৈরির রোলার; কতকগুলি নদীর পলিমাটিতে একেবারেই লুকাইয়া গিয়াছে। গ্রামে ঘুরিতে ঘুরিতে তবু কদাচিৎ ধূলামাটি-মাখা দু-একটার হঠাৎ দেখা পাইয়া যাইতে পার। হয়ত কোন অশ্বত্থতলায় বিলুপ্ত-বংশ প্রাচীন অতিকায় কঙ্কালের মত রোদ-বৃষ্টির মধ্যে পড়িয়া আছে, মহাকাল পদাঘাতে ঠেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে, ইদানীং রাখালেরা গরু ছাড়িয়া দিয়া তাহার উপরে বসিয়া বাঁশি বাজায়। এমনি একটা কিল্লাবাড়ির ঘাটের উপর পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিতে পাইবে। সেইটা থাকায় ডোঙা বাঁধার বড় সুবিধা হইয়াছে।

কিন্তু, সাবধান। ফুটফুটে জ্যোৎস্না দেখিয়া রাত্রে কোনদিন ঐ ঘাট হইতে ডোঙা খুলিয়া দিও না, সহস্র সহস্র ফুটন্ত শাপলা তোমাকে দিগভ্রান্ত করিবে। লগি ঠেলিতে ঠেলিতে হঠাৎ এক সময়ে পাষাণ-স্তূপে ধাক্কা খাইবে, তাকাইয়া দেখিবে—একেবারে রায়রায়ানের দেউলের কাছে আসিয়া পড়িয়াছ। নিষুপ্ত রাত্রে দ্বীপের উপর তালগাছের ফাঁকে ফাঁকে তেরছা হইয়া পড়া জ্যোৎস্না... হঠাৎ বাতাস উঠিয়া নলবন বাজিয়া উঠিবে; মনে হইবে, নির্জ্জন ধ্বংসাবশেষ দেউলে রায়রায়ান হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছেন। ত্রস্ত হইয়া যেদিকে ডোঙা ঘুরাইবে, দেখিতে পাইবে সেকালের প্রস্তরীভূত অসংখ্য অপ্সরা, ময়ূর ও পদ্মফুল। অল্প অল্প মাথা তুলিয়া তাহারা তাকাইয়া থাকিবে, আলেয়ার মত পথ ভুলাইয়া সমস্ত রাত্রি তোমাকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইবে—ফিরিবার পথ খুঁজিয়া পাইবে না।

৩৩ বর্ষ, ফাল্গুন ১৩৪০



আরোগ্য-স্নান

প্রমথনাথ বিশী

সে আমাদের সঙ্গে একই ইস্কুলের একই ক্লাসে পড়িত—তার নাম ছিল রামতনু। কিন্তু ছেলেরা নামটির পূর্ব্বে ছোট একটি উপসর্গ জুড়িয়া দেওয়াতে তাহা দাঁড়াইয়া ছিল—আরামতনু। এই নূতন নামকরণে কোন পক্ষের যে দোষ তাহা লইয়া বাদানুবাদ করিবার পূর্ব্বে ইহার ইতিহাসটুকু শুনিলে বিচারে সাবধান হওয়া যাইতে পারে।

আমাদের ইস্কুলটিতে এত বিভিন্ন-প্রকারের ছেলে আছে যে হঠাৎ ইহার উপমা মেলে না। এই অসংখ্যপ্রকার বিভিন্নতার মধ্যেও রামতনু স্বীয় ব্যক্তিত্বটিকে খর্ব্ব হইতে দেয় নাই। দারুণ গ্রীষ্মের দুপুর বেলায় যখন সকলে গায়ের কৃত্রিম আবরণ খুলিয়া ফেলিয়া চামড়াখানি পর্য্যন্ত খুলিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তখন সে তার ঘাড়ের কাছে তেলে-মলিন হাতের কাছে সূতা বাহির-করা প্রাচীন আলপাকার কোটটি গায়ে দিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া ইংরেজী গ্রামার পড়িত! যদি জিজ্ঞাসা কর এই ব্যবহারের অর্থ কি—তবে প্রবীণ বৈজ্ঞানিকের মত সে পেন্সিলটি নাড়িয়া উত্তর দিবে যে বাহিরের তাপের সহিত শরীরের আভ্যন্তরীণ তাপের সমতা রক্ষা না করিয়া চলিলে উৎকট ব্যাধি-বিশেষ জন্মাইবার আশঙ্কা আছে।

তাহার শুইবার ঘরে গেলে দেখা যায় ছোট বড় মাঝারি লাল নীল কালো স্বদেশী বিদেশী নানা-রকমের ঔষধের শিশি সাজানো, সেটি একটি ছোটোখাটো ঔষধালয় বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাইতে কেহ তাহাকে দেখে নাই—কারণ তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ যখন পরিমাণে অল্প এবং স্বাদে বিকৃত নয় তখন উহা ঔষধের মধ্যে গণ্য হইতেই পারে না। যেহেতু যে ঔষধ পরিমাণে যত বেশী এবং আস্বাদনে যত বিকৃত, রোগের পক্ষে তাহা ততই অধিক বজ্র-স্বরূপ। রাত্রিবেলা তাহাকে স্মেলিং সল্টের শিশিটি লইয়া বারেবারে ঘ্রাণ গ্রহণ করিতে দেখা যায়। শুইবার সময় তিন-চারিটি ঔষধের শিশি তাহাদের উৎকট গন্ধ লইয়া তাহার নিদ্রা পাহারা দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। কারণে এবং অকারণে ঔষধ খাইতে কেহ তাহার এতটুকু আপত্তি কখনো দেখে নাই। যখন সে প্রথমে ইস্কুলে আসিয়াছিল তখন তাহার কণ্ঠদেশে ও বাহুতে একরাশি ছোট বড় মাদুলি ছিল; বিশেষতঃ কণ্ঠেরটিকে ছোটো-খাটো একটি ঢোলক বলিলেও বেমানান হয় না। ইস্কুলের ছেলেদের বচনকে সে বেশী ভয় করিত না—কিন্তু পাছে তাহারা এই অক্ষয়-কবচগুলি অপহরণ করে এই ভয়ে সমস্ত মাদুলিগুলি বস্ত্রান্তরালে তাহার কোমর-দেশে একটি মেখলার সৃষ্টি করিয়াছিল। শীতের দেশে দক্ষিণের বাতাস দিতেই যেমন পৃথিবী রং-বেরঙের ফুলে ভরিয়া যায়—তেমনি যেমন একটু শীতের হাওয়া দিয়াছে অমনি রামতনুর বাক্সের ভিতর হইতে লাল নীল ফ্লানেলের টুকরা বাহির হইয়া তাহার শরীরের নানাস্থান অধিকার করিয়া বসে। জ্যোৎস্নারাত্রিতে যখন আর-সকলে বাহিরে গল্প গুজব গান বাজনা করিতেছে, তখন রামতনু মাথায় কাপড় জড়াইয়া খড়ম পায়ে দিয়া পড়িতে বসে। জানলাটা ভালো করিয়া ভেজাইয়া দেয়—আর মশা মারিতে গিয়া গালের উপরে সুজোরে চপেটাঘাত করে। মোট কথা, এ জগতে যত ঠাণ্ডা মশা মাছি ধূলা আবর্জ্জনা, সকলেরই যেন একমাত্র লক্ষ্য দীন-হীন রামতনু!

(২)

এত সাবধান থাকিতেও রামতনুর আজ দুইদিন হইল জ্বর হইয়াছে। ডাক্তার দিনের মধ্যে চারবার আসে। খাটের উপর অগাধ লেপের তলায় রামতনু—একপাশে তাহার মুখখানা দেখা যায় ফ্লানেল ও কাপড়-জড়ানো। অন্ধকার রাত্রে যেমন ষ্টেশনের দুই পাশে তাকাইলে সিগ্‌নালের লাল নীল আলো দেখা যায়—তাহার খাটের চারিপাশে সেইরকম লাল নীল নানা-রকমের ঔষধের শিশি রোগকে বিভীষিকা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছে।

পূর্ণিমা রাত্রি। ধরণী-গগনের কানায় কানায় জ্যোৎস্নার আলো ভরিয়া উঠিয়াছে—কোথাও এতটুকু ফাঁক নাই। মাঠের মধ্যে চাঁদের আলো স্বর্গের আভাসের মত কাঁপিয়া উঠিতেছে। দূরে দিকচক্রবালে বনরেখা নিবিড়-রহস্যময়। অদূরে নদীর জলে আলো পড়িয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। বাতাসে গাছের পাতা মৃদুশব্দে কাঁপিতেছে, যেন ঘুমন্ত পৃথিবী স্বপ্নের ঘোরে কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছে। শেফালির গন্ধ, বাঁশীর সুর, নদীর কলতান আকাশ জুড়িয়া ভাসিতেছে!

হঠাৎ বাতাসে রামতনুর ঘরের জানলাটা একটু খুলিয়া গেল। তাহা বন্ধ করিবার জন্য রামতনু অতিকষ্টে উঠিয়া জানলার ধারে গেল। সহসা বাহিরে তাহার দৃষ্টি পড়িল—এক মুহূর্ত্তে তাহার মনে হইল যে সে মুক্তি-সাগরের তীরে আসিয়াছে। এ কী, আনন্দ! ঘরের ভিতরটিতে শোক-দুঃখ-ব্যথা রোগের যন্ত্রণা; আর বাহিরে ওই চাঁদের আলোয় স্বর্গের কি স্বপ্ন মাখানো আছে। নদীর জলে কি অমৃত, তার কলতানে কি আহ্বান, বাতাসে কি পরশ, আহা আকাশে কি পুলক! রামতনু অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল দূরে কে একজন গান করিতেছে। একবার ভাবিল—ও মানুষ না প্রেত? হঠাৎ তাহার বুকের মধ্যে ছাঁৎ করিয়া উঠিল। কিন্তু তার পরের মুহূর্ত্তেই গানের ভাষা বুঝিল—গানের একটি পদ একটি ছেঁড়া ফুলের মত ভাসিয়া আসিল—"তারা চাঁদের চোখে চমক হেনে যায় চলে।" রামতনু একবার ভাবিল যাই নামিয়া ওই শান্তি-স্বর্গের নন্দন-কাননে। ওখানে রোগের জ্বালা জুড়াইবার অমৃত আছে। কিন্তু জানলার লোহার গরাদে তাহাকে বাধা দিল। সহসা কল্পনার স্বপ্নরাজ্য কঠিন বাস্তবের স্পর্শে চূর্ণ হইয়া গেল। এতক্ষণ জানলার কাছে দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া রামতনু নিজেই অবাক হইল; তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ করিয়া দিয়া একবার ঘড়ি দেখিল; তারপর একমাত্রা ঔষধ খাইয়া লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল!

পরদিন সকালবেলা রামতনু জাগিয়া ভাবিতে লাগিল কাল রাত্রির ঘটনা সত্য না স্বপ্ন! যদি স্বপ্ন হয় তবে কী ভীষণ স্বপ্ন! নিশিভূতে পাওয়া একেই বলে। আর সত্য হইলে ইহার অপেক্ষা হাসির কাণ্ড আর হয় না। মাঝে মাঝে নিজের দুর্ব্বলতা স্মরণ করিয়া রামতনু হাসিতে লাগিল। এই-রকম ভাবনা-চিন্তার দোলায় দোলায় তার সকালটি কাটিয়া গেল। দুপুর-বেলা সমস্ত প্রান্তরখানি তপ্ত রৌদ্রে স্নাত; মনে হইতেছে যেন কোন্ স্বর্গীয় এক মধুচক্রের মধু ঝরিয়া পড়িতেছে—সমস্ত ধরণী তাই মধুর মনে হইতেছে। রামতনু জান্‌লার ফাঁক দিয়া তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিল—উদাস প্রান্তর আকাশের শেষ পর্য্যন্ত শুইয়া পড়িয়া রহিয়াছে;—রৌদ্রের রং কাঁচা সোনার মত; আকাশের রং গভীর নীল; —বনরাজি রৌদ্রতাপে গভীর শ্যামবর্ণের মত দেখাইতেছে;—নূতন ধানক্ষেতের সবুজটুকুর তুলনা নাই। মাঠের মধ্যে গরু চরিতেছে, রাখাল বটের ছায়ায় বসিয়া বাঁশি বাজাইতেছে, অদূরে যেখানে বর্ষার জলে ক্ষয় হইয়া কাঁকর বাহির হইয়া পড়িয়াছে সেই রক্তবর্ণ অনুর্ব্বর ভূখণ্ডে রৌদ্র-মরীচিকা কাঁপিয়া কাঁপিয়া কি অসীম রহস্য আনয়ন করিয়াছে! সেই রৌদ্রকরুণ শরৎ-মধ্যাহ্নটির ছবি, দূরের শ্যামায়মান বেণুবনের ব্যাকুল কম্পন যেন রোগ-যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট অতিসাবধানী ওই রামতনুকেই ডাকিতেছে। রামতনু মুগ্ধনয়নে শয্যার উপর বসিয়া বসিয়া শরতের খেলা দেখিতে লাগিল। ক্রমে বেলা পড়িয়া পড়িয়া সন্ধ্যা হইয়া অবশেষে রাত্রি আসিল। আঃ! জ্যোৎস্নাময়ী রজনী! ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে রামতনুর ঘরের জানলা বন্ধ। সে ভাবিতে লাগিল জানলা খুলিয়া দিবে কিনা? কিন্তু পাছে ঠাণ্ডা লাগে এই ভয়ে জানলা খুলিয়া দিল না। কত কি ভাবিতে ভাবিতে অবশেষে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

রাত্রে জ্বরের ঘোরে রামতনু স্বপ্ন দেখিল। যেন সে একটা অন্ধকার ঘরে বন্ধ। ছোট্ট ঘর। আলো বাতাস এত কম যেন তাহা কোন দুর্ভিক্ষ-পীড়িত রাজ্য হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। ক্রমে মনে হইতে লাগিল যেন তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে। সে যখন বাতাসের জন্য চীৎকার করিতেছে তখন রাশি রাশি ফ্লানেল-কোট, কম্ফর্টার, ঔষধের শিশি, ডাক্তারের বিল ঝরিয়া পড়িতেছে। জলের জন্য ছাতি ফাটিয়া চীৎকার করিতেছে, তখন এক শিশি কুইনাইন-মিক্‌শ্চার—উঃ কি তিতো! আলো যখন চাহিল তখন অন্ধকার—ঝুড়ি ঝুড়ি অন্ধকার, অমাবস্যা রাত্রির অন্ধকার, দিনের তালতলীর

ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, পোকার গর্ত্তের অন্ধকার, বটের ছায়ার অন্ধকার পড়িতে লাগিল। দূরে একটি আলো জ্যোৎস্না-রাত্রির তারার মত ক্ষীণ, ক্ষীণ দীপশিখার মত অনুজ্জ্বল। ক্রমে তাহা বড় হইতে লাগিল। অবশেষে রামতনুর মনে হইল সে একটি জানলার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাকাইয়া দেখিতে পাইল বাহিরে জ্যোৎস্নার আলোয় কত লোক খেলা করিয়া গান করিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের কি আনন্দ! কি মুক্তি! এমন সময় মনে হইল ঔষধের শিশিগুলি গড়াইয়া গড়াইয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। রাস্তা যেমন রোলারের ভারে সমান হইয়া যায়, তাহাকেও সেইরূপ করিবার ইচ্ছা। সে এক লাফ দিয়া যেন ঘরের বাহিরে আসিয়া পড়িল।

বাহিরে লাফাইয়া পড়িয়াই রামতনুর মনে হইল সে ফিভার-মিক্‌শ্চারের মস্ত বড় একটা নীল শিশির মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে, সেই ঔষধের তলানি সবুজ, থিতানি সোনালি, আগুনের ফুলকির মতন তার বুদ্বুদ! রামতনু আরামে তনু ঢালিয়া সেই ঔষধসমুদ্রে অবগাহন করিতে লাগিল। তার জ্বরের জ্বালা, অসুখের সন্তাপ যেন অমৃত স্নানে জুড়াইয়া গেল। রামতনু আরামে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আঃ! যেমন অসুখ, তেমনি ঔষধ, তেমনি তার বোতল—সব বিরাট! ধন্বন্তরির ঔষধ-সমুদ্রের নীল বোতলে তার আজ আরোগ্যস্নান হইতেছে! তার এক সহপাঠী সানন্দে রামতনুর পিঠে বিরাশি সিক্কার ওজনে এক চড় বসাইয়া বলিল—আরামতনু, আজ হিমে যে!

রামতনু জাগিয়া দেখে সে মুক্ত আকাশের তলে দাঁড়াইয়া—জ্যোৎস্নাপ্লাবনে তার সর্ব্বাঙ্গ পরিস্নাত হইয়া যাইতেছে। সে স্বপ্নাবিষ্টের মত কোট কম্ফর্টার খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া একা সুদূর নির্জ্জন মাঠের মধ্যে ছুটিয়া চলিয়া গেল। বাহিরে তখন পূর্ণিমার পূর্ণ চাঁদ সারা রাত্রির জাগরণে লাল রঙের হইয়া আকাশের সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে লালের বর্ণনা করা যায় না। জ্যোৎস্নাতে তারাগুলি দেখা যাইতেছে না—যেন তাহারা অরুণের রথের সাড়া পাইয়া এক ঝাঁক পাখীর মত উড়িয়া গিয়াছে। কেবল শুকতারাটি অতি অস্পষ্টভাবে আসন্ন-বিধবা রমণীর ভালে অনুজ্জ্বল সিন্দূরবিন্দুর মত জ্বলিতেছে! ভোরের শীতল উত্তরে হাওয়াটি নদীর উপর দিয়া, ধানক্ষেতের উপর দিয়া, শিশিরের স্নিগ্ধ স্পর্শ বহিয়া, শিউলির গন্ধ মাখিয়া বহিয়া আসিতেছে। ঘাসে ঘাসে শিশির পড়িয়া কেমন সুন্দর ও স্নিগ্ধ দেখাইতেছে। রামতনু ভোর পর্য্যন্ত পাগলের মত মাঠে মাঠে ধান-ক্ষেতে কাশবনে নদীর তীরে শিউলিতলায় ঘুরিয়া বেড়াইল। মুক্তির স্বাদ সে পাইয়াছে।

দুপুর-বেলায় ডাক্তার রামতনুকে দেখিতে আসিল। তাহার আর সে ভাব নাই—সে অনাবৃত অঙ্গে বসিয়া আছে, মুখে তাহার মুক্তির আভাস। ডাক্তার হাত দেখিয়া বলিল—জ্বর নাই, অসুখ সারিয়া গিয়াছে। অন্য সকলে ডাক্তারের কাছে গত রাত্রির ঘটনা উল্লেখ করিল, তাহাই অসুখ সারিবার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিল। কিন্তু বিজ্ঞ ডাক্তার তাহা কানেই তুলিল না—কেবল মাথা নাড়িয়া বলিল—"বটে বটে! যে ওষুধ দিয়েছিলাম, অসুখ না সেরে যায় কোথায়!"

২৪ বর্ষ, বৈশাখ ১৩৩১



তারকার জন্ম

গোপাল হালদার

অবশেষে একদিন এই একান্ত-অপরিচিত গ্রামখানায় আসিয়া নামিলাম।

প্রথম প্রথম স্কুলের কাজ চুকিয়া গেলে আমি আমার ছোট ঘরের তক্তপোষের উপর পড়িয়া একবার অতীত দিনের সামান্য স্মৃতিগুলিকে মনে মনে নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতাম। নগণ্য জিনিষ, তুচ্ছ কথা, ঘটনার অর্থহীন টুক্‌রা, ক্ষণিকের চাহনি, বন্ধুর লঘুহাস্য, আত্মীয়-পরিজনের স্নেহ-সম্ভাষণ মনের অযত্নবিন্যস্ত ভাণ্ডারে কখন কোনটি জমা হইয়াছিল জানা নাই। এই নূতন জীবনযাত্রার নিঃসঙ্গতার মধ্যে ইহাদের যেন নূতন করিয়া পাইতাম—চিরদিনকার আত্মীয় যেন পাশে আসিয়া বসিত।

সপ্তাহ-দুই পরে আর অবসর পাইতাম না। জগদীশবাবুর ভৃত্য মধুসূদন আসিয়া জানাইত—চা প্রস্তুত। স্মৃতির চিত্রশালার আর দ্বার খুলিবার অবসর থাকিত না, শহরে জীবনের ছিন্ন স্বপ্নগুলি দিয়া আর অপরাহ্নের শূন্যতা ভরিবার প্রয়োজন হইত না। যাই—বলিয়া উঠিয়া মধুর অনুসরণ করিতাম।

নারিকেল গাছের ফাঁকে জগদীশবাবুর বাড়ী দেখা যায়। নদীপারের প্রকাণ্ড মাঠের সম্মুখে স্কুলের ঢেউখেলানো টিনের লম্বা ঘর। মাঠের একপার্শ্বে নারিকেল গাছের আড়ালে হেডমাষ্টার জগদীশবাবুর বাড়ী, খান তিন-চার ছোট ও মাঝারি টিনের ঘর, আর এক পার্শ্বে, বাঁশবনের সম্মুখের বাড়ী এসিষ্টেন্ট হেড্‌মাস্টার আমার,—খান-দুই নাতিবৃহৎ ঘর।

মাঠ পার হইয়া তাঁহার গৃহে যাইয়া বসিতাম। জগদীশবাবু ডাকিতেন, "নিমু মা, পরেশবাবু এসেছেন। চা-টা"—কন্যা নির্ম্মলা চা লইয়া আসিত। যে-দিদি মাতৃহীনা এই মেয়েটি ও পত্নীহীন এই বৃদ্ধটিকে সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, চা'এর উপর তাঁহার নিরতিশয় অশ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু, ভাগ্যক্রমে নির্ম্মলা চা তৈয়ারীতে হইয়া উঠিল সুপটু; তাই জগদীশবাবুর অসুবিধা হইল না—এমন কি চা-রসিক পাইলে জোর করিয়া তাহাকে নিজ গৃহে সন্ধ্যায় চা না খাওয়াইয়া ছাড়িতেন না। কিন্তু বেশী দিন কেহ এই সদাব্রতের সুখ ভোগ করিতে স্বীকৃত হইত না; তাহার কারণ চা'এর সঙ্গে এই সময়ে অতিথিকে জগদীশবাবুর তত্ত্বকথাও পান করিতে হইত।

সপ্তাহ দুই গেল। তারপর চা'এর পেয়ালাটি আগাইয়া দিয়া জগদীশবাবু আমাকেও বলিতে শুরু করিতেন 'তারপর'—

তারপর আর কিছু নয়, সেই পূর্ব্বদিনের আলোচনা—দেহবিচ্যুত মানবাত্মা দেহাতীত সত্তা লইয়া কোথায় অবস্থান করে, কিরূপে পৃথিবীর এক একটি স্মৃতি ও সংস্কারের নির্মোক খসিয়া যায়, কিরূপে লঘু স্বচ্ছ তরঙ্গায়িত বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া সেই মানবাত্মা অনন্ত শূন্য পারাবারে ভাসিয়া ভাসিয়া চিরস্বচ্ছ চিরানন্দময় শান্তিলোকে আসিয়া পৌঁছায়। সেই আত্মা চিরঅম্লান, চিরজ্যোতিঃস্নাত, সৌর-কিরণের নিত্য অভিষেকে তাঁহার শান্ত সমাহিত শক্তি, তাহা সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ববিসর্পিত চেতনাসমৃদ্ধ। আমি শুনিয়া যাইতাম, কৌতুক ও কৌতূহল বাড়িয়া উঠিত, মাঝে মাঝে সহজ অনাস্থায় দুই একটি প্রশ্ন করিয়া বসিতাম। সস্নেহে হাসিয়া বৃদ্ধ বলিতেন, "নিমু আর দু' পেয়ালা চা"—তারপর আবার আমার সন্দেহ-নিরসনে প্রবৃত্ত হইতেন।

নির্ম্মলা দুয়ারের পার্শ্বে বসিয়া অতৃপ্তকর্ণে শুনিত, পিতার ডাকে তাহার চমক ভাঙিলে উঠিয়া চা'এর ব্যবস্থা করিতে যাইত। খানিক পরে চা লইয়া আসিয়া আবার পূর্ব্বস্থানটিতে নিবিষ্টমনে বসিয়া পড়িত। দুয়ারের আড়ালে মাটির উপর তাহার একখানা হাত দেখা যাইত, মাঝে মাঝে মুখের একটি পাশ ও দুই একটি অলকগুচ্ছ চোখে ঠেকিত। বাক্যস্রোত বাড়িয়া চলিত, রাত্রি গভীর হইয়া আসিত

বিপত্নীক বৃদ্ধের কণ্ঠে আমি যেন একটি প্রগাঢ় আস্থা ও অতি আয়াসলব্ধ সান্ত্বনার সুর শুনিতে পাইতাম। তাই, দুই-চারিদিন পরেই আমার তর্কের ইচ্ছা ও কৌতুক-বাসনা নিঃশেষ হইয়া গেল। শুনিতে শুনিতে আমিও তখন সশ্রদ্ধচিত্তে বলিয়া ফেলিতাম—ফুরায় নাই, ফুরায় নাই, পার্থিব বিয়োগ-বিরহের পরপারে অনন্ত শূন্যলোকের মধ্যেও আমাদের আনন্দ-বেদনার চেতনা, আমাদের স্নেহস্মৃতি সমস্ত মালিন্যমুক্ত হইয়া জ্যোতিঃতরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতেছে। আমাদেরই কামনা বেদনাময়, প্রেম বাষ্পময় জ্যোতিঃকণার মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনন্ত শূন্যলোকে এক একটি জ্যোতির্ম্ময় তারকা হইয়া ফুটিয়াছে, শেষ হয় নাই,—শেষ হইবে না, কাল হইতে কালে সেই ক্ষুদ্রতম তানটিও বাজিবে, ক্ষীণতম প্রেমের প্রদীপটিও দীপ্তি পাইবে!

বৃদ্ধের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত—যেন আমার এই সম্মতির মধ্যে তিনি একটা অখণ্ডনীয় যুক্তি পাইলেন। নির্ম্মলার স্থির শান্ত চক্ষুতেও সেই আশা ও আনন্দ প্রতিফলিত হইত, কৃতজ্ঞতায় তাহার দৃষ্টি স্নিগ্ধ হইয়া উঠিত, সে আর-একটু কাছে আসিয়া বসিত।

কোনও দিন বা জগদীশবাবু জ্যোতিষশাস্ত্রের কথা পাড়িতেন, আমাকে গ্রহ-নক্ষত্রের মর্য্যাদা বুঝাইতেন। এই সৃষ্টির বিরাট দেহে আমাদের পৃথিবী কতটুকু! চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ-নক্ষত্রের জপমালায় ইহাও একটি গুটিকা মাত্র, অভ্রান্ত তরঙ্গস্রোতের মধ্যে ইহাও একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গভঙ্গ। সৌরলোকের উৎসধারায় এই ধরিত্রী নিত্য অবগাহন করিতেছে, চান্দ্রলোকের শুভ্র মুকুরে নিত্য সে তাহার মুখখানি দেখিতেছে, গ্রহ-নক্ষত্রের সৈকত হইতে তাহার সৈকতে আমাদের চেতনাতীত, ধারণাতীত বাণীতে নিত্য আদান-প্রদান চলিতেছে। জীবজগতের ক্ষুদ্রতম জীবনটুকুর মধ্যেও কোন্ দূরদূরান্তরের অজানিত, অচিন্তিত, অকল্পিত, প্রভাব স্ফূর্ত্তিলাভ করিতেছে, কোন্ সুচিহ্নিত, সুনির্দ্দিষ্ট পরিণামের দিকে প্রতিমানবের জীবনকে তাহা টানিয়া লইতেছে,—আমাদের পরিমিত দৃষ্টি, পরিমিত জ্ঞান, অপরিচ্ছন্ন চেতনা তাহা বুঝিবে কি করিয়া?

আমিও বুঝিতাম না। গ্রহ-নক্ষত্রের সঙ্গে আমার পরিচয় অতি সামান্য; কিরূপে জীবজগতের কর্ম্ম ও জ্ঞান, আয়ু ও চেতনা জন্মক্ষণেই তাহারা নির্ধারিত করিয়া দেয়, সে পরিচয়ে তাহার সন্ধান আমি পাইতাম না। নব-নব নক্ষত্রের সৃষ্টি হইতেছে, মানবের চক্ষু নব-নব গ্রহের সন্ধান পাইতেছে; —ইহাদেরও কি প্রভাব আছে? সে-প্রভাবের সন্ধানও কি অতীতের মানব পাইয়াছিল? মানব-ভাগ্য কি তাহারা তখনো নিয়ন্ত্রিত করে নাই? আরো অজানিত কত গ্রহ-নক্ষত্র, আজও যাহারা মানবদৃষ্টির বাহিরে, তাহারাও কি তবে তেমনি করিয়া জীবজগতকে টানিতেছে না? —সন্দেহ ঘুচিত না, আমি প্রশ্ন করিতাম, তর্ক করিতাম, তর্ক জমিয়া উঠিত, জ্যোতিষশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যায় মিলন ঘটিত না। সহৃদয় বৃদ্ধের প্রাণে এমনি করিয়া ধীরে ধীরে জ্যোতির্লোকের সঙ্গে পরিচয়ের বাসনা জাগিয়া উঠিল—আমার সামান্য জ্ঞান পুঁজি লইয়াই আমি সে কার্য্যে অগ্রসর হইলাম।

সন্ধ্যাশেষে আমরা এখন ঘরের আঙিনায় আসিয়া দাঁড়াই, পিছনে পিছনে নির্ম্মলাও আসিয়া পশ্চাতে দাঁড়ায়। জগদীশবাবু বলেন—"মা নিমু, আমার চশমা-জোড়া ফেলে এসেছি যে।" নির্ম্মলা চশমা হাতে লইয়াই আসে, বস্ত্রাঞ্চলে একবার কাচ দুইখানা মুছিয়া পিতার হাতে তুলিয়া দেয়। তারপর বিচিত্র আকাশের দিকে চক্ষু মেলিয়া আমরা বসিয়া থাকি। রাত্রি গভীর হইয়া আসে, আকাশ প্রদীপ্ত তারকাপুঞ্জে রহস্যময় হইয়া উঠে, শেষে যখন গৃহে ফিরিবার জন্য উঠিয়া পড়ি তখন দেখি, আমাদের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, একটি সসম্ভ্রম বিস্ময়ে ও অকারণ শ্রদ্ধায় হৃদয় দোলা খাইতেছে। নির্ম্মলার শান্ত দৃষ্টি গভীর হইয়া উঠিয়াছে।

মাঠ পার হইয়া তেমনিভাবে ফিরিয়া আসি, নিঃসঙ্গ শয্যায় শুইয়া পড়ি। অদূরের নদীতে জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে জলধারা কলভাষী হইয়া উঠে, নৌকার মাঝিরা নির্ভাবনায় ভাটিয়ালী রাগিণী টানিতে থাকে, গানের কথাগুলি ধরিতে পারি না, ধ্বনিটি পাক খাইয়া খাইয়া আমার চারিদিকে ঘুরিয়া

বেড়ায়। খানিক দূরে বাজারের ঘাট হইতে অনেক অস্পষ্ট কণ্ঠ ভাসিয়া আসে, মাঝিদের শিঙ্গা থাকিয়া থাকিয়া শহরের যাত্রীদের আহ্বান করে, তারপর একবার 'গঙ্গামাই' বলিয়া একটা সমবেত জয়ধ্বনি —বুঝিতে পারি, শহর-গামী নৌকা ঘাট ছাড়িয়া ভাসিয়া পড়িতেছে। আবার নিস্তব্ধতা, একেবারে গাঢ়, অচেতন, জমাটবাঁধা,—শুধু ঝুপ্ ঝাপ্, ঝুপ্ ঝাপ্, দ্রুত দাঁড় পতনের শব্দ, ধীরে ধীরে তাহাও মিলাইয়া যায়। খানিকক্ষণ অসাড়—যেন চরাচর দিনান্তের পরম শ্রান্তিতে এলাইয়া পড়িয়াছে। তারপর আবার ধ্বনিময় জগতের প্রাণ প্রবাহের ছন্দ কানে আসিয়া পৌছায়। ঝিঁ ঝিঁ ডাকিতেছে, দুই একটা নাম-না-জানা নিশাচর পাখী পাখা ঝাপ্টা দিতেছে—কদাচিৎ তাহাদের অস্বাভাবিক নিম্নধ্বনি দূরে শুনিতে পাওয়া যায়। হয়ত কখনো বা স্কুলের মাঠে কোনো গৃহগামী গ্রামবাসীর সুরলয়হীন গীত ভয়ার্ত্ত কণ্ঠের অসহজ প্রকাশে কুণ্ঠিত হইয়া প্রতিধ্বনিত হয়। কখনো সব থামিয়া যায়—শুধু আমার ঘরের পিছনের বাঁশঝাড়ে আন্দোলিত বাঁশের বনে কেমন একটা শির শির, শির শির শব্দ চলিতে থাকে; সহসা বাঁশবনে তীব্র আর্ত্তনাদ উঠে, ঝিমন্ত মন চমকিত হয়। রাত্রি বাড়িয়া চলে, নিশীথ রাতের বাতাস উতলা হইয়া উঠে, নদীপাড়ের ঝাউ-সারের করুণ ক্রন্দনে নৈশ নিস্তব্ধতা যেন উচ্ছলিত হইয়া পড়ে, অকারণে একটি মৃদু বেদনা বুকে জমিতে থাকে। কখনো সেই ঝাউ-সারি হইতে গাংচিলের কর্কশ চীৎকারে বা বেলেহাঁসের বিলীয়মান শব্দ শোনা যায়। ঘরের বাঁশের বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্না চক্রাকারে প্রবেশ করে মাটির মেঝেয়, বিছানায়, শিয়রে, পদতলে, পাশের বেড়ায়, অন্ধকার ও আলোকের একটি অনির্ব্বচনীয় চিত্র লেপিয়া যায়। শিয়রের খোলা জানালায় খণ্ড আকাশে কয়েকটি তারা জ্বলিতে থাকে—অপলকনেত্রে তাহাদের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া আমি নিজেকে হারাইয়া ফেলি। অনন্ত শূন্যলোকে ইহারা কবে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে? কবে যাত্রা ইহাদের শেষ হইবে? ইহারাও কি জ্যোতিঃস্নাত মানবাত্মার মত নিত্যকালের যাত্রী? ইহাদেরও ঘিরিয়া কি নব-নব জীবনের নব-নব লীলা উদ্ঘাটিত হয়? ইহাদের তটেও কি দুঃখ বেদনার আনন্দ-জয়ধ্বনিব তরঙ্গ উঠিতেছে? না, মৃত্যুর অশেষ প্রবাহ ইহাদের স্পর্শ করে না? সেইসব অগণিত সৌরজগতে কি জীব নাই, দেহ নাই, প্রাণ নাই, শুধু মহাশূন্যের অক্ষুণ্ণ শূন্যতা নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছে? সৃষ্টির আদিক্ষণ হইতে এই বায়ুহীন, জীবহীন, শব্দহীন চিন্তায়, নিঃসন্তানা জগন্মালা সৃষ্টির অন্তিম নিমেষটি পর্যন্ত শুধু কি বন্ধ্যা নারীর অপার ব্যথা লইয়া এমনি অপেক্ষা করিবে?—নিঃসঙ্গ নির্লিপ্ত নির্বিশেষ সেই নক্ষত্রচয়ের একাকীত্বের কথা ভাবিয়া আমি'একক শয্যায় শিহরিয়া উঠি। আকাশেব আলোকের জোয়ারে দিনান্তে ভাটা পড়িয়া আসে, ঘনায়মান অন্ধকারের মায়া নিশীথ রাত্রে গাঢ়তর হইয়া উঠে, রাত্রিশেষে আবার আলোকের জোয়ার ফিরিয়া আসে,—অনন্ত কালস্রোতের মধ্যে শুধু এই তারকারা নীল সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জের মত অসাড়, নিশ্চল, জীবনচাঞ্চল্যহীন, শাশ্বত নিস্তব্ধতায় চিরকবলিত! মনে হয় নিরন্ধ্র অন্ধকার বুঝি আমায় ঘিরিয়া ধরিতেছে, আমি বুঝি চেতনাতীত রহস্যের মধ্যে তলাইয়া যাইতেছি, আমার জ্ঞান-বুদ্ধি যেন কোন্ বিভ্রমকুয়াশায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। ভয়ে ভয়ে একবার চোখ মেলিয়া খণ্ড আকাশটুকুর দিকে তাকাই—সেই নক্ষত্র কয়টির মুখে চিরন্তন সেই কৌতুকরহস্যময় হাসি!

তিনমাস মাত্র—কিন্তু আমি পুরাতন পরিচিত ধূলাধূসর পৃথিবী হইতে যেন অন্য আর এক পৃথিবীতে জন্মলাভ করিয়াছি, তিনমাস মাত্র—কিন্তু আমার আজন্ম নাগরিক সংস্কার, আজন্মের স্মৃতি, আজন্মের অভ্যাস, যেন কত পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে। দিনের বেলায় আমি আমার স্কুলের কাজ করিয়া যাই, কখনো সম্মুখের নদীর দিকে তাকাইয়া থাকি—নীল, সাদা, গেরুয়া রঙের পাল তুলিয়া দ্রুত মন্থর গতিতে ছোটবড় নানা রকম নৌকা চলিয়াছে, গরুর গাড়ীগুলি মালবোঝাই হইতেছে, একটু পরেই কঠিন কর্কশ ধ্বনি তুলিয়া স্কুলের পার্শ্বের কাঁচা পথের ধূলা উড়াইয়া উহারা গ্রামান্তরে যাত্রা করিবে। চোখ ফিরাইয়া লইয়া আবার জ্যামিতির প্রতিজ্ঞায় মন দিই।

স্কুল শেষ হয়, পড়ানো চুকিয়া যায়, কিন্তু ম্লান অপরাহ্নে এখন আর পিছনের জীবনের খণ্ড স্বপ্নগুলি করুণ হইয়া দেখা দেয় না—আমি তাহাদের আর উদ্দেশ পাই না। শান্ত, অক্ষুব্ধ,

উত্তেজনাহীন সন্ধ্যা নিস্তব্ধ গ্রামখানার উপর নামিয়া আসে, তাহার আকর্ষণে আমি বাঁধা পড়িয়া গিয়াছি। যুগ-যুগান্তরের রহস্য আমাকে মোহাবিষ্ট করিয়াছে। নিম্নে পৃথিবীতে এই নদী, এই ঝাউবন, এই বাঁশঝাড়, এই নারিকেলের কুঞ্জ, ঊর্ধ্বে অনন্ত নীলিমার দুর্জ্ঞেয় রহস্য এই জ্যোতিঃপুঞ্জ, আর ইহার মধ্যস্থলে শুধু দুইটি মানব-হৃদয়, সরল শিশুপ্রায় শুভ্রহৃদয় বৃদ্ধ ও নির্ব্বাক সেবারতা তাঁহার বালিকা কন্যা— ইহার বাহিরের বিপুল পৃথিবী আমার নিকট অস্পষ্ট অপরিচিত হইয়া একেবারে মুছিয়া গিয়াছে।

একটু সকাল-সকালই আসিয়াছিলাম। শনিবার, স্কুল অনেকক্ষণ ছুটি হইয়া গিয়াছে। বেলা পড়িতেই চলিলাম জগদীশবাবুর নিকটে।

বাঁশের বেড়ার বাহির হইতে কথা শুনিতে পাইলাম। —কই, কথা বলছ না যে?

বুঝিলাম এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন জগদীশবাবুর ভগ্নী, বাড়ির কর্ত্রী। মাতৃহীনা কন্যা ও গৃহহীন ভ্রাতাকে ইনিই আগলাইয়া আছেন। প্রশ্নের উত্তরও শুনিলাম।

—কি বলব বল্?

—মেয়ে চোদ্দ বছর পেরিয়ে গেল—এটা বুঝেছ?

—চোদ্দ বছর শেষ হল—এত? হবেও বা।

—হবেও বা নয়, হয়েছে। কতদিন ত বলছি। কিছু ভেবেছ? কোনো ব্যবস্থা ঠিক করেছ?

এবাব আর উত্তর আসিল না।

—বিয়ে যে এবার দিতে হবে তা বুঝেছ ত? একমাস দু'মাস করে কবে ত অনেক মাস, গোটা বছরটাই কাটিয়ে দিলে। এখন ত আর দেরী করা চলে না।

—আরও কিছুদিন যাক। এমন তাড়াতাড়ির কি?

—তাড়াতাড়ি! বিস্মিতা ভগ্নী সবিস্তারে বুঝাইতে লাগিলেন, —কত দেরি হইয়া গিয়াছে, ইহাতে ভালো ঘরের ছেলে পাওয়া কত শক্ত হইয়া উঠিতেছে। ভ্রাতা নীরব। ভাবিলাম এইবার হাঁক দিয়া বিপন্ন ভাইটিকে উদ্ধার করিয়া লই। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই তাঁহার প্রশ্ন শুনিলাম—

—তা কি করবো বলো?

—ছেলের খোঁজ নাও, দেখ-শোনো, বসে থাকলে ত চলবে না।

—আমি কি করে খোঁজ নেব—স্কুল রয়েছে, কাজ-কর্ম্ম দেখছ ত?

—সামনেই ত ছুটি আসছে তখন বেরুবে—সব ঠিক করে ফেলবে। এখন বরং সন্ধান নাও।

—আচ্ছা তা রয়ে-বসে দেখা যাবে। তুমিও বরং পাড়ার চাটুজ্যে, মুখুজ্যে ওদের বাড়ী জিজ্ঞাসা করে জেনে রাখ।

দিদি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া গলার স্বর একটু নামাইয়া কহিলেন—একটি ছেলে কিন্তু ছিল।

—কে?

—এই যে তোমাদেব পরেশ। আমি খোঁজ নিয়েছি আমাদেরই পাল্টা ঘর।

সবিস্ময়ে প্রশ্ন হইল—পরেশবাবুর কথা বলছ?

—হাঁ। কেন হবে না, আপত্তি আছে নাকি?

—আপত্তি আমাদের নেই, কিন্তু ওঁরা নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন। শুনেছি এক সময় ওঁদের সম্মান-প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল—ঘরও খুব উঁচু।

—আমরাই বা কিসে ছোট?

—আমরা হলুম পাড়াগাঁয়ের লোক—ওঁরা শহুরে। আমাদের চালচলন সমাজ সাদা-সিধে, ওঁদের মত ভব্য নয়। নিমু আমাদের শান্ত মেয়ে, কথাটি কয় না, ওঁদের সে শিক্ষিত সমাজে পেরে উঠবে না—ওঁরাও নেবেন না।

—কেন? নিমুর চেয়ে ভালো মেয়ে কোথায় পাবে? দেখেছি ত, ওঁদের শহুরে মেয়েও দেখেছি—লেখাপড়া ত জানে ছাই—কেবল কথায় ওস্তাদ। আমার নন্দাই'র বৌকেও দেখেছি, তারিণী-খুড়োর নাতবৌকেও দেখলুম—আমাদের নিমুর কাছে ঢের ঢের শিখতে পারে। তুমি একবার পরেশবাবুদের কথাটা তুলেই দেখ না।

—না না। উনি মহাবিব্রত হবেন, অপমানিত হবেন। আমার সঙ্গে প্রীতি আছে, নিমু ওঁর কাছে অবাধে আসে যায়, আমি এমনভাবে ওঁর প্রতি অত্যাচার করতে পারব না।

তাঁহার কথা নড়িল না। আমি ভাবিতেছিলাম ফিরিয়া যাইব কি? নিজের সম্পর্কে এইরূপ কথাবার্ত্তা শুনিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না, একবার ভালো করিয়া নিজেকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইব নাকি, কি কর্ত্তব্য। বৃদ্ধের মতের দৃঢ়তা দেখিয়া আমার সঙ্কোচে আমি লজ্জিত হইলাম। যেখানে কুণ্ঠা নাই, সেখানে আমি কেন কুণ্ঠার আশ্রয় লইয়া কপটতার সৃষ্টি করিব? সহজ কণ্ঠে ডাক দিলাম—

—জগদীশবাবু!

—আসুন! আসুন! —ভিতরের আঙিনা হইতে সাদরে উত্তর আসিল।

আমি বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিয়াই দেখিলাম—একাকী দাঁড়াইয়া নির্ম্মলা মাটির মেঝেয় পায়ের নখে কি আঁচড় কাটিতেছিল। আমি ঘরে ঢুকিতেই সে চোখ তুলিল, চিরদিনকার পরিচিত সেই গভীর শান্তদৃষ্টির মধ্যে আজ আমি যেন একটি নূতন সংজ্ঞা আবিষ্কার করিলাম। চমকিত হইলাম—নির্ম্মলাও সব কথা শুনিয়াছে কি?

নিত্যকারের মতই গল্প জমিয়া উঠিল, আলোচনা চলিল। আমরা দুজনে কথা তুলিলাম, নির্ম্মলা নীরবে তাহাতে যোগ দিল। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল—একটি দুইটি করিয়া তারা ফুটিয়া উঠিতেছিল। নিত্যকারের মতই আমরা যেন তাহাদের আহ্বান শুনিতে পাইলাম। বাড়ীর ভিতরের প্রাঙ্গণে মাদুর বিছাইয়া আমরা আকাশের তলে আসিয়া বসিলাম।

নির্মেঘ আকাশ জুড়িয়া কৃষ্ণপক্ষের ঘনীভূত অন্ধকার—অসংখ্য তারকার অদ্ভুত দীপ্তি। কিসের লজ্জা ও দৈন্য যেন নিজের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। পৃথিবীর শিয়রে এই যে অগণিত জ্যোতির্মণ্ডলী অতন্দ্র-নেত্রে অনন্ত রাত্রি ধরিয়া জাগিতেছে, আমি তাহাদের কতটুকু জানি, কতটুকু সন্ধান লইয়াছি! মানব-জীবনের এত বড় সুহৃদ আর কে আছে? কাহাদের সঙ্গে এমন অশ্রান্ত বাক্‌হীন আলাপন সম্ভব?

বৈশাখের আকাশে আজ কালপুরুষ সন্ধ্যার পরেই বিদায় লইয়াছেন—না, মহাকাশের পটে সেই গম্ভীর রূপ আজ আর দেখিতে পাইব না। মহাকালের তিমিরফলকে কোন্ বাণী সে লেখে জানি না—কোন্ ভীম পরিণামের সে সঙ্কেত করে জানি না। ছয় মাস আকাশ জুড়িয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বাকি ছয় মাস কোন মায়াবসনে কেন সে আপনাকে গোপন করিয়া লয়? গ্রীক কাহিনীর মতে দুর্দ্ধর্ষ শিকারী এই ওরায়ন তারকার নীবিবন্ধ আঁটিয়া উর্দ্ধ-উৎক্ষিপ্ত নেত্রে সে তারকার তরবারি ঝুলাইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। নিম্নে, পার্শ্বে শিকারী কুকুর সিরিয়াস—আমরা যাহাকে বলি লুব্ধক, তাহার ইঙ্গিতের অপেক্ষায় বসিয়া আছে—পদতলে ভয়ার্ত্ত শশক। আশ্বিনের নির্মেঘ আকাশে ফিরিয়া আসিলে আবার ঐরূপেই সে উদিত হইবে। আজ সে কোথায়?

ওই সপ্তর্ষিমণ্ডল—বশিষ্ঠাদি ত্রিকালদর্শী অমৃত-পুত্রগণ ওইখানে তাঁহাদের আশ্রম রচনা করিয়াছেন, এখানে বসিয়া তাঁহারা মানব-ভাগ্যের পট-পরিবর্ত্তন নির্ণিমেষ নেত্রে নিরীক্ষণ করিতেছেন, অন্ধকার গগনপট কালে কালে এমনি করিয়া তাঁহাদের পুণ্যপ্রত্যয় আলোকিত হইয়াছে। পার্শ্বে ঐখানে ঋষিপত্নী অরুন্ধতী—আমাদের চক্ষুর মর্ত্ত্য-মোহ না ঘুচিলে আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না, নব-পরিণীতা বধূ শুধু এই সাধ্বীর উদ্দেশে নমস্কার জানায়, যুগে যুগে ওইখান হইতে দেবী স্নেহোজ্জ্বল নেত্রে কন্যাদের শিরে অলক্ষ্যে শুভাশীষ বর্ষণ করিতেছেন। হাঁ হাঁ, ঐ স্বাতীনক্ষত্র দীপ্ত, ভাস্বর, মানব-সৌভাগ্য বিধাত্রী। উহার শিয়রে জ্যোতির্ম্ময় রত্নমুকুট।

ঐ উত্তরেই পূর্ব্বাকাশে উঠিয়া বীণাযন্ত্রাকৃতি জ্যোতির্মণ্ডলী—গ্রীক জ্যোতিষী যাহার নাম দিয়াছেন লিরা। এই আলোকবীণায় কোন অনাহূত জ্যোতির্মন্ত্র নিশিদিন ধ্বনিত হইতেছে, কে তাহা বলিতে পারে? কোন্ পুণ্যবান দিব্যজ্ঞানবান তাহা শুনিতে পায়? —ওইটি? ওই জ্যোতির্মণ্ডলের প্রোজ্জ্বলতম নক্ষত্র ভেগা দেখা যাইতেছে। কবে ইহার যাত্রা কে বলিবে? পনের হাজার বৎসর পূর্ব্বে মানবাকাশে উহাই ছিল ধ্রুবতারা, পৃথিবীর ভাগ্যে কত বড় মহাপ্রলয় সাধিত হইতেছে ভেগা তাহার সাক্ষী। এখনো প্রতি নিমেষে পাঁচক্রোশ বেগে আমাদের সূর্য্যদেবতার রথ উহারই দিকে ধাবিত হইতেছে। আরো পনের হাজার বৎসর পরে ধরিত্রী আবার উহাকেই ধ্রুবতারা বলিয়া গ্রহণ করিবে—মানবাকাশে পনের হাজার বৎসর পরে আবার ভেগাই হইবে দিককালের স্থির আশ্রয়। পশ্চিমে বিলীয়মান ওই যুগ্ম নক্ষত্র ক্যাষ্টর-পোলক্স ভ্রাতৃদ্বয়—যাঁহারা অচ্ছেদ্য সৌভ্রাত্রে যুগ-যুগনিবদ্ধ, যাঁহারা তারকার তরী ভাসাইয়া গোল্ডেন ফ্লীস্-এর সন্ধানে বাহির হইয়া ছিলেন, প্রতিমানবের জীবন কি তেমনি পরম প্রার্থিতের সন্ধানে নিরুদ্দেশযাত্রা নয়? ঐ দক্ষিণ আকাশে এখনো সেই মহাযাত্রার তরণী ভাসিয়া চলিয়াছে—ওই মাস্তুল, ওই পাল পিছনে প্রায় আমাদের মাথার উপরে ভির্গো ন্যায়াধিষ্ঠাত্রী এস্ট্রিদেবী যিনি মানবজগতে ধন-ধান্য-শস্য বিলাইয়া দিতে আসিয়াছিলেন, যিনি আমাদের অন্যায়ে, অবিচারে, উৎপীড়নে ব্যথিত হইয়া ঐ ঐখানে ফিরিয়া গেলেন। ন্যায়াধিষ্ঠাত্রী দেবী কি আর ফিরিবেন না, পৃথিবী কি তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবে না, ন্যায়ের লক্ষ্মী কি চিরদিন ওখানে দূরেই রহিবে, পৃথিবীতে পূজা পাইবে না? ঐ সাতটি নক্ষত্র দেখ, যেন একবৃন্তের সাতটি ফুল—আকাশের পুষ্পোদ্যানে যেন সৌন্দর্যস্তবক। না, না, উহারা বুঝি ধরণীর সেই সপ্ত রাজপুত্র এ পারের খেলাশেষে যাঁহারা ওপারের কোন নূতন বৃন্তে সাত ভাই চম্পার মত ফুটিয়াছেন। আর ঐ দিক্‌কার ঠিক নিম্নের এই পৃথিবী এই বুঝি বোন পারুল শূন্যের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে এই সপ্তনক্ষত্রের দিকে নিমন্ত্রণ পাঠাইতেছে—'সাত ভাই চম্পা জাগো রে'! জাগিয়া আছে, জাগিয়া আছে, নিদ্রাহীন, নিষ্পলক চোখে তারারা জাগিয়া আছে—ক্ষুদ্র ধরণীর চিরাগ্রজ তাহারা।

নক্ষত্রলোক যেন কাঁপিতে লাগিল! মনে হইল নক্ষত্রসভায় নৃত্য শুরু হইয়াছে—কেহ বাকি নাই, সপ্তর্ষিদল, লিরা, স্বাতী, ভির্গো, সকলেই জাগিয়াছে, ছায়াপথের ক্ষীণালোকিত বর্ত্ম সহসা নৃত্যমুখর হইয়া উঠিয়াছে।

মনে হইল, চোখ বুঝি অন্ধ হইয়া গেল, মস্তিষ্কের শিরা বুঝি অসহ্য ভাবস্রোত বহিতে না পারিয়া ছিঁড়িয়া গেল। চোখ মুদিলাম। অন্ধকার আবর্ত্তে আমি কি ঘূর্ণ্যমান পালকের মত তলাইয়া যাইতেছি? পদতলের পৃথিবী কি লুপ্ত হইয়াছে? চারিদিকে এক নৃত্যাবর্ত জ্যোতিঃপুঞ্জ, হাতে যেন কাহার হাত ঠেকিল, সজোরে চাপিয়া ধরিয়া ভাবিলাম, না, না, এই পৃথিবী যেন কিছুতেই সরিয়া না যায়, আমি ইহাকে ছাড়িব না, ইহাকেই আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিব।

চোখ খুলিলাম, দেখিলাম তেমনি অন্ধকারের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ গর্জ্জিয়া চলিয়াছে—সম্মুখে শুধু একখানি ছোট সুকুমার মুখ—তাহার দেহ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার নীলবসন মহাকাশের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে—বুঝি তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাই, কোনোকালে ছিল না—স্বপ্নাবিষ্ট সুকুমার মুখখানি তারকার চূর্ণ জ্যোতিঃকণায় চর্চ্চিত—সেই মুখে জাগিয়া আছে এক জোড়া অদ্ভুত চোখ, অনন্ত নক্ষত্রালোকের তীব্রদ্যুতি যেন সে আপনার আঁখি তারকার মধ্যে টানিয়া লইয়াছে, সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, এই মুখ বুঝি কোনো মানব-কন্যার নয়—বুঝি কোনো মানব মায়া মানব কামনা অন্তরীক্ষে কোন নক্ষত্র সৃষ্টি করিতেছে, বুঝি কোনো নৃত্যচপলা রূপসী তারকা ছায়াপথ হইতে নামিয়া আমার সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে—তাই অধরকোণে সেই নক্ষত্রলোকের রহস্যমধুর অদ্ভুত হাসি—যে হাসির আদি নাই, অন্ত নাই, যে হাসি অপরিসীম প্রহেলিকা!

পূর্ব্বদিন শ্রান্তবর্ষণে সায়াহ্নে বরকনে বিদায় হইয়াছে। যাত্রার সময়ে ভাগ্যক্রমে বৃষ্টিটা থামিয়াছিল—যেন ক্রমাগত দুইদিন অশ্রান্ত অশ্রমোচনের পর বিবর্ণ আকাশ অবসন্ন হইয়াছে। বুঝিলাম,

এইবার জগদীশবাবুর চোখে বান ডাকিবে। কিন্তু আশ্চর্য্য মানুষ! পিসিমা তখন কাঁদিয়া ভাসাইতেছেন—যাহাকে দুই বৎসর হইতে চোদ্দ বৎসরের করিলেন সে আজ চিরদিনের মত পরের হইতে চলিল! নির্ম্মলার চোখ আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছে—প্রণাম করিতেই পিতার পায়ে ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। সহাস্য মুখে জগদীশবাবু বলিলেন—

—দাঁড়া মা, দাঁড়া। চশমার খাপ, বাক্সের চাবি, দিদিকে এসব বুঝিয়ে দিয়েছিস ত? নইলে কিন্তু কাল থেকে চোখেও কিছু দেখব না, খেতেও কিছু জুটবে না।

সকলে একটু আশ্চর্য্য হইল—এত কঠিন।

আমাকেও নির্ম্মলা প্রণাম করিল। প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলাম, চিরায়ুষ্মতী হও। সে মুখখানি তুলিতেই আমি চমকিয়া উঠিলাম—সেই রহস্যময় হাসির আভাস! —যে স্মৃতি মনের অচেতন-লোকে সুপ্ত হইয়াছিল, নিমেষমধ্যে তাহা আমার সম্মুখে জীবন্ত হইয়া দেখা দিল। মাস পাঁচ পূর্ব্বে নক্ষত্রের ছায়াতলে সে রাত্রিতে আমার বিভ্রান্ত দৃষ্টি কি সত্যই এমনি হাসি দেখিয়াছিল—আমি কি ভুল করি নাই?

নদীপারের ঝাউবনের মধ্য দিয়া নৌকা বরকনে লইয়া মিলাইয়া গেল—মনে হইল, আমি যেন তখনো দূরের নৌকায় সেই রহস্যময় হাসি দেখিতেছি, নদীর খরস্রোতে যেন সেই তীক্ষ্ণ বক্র হাসিরই প্রতিচ্ছায়া।

দুইদিন বিবাহোপলক্ষে খুব পরিশ্রম করিয়াছিলাম, জগদীশবাবুকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া আসিয়া শুইয়া পড়িলাম। একবার শিয়রের জানালা দিয়া আকাশের দিকে তাকাইলাম—আশ্বিনের মেঘ থম-থমে আকাশ রূপহীন, ক্লান্ত, বিবর্ণ।

পরদিন ভোরে গাঢ় নিদ্রা হইতে জাগিয়া দেখিলাম—বর্ষণ-স্নাত আশ্বিনের মেঘমুক্ত আকাশের তলে ধরণী যেন সূর্য্যকরের সুবর্ণ কিরীটখানি পরিয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বদিবসের কথা মনে পড়িল—নিজের অদ্ভুত কল্পনা-বিলাসে নিজেই হাসিলাম।

অপরাহ্ন নামিয়া আসিল। আজ একটু সকাল-সকালই জগদীশবাবুর নিকট চলিলাম। বৃদ্ধ আজ একা, আমি না গেলে নিতান্তই একা পড়িবেন।

চোখের চশমা আজ তিনি নিজেই খুঁজিয়া লইয়াছেন, আলমারির বইও আর কাহাকেও আনিয়া দিতে হইল না; আজ মধুসূদন নিজ হইতেই চা লইয়া উপস্থিত। সুন্দর ব্যবস্থা, শুধু জগদীশবাবুর চশমার কাচ আর কিছুতেই তেমনটি পরিষ্কার হইতেছে না, চায়ের সেই সুপরিচিত স্বাদ ও ঘ্রাণটিও তিনি আজ আর পাইতেছেন না। আমার দিকে তাকাইয়া তিনি বলিলেন,—"খেতে পারবেন তো—যে অপূর্ব রসায়ন হয়েছে"—। বিশেষ কোনো নূতনত্ব আমি অন্তত বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু আজ আর কিছুতেই আমাদের কথা জমিল না। আলোচনার জাল যত্ন করিয়া বুনিতে চেষ্টা করিলাম, বারে বারে ছিঁড়িয়া গেল। মনে হইল, কোথায় যেন ছেদ পড়িয়াছে, কি ফাঁক রহিয়া গিয়াছে, কেমন যেন একটা কি নাই। কথা বলিতে না বলিতেই জগদীশবাবু অভ্যাসমত দুয়ারের নির্দ্দিষ্ট স্থানটির দিকে চোখ তুলিয়া ডাকেন—"নিমু—"। তারপর লজ্জিত হইয়া হাসিয়া বলেন—"দেখছেন পরেশবাবু, মেয়েটা আমাকে একেবারেই অসহায় করে রেখে গেছে।" চেষ্টা করিয়া আমিও হাসিতে যোগ দিই—আবার কথা আরম্ভ করি, কিন্তু অল্পক্ষণেই আবার বৃদ্ধের দৃষ্টি উদাস হইয়া উঠে, মন বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে।

সন্ধ্যা হইল—প্রাঙ্গণে আসিয়া বসিলাম। আকাশে তারকার সভা বসিয়াছে। পূর্ব্বেকার মত তাহাদের দেখিতে চেষ্টা করিলাম—দেখিলামও—পূর্ব্বে প্রতিদিনকার দেখার মত দেখা এ নয়—এ যেন সাধারণ চোখের সচরাচর দর্শন—বিস্ময়লেশহীন, মায়াহীন, মমতাহীন দেখা।

বুঝিলাম আমাদের নক্ষত্রসভা ভাঙিয়াছে।

খানিকক্ষণ পরে ঘরে ফিরিলাম—ঘরের সম্মুখের সিঁড়িতে উদ্ভ্রান্তদৃষ্টিতে বসিয়া রহিলাম।

অন্ধকার নদীপারে আজ আর কিছুই দেখা যায় না, শোনা যায় না। সাড়াহীন নিঃস্তব্ধতা চারিদিকে আপনার শাসন বিস্তার করিয়া বসিয়া আছে, মুখরা সৃষ্টি যেন মৌনাবলম্বন করিয়া ধ্যানে সমাসীনা। কান দিয়া আর কিছুই শুনিতেছি না—প্রাণ দিয়া বিশ্ব-স্পন্দনের নির্ব্বাক ধ্বনি উপলব্ধি করিতেছি। এ শোনা নয়, এ অনুভূতি—এ যেন ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্ম বোধ। নদীপারের ঝাউ-সারের আন্দোলিত দীর্ঘশ্বাসে অন্ধকার রজনীর অন্তর মথিত হইতেছে—আমার বুকের চারিদিক যেন বেদনার গাঢ় গুণ্ঠনে শতপাকে ঘিরিয়া উঠিতেছে—অদূর নদীর কূলছাপানো কলস্রোত দেখা যায় না, তবু তাহারই মধ্যে যেন আমি অবগাহন করিতেছি—কল কল কল, আমার অন্তর ঘিরিয়া যেন সেই অশান্ত কলরোল। মাথার উপরে বুঝি একসার বেলেহাঁস অকস্মাৎ ধ্বনিতে আমাকে আহ্বান করিয়া দূরে—দূরে—দূরে চলিয়া গেল—তবু যেন তাহাদের ধ্বনি শূন্যে মিলাইয়া গেল না, আমার কানের উপরে কাঁপিতে লাগিল। পদতলে শিশির-স্নাত শষ্পদল প্রতি নিমেষে বাড়িয়া চলিয়াছে—সেই ছন্দ আমি শুনিতে পাইলাম। উপরের আকাশে কি উচ্ছলিত সঙ্গীত প্রবাহ—যেন সমস্ত সৃষ্টিকে একটা দুর্দ্দম, গম্ভীর, উদার অসহনীয় রাগিণীতে উচ্ছৃত করিয়া দিতেছিল।

উর্দ্ধে চোখ মেলিয়া বসিলাম—সম্মুখে পূর্ব্বাকাশে কালপুরুষের সুদীর্ঘ বপু—আমার অন্তরের কাঁপুনি আমি শুনিতে পাইলাম। পৃথিবী বিস্মৃত হইয়া অন্ধকার আকাশের সঙ্গে আমার পলকহীন চক্ষু দৃষ্টিবিনিময় করিতে লাগিল।

রাত্রির প্রবাহে তখন কত যায়? নিম্নেকার পৃথিবীর মতই কালও আমার চেতনা হইতে সরিয়া গিয়াছে—কিছুই জানি না। সপ্তর্ষিমণ্ডলের চোখ বুঝি নিদ্রায় কাতর হইয়া উঠিল,—অত্রি মারীচী আদির চক্ষু বুঝি স্তিমিত হইয়া আসিল, বশিষ্ঠারুন্ধতী ধীরে ধীরে নারিকেল-বনের পিছনে লুকাইলেন।

মুহূর্ত্তমধ্যে আকাশ জুড়িয়া এক অপূর্ব্ব চপলতা দেখা দিল—অগণিত নক্ষত্র স্থির প্রকোষ্ঠ ছাড়িয়া চঞ্চল পদবিক্ষেপে নামিয়া আসিতেছে—সেই দূর নীলাভ সপ্ত তারকা 'প্লিয়াইডিস্, সেই লিরা, দীপ্তিময়ী ভেগা, সিগনাস্, সেফিয়স—কেসিওপীয়া, দানববি পার্সিয়ুস, দীপ্ততারকার মেখলাময়ী শৃঙ্খলিতা এণ্ড্রোমিডা! নক্ষত্রসমাজ চপল, তরল, অস্থির;—আকাশ উদ্বেল, অশান্ত, নৃত্যমুখর! পরিচিত, অপরিচিত, দৃষ্ট, অদৃষ্ট, অনন্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডল! —নারিকেলের ছায়ায় যেখানে বশিষ্ঠারুন্ধতী অন্তর্হিতা হইলেন ঠিক সেইখানে একটি নূতন জ্যোতির রেখা। রেখা স্পষ্ট হইয়া উঠিল, আরো স্পষ্ট—গতিশীল লক্ষ লক্ষ জ্যোতিঃকণা। —আরো স্পষ্ট—বুঝি কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাষ্পময় নীহারিকা জমিয়া উঠিতেছে। বুঝি কোনো নূতন নক্ষত্র সৃষ্ট হইতেছে। অপূর্ব্ব দীপ্তিময় এক নক্ষত্র! চক্ষু বিস্ফারিত হইল, দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা সহস্রগুণে বাড়িয়া গেল—সেই মুখ, সেই রহস্যময় হাসি সেই মুখে! একবার আকাশের চারিদিকে তাকাইলাম—সমস্ত তারকার মুখে সেই অবর্ণনীয় কৌতুকহাস্য।

নূতন নক্ষত্র অগ্রসর হইয়া আসিল—নারিকেলের বন পিছনে পড়িয়া রহিল। সম্মুখের প্রসারিত মাঠ কাঁপিতে লাগিল। দেহহীন চরণহীন গতিতে সে আসিতে লাগিল, চূর্ণ তারকার রশ্মিতে তাহার পদচিহ্ন আঁকিয়া। দেহের চেতনা থাকিলে আমি হয়ত দেখিতাম আমার দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আলোকের প্লাবন চলিয়াছে।

আরো কাছে, আরো কাছে, একেবারে আমার নিকটে ঠিক আমার চোখের সম্মুখে সেই মুখ, সেই হাসি!

বুঝিলাম আমার চেতনা লোপ পাইয়াছে। পৃথিবীকে আর আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিলাম না—এই আনন্দময় জ্যোতির্লোকে আমি আপনাকে নিমজ্জিত করিয়া দিতে চাই। হাত বাড়াইয়া দিলাম, কহিলাম,—ওগো জ্যোতির্ম্ময়ী, আমাকে তুলিয়া লও! ভাবিয়াছিলাম নিশ্চয় কাহার হাত আমার হাতে ঠেকিবে, কেহ কৃপাস্নিগ্ধ হস্তে আমার প্রসারিত হাতখানি ধরিয়া লইবে। কেহই আমাকে ধরিল না। আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম—

—ওগো রহস্যময়ী, কেন আমায় লইলে না? লইতেই হইবে, লইতেই হইবে—এই পৃথিবী

হইতে আমাকে তোমায় উদ্ধার করিয়া লইতে হইবে! তোমার অপূর্ব্ব হাস্য আমি বুঝিতে চাই। কি করিয়া আমায় ত্যাগ করিবে? এই আমি তোমায় জড়াইয়া ধরিলাম।

নক্ষত্রসভায় একটা ত্বরিত চরণ-ক্ষেপের ধ্বনি উঠিল, চঞ্চল নক্ষত্রমালা সরিয়া গেল—দূরে দূরে, একেবারে নিজ নিজ প্রকোষ্ঠে আমার শূন্য আলিঙ্গন হইতে দেহহীন সেই নূতন নক্ষত্র সরিয়া উপরে উঠিতে লাগিল—মুখের হাসিতে তীব্রতর কৌতুকের আভাস। উপরে, আরো উপরে, আরো-আরো-আরো—ছায়াপথ শেষ হইয়া গেল, সমস্ত নক্ষত্র সসম্মানে সরিয়া গেল, লজ্জায় ম্লান হইয়া উঠিল, শূন্য আকাশের একটি কোণে উত্তীর্ণ জ্যোতির্ম্ময়ী অবশেষে স্থির হইয়া আমার দিকে তাকাইল—চোখে তেমনি তারকার বিভ্রম দৃষ্টি, অধরে তেমনি রহস্যময় হাসি!

কিছুদূরে নদীপারের মন্দিরে সহসা শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ভোর হইয়াছে? না এ নবজাত তারকার অভিনন্দন? —নশ্বর মানবের অবিনশ্বর প্রেমের আরতি? চমকিয়া দেখিলাম, আমার চোখের সম্মুখে রাত্রিশেষের শুকতারাটি জ্বল জ্বল করিতেছে।

২৯ বর্ষ, বৈশাখ ১৩৩৬



নায়ক-নায়িকা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

একটা চমৎকার গল্পের প্লট্ পাওয়া গেচে। ...দিশেহারা হয়ে গল্পের নায়ক নায়িকার নাম খুঁজ্‌চি, কিন্তু হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে একটা আন্‌কোরা একেবারে নূতন কবিত্বময় নাম কিছুতেই মনে আসচে না।

রাত তখন বারোটা প্রায় হয়ে এল, কেবল ভাব্‌চি, মনোমত নাম কিছুতেই মিল্‌চে না, এ যেন তীর্থ-কাকের মতন ধর্ণা দিয়ে পড়ে' থাকা!

হঠাৎ আমার মনে হ'ল আমার খোলা জান্‌লার সুমুখে কে একটা কালো বলিষ্ঠ লোক অন্ধকারকে শিউরে দিয়ে পুরুষ কণ্ঠে বল্লে—আমাকে তোমার গল্পের নায়ক করো।

আমি আঁৎকে উঠ্‌লাম—তোমাকে নায়ক করব? কি তোমার নাম?

লোকটা দৃঢ়কণ্ঠে বল্লে—বামাচরণ।

—বামাচরণ? আমি হো-হো ক'রে হেসে উঠ্‌লাম।

লোকটা কঠিনভাবে জান্‌লার শিকটা ধরে বল্লে—কেন, আমার নাম তোমার পছন্দ হচ্ছে না? তোমার উপন্যাসের নায়ক হবার যোগ্যতা কি আমার একটুও নেই? চিরকালই তুমি আমাকে কেবল চাকর, দারোয়ান বাজার-সরকার আর দেওয়ান করবে? কেন আমাকে নায়ক করলে তোমার উপন্যাসের কাট্‌তি কি অনেক কমে' যায়?

আমি লোকটার মুখের দিকে চেয়ে হাস্‌তে লাগ্‌লুম।

লোকটা বল্লে—আমার জন্য কেবল রেখেছ হুঁকো আর গাঁজা। কেন, আমি কি ভালোবাস্‌তে পারি না? আমার প্রেমের উপাখ্যান কি তোমার গল্পের খাতায় লেখা যায় না, না, আমার প্রেমটা এতই খেলো আর বাজে, যে তার মূল্য একটুও নেই? আমি বি এ, এম এ পাশ করি না, প্যাঁস্‌নে চশমা পরি না, সিগারেট্ খাই না, টেড়ী কাটি না, বাঁশী বাজাই না, মার্কেটে ঘুরি না—তাই কি আমি নায়ক হবার যোগ্য নই? আমার নাম বামাচরণ—এই কি আমার চরম অপরাধ?

আমি হাসি চেপে বল্লুম—কিন্তু তোমার সঙ্গে নায়িকা হবে কে?

লোকটা হাতছানি দিয়ে কাকে যেন ডাক্‌তে লাগ্‌ল। খানিকবাদে একটি অদ্ভুত স্থূলতনু কালো রমণী তার পাশে এসে দাঁড়াল। মাথার চুলগুলি টেনে কষে' ঝুঁটি করে' বাঁধা, কপাল ও চুলগুলি দুর্গন্ধ তেলে চপ্‌চপ্ করচে, নাকে সুদর্শন চক্রের মতো একটা নৎ, দু-কানে প্রায় গোটা কুড়ি মাক্‌ড়ি, দাঁতে অমাবস্যা-রাতের মতন মিশি মাখানো, গলায় একটা লোহার হাঁসুলি, পরণে একটা লাল পাছা-পেড়ে শাড়ী তাতে চ্যাপ্‌মা হলুদের দাগ লাগানো, দু-পায়ে দুটো রুপোর মল—বয়স এই ত্রিশ বত্রিশ হবে।

রমণী স্থিরকণ্ঠে বল্লে—আমি তোমার গল্পের নায়িকা হব।

আমি কৌতূহলী হয়ে বল্লুম—তোমার নাম কি?

মেয়েটি বল্লে—আমার নাম? আমার নাম...। হাস্‌তে হাস্‌তে আমার পেটে খিল পড়ল। জগদম্বা? তা হলেই হয়েছে! হাঃ হাঃ হাঃ!

রমণী বিরক্ত হয়ে বল্লে—আমার এই চেহারায় ও নামে কিছুতেই তোমার উপন্যাসের নায়িকা হতে পারব না? লেখা, পাপ্‌ড়ি, যূথিকা, হাস্নাহানা—এম্‌নি ঢং-করা বিবিয়ানার নামই তোমার পছন্দ হয়, এখন ঠাকুর দেবতার নাম মনে ধরে না? আমি আনারসী-বারাণসী শাড়ী পড়ি না, এলানো চুলে ফাঁসগেরো দিয়ে কান ঢেকে চুল বাঁধি না, উঁচু হীল্-ওয়ালা জুতো পরে' দুল্‌তে দুল্‌তে চলি না ও আছাড় খাই না, পুডিং কাট্‌লেট্ রাঁধ্‌তে পারি না, তাই কি আমি তোমার নায়িকা হবার অযোগ্য?

আমার এ কালো বুকে তোমার গল্পের সুন্দরী শিক্ষিতা নারীর মতনই প্রেম জাগে না, কবিতা উথ্‌লে ওঠে না?

আমার হাসির মাত্রা আরও বেড়ে গেল।

দেখি বামাচরণ আর জগদম্বা খোলা জান্‌লাটা পেরিয়ে আমার ঘরে এসে ঢুক্‌ল। কি কর্‌বে রে বাবা! ঐ শক্ত কালো দু-হাতে দু-গালে দু-চাঁটি বসিয়ে দেবে না তো? না না ওগো, তোমাদেরই আমি গল্পের নায়ক—নায়িকা কর্‌ব।...

আমার ঘরের দেওয়ালের এক নিরালয় কোনে রাধা-কৃষ্ণের যামিনী-মিলনের একটি বর্ণবহুল সুন্দর ছবি ছিল। কিন্তু তার ওপর আমার কোন মোহ বা আকর্ষণ ছিল না, হয়ত আমার আধুনিক রুচির সঙ্গে এই ছবিটা একটুও খাপ্‌ খেত না বলে'। দেখি, বামাচরণ আর জগদম্বা বেশী কিছু নামসুলভ উপদ্রব না করে', ধীরে ধীরে সেই ছবিটার মধ্যে লীন হয়ে গেল।...

যাঃ, কি এতক্ষণ বাজে আবোল-তাবোল্‌ স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম। মনে-মনে খানিকক্ষণ হাস্‌লুম। গল্পলেখা আর এগোলই না। আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়্‌লুম।

মাঝ-রাতে মনে হ'ল সেই ছবির কৃষ্ণ সেই কদমশয়ন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে রাধাকে বল্লে—চল, এই কারাগার থেকে মুক্তি নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ি! এই তরুণ কবি দিনান্তেও আমাদের মুখের পানে চোখ তুলে চায় না, আমরা যে গোপনে এখানে ভালোবাসার অভিনয় কর্‌চি তার একটুও মর্ম্মগ্রহণ কর্‌তে পারে না, তার উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার নাম খুঁজে মরে; আর, আমরা যে তার বুকের আগারে বন্দী হয়ে দিন কাটাচ্চি এত নিকটে থাকি, আমাদের কথা সে একটুও ভাবে না, অতি-পুরোণো বলে' সে আমাদের অবহেলা করে ফেলে দ্যায়! চল, আমরা এই ভণ্ড পূজারীর মন্দির থেকে বেরিয়ে যাই।...

বলে' কৃষ্ণ তার বাঁশী তুলে নিলে, আর রাধিকা তার অগোছাল কেশ-বাস বিন্যস্ত করে' কৃষ্ণের পাশে-পাশে চল্‌তে লাগ্‌ল মেঘের পথে-পথে চাঁদ্‌নী আলোর স্নিগ্ধ রূপার দেশে!

কৃষ্ণ ঘাড় হেলিয়ে বাঁশী বাজাচ্চে আকুলকরা সুরে, আর রাধিকা তার বাঁ হাতের ভঙ্গিমাটিকে বেঁকিয়ে কৃষ্ণের গ্রীবাটি বেষ্টন করে' চলেচে ভাষাহীন আনন্দ-ছন্দে!

কতদূর এগিয়ে গেলে মনে হ'ল—ওরা যেন সেই গোকুলের কৃষ্ণ-রাধা নয়, আমাদেরই পাড়ার পচা বস্তির বামাচরণ আর জগদম্বা, অনন্ত অভিসারের পথে নূতন রূপ নিয়ে সত্যিকারের প্রণয়ী-প্রণয়িনী, চিরযুগের কবির কল্পনার নায়ক-নায়িকার যুগল-মূর্ত্তি।

২৩ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০



অসামান্য

প্রবোধকুমার সান্যাল

দুই দিকের প্রান্তরের পরে বসন্তকালের মধ্যাহ্ন-রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল। ট্রেন চলিতেছে। দক্ষিণ দেশের গাড়ী, হাওড়া ষ্টেশন হইতে সকালে ছাড়িয়া আসিয়াছে। প্রথম শ্রেণীর ক্ষুদ্র কাম্‌রাখানিতে এতক্ষণ তিনজন যাত্রী ছিল। ইউরোপীয় ভদ্রলোকটি একটু আগে নামিয়া যাইবার পর এখন কেবল দুইজন—পোষ্টাল্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ মিস্টার মুখার্জ্জি ও তাঁহার স্ত্রী। মিস্টার মুখার্জ্জি কয়েক দিন ধরিয়া ডাকঘরগুলি পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন, আরও দিন-দুই তাঁহার ডিউটি, তারপর স্বস্থানে ফিরিয়া যাইবেন।

'তোমার এবার কষ্ট হচ্চে নীলা, রোদে তোমার মুখ রাঙা হয়ে উঠেচে।'

নীলা হাসিয়া কহিল, 'তাই তো, উপায়?'

'সত্যি ঠাট্টা নয়, মুখ রাঙা হয়েচে!'

'আমার মুখ রাঙা হ'লে তুমি ত খুশী হও!'

'ধারালো তোমার বিদ্রূপ। কিন্তু রাগ করো না, আর মাত্র দু-দিন। তুমি সঙ্গে না থাকলে আমি কাজ করতে পারিনে নীলা।'

'কেন?'

মিস্টার মুখার্জ্জি উঠিয়া একবার আলস্য ভাঙিয়া লইলেন, তারপর হাসিয়া কহিলেন, 'Women's beauty is the energy of a man.'

'থাক্, পুরুষমানুষের কাঙালপনা আমার সহ্য হয় না!' বলিয়া নীলা তাহার জুতাপরা পা দুইখানি সুমুখের দিকে ছড়াইয়া বসিল।

'আঃ, এবার বাঁচলাম—' মুখার্জ্জি কহিলেন, 'এত ছোট কাম্‌রায় বেশী লোক থাকা... বাস্তবিক, লোকটা এতক্ষণ হাঁ ক'রে তাকাচ্ছিল তোমার দিকে।'

'কোন্ লোকটা?'

'এই যে গো বসেছিল এখানে, সেই ফিরিঙ্গিটা....অসভ্য!'

নীলা কহিল, 'কই আমি ত লক্ষ্য করিনি! আর তাকালেই বা, ক্ষয়ে ত যাইনি!'

মিস্টার মুখার্জ্জি বলিলেন, 'সে তুমি বুঝবে না কি রাগ হয়!'

নীলা হাসিল। বলিল, 'ওটা রাগ নয়, অন্য কিছু।'

'কি? বিদ্বেষ?'

'জানিনে।' বলিয়া নীলা চুপ করিয়া রহিল।

আবার কিয়ৎক্ষণ পরে কি একটা ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল। অনেকক্ষণ এক জায়গায় বসিয়া বসিয়া নীলা ক্লান্ত হইয়া গেছে, এইবার সে গাড়ী হইতে নামিয়া একটুখানি হাঁটিয়া বেড়াইতে লাগিল। আরদালি আসিয়া কিছু বরফ ও ফলমূল গাড়ীর ভিতর ডিসের উপর সাজাইয়া দিয়া গেল, পরে বাহিরে দাঁড়াইয়া সেলাম করিয়া জানিতে চাহিল, আর কিছু চাই কি না!

'নেহি।'

আরদালি চলিয়া যাইতেই বাঁশী বাজিল, নীলা আসিয়া উঠিল গাড়ীতে। দরজাটা বন্ধ করিয়া মুখার্জ্জি কহিলেন, 'ফুটবোর্ডে পা দিয়ে তুমি ওঠা-নামা করলেই আমার ভয় করে, কখন্ হয়ত পা ফস্‌কে... এসব তো তোমার অভ্যেস নেই! তাছাড়া শরীরও কাহিল, বড় ভাবনা হয় তোমার জন্য নীলা।'

'মাথাটা ধরেচে একটু।' নীলা চোখ বুজিয়া কহিল।

'তা ত ধরবেই—' বলিয়া মুখার্জ্জি ব্যস্ত হইয়া বরফ ও ফলের প্লেট্‌টা আনিলেন। বলিলেন,

—'তোমার শরীরের যত্ন হচ্চে না—এত ট্রাভ্‌ল্ করা, চল ওখানে নেমেই ডাক্তারকে ডাকতে পাঠাব। কিছু নেবে এর থেকে?'

নীলা কেবলমাত্র এক টুক্‌রা বরফ তুলিয়া লইল।

'তিন বছর হ'ল তোমাকে বিয়ে করেচি, কিন্তু আমি দেখচি তোমার শরীর তোমার মনের মতই ডেলিকেট, সেন্‌সিটিভ্। কত যে ভাবি তোমার জন্যে! অথচ একটুখানি সেবাও তুমি করতে দাও না... কাছে এলেই তুমি দূরে সরে যাও... কতখানি আমার দুঃখ!'

নীলা কহিল, 'আমি কি কিছু বলেচি তোমাকে?'

'বলনি কিন্তু ভঙ্গীতে জানিয়েচ। তোমার সেবার অধিকার যে পেল না সে নিতান্ত দুর্ভাগ্য!'—মিস্টার মুখার্জ্জি একটু থামিলেন, প্লেটটা সুমুখের টেবলের উপর নামাইয়া রাখিলেন, তারপর পুনরায় কহিলেন, 'এ বেলা এই শাড়ীটা পরেচ? কিন্তু গাড়ী থেকে নামার সময় সেই ম্যাডরাসি পারপল্ শাড়ীটা পরে নিও, কেমন? সেখানা পরলে মনে হয় তুমি যেন এন্‌জেল্, নেমে এসেচ স্বর্গ থেকে। বাস্তবিক, তোমার দিকে যখন লোকেরা তাকায় তখন আমার রাগ হয় বটে, কিন্তু খুশীও হই। সকলের ঈর্ষার উপর দিয়ে সৌভাগ্যের রথ ছুটিয়ে দিতে আমার খুব ভাল লাগে।'

গম্ গম্ করিয়া ট্রেন ছুটিতেছে। মিস্টার মুখার্জ্জি একটু থামিলেন, তারপর পুনরায় শুরু করিলেন সেই চিরন্তন বিষয়বস্তুটির পুনরাবৃত্তি। স্ত্রীর জন্য তাঁহার উদ্বেগ-আকুলতার সীমা নাই, কোথায় কোথায় প্রসাধন-সামগ্রীর জন্য অর্ডার পাঠাইয়াছেন, কতগুলি ডাক্তারের সহিত তিনি স্ত্রীর স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন,—এবারের গ্রীষ্মে দার্জ্জিলিং কিংবা মুসৌরী কোন্‌টা নীলার বর্ত্তমান স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল, ইত্যাদি। নীলা চুপ করিয়া শুনিয়া যাইতেছিল, তিন বৎসরকাল এমনি নীরবে সে শুনিয়া আসিতেছে। ইহার ঠিক পরেই শুরু হইবে তাহার রূপ সম্বন্ধে স্তুতিবাক্য। সে দেখিতে সুন্দর, সে এন্‌জেল্, তাহার কণ্ঠে সঙ্গীত, তাহার সর্ব্বাঙ্গে বসন্তকালের ঐশ্বর্য্যসম্ভার। প্রতিদিন সে না-কি তাহার মোহগ্রস্ত স্বামীর চক্ষে নব নব রূপে মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠে, নব নব রসে,—নব নব অনুপ্রেরণায়। বারে বারে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিলে স্বামী আনন্দিত হন—নিত্যনূতন সাজসজ্জায় প্রকৃতি যেমন আপন বৈচিত্র্যকে প্রকাশ করে,—যেমন বর্ষার পরে শরৎ, শীতের পর বসন্ত।

নিরন্তর প্রশংসা ও খ্যাতি মানুষকে অবসাদগ্রস্ত করিয়া তুলে, ক্লান্তি আনিয়া দেয়। নীলার চক্ষে তন্দ্রা নামিয়া আসিল। মিস্টার মুখার্জ্জি তাহার মাথার কাছে বসিয়া তাহার চুলের ভিতরে ধীরে ধীরে আঙুল চালাইতে লাগিলেন।

মেদিনীপুরের একটা সাবডিভিশনের স্টেশনে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইতেই নীলার তন্দ্রা ভাঙিল। প্ল্যাটফর্‌মে কয়েক জন ভদ্রলোক তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া নামাইতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সাবপোষ্টমাষ্টার ও ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু হাসিয়া মিস্টার মুখার্জ্জিকে নমস্কার করিলেন। দুই একজন কেরানী উভয়কে নমস্কার করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। গাড়ী বেশীক্ষণ থামিবে না, আরদালি আসিয়া জিনিসপত্র নামাইয়া লইল। স্টেশনে গাড়ীর ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় নাই, নিকটেই সরকারি বাংলো।

মাস্টারবাবু কহিলেন, 'সব ব্যবস্থা আছে, থাকার কোনো কষ্ট হবে না, আমরা রান্নাবান্নার ব্যবস্থা ক'রে রেখেচি।'

ইন্‌স্‌পেক্টর কহিলেন, 'যদি অসুবিধে না হয় তবে দিন-দুই থেকে যাবেন।'

মিস্টার মুখার্জ্জি কহিলেন, 'থাকা আর চল্‌বে না, এঁর শরীর ভাল নেই। আপনাদের রেকর্ডগুলো আজকেই আমাকে দেখেশুনে নিতে হবে, কাল সকালের গাড়ীতেই ফিরে যাব। বেলা দেখছি আর বাকি নেই। হরিপদ যে, কি খবর?'

একটি লোক অদূরে তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল, এইবার সবিনয়ে হেঁট হইয়া নমস্কার করিল। বলিল, 'আমাদের সৌভাগ্য যে আপনারা এলেন!'

'কাজকর্ম কেমন করচ?'

মাস্টারবাবু কহিলেন, 'কাজকর্ম্ম তো ভালই করে, তবে স্ত্রীকে নিয়েই ওর বিপদ... ছুটোছুটি ক'রে হয়রাণ হয়।'

মুখার্জ্জি কহিলেন, 'স্ত্রী এখন কেমন?'

হরিপদ কহিল, 'সেই একই রকম।'

'তুমি ছুটি চেয়েছিলে, কিন্তু মঞ্জুর করতে পারিনি। ছুটি আর তোমার পাওনা নেই হরিপদ।'

হরিপদ মাথা হেঁট করিয়া চলিতে লাগিল।

বাংলোর বারান্দার কাছে আসিয়া সকলে বিদায় লইল। মাস্টারবাবু প্রভৃতি সবাই রেকর্ড গুছাইতে তাড়াতাড়ি ডাকঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। স্বামী-স্ত্রী বাংলোর ভিতরে প্রবেশ করিল।

সম্মুখে বিস্তৃত ঘাসের জমি; তাহাকেই বেষ্টন করিয়া রাঙামাটির চক্রাকার পথ ঘুরিয়া ষ্টেশনের দিকে চলিয়া গেছে। উত্তর দিকে কয়েকটি সরকারী দপ্তর, পাশেই পুলিসের থানা, আদালত, মহকুমা হাকিমের বাসা—তাহারই সংলগ্ন উদ্যানে কয়েকটি সুস্থ ও বলিষ্ঠ বালক-বালিকা খেলা করিতেছে। পূর্ব্বদিক হইতে দক্ষিণ ও পশ্চিমে ঘন শালের জঙ্গল,—বসন্ত-বাতাসে থাকিয়া থাকিয়া সেই জঙ্গলের ভিতর মর্ম্মর শব্দ হইতেছিল।

অপরাহ্ন হইয়া আসিয়াছে, কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ও জলযোগ সারিয়া মিস্টার মুখার্জ্জি বাহির হইলেন। বলিয়া গেলেন, 'বেশীক্ষণ আমার লাগবে না, ঘণ্টাখানেক মাত্র, তুমি ততক্ষণ ওদের একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দাও নীলা।'

নীলা কহিল, 'চমৎকার জায়গা, আমার বেশ লাগচে।'

আরদালি ও বেয়ারা মিলিয়া রান্নার আয়োজন করিল, খাটে বিছানা পাতিল, ডিনারের টেবিল সাজাইল, আলোর ব্যবস্থা করিল। বাহিরের বারান্দায় একটা ইজি-চেয়ারে নীলা নীরবে বসিয়াই রহিল, তাহাকে কিছুই নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হইল না। আরদালি আসিয়া তাহার হাতের কাছে চা ও জলখাবার রাখিয়া দিয়া গেল।'

'কি রান্না করবি রে ভর্ত্তু?'

ভর্ত্তু কহিল, 'আলু-পটলের দম, ভাজা, আর ডিমের—'

'না না, ডিম নয় বাবা।'

'তবে মাংস করব, মা?'

'তাই কর্, তবে আমাকে বাদ দিয়ে করিস। তোর বাবুর তো মাংস নইলে খাওয়াই হয় না। আমার ওসব কিছু দরকার নেই।'

'যে আজ্ঞে।' বলিয়া ভর্ত্তু মাংসের ব্যবস্থা করিতে গেল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মিস্টার মুখার্জ্জি আসিয়া পৌঁছিলেন। বলিলেন, 'শরীর একটু সুস্থ হয়েচে নীলা? মাথাধরাটা ছেড়েচে? খবর পাঠিয়েছি ডাক্তারকে, রাতে আসবেন।'

নীলা কহিল, 'ডাক্তারের আর কি দরকার?'

'তুমি বোঝ না নীলা, তুমি বুঝতে পার না তোমার শরীর। এখন প্রত্যেক দিন তোমাকে একজন ডাক্তারের য়্যাটেন্ড্ করা উচিত, মাথাধরা জিনিসটা ভয়ানক খারাপ।'

'এখন মাথা ভাল হয়ে গেছে।'

'আবার ধরতে পারে, এখন থেকে যদি সাবধান হওয়া যায়—' বলিয়া মুখার্জ্জি ভিতরে ঢুকিয়া তাঁহার টুপি, জামা ও ট্রাউজার ছাড়িতে লাগিলেন।

নিকটে শালবনের ধারে ধারে একটু বেড়াইয়া আসিবার কথা হইল। নীলা পরিল একখানি জরির পাড়-দেওয়া নীলাম্বরী; মিস্টার মুখার্জ্জি কোট-প্যাণ্ট ছাড়া চলিতে পারেন না, অনেক অনুরোধে ও উপরোধে তিনি কোঁচানো ধুতি, পাঞ্জাবী ও চাদর চড়াইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। সূর্য্যের আলো তখনও একেবারে নিষ্প্রভ হয় নাই, ইহারই মধ্যে শালবনের পারে চাঁদ উঠিয়াছে; বোধ করি পূর্ণিমার

কাছাকাছি একটা কোনো তিথি হইবে। মাঠ পার হইয়া তাহারা রাঙামাটির পথের উপর উঠিয়া আসিল। গাছপালার ফাঁক দিয়া রেলপথের টেলিগ্রাফের তারগুলি দেখা যাইতেছে। আশপাশে অরণ্যপুষ্পের একরূপ সংমিশ্রিত বিচিত্র গন্ধে পথের এলোমেলো বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

'এই বুঝি এদেশের বেড়াবার জায়গা, এইটুকু?'

মুখার্জ্জি কহিলেন, 'না, ভাল জায়গা আছে, স্টেশনের ওপারে, ওপারেই বেশী লোকজনের বাস।'

নীলা কহিল, 'চল না ওইদিকেই যাওয়া যাক্।'

মুখার্জ্জি একবার হাতঘড়ির দিকে তাকাইলেন, পরে তাকাইলেন আকাশের দিকে। তারপর বলিলেন, 'যেতে আপত্তি নেই, তবে এখন সাড়ে-ছ'টা, একটু দেরি হয়ে গেছে,—তাড়াতাড়ি ফিরে আসা দরকার।'

'চল ঘুরেই আসি, এলাম ত সব দেখেই যাই। চাঁদের আলো হবে, পথে অসুবিধা হবে না।'

দুই জনে স্টেশনে আসিয়া প্ল্যাট্‌ফরম্ হইতে নামিয়া ট্রেনের লাইন অতি সাবধানে অতিক্রম করিল। সাড়ে ছয়টা বাজিলেও প্রান্তরের পরে দিনান্তকালের দীপ্তিহীন আলো তখনও ঝিকিমিকি করিতেছে। পথে আসিয়া নামিতেই এক পাশ হইতে দুই তিনটি লোক তাহাদের নমস্কার জানাইয়া সরিয়া গেল। পথ সুন্দর ও মসৃণ, দুইধারের বন কাটিয়া এক একখানি পাকা ঘর তৈরি হইতেছে। দূরে বা নিকটে গ্রাম নাই, কেবল এখানে-ওখানে দুই চারখানি পাকা বাংলোয় গৃহস্থবাসের চিহ্ন দেখা যাইতেছিল। পথের কোলেই একটি শীর্ণ জলধারা নিঃশব্দে বহিয়া চলিয়াছে, কেউ বলে খাল্, কেউ বলে নদী, তাহারই পুলের উপর দিয়া স্বামী-স্ত্রী পার হইয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে অন্ধকার হইয়া আসিল, চন্দ্রালোক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। পথে আলো কোথাও নাই, মাঠের জঙ্গলে থাকিয়া থাকিয়া জোনাকি পোকা জ্বলিতেছিল। মুখার্জ্জি কহিলেন, 'চল নীলা এবার ফেরা যাক্।'

'চল।'

ফিরিবার পথে কিছুদূর আসিয়া একজন পথিকের সহিত মুখোমুখি হইল। লোকটি পথের একপাশে দাঁড়াইয়া বিনীত কণ্ঠে কহিল, 'আলো এনে ধরব আপনাদের? —অন্ধকার হয়ে গেছে।'

'কে তুমি?'

'আজ্ঞে আমি হরিপদ।'

'ও, তোমার বাসা বুঝি এইদিকে হরিপদ? বেশ বেশ—থাক্, আলো আর ধরতে হবে না, এমনিই চলে যেতে পারব।'

হরিপদ কহিল, 'বাসা আমার এই খুব কাছেই। আমার অনেক দিনের সাধ... এসেছেন যখন আপনারা, একবার আমার ঘরে পায়ের ধুলো দিয়ে যান্।' বলিতে বলিতেই সে যেন কৃতার্থ হইয়া গেল।

'আচ্ছা আচ্ছা হবে, এদিকে আবার এলে আসা যাবে এক সময়, আজ একটু রাত হয়ে গেছে কি-না!'

নীলা কহিল, 'তা হোক গে, এতদূর এসেচি, উনি বলছেন, চল দেখেই যাই।'

মুখার্জ্জি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া রাজি হইতেই হরিপদ ছুটিয়া আলো আনিতে গেল। নীলা কহিল, 'এরই স্ত্রীর তখন অসুখের কথা শুনছিলাম না?'

মুখার্জ্জি কহিলেন, 'হ্যাঁ, এই সে। আমিই এর চাকরি ক'রে দিয়েছিলাম, তাই এ আমার খুব অনুগত।'

তাঁহার গলার আওয়াজটা নীলার কানে ভাল শুনাইল না, অহঙ্কারী মনের একটি গোপন

দন্ত যেন তাহার কানের ভিতর দিয়া অন্তরে আঘাত করিল। আর কোনও কথা সে বলিতে পারিল না।

আলো আনিয়া হরিপদ কহিল, 'আসুন, আজ আমার সৌভাগ্য।'

পথ হইতে নামিয়া হরিপদর অনুসরণ করিয়া তাহারা উভয়ে একখানি পাতার ঘরের দাওয়ার পরে উঠিয়া আসিল। পাশাপাশি দুইখানি ঘর, একখানিতে টিম্ টিম্ করিয়া তেলের আলো জ্বলিতেছে। ভিতরে দারিদ্র্যের একটি করুণ ছায়া। হরিপদ কহিল, 'আসুন এই ঘরে।'

দরজার ভিতরে একবারটি ঢুকিয়াই মিস্টার মুখার্জ্জি কহিলেন, 'আমি বাইরেই আছি, বুঝলে হরিপদ? তোমার এই উঠোনটি বেশ, চমৎকার বাতাস।' বলিতে বলিতে তিনি পুনরায় বাহির হইয়া আসিলেন। কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না যে, তিনি এই আতিথেয়তাকে এড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন।

কিন্তু নীলা আসিল না। হরিপদর রুগ্ন স্ত্রী যেখানে শুইয়া আছে তাহারই কাছে গিয়া সে মেঝের উপরেই বসিয়া পড়িল। হরিপদ তাড়াতাড়ি আসন দিতে গেল, কিন্তু সে লইল না। শীর্ণ অস্থিচর্ম্মসার দেহ,—মেয়েটির বয়স বাইশ-তেইশেব বেশী হইবে না। রূপ নাই, এবং সে যে কতখানি রূপহীনা তাহা এই স্তিমিত দীপালোকে এই পর্ণকুটিরের বুকচাপা দারিদ্র্যের ভিতরে বসিয়া না দেখিলে বুঝা যায় না। সমস্ত মুখখানিতে ক্ষতের দাগ, বোধ করি বসন্ত হইয়াছিল। সর্ব্বাঙ্গে কোথাও আভরণের চিহ্নমাত্র নাই, কেবল দুই হাতে দুইগাছি মাটির রাঙা রুলি। নিতান্ত জীর্ণ শয্যায় পড়িয়া মেয়েটি চোখ চাহিয়াই ছিল বটে, কিন্তু নবাগতাকে পাশে আসিয়া বসিতে দেখিয়া কোনরূপ সাড়াও দিল না, অভ্যর্থনাও করিল না।

'উনি কি আর জান্‌তে পেরেচেন, চোখে যে দেখতে পান না।' বলিয়া হরিপদ স্নিগ্ধ হাসিয়া স্ত্রীর কানের কাছে মুখ লইয়া গেল এবং উচ্চ কণ্ঠে কহিল, 'শুন্‌চ মা এসেচেন, আলাপ করবে না মা'র সঙ্গে?'

মেয়েটি ব্যাকুল হইয়া এদিক-ওদিক মুখ ফিরাইল, বলিল, 'কই?'

'এই যে।' বলিয়া নীলা ঝুঁকিয়া পড়িয়া একখানি হাত তাহার গায়ের উপর রাখিল, বলিল, 'মা নয়, আমি বোন,—কেমন আছেন?'

মেয়েটি ক্লান্ত হাসি হাসল। অকর্ম্মণ্য জীবনের সহিত যাহার এতটুকুও পরিচয় আছে সে-ই জানে এ হাসির অর্থ কি!

নীলা জিজ্ঞাসা করিল, 'কি অসুখ হরিপদবাবু?'

হরিপদ কহিল, 'কি-যেন একটা ইংরেজী নাম আছে, তার বাংলা নেই। এই ত আজ আট বছর হ'ল।'

'আট বছর!' —দুইটি শঙ্কাকুল চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া নীলা তাহার দিকে তাকাইল।

'হ্যাঁ, এই আষাঢ়ে ন'বছর হবে। খুব কষ্ট পাচ্ছেন, চোখ আর কান গিয়ে ভারি বিপদ হয়েচে। প্রত্যেক বছরেই আশা করি এবার উনি ভাল হবেন, সংসারের ভার নেবেন—কিন্তু তা আর হন্ না। আত্মীয়রা আসেন, দেখে চলে যান্... উনি আবার একটু খিটখিটে মানুষ কি-না!'

'আপনাকেই সব করতে হয় ত?'

'করি কোনো রকমে, আর কাজ ত এমন কিছু নয়! সকাল বেলায় ওঁকে সুস্থ ক'রে রেখে ট্রেনে বেরিয়ে যাই, সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসি। —দাঁড়ান, ভয় পাবেন না, ওর অমন হয় মাঝে মাঝে।' বলিতে বলিতে হরিপদ তাড়াতাড়ি আসিয়া স্ত্রীর অর্দ্ধেক দেহটা কোলের উপর তুলিয়া লইল। হাত-মুখ কিম্ভূতকিমাকার বাঁকাইয়া মেয়েটি তখন গোঁ গোঁ করিতেছে। সযত্নে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া শান্ত হাসি হাসিয়া হরিপদ কহিল, 'আপনাকে কাছে পেয়ে আনন্দ হয়েচে কি-না... ডাক্তার বলে এর নাম মৃগী।'

ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া নীলা বসিয়া রহিল। হরিপদ কহিল, 'বিয়ের এক বছর না যেতেই এই অসুখ। পরের চাকরি করি, চাকরিই তো ভরসা, তাই সেবাযত্ন করার তেমন সময় পাইনে। একদিন

অজ্ঞান অবস্থায় আমার হাতটা কাম্‌ড়ে দিয়েছিলেন... এই দেখুন না হাসপাতালে গিয়ে এই আঙুলটা বাদ দিতে হয়েছে।' বলিয়া সে আবার হাসিল।

এই পরিচ্ছন্ন হাসিটুকুর মধ্যে কোথাও ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই, বিরক্তি নাই। এই চিররুগ্না কুরূপা স্ত্রী, এই দারিদ্র্য ও স্বজন-সহায়হীন দুঃস্থ জীবন—ইহাদেরই আসনের 'পরে বসিয়া এই শান্ত নিরীহ মানুষটি যেন কঠিন তপস্যা করিয়া চলিয়াছে। ইহা সংগ্রাম নয়, সাধনা। একটি অপরিসীম সৌন্দর্য্যোপলব্ধিতে নীলার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল। আকাশের ধ্রুবতারার অচঞ্চলতাকে তাহার মনে পড়িল, তাহার মনে পড়িল প্রভাতসূর্যের প্রথম রশ্মিটির পবিত্রতাকে!

চুপ করিয়া সে বসিয়া রহিল, বাহিরে রাত্রি গভীর হইতে লাগিল, স্বামী অপেক্ষা করিতেছেন, কিন্তু তাহার উঠিতে ইচ্ছা হইল না। দেবতার মন্দিরে সে যেন এক সামান্য পূজারিণী, তাহার ইচ্ছা হইল ধূপ-ধূনা দিয়া এই প্রদীপটি লইয়া এই অর্দ্ধশয়ান হরপার্ব্বতীর আরতি করিয়া যায়। চক্ষু তাহার বাষ্পাকুল হইয়া আসিল।

একটু পরে রোগিণী আবার সুস্থ হইল। সুস্থ হইয়া সে হাসিল, সে হাসি দেখিলে মানুষ ভয় পায়। হাতটা বাড়াইয়া আন্দাজে সে নীলার একখানি হাত ধরিল, তারপর সেখানি লইয়া নিজের মাথার পরে রাখিয়া কহিল, 'আশীর্ব্বাদ কর দিদি।'

নীলা তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া কহিল, 'আশীর্ব্বাদ যে চাইতে এলাম!'

এমন সময় বাহিরে মিস্টার মুখার্জ্জির গলার আওয়াজ শোনা গেল। নীলা আর বসিতে পারিল না, উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'এখানে থাকলে কাল আবার আসতুম, কিন্তু ওঁর থাকার উপায় নেই ত!'

হরিপদ উঠিয়া আসিয়া প্রণাম করিতে চাহিল, নীলা সরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'অমন কাজ করবেন না, প্রণামের যোগ্য আমি নই, আপনি।'

হরিপদ অবাক হইয়া তাহার দিকে তাকাইল। নীলা তাড়াতাড়ি রোগিণীর মুখখানি নাড়িয়া আর একটু আদর করিয়া বাহির হইয়া আসিল। হরিপদ আলো ধরিতে গেল, কিন্তু সে বাধা দিয়া কহিল, 'কিছু দরকার নেই; বেশ যাব আমরা, আপনি গিয়ে বসুন ওঁর কাছে।'

উঠানে নামিয়া স্বামীর সহিত গিয়া সে মিলিত হইল। জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভাসিয়া যাইতেছে, পথ দেখিয়া লইবার কিছুই অসুবিধা হইল না। মিস্টার মুখার্জ্জি একটু উত্যক্ত হইয়াছিলেন, একজন নগণ্য সর্টারের বাড়ির উঠানে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ হইয়া এতক্ষণ অপেক্ষা করাটা তাঁহার সম্মানে আঘাত করিয়াছে।

'গল্প জমেছিল না-কি?'

চলিতে চলিতে নীলা কহিল, 'না।'

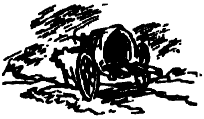
'তবে বুঝি হরিপদ জলখাবার খাওয়াচ্ছিল? ওর স্ত্রীর সঙ্গে 'গঙ্গাজল' পাতিয়ে এলে না কেন?'

নীলা বিদ্রূপ শুনিয়াও চুপ করিয়া রহিল। মিস্টার মুখার্জ্জি পুনরায় কহিলেন, 'সামান্য লোককে প্রাধান্য দেওয়া তোমার স্বভাব।'

নীলা একবার তাহার মুখের দিকে তাকাইল, তারপর মুখ নীচু করিয়া চলিতে চলিতে কহিল, 'সামান্য নয়!'

এইবার তাহার চক্ষে জল নামিয়া আসিল।

৩৩ বর্ষ, শ্রাবণ ১৩৮০



পোষ্টাপিসের পিয়ন ও তার মেয়ে

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সিদ্ধির নেশায় কৈলাসের চোখ দুটি স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। রামগতি নিজের মনে খুব হাসিতেছিল। কাঁচা-পাকা খোঁচা-খোঁচা দাড়ির নীচে চিবুক চুলকাইয়া সে রামগতির হাসিতে যোগ দিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু আজ নেশাটা বড় ধরিয়াছে। রামগতির রসিকতাতেও হাসি আসে না।

দুধের সাধ ঘোলে মেটানোর মত করিয়াই সিদ্ধি খাওয়া, নহিলে সিদ্ধির নেশায় কৈলাসের কোনদিন ঝোঁক ছিল না। তাড়ির কাছে কি সিদ্ধি! কিন্তু তাড়ি সে আজকাল আর খায় না। একদিন নেশার ঝোঁকে মেয়ে কালীতারার কানের মাকড়ি টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলার পর হইতে ছাড়িয়া দিয়াছে। পোষ্টাপিসের ছুটি থাকিলে বদনের দোকানে যাওয়ার জন্য বিকালের দিকে এখন তার পা সুর সুর করে, এক ভাঁড় তালের রস আর বদনের বউয়ের কড়া করিয়া ভাজা পেঁয়াজবড়ার অভাবে দিনটা তার বৃথাই গেল মনে হয়। কিন্তু বদনের দোকানে যাওয়া আর তার হইয়া উঠে না। কানের খানিকাটা উঁচুতে আর একটা ছেঁদা করিয়া কালী অবশ্য আবার মাকড়ি পরিয়াছে, কিন্তু কানের কাটা অংশটুকু বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কৈলাস চাহিয়া দেখে আর অনুতাপ করে। মাকড়ি-ছেঁড়ার রাত্রে কৈলাসের নেশার জগতে তিলটি তাল হইয়াই ছিল, কালী বিশেষ না চেঁচাইলেও তার মনে হইয়াছিল মেয়েটা বুঝি আর্তনাদ করিয়াই মারা যায়, এবং সেই ফেনানো উপলব্ধিটাই তার স্মরণ আছে।

কাটা কানের জন্য কালী বিশেষ দুঃখ করে না। বলে 'হোকগে' বাবা, কান নে' ধুয়ে ধুয়ে জল খাব কি! তোমার একটো কুস্বভাব তো শুধরোলো।'

শুনিয়া কৈলাস খুশী হয়। সে যে আর তাড়ি খায় না মেয়ের জন্য সে একটা বড়রকম ত্যাগ ছাড়া আর কিছুই নয়। মেয়ে ত্যাগটা বোঝে জানিলে নেশা না করার আপশোষে সে অনেকখানি সান্ত্বনা পায়।

রামগতির জামাই মাখম একটা কালিপড়া লণ্ঠন রাখিয়া গিয়াছে। তারই মৃদু আলোকে পরিমাণ ঠিক করিয়া কৈলাস আরও খানিকটা সিদ্ধি গিলিয়া ফেলিল। তারপর একটা অত্যন্ত দুঃখের হাসির সঙ্গে নিজের মনে তাব মাথা নাড়ার কারণটা রামগতি কিছুই বুঝিতে পারিল না।

বলিল 'আর খেও না দাদা।'

কৈলাস বলিল, 'না।' খাইলে ছাই হয়। না আছে তাড়ির গন্ধ না আছে স্বাদ!

তবু সে প্রায়ই রামগতির কাছে সিদ্ধি খাইতে আসে, সর্পী হইতে বাদাম পেস্তা আর সাদা চিনি আনিয়া দিয়া সবুজ সরবৎকে বিলাসিতায় দাঁড় করানোর ব্যবস্থা করে। সিদ্ধি যোগায় রামগতি। তার জামাই মাখমের বাড়ি ময়মনসিং-এর একটা মহকুমা শহরে—যেখানে মাঠে-ঘাটে বিনা চাষেই সিদ্ধি গাছে জঙ্গল হইয়া থাকে। টিনের তোরঙ্গে কাপড়ের নীচে লুকাইয়া সে শ্বশুরের জন্য সিদ্ধিপাতা লইয়া আসে। নিজে না আসিলে লোক মারফৎ পাঠাইয়া দেয়। আবগারী বিভাগের লোকেরা মদ আফিং প্রভৃতি বড় বড় মাদক সামলাইতে ব্যস্ত থাকে, সুতরাং কাজটা মাখম আইন বাঁচাইয়াই করে। মাখম নিজে কিন্তু কোন নেশাই করে না। কেবল তামাক খায়। সে ভারি শান্ত ও সংসারী মানুষ, —একা সে সাতাশী বিঘা জমির চাষ আবাদ দেখে আর বছরে দেড় হাজার টাকার গুড়ের কারবার সামলায়। শ্বশুরকে সে বিশেষ ভক্তি করে এবং শ্বশুরের বন্ধু বলিয়া প্রতিবার আসা ও যাওয়ার সময় কৈলা. পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে ভোলে না।

কৈলাস 'থাক, থাক', বলিয়া তার প্রণাম নেয় ও চিরজীবী হওয়ার জন্য আশীর্ব্বাদ জানায়। তারপর রামগতির কাছে প্রাণ খুলিয়া মাখমের সঙ্গে নিজের গোঁয়ারগোবিন্দ জামাই সুবলের তুলনামূলক সমালোচনা আরম্ভ করিয়া দেয়। সুবলকে সে চাষা বলে, গুণ্ডা বলে, গেঁজেল বলে এবং

আরও অনেক-কিছু বলে। সুবলের নাই এমন অনেক দোষও সে তার ঘাড়ে চাপাইয়া দেয়। বারকয়েক বলিবার পর সুবলের সেই কাল্পনিক দোষগুলিতে তার বিশ্বাস জন্মিয়া যায়।

মেয়ের মত মেয়ের সেই অপদার্থ জামাইটাও বেচারীর সজ্ঞান মুহূর্ত্তগুলিতে অধিকার করিয়া থাকে। আজও সমস্ত সময়টা সে মাখমের সঙ্গে সুবলকে মিলাইয়া দেখিতেছিল। সুবলের সঙ্গে সম্পর্ক একপ্রকার রহিত করিয়া এবং কালীকে পাঠাইতে রাজী না হইয়া সে যে ভালই করিয়াছে এর স্বপক্ষে সমস্ত যুক্তিগুলি তার কাজে ক্রমেই পরিষ্কার ও অকাট্য হইয়া উঠিতেছিল।

'ভয় দেখিয়ে পত্র লিখিছে দাদা, এবার মেয়ে না পাঠালে ফের বিয়ে করবে। আমি বলি, কর! কর গিয়ে তুই য'টা পারিস বিয়ে। ওতে ভয় পাবার পাত্র কৈলেস ধর নয়। একটা মেয়েকে সে রাজার হালে পুষতে পারবে।' হঠাৎ ভয়ানক রাগিয়া, 'আরে আগে তুই গাঁজা গুণ্ডামি ছাড়, মানুষ হ' তবে তো পাঠাব মেয়ে। নিজের গর্ভধারিণী মার গায়ে হাত তুলিস, তোকে বিশ্বাস কি!'

এটুকু কল্পনা। রামগতি বলিল, 'মার গায়ে হাত তোলে না কি?'

'তোলে না? ওর অসাধ্য কর্ম্ম আছে জগতে? মেয়ে কি আমি সাধে পাঠাই না দাদা,—মেরে ফেলবে যে!'

প্রকৃতপক্ষে মেয়েকে স্বামীর ঘর করিতে না পাঠানোর কৈফিয়তই সে আগাগোড়া রামগতিকে দিয়া যায়। সুবলের মেজাজটা বিশ্রী, অন্য দোষও তার কমবেশী আছে, কিন্তু মেয়ে পাঠানো চলে না এমন অজুহাত সেটা নয়। কিন্তু নিজে রাজা না হইলেও রাজকন্যার সঙ্গে কালীর বিশেষ পার্থক্য আছে বলিয়া কৈলাস মনে করে না এবং মাখমের মত রাজপুত্রগুলির একটাকেও সে যে কালীর জন্য সংগ্রহ করিতে পারিত না এ কথাটাও সে ভুলিয়া থাকে। সে ভালবাসে বলিয়াই সুবলের চেয়ে ভাল স্বামীর ভাগ্য কালির অর্জ্জিত হইয়া গিয়াছে এই রকম একটা ঝাপসা ধারণা বরং তার আছে।

তবু মাঝে মাঝে সুবলের দোষগুলি তার কাছে সংসারের রোগশোকের মতই অপরিহার্য্য ও মার্জ্জনীয় মনে হয়। কালীকে না পাঠানোর অনেকগুলি সমর্থনই কমজোরী হইয়া যায়। তখন সে আশ্রয় করে জামাইয়ের সঙ্গে তার মনান্তরকে। কালীকে নিতে আসিলে বিনা প্ররোচনায় সুবলকে সে এমন অপমানই করে যে সুবলও তাকে অপমান না করিয়া পারে না। কৈলাস তখন পাড়াপ্রতিবেশীকে ডাকিয়া জামাইয়ের মেজাজ দেখায়, তার গালাগালির সাক্ষী করে, এবং সকলের সামনে জোর গলায় ঘোষণা করিয়া দেয় যে জামাই যতদিন জামাইয়ের মত না আসিবে মেয়ে সে কোনমতেই পাঠাইবে না। সর্পী পোষ্টাপিসের সে হেডপিয়ন তার একটা সম্মান আছে, মেয়ে তার ফেলনা নয়।

কালী ঘরেব ভিতর থ' হইয়া থাকে। ভাবে এত গোলমালে কাজ কি বাবু, দিলেই হয পাঠিযে! মারে যদি না-হয় খাবই একটু মার।

দাঁতে দাঁত ঘষিয়া সুবল সকলের কাছে তার একটা নালিশ জানায়।

শুনিয়া কৈলাস যায় ক্ষেপিয়া। কালীকে ঘরের ভিতর হইতে হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া চড়া গলায় জিজ্ঞাসা করে, 'চাস? চাস তুই যেতে? বল, চেঁচিয়ে বল, সবাই শুনুক।' কালী সুস্পষ্ট মাথা নাড়ে।

সুবল সহসা কেমন ঝিমাইয়া পড়ে, আর তেমনভাবে কৈলাসের সঙ্গে কলহ চালাইতে পারে না। সকলকে শুনাইয়া একটা অশ্রদ্ধেয় কথা বলিয়া ঘাড় উঁচু করিয়া সে চলিয়া যায়।

সুবল যতক্ষণ উপস্থিত থাকে প্রতিবেশীরা তাকে এত বেশী ছি ছি করে যে, তার প্রতি কালীর পর্য্যন্ত একটা সাময়িক অশ্রদ্ধা জন্মিয়া যায়। সুবল চলিয়া গেলে তারা একটু সুর বদলায়। বলে যে জামাই যাই হোক মেয়ে না পাঠাইয়া উপায় কি? আরও বলে যে কালীর যখন বয়সের গাছপাথর নাই তাকে আর এভাবে রাখা উচিত নয়। কারণ গ্রামটা খারাপ ছেলেতে ভর্ত্তি, কালীর খারাপ হইতে কতক্ষণ?

কৈলাস কটমট করিয়া ইহাদের দিকে তাকায়, কিন্তু কিছু বলে না। নিজেই এক ছিলিম তামাক সাজিয়া টানিতে থাকে।

একজন বয়স্কা বিধবা কথাটা আরও স্পষ্ট করিয়া দেয়।

'হ্যাঁ লো কালী, সেদিন দুপুরবেলা বংশী কি করতে এসেছিল রে? তোর কাছে তার কি দরকার?'

কালী মুখ লাল করিয়া বলে, 'কবে মাসী?'

কৈলাস লাফাইয়া ওঠে। বলে 'খুন ক'রে ফেলব কাতুর মা। যত্নের পিসী রোজ দুপুরে এসে বসে থাকে জানিস নে তুই?'

কাতুর মা বলে, 'বসে থাকে না ঘুমোয় তুই দেখতে আসিস্? আমি তো দুপুরে না ঘুমিয়ে থাকতে পারি না।'

খানিক রাত্রে কৈলাস রামগতির কাছে বিদায় নিল। রামগতি হাঁকিয়া বলিয়া দিল, 'একটু তেঁতুল গুলে খেয়ো দাদা। রকম ভাল নয়।'

গ্রামে সন্ধ্যার পরেই রাত্রি। কানাইমুদী ইতিমধ্যেই ঝাঁপ বন্ধ করিয়াছে। দোকানের সামনে বাঁশের বেঞ্চিতে কে চিৎ হইয়া শুইয়া আছে, মুখে তার বিড়ির আগুন। কানাইয়ের ভাই বংশী ছোঁড়া রোজ এমনি সময় ওখানে এমনিভাবে শুইয়া থাকে আর থাকিয়া থাকিয়া বাঁশী বাজায়। সুবলের মতই অপদার্থ। কয়েকবার মুখ ফিরাইয়া কৈলাস জোনাকির মত তার বিড়ির আগুনের জ্বলা-নেবা চাহিয়া দেখিল। ছেলেদের এ-রকম ভাসিয়া বেড়ানো সে পছন্দ করে না। কানাইয়ের একেবারে দায়িত্ববোধ নাই। ভাইয়ের একটা বিবাহ সে এবার দিলেই পারে।

মেয়ের বদলে বংশীর মত ছেলেও যদি তার একটা থাকিত তবে কোন ভাবনা ছিল না, এও কিন্তু কৈলাসের মনে হয়। পরের বাড়ি পরের সংসার মানুষের ছেলেকে ধরিয়া টানাটানি করে না, মমতার সঙ্গে থাকে অধিকার। ছেলের বউ আনিয়া মেয়ের সাধও মেটানো চলে। নিজের সন্তানকে নিজের কাছে রাখিয়া সকলের কাছে অপরাধী হইয়া থাকিতে হয় না।

অন্ধকার পথে চলিতে চলিতে কৈলাসের ভয়ানক রাগ হইতে লাগিল। সংসারে একি অবিচার! সে তার মেয়েকে কোথাও পাঠাইতে চায় না, মেয়ে তার কোথাও যাওয়ার নামে ভয়ে অস্থির হয়— তাদের দু-জনকে পৃথক করিয়া দেওয়ার জন্য লোকের এত মাথাব্যথা কেন? সে কারও ভালমন্দে থাকে না, তার শান্তি নষ্ট করিতে লোকের এত উৎসাহ কি জন্য? প্রতিবেশী নিন্দা করে, সুবল আসিয়া দাবী জানায়। কিসের নিন্দা কিসের দাবী? দেশে ঢের মেয়ে আছে, সুবল যাকে খুশী ঘরে আনিয়া কষ্ট দিক, প্রতিবেশীদের ঘরে ছেলেমেয়ে আছে তাদের ভাল মন্দ লইয়া তারা মাথা ঘামাক্। সে কথাটি কহিবে না। কিন্তু সে আর তার মেয়ে দু-জনেই যখন সুবলকে অস্বীকার করিয়াছে, লোকের বলাবলিকে তারা যখন গ্রাহ্য করে না, তাদের আর বিরক্ত করা কেন? গায়ের জোরেই সকলে মিলিয়া তাদের দিয়া যা-খুশী করাইয়া লইবে না কি? রাগ আর তার কমিতে চায় না। নির্জ্জন রাস্তায় নিজের মনে কৈলাস গজ্ গজ্ করিতে লাগিল। নেশায় তার মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করিতেছে, রাস্তাটা ঝুলানো দোলনার মত দুলিয়া উঠিতে চায়। গ্রামের সমতল পথে সে পাহাড়ী দেশের চড়াই উৎড়াই ভাঙিতেছে। তবু এমন জমজমাট নেশার মধ্যেও তাড়ির তৃষ্ণায় সে আহত। মেয়ের জন্য কত দুর্দ্দশাই তার কপালে আছে কে জানে। এতেও লোকে মেয়ের উপর তার অধিকারকে স্বীকাব করিবে না। তাড়ি তো বড় কথা, কালীর জন্য সুবল একটা ছোটখাট ত্যাগও স্বীকার করুক দেখি। সেবেলা তার পাত্তা মিলবে না। অধিকার জাহির করিতেই সে মজবুত।

এমনি মানসিক অবস্থায় বাড়ির উঠানে পা দিয়া কৈলাস দেখিল, দাওয়ায় মাদুরে কাত হইয়া তারই হুঁকায় সুবল পরম আরামে তামাক টানিতেছে। চিনিতে পারিয়াও সেখান হইতেই কৈলাস হাঁকিয়া বলিল, 'কে?'

হুঁকা রাখিয়া সুবল নামিয়া আসিল। বলিল, 'আজ্ঞে আমি।'

'বলা নেই, কওয়া নেই তুমি বাড়ির মধ্যে ঢুকেছ কেন?'

সুবল ঠিক করিয়া আসিয়াছিল এবার সুর নরম করিবে, সহজে রাগিবে না।

মাটির দিকে চাহিয়া সে বলিল, 'বাড়ির মধ্যে ঢুকব না তো কোথায় যাব?'

শ্বশুরকে একটা প্রণাম ঠুকিবে কি-না সুবল তাহাও ভাবিয়া দেখিতেছিল। অভ্যর্থনার রকম দেখিয়া সেটা আর পারিয়া উঠিল না।

কৈলাস বলিল, 'কোথায় যাবি তা আমি কি জানি? চুলোয় যাবি।'

সুবল বলিল, 'এত রাগবার কারণটা কি হ'ল? মা নিতে পাঠাল বলে এসেছি বই তো নয়।'

কৈলাস বলিল, 'মা নিতে পাঠাল! তোর মা কে রে যে আমার মেয়েকে নিতে পাঠায়? যা তুই, বেরো আমার বাড়ি থেকে।'

সুবল অল্প রাগ করিয়া বলিল, 'বার ক'রে দিচ্ছ যে, তোমার বাড়ি থাকতে এসেছে কে? গাছতলা ঢের ভাল।'

'যা তবে গাছতলাতে যা। ফের আমার বাড়ি ঢুকলে তোর ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব।'

'ঠ্যাং অমনি সবাই সবাকার খোঁড়া করছে। আমারও দুটো হাত আছে।'

প্রতিবার যেমন হয়, এবারও তেমনি ভাবে দুজনের সুর চড়িতে লাগিল; ভাষা রূঢ় হইতে অভদ্র এবং অভদ্র হইতে অশ্রাব্যে দাঁড়াইয়া গেল। মাত্রা কৈলাসেরই বেশী। সে বুঝিতে পারিয়াছিল আজ একটা হেস্তনেস্ত হইয়া যাইবে, সুবল শেষ মীমাংসা করিতে আসিয়াছে, আজ ওকে ফিরাইয়া দিতে পারিলে ও আর আসিবে না। শুধু আসিবে না নয়, কালীকে কোনদিন পাঠানও অসম্ভব করিয়া দিবে। বিধবা মেয়ের মত তার কাছে থাকা ছাড়া কালীর আর কোন উপায় থাকিবে না। মেয়েটা বাঁচিবে।

খানিক পরে তাই কলহের পরিসমাপ্তির জন্য কৈলাস পা হইতে ছেঁড়া চটি খুলিয়া সুবলকে পটাপট কয়েক ঘা বসাইয়া দিল। উঠানে একটা বাঁশের বাতা পড়িয়া ছিল, সেটা কুড়াইয়া লইয়া কৈলাসের মুখের উপর নির্ম্মম ভাবে কয়েকবার আঘাত করিয়া সুবলও করিল প্রস্থান। রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া উলুখড় কালী তার জীবনের দুই রাজার যুদ্ধ আগাগোড়া সবটাই চাহিয়া দেখিল।

কৈলাসের আঘাত কম লাগে নাই। মুখে চার-পাঁচটা কালো দাগ পড়িয়াছে, নাক দিয়া রক্তপাত হইয়াছে এবং খোঁচা লাগিয়া একটা চোখ বুজিয়া গিয়াছে। অনেক রাত অবধি তাহার নাক দিয়া রক্ত ও চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। থাকিয়া থাকিয়া সে বলিতে লাগিল, 'দেখলি কালী, দেখলি? আর একটু হলে খুন করে ফেলত রে!'

মনে মনে সে কিন্তু নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। সুবল আর আসিবে না। তাকে ক্ষমা করার কামনা কালীর মনে যদি কখনও জাগিয়া থাকে এ ঘটনার পর আর জাগিবে না। বাপকে যে এমন করিয়া মারিয়া যায় মেয়ে কি তাকে ক্ষমা করিতে পারে? এবার আর বুঝিতে পারা নয়, কালী নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাইয়াছে যে, সুবল মানুষ নয়—খুনে ডাকাত। ওকে এবার কালী ভয়ঙ্কর ঘৃণা করিবে। আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিই এবার তাকে কোনমতে ভুলিতে দিবে না যে বাপের কাছে থাকাই তার পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ ও মঙ্গলজনক ব্যবস্থা।

অথচ কালী ভয়ানক গম্ভীর হইয়া গিয়াছে। ভাল করিয়া কথার জবাব দেয় না। সুবলের বিরুদ্ধে সত্যমিথ্যা অভিযোগে সায় দিতে তার যেন আর তেমন উৎসাহ নাই।

প্রথমটা কৈলাস অত খেয়াল করে নাই। শেষে মেয়ের ভাব লক্ষ্য করিয়া সে অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

'কথা কইছিস না যে কালী?'

'কি বলব বল না?'

'বাঁচলি, কি বলিস?'

'ঝগড়াঝাঁটি ভাল লাগে না বাবু।'

'দেখলি তো? কি রকম কাণ্ডটা ক'রে গেল?'

কৈলাস নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইল। একটা বিরক্তিকর ব্যাপার ঘটিয়াছে শুধু এই জন্যই কালীর মন খারাপ হইয়াছে, সুবলের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়া গেল বলিয়া নয়। কাল ওর মুখের মেঘ কাটিয়া যাইবে। যেমন হাসিয়া খেলিয়া এতদিন এতকাল তার দিন কাটিয়াছে কাল আবার গোড়া হইতে তার শুরু। এবার আর বাধা পড়িবে না। কাল সে ওকে সতীশের হার্মোনিয়মটা আনিয়া দিবে। পাড়ার লোকে নিন্দা করিবে, তা করুক। নিন্দা করা যাদের স্বভাব নিন্দা তারা করিবেই। কালী আনন্দে শুধু নাচিতে বাকী রাখিবে। তার মত অবস্থার লোক কে কবে মেয়েকে বাইশ টাকা দিয়া হার্মোনিয়ম কিনিয়া দিয়াছিল? তার এক মাসের মাহিনা!

পরদিন সোমবার। সোমবার উখারায় মস্ত হাট বসে। অনেক দূর দূর গ্রামের লোক হাটে চিঠিপত্র সংগ্রহ করিতে আসে, সেখানে বড় বড় মহাজনদের নামে মোটা টাকার মনিঅর্ডার ও ইনসিওর থাকে। চিঠির তাড়া হাতে চামড়ার ব্যাগ কাঁধে ঝুলাইয়া বেলা দশটার মধ্যে কৈলাসকে হাটে হাজির হইতে হয়। একটা পর্য্যন্ত সেখানে সে চিঠি ও টাকা বিলি করে।

সদরের পোস্টাপিস কাছে নয়, পাঁচমাইল পথ। পোস্টাপিসে চিঠি ও টাকা হিসাব করিয়া গুছাইয়া লইয়া আরও তিন মাইল হাঁটিলে তবে উখারার হাট। কৈলাসের সকালে ওঠা দরকার ছিল, কিন্তু কালী তাকে কোনমতেই ডাকিয়া তুলিতে পারিল না। উঠিতে সে বেলা করিয়া ফেলিল।

'সকালে তুলে দিলি না যে কালী? আজ হাট বার খেয়াল নেই? দিনকে দিন তোর কি হচ্ছে!'

'তুমি উঠলে? রাঁধতে রাঁধতে ক'বার যে ডেকেছি তার ঠিক নেই।'

কৈলাসের রাগ হইয়াছিল। সে আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ গত সন্ধ্যার কথা মনে পড়ায় এক নিমেষে গলিয়া জল হইয়া গেল।

'রাঁধতে তোর যদি কষ্ট হয় তো বল তোর মাসীকে এনে রাখি।'

'রাঁধতে আবার কষ্ট কিসের? মাসীর ধাক্কা পোয়াতে পারব না বাবু।'

কৈলাস খুশী হইয়া মনে মনে হাসিল। ভাবিল, বাপের সেবার ভারটা মাসীর উপরেও ছাড়িয়া দিতে কালীর বাধে।

সে স্নান করিয়া আসিল। পিঁড়িতে বসিয়া বলিল, 'আন রে কালী, চটপট আন্। দেখেছ শালার রোদ্দুর! প্রাণটা যাবে।'

কালী বলিল, 'হুটোপাটি করলে চলবে না বাবা, বসে খেতে হবে।'

'বসে খাওয়ার সময় গড়াচ্ছে।'

কিন্তু কালী যে কাণ্ড করিয়া রাখিয়াছে তাহাতে বসিয়া না খাইয়া তার উপায় রহিল না। ডাল আর আলুভাতে খাইয়াই নিত্য সে পোস্টাপিসে যায়, আজ কালী নিমন্ত্রণ রাঁধিয়াছে। কখন সে এত সব করিল কে জানে। কৈলাস যা খাইতে ভালবাসে তার কোনটাই একরকম সে বাদ দেয় নাই। কলাপাতার বদলে আজ খাওয়ার ব্যবস্থা থালাতে, থালায় তরকারী সাজাইয়া কালী কুলাইয়া উঠিতে পারে নাই।

'এ কী করেছিস রে! তুই কি ক্ষেপেছিস কালী?'

'একদিন কি ভাল খেতে নেই?'

'এত কেউ খেতে পারে?'

'না খাও তো আমার মাথা খাও।'

কৈলাস প্রাণপণে খাইল। মেয়ের এতটুকু সখের জন্য সে প্রাণ দিতে পারে, মেয়ে সাধ করিয়া রাঁধিয়াছে, সে খাইবে না? উঠান রোদে ভরিয়া গিয়াছে, সেখানে ছায়া ফেলিয়া কালী তাহাকে পরিবেশন করিল, মাছের কালিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেমন হয়েছে বাবা।'

'বেশ হয়েছে। চমৎকার রেঁধেছিস কালী।'

কালীর পায়ের মলের আওয়াজ বাড়িটাকে যেন জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছে। সে একাকিনীই

ঘরভরা। এ বাড়িতে তার অতগুলি ছেলেমেয়ে যে পট-পট করিয়া মরিয়াছিল, কৈলাসের কাছে আর তাহা শোকাবহ স্মৃতি নয়। এমনি ভাবে ভাত বাড়িয়া দিয়া, এমনি ভাবে মল বাজাইয়া হাঁটিয়া কালী তার জীবনে শোকের চিহ্ন রাখে নাই, তার গৃহের আবহাওয়া হইতে মৃত্যুর স্তব্ধতা মুছিয়া লইয়াছে। ক'টা ছেলেমেয়ে আর তার মরিয়াছে? দু'টা—তাও পাঁচ-সাত বছর বয়সে—একযুগ আগে। তবু, কালী না থাকিলে তাদের জন্যই কৈলাস শোকাতুর হইয়া থাকিত বই কি!

খাওয়ার পর বসিয়া বসিয়া কৈলাস খানিক তামাক টানিল। বেলার দিকে তার নজর ছিল না. ধীরেসুস্থে খাকী কোট কাঁধে ফেলিয়া সে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইল।

কালী ছল ছল চোখে বলিল, 'এই রদ্দুরে কি ক'রে অদ্দূর যাবে বাবা?'

মেয়ের মমতায় মুগ্ধ হইয়া কৈলাস বলিল. 'জানিস কালী, তোর মা ঠিক অমনি ক'রে বলত।' তারপর সান্ত্বনা দিয়া বলিল, 'বিশ বছরের অভ্যেস. আর কি কষ্ট হয়? বলে, রোদে ঘুরে ঘুরে মাথার চুলে ছাই-এর রঙ ধ'রে গেল।'

ধূসর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কৈলাস বাহির হইয়া গেল। কালী বলিয়া দিল, 'গাছের ছায়ায় জিরিয়ে জিরিয়ে যেও বাবা।'

মানুষের ছায়ায় যে জিরাইয়া জুড়াইয়া গেল, গাছের ছায়া দিয়া সে করিবে কি? বিশ বছরের দুবেলা চেনা পথ কাঠফাটা রোদে বোঝাই পেটে পথ চলিতে কৈলাসের মুখের হাসি কোন মতেই মুছিয়া গেল না। চেনা মানুষকে দাঁড় করাইয়া সে কুশল জিজ্ঞাসা করিল, যে ডাকিল দুদণ্ড বসিয়া তার তামাক খাইল, মেয়ে আজ তাকে কি রকম গুরুভোজন করাইয়াছে অনেক বাড়াইয়া তার বর্ণনা করিল। পোস্টাপিসে পৌঁছনোর আগেই তার পেটে কেমন করিয়া মাংস সন্দেশ আর নাম না-জানা একটা ক্ষীরের খাবার হাজির হইয়া গেল।

নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'আমার অমন মেয়ে, তার কীই বা আমি করলাম। চোখ কান বুজে একটা জানোয়ারের হাতে সঁপে দিলাম মেয়েকে। এমন ঝকমারি কাজ মানুষ করে!'

পোস্টাপিসে পৌঁছিতে তার দেরী হইয়া গেল।

পোস্টমাস্টার বলিলেন, 'দিন কে দিন বড় যে নবাব হয়ে উঠছ হে কৈলাস!'

'আজ্ঞে মেয়েটার বড় অসুখ বাবু।'

পোস্টমাস্টার তার দুর্ব্বলতা জানিতেন, একটু নরম সুরে বাললেন, 'মেয়ের তো তোমার অসুখ লেগেই আছে।'

কৈলাস উৎসাহিত হইয়া বলিল, 'সাধে অসুখ লেগে থাকে বাবু? মনের কষ্টে। জামাই যে মানুষ নয়, ডেকে জিজ্ঞেস করে না। একদিন-দুদিনের জন্য যদি বা আসে তো মেরে গাল দিয়ে ভূত ছাড়িয়ে দিয়ে যায়। মেয়ে আমার খায় না দায় না, দিবারাত্তির কাঁদছে,—অসুখ হবে না?'

দ্রুত পটু হস্তে সে চিঠির তাড়া গুছাইয়া নিতে লাগিল। গলা নামাইয়া বলিল, 'আপনার জামাইটি ভাল। আমায় সেদিন ডেকে বললেন, কৈলেস, অমন খাসা শাড়ী নিয়ে যাচ্ছ কার জন্যে? আমি বললাম, মেয়ে পরবে জামাইবাবু, গরীবের মেয়ে হলে কি হয় মেয়ের আমার সখটি আছে পুরোমাত্রায়। জামাইবাবু হেসে কাপড়ের দাম জিজ্ঞেস করলেন, তারপর আমার হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে বললেন, 'আমায় একজোড়া এনে দিও তো কৈলাস। লুকিয়ে এনো।' পোস্টমাস্টারের মুখের দিকে চাহিয়া চোখ মিটমিট করিয়া কৈলাস রহস্যটা তাকে বুঝাইয়া দিল, 'দিদিমণির জন্যে আর কি, তাই লুকিয়ে আনতে বলা।'

'তোমার মুখে দাগ কিসের কৈলাস?'

কৈলাসের বকুনি থামিয়া গেল। সে সংক্ষেপে জবাব দিল 'পড়ে গিয়েছিলাম।'

পোস্টমাস্টার সিন্দুক খুলিয়া টাকা বাহির করিয়া দিলেন। আজ ইনসিওর নাই, মনিঅর্ডারও কম। সই করিয়া টাকা লইয়া কৈলাস বলিল, 'আমায় গোটা কুড়িক টাকা দিন।'

'এবার হবে না কৈলাস।' বলিয়া পোস্টমাস্টার মাথা নাড়িলেন।

কৈলাস কোমরের কাপড়ের ভিতর হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া পোস্টমাস্টারের সামনে

টেবিলের উপর রাখিল। বলিল, 'আগাম সুদ দিচ্ছি বাবু দিন। মাইনে থেকে পাঁচটাকা ক'রে কাটবেন, চারমাসেই শোধ হয়ে যাবে। নতুন তো নয়?'

'সুদের জন্য নয় হে!' পোষ্টমাষ্টার টাকাটা দুই আঙ্গুলে তুলিয়া লইলেন, কিন্তু পকেটে ভরিলেন না, 'কি জান, সাহস হচ্ছে না। কোন্‌দিন ইন্‌স্‌পেক্টর হুট ক'রে এসে পড়বে, বলবে সিন্দুক খোলো। একেবারে ডুবে যাব তাহ'লে। তোমার কি বল, গায়ে তোমার আঁচড়টি লাগবে না, টানাটানি করবে আমাকে নিয়েই।' মাথা নাড়িলেন 'একটা টাকার জন্য অতবড় ভয়ানক দায়িত্ব নিতে পারি না কৈলাস।'

'একটা টাকা কি কম হ'ল বাবু!' কৈলাস অনিচ্ছার সঙ্গে একটা সিকি বাহির করিয়া দিল।

টাকা আর সিকিটা পকেটে ভরিয়া পোষ্টমাষ্টার আবার সিন্দুক খুলিলেন। কুড়িটি টাকা বাহির করিয়া কৈলাসকে দিলেন। কথা আর তিনি বলিলেন না, নীরবে কাজ করিতে লাগিলেন।

একটু লজ্জা বোধ হয়। যৎসামান্য।

হাটে পৌঁছানো মাত্র কৈলাসকে ঘিরিয়া ভিড় জমিয়া গেল। তার মধ্যে এমন নরনারীর সংখ্যা অল্প নয়, একটি পোষ্টকার্ড পাওয়া তাদের জীবনে বিশেষ ঘটনা। তাদের আগ্রহ ও উত্তেজনা কৈলাসকে চিরদিনই বিশেষভাবে বিচলিত করে। চিঠি বিলানো সকলের প্রতি তারই যেন অনুগ্রহ। ধনীর দারোয়ানের কাঙালী বিদায় করার মতই গর্ব্ব সে বোধ করে!

ছেলেবেলা কালী মাঝে মাঝে তার সঙ্গে হাটে আসিত। কৈলাসের ইচ্ছা হয় কালীকে এখন একবার হাটে লইয়া আসে। সে দেখিয়া যায় হাট-ভরা লোক কি ভাবে তার বাপের পথ চাহিয়া থাকে, তাকে কত খাতির করে। কত লোককে সে হাঁসায়-কাঁদায়। অধর চিঠি পড়িয়া বলে, 'সুখবর এনেছ কৈলেসদা, যাওয়ার সময় ফুটিটুটি একটা কিছু তুলে নিয়ে যেও।' বসন্ত চিঠি হাতে ধূলার উপর বসিয়া পড়ে। তার দেওয়া চিঠির খবরে হরিদাসী হাটের কলরব ছাপাইয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকে।

এসব দেখিলে কালী কি রকম আশ্চর্য্য হইয়া যায়।

শেষ দুপুরে প্রাপ্য তরিতরকারী সংগ্রহ করিয়া গামছায় বাঁধিয়া কৈলাস পোষ্টাপিসে ফিরিয়া গেল। গুমোট হইয়া দারুণ গরম পড়িয়াছে। বিকালে ঝড়-বৃষ্টি হওয়া আশ্চর্য্য নয়। হার্ম্মোনিয়মটা আজ তাহা হইলে আর কেনা হয় না। কিন্তু কালী পাঁচ মিনিটের নোটিশে কাল তার মান রাখিয়াছে, পুরস্কারটাও তাকে অবিলম্বে দেওয়া দরকার। কাল পর্য্যন্ত ধৈর্য্য কৈলাস ধরিতে পারিবে না। অথচ দেরী করিয়া আসিয়া পাঁচটার আগে আজ ছুটি পাওয়াও মুস্কিল।

সে শ্রান্তি বোধ করিতেছিল। তবু বেঞ্চিতে চিৎ হইয়া খানিক ঝিমানোর ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া সে পোষ্টমাষ্টারের বাড়ির মধ্যে গেল।

পোষ্টমাষ্টারের মেয়ে দাওয়ায় ছেলে কোলে লইয়া বসিয়াছিল, বলিল, 'কি কৈলাস?'

'সেই যে মাদুলির কথা বলছিলে দিদিমণি, আজ গেলে সেটা পাওয়া যায়।'

পোষ্টমাষ্টারের মেয়ে সাগ্রহে বলিল, 'তবে তুমি আজকেই যাও কৈলাস।'

'বাবু যদি রাগ করেন?'

'আমি বলে রাখব।'

মাদুলি লইয়া পোষ্টমাষ্টারের মেয়েকে কৈলাস অনেকদিন ঠকাইতেছে। ঝিকণ ফকিরের মাদুলি আনা সহজ কথা নয়, একবেলা নৌকায় গিয়া সাত ক্রোশ হাঁটিলে তবে ঝিকণ ফকিরের আস্তানা। আজকাল করিয়া কৈলাস মাদুলির দাম বাড়াইয়াছে. এবার একদিন আধ পয়সা দিয়া একটা মাদুলি কিনিয়া তার গ্রামেরই জাগ্রত দেবতার পূজার ফুলের একটি শুকনো পাপড়ি ভরিয়া আনিয়া দিবে। বলিবে, 'দিতে কি চায় দিদিমণি, কত হাতে পায়ে ধরে আনলাম। পাঁচসিকে লাগল। না না, ও আর তোমাকে দিতে হবে না দিদিমণি। নিতে নেই গো, নইলে নিই না? মাদুলির খরচ বলে নয়, আমার মেয়েকে সন্দেশ খাবার জন্য যদি দাও তবে বরং নিতে পারি।'

পোষ্টমাষ্টার যে পাঁচসিকে গালে চড় মারিয়া লইয়াছে সেটা ফেরৎ আসিবে।

এই মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে কৈলাসের বিবেকের কোন প্রতিবাদ নাই। কালী ভিন্ন সংসারের আর সমস্ত মেয়ে তাদের কর্ম্মফল ভোগ করিবেই, ঝিকণ ফকিরের মাদুলিতে তাদের কোন উপকার হওয়া সম্ভব নয়। এটুকু ছলনায় তবে ক্ষতি কিসের? মাদুলিতে দেবতার ফুল তো থাকিবেই।

সকলের মত কৈলাসের আত্মপ্রবঞ্চনাতেও এমনি একটি সুন্দর শৃঙ্খলা থাকে। কালীর সম্বন্ধেও তার আত্মপ্রবঞ্চনা এমনি মনোহর। পোষ্টমাষ্টারের মেয়ের কাছে ঝিকণ ফকিরের মাদুলির মত কালীর জীবনে সুবল অনর্থক, মঙ্গল দূরে থাক এ দু'টি মেয়ের দুঃখ মোচনও মাদুলি আর সুবলকে দিয়া হইবে না। একজনের জন্য সে তাই অকারণে সাতক্রোশ পথ হাঁটিতে যেমন রাজী নয়, আর একজনকে পরের বাড়ী পাঠাইয়া শূন্য ঘরে বুক চাপড়াইতেও তার তেমন ইচ্ছা নাই।

সতীশের বাড়ি পথে পড়ে না, একটু ঘুরিয়া যাইতে হয়। হার্ম্মোনিয়ম কিনিয়া বাহির হইতে অপরাহ্ন হইয়া গেল। রোদের তেজ কমিয়াছে, কিন্তু হার্ম্মোনিয়ম ঘাড়ে করিয়া পথ চলিতে কৈলাস শ্রান্ত হইয়া পড়িল। মনে হয় এতক্ষণে তার নেশা টুটিয়া গিয়াছে। কিন্তু নেশার সঙ্গে স্নেহকে সে ঝিমাইয়া পড়িতে দিবে কেন? সে জোরে জোরে পা ফেলিয়া চলিতে লাগিল।

আধ মাইল গিয়াই সে হাঁপাইয়া পড়িল। বাদ্যযন্ত্রের ভারে ঘাড়টা ইতিমধ্যে ব্যথা হইয়া গিয়াছে। পথের ধারে সেটা সে নামাইয়া রাখিল। পা দু'টা বেজায় টন টন করিতেছে।

বয়স যে পঞ্চাশ পার হইয়াছে সেটা আর অস্বীকার করা যায় না। এই ধরণের প্রমাণ আজকাল প্রায়ই পাওয়া যায়। বয়সটা কৈলাসের গুরুতর বিপদ। কালীর জীবনের অর্দ্ধেকটা কাটিতে-না-কাটিতে তাকে মরিতে হইবে ভাবিতে কৈলাসের ভাল লাগে না। কালীর কি উপায় হইবে? কালীর ভার কে লইবে?

সুবল লইতে পারিত। তার মৃত্যুর পরেও সুবল বাঁচিয়া থাকিবে।

মৃত্যুর সঙ্কেত মানিয়া মেয়েকে তার নিশ্চিত দুঃখ-দুর্দ্দশার মধ্যে বিসর্জ্জন দিতে হইবে না কি? তার এত স্নেহ এত কল্যাণকামনা, এত ত্যাগ কোন কাজে লাগানো যাইবে না? মাঝে মাঝে নেশার অবসাদের সময় কথাটা ভাবিয়া অসহায় আফশোষে কৈলাসের মাথা ঝিম ঝিম করে। মরণে তার এমন নিশ্চিহ্ন নিশ্চিন্ত অবলুপ্তি যে কালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু পরিমাণে হওয়া যায় এমন একটা জোড়াতালি দেওয়া যুক্তিও সহজে আবিষ্কার করা যায় না।

তবু বসিয়া বসিয়া সে জোড়াতালি দেয়। ভাবে, সে তো আজই মরিতেছে না। দু-চার বছর গেলে সুবলের হয়ত পরিবর্ত্তন হইতে পারে, সে মানুষ হইতে পারে। তখন কালীকে পাঠান চলিবে। সে আরও ভাবে যে কালীকে লইয়া যাইবার জন্য সুবলের যেরকম আগ্রহ তাতে এ আশা করা যায় তার মৃত্যুর পর মেয়েটাকে সে ফেলিবে না। তার সুবিধার জন্য কালীর প্রতি প্রেমকে সুবল দশ-বিশ বছর বাঁচাইয়া রাখিবে এটা কৈলাসের আশ্চর্য্য মনে হয় না। এই বিশ্বাস বজায় রাখার জন্য সে একটা যুক্তিও ব্যবহার করে। সুবলের সঙ্গে কলহ তার; কালী কোনও অপরাধ করে নাই। কালী ছেলেমানুষ, বাপের ব্যবস্থা না মানিয়া তার উপায় কি? বাপের অপরাধে সুবল নিশ্চয় মেয়েকে শাস্তি দিবে না।

তাছাড়া, তার সম্পত্তি আর জমানো টাকা এবং কালীর মত রূপে গুণে দুর্লভ বউয়ের লোভ সুবল কি সহজে ত্যাগ করিবে?

আধঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করিয়া কৈলাস উঠিল। একটা লোক ধরিয়া তার মাথায় হার্ম্মোনিয়ম চাপাইয়া গ্রামের দিকে চলিতে আরম্ভ করিল।

গ্রামের বাহিরে দেখা হইল বংশীর সঙ্গে।

বংশী বলিল, 'কালীকে তাহ'লে পাঠিয়েই দিয়ে কৈলেস কাকা?'

'হুঁ' বলিয়া কৈলাস শঙ্কিত হইয়া রহিল।

বংশী বলিল, 'সুবল গাড়ী খুঁজে হয়রাণ। সব গাড়ী গেছে হাটে, কোথায় পাবে গাড়ী? আমি

বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম, কালী আমায় ডেকে বললে, বংশীদা, একটা গাড়ী জোগাড় ক'রে দাও না? আমি শেষে রামগতি কাকার গাড়ীটা জুটিয়ে আনি তবে ওরা রওনা হয়।'

কৈলাস বলিল, 'দেখ দিকি কাণ্ড! আগে থাকতে গাড়ী ঠিক ক'রে রাখবে, তা নয়,—সুবলটার একেবারে বুদ্ধি নেই।'

'তোমার সঙ্গে দেখা হল না বলে কালী কেঁদেই অস্থির।'

'কেন, কাঁদল কেন? জষ্টি মাসেই তো ওকে আমি নিয়ে আসব।'

বংশী জ্ঞানীর মত বলিল, 'তাতে কি শানায় কৈলাস কাকা, শ্বশুরবাড়ি যেতে মেয়েরা কাঁদবেই। —হার্মোনিয়মটা তোমার না কি? কার জন্যে কিনলে?'

'কার জন্যে আবার, নিজের জন্যে। খালি বাড়িতে কি ক'রে সময় কাটাব; ওটা বাজিয়ে প্যাঁ পোঁ করা যাবে। তুই কোথায় যাচ্ছিস রে বংশী? সন্ধ্যের সময় এসে দুটো গানটান শুনিয়ে যাস তো।'

বাড়ি গিয়া জামা খুলিয়া কৈলাস তামাক সাজিয়া লইল। কালী পাড়ায় কোথায় বেড়াতে গিয়াছে; তামাক খাইয়া সে স্নান করিল। চিনি খুঁজিয়া লেবু দিয়া সরবৎ করিয়া পান করিয়া রামগতির ওখানে গেল।

রামগতি বলিল, 'কালীকে তা হ'লে পাঠাতে হ'ল কৈলাসদা?'

কৈলাস বলিল, 'হ্যাঁ, দিলাম পাঠিয়ে। কালী সতেরয় পড়েছে, আর কি রাখা যায়? তবে এবার বেশী দিন রাখব না, জষ্টির মাঝামাঝি নিয়ে আসব। পাঠাব একেবারে সেই পুজোর পর।'

রামগতি বলিল, 'ভালই করেছ। মানুষের মন, কি জান দাদা, একেবারে আশ্চর্য্য। কালীকে পাঠাওনি বলেই হয়ত সুবল ওরকম হয়ে যাচ্ছিল, এবার বদলে যাবে। এতদিন কালীকে আটকে রাখা উচিত হয় নি।'

কৈলাস বলিল, 'অতটা বুঝতে পারি নি।'

'সুবল আর একটা বিয়ে ক'রে বসলে কি বিপদ হ'ত বল ত?'

কথাটা কৈলাস নিজেও অনেকবার ভাবিয়াছে, আজ রামগতির মুখে শুনিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। ভাগ্যে কালী তার পাগলামীতে সায় দিয়া নিজের সর্ব্বনাশ করে নাই, গোপনে স্নেহ দিয়া সম্মান দিয়া বাপের অপমান ও অবিবেচনার বন্যাতেও নোঙর হইয়া স্বামীকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে!

রামগতি বলিল, 'একটু সিদ্ধি করব না কি?'

কৈলাস বলিল, 'বদনার ওখানে গেলে হয় না? থাক্, কাজ নেই। সিদ্ধিই কর।'

গ্রামে সন্ধ্যার পরই রাত্রি। ঝাঁপ বন্ধ করা দোকানের সামনে বেঞ্চিতে কাৎ হইয়া এমনি সময় বংশী বিড়ি টানে আর থাকিয়া থাকিয়া বাঁশী বাজায়, রামগতির বৈঠকখানায় মাখম একটা কালি-পড়া লণ্ঠন রাখিয়া যায়, সিদ্ধির নেশায় কৈলাসের দু-চোখ স্তিমিত হইয়া আসে, খানিক পরে বাড়ি ফিরিয়া কালীকে দেখার চেয়ে একমাস পরে পাথুরেঘাটায় গিয়া কালীকে বাড়ি ফিরাইয়া আনার কল্পনা কৈলাসের বেশী মনোরম মনে হয়, আর ওদিকে গরুর গাড়ীর মধ্যে কালী সুবলের সঙ্গে বক্ বক্ করে।

বলে, 'তোমার জন্য বাবার কাছে মুখ দেখাবার উপায় রইল না।'

কিন্তু একমাস বলে তাকে আনিতে গেলে কালী অনায়াসে আসিয়া কৈলাসকে প্রণাম করে, বলে, 'রাস্তায় কষ্ট হয়নি তো বাবা? যে গরম!'

কারও লজ্জা নাই। নিয়ম পালনে লজ্জা কি? পদে পদে নিয়মলঙ্ঘন করিয়াই তো সংসারে লজ্জা ও দুঃখের সীমা নাই।

৩৩ বর্ষ, আষাঢ় ১৩৫০



হাত

অজিতকৃষ্ণ বসু

'দেখি রে তোর হাত দেখি।'

অদ্ভুত এই লোকটা। কাহারও হাত নাগালের মধ্যে পাইলে আর ছাড়াছাড়ি নাই, অমনি টানিয়া নিয়া দেখিতে শুরু করে। সাংঘাতিক দৃষ্টি তার অসাধারণ অস্বাভাবিক দুটি চোখে, যেন সব কিছুই মুহূর্তে ভেদ করিয়া ফেলিবে। এই দৃষ্টি দিয়া একাগ্রমনে সে হাতের প্রত্যেকটি রেখার রহস্য ভেদ করিতে থাকে।

"নাঃ, তোর মনটা এখন ভাল যাচ্ছে না। বিশ্বাস করলেই লোক বিশ্বাসঘাতকতা করে। সেজন্যে মিথ্যে মন খারাপ করে কি হবে? তাই বলে মানুষে বিশ্বাস হারাবি? ছিঃ! তাহলে বাঁচবি কি করে? বিশ্বাস লোককে করতে হবে বই কি, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তৈরি থেকো। ওরে না না মূর্খ, রাগ নয়, ঘৃণা নয়, অভিশাপ নয়। বিশ্বাসঘাতক যারা, তারা বিশ্বাসঘাতকতা না করে পারে না বলেই করে। কাঁচালঙ্কা ঝাল, সে তার স্বভাব। তাকে পিষে ফেললেও সে মিষ্টি ছড়াবে না, ঝালই ছড়াবে।"

এইভাবে শুধু হাতের লেখা বিচার করা নয়, তারই সঙ্গে তার নিজের তৈরি দর্শনশাস্ত্রের উপদেশও চলিতে থাকে।

"বাঃ, তোর হাতটা তো বড় ভাল রে ছোক্‌রা। লিখিস বুঝি? লিখে যা। লিখে যা। তোর হবে। পরিষ্কার লেখা আছে তোর হবে। কিন্তু তেমন নাম হবে না, পয়সা হবে না, সে ভাগ্য তোর নেই। দমে গেলি বুঝি? ওরে মূর্খ, কত লোকের আনন্দের খোরাক জোগাবি তার কোন সার্থকতা নেই? তার চেয়ে যশ আর পয়সা তোর বড় হ'ল? পৃথিবীর আনন্দের খোরাক যারা বেশী যোগায় পৃথিবী দুঃখ দেয় তাদেরই বেশী। গৌরব কিনতে হয় ঐ দুঃখের মূল্য দিয়েই। চাকরি করছিস। মন তোর বসে নি চাকরিতে। হুঁ, এ চাকরি তোর থাকবে না আর বেশী দিন। ভালই তো। চাকরি করবে সাধারণ লোক। প্রতিভা যার আছে সে কেন চাকরি করবে?"

"তোর হাতটা দেখি। ছেলেবেলায় টাইফয়েড হয়েছিল বুঝি? খুব ভুগেছিলি। বারো বছর বয়সে মা মারা গেছে। সৎমা তোকে দুচোখে দেখতে পারে না। এতে অবাব হবাক্ কি আছে রে বোকা? সৎমারা তো সাধারণতঃ অসৎই হয়ে থাকে। ছটফট করিস নি বাপু, দেখতে দে ভালো করে। এ চাকরি তোর হবে না, হবে না, হবে না। এই রেখাটায় স্পষ্ট বলে দিচ্ছে চাকরি তোর হবে না। ব্যবসা কর্ তুই। ব্যবসা তোর ভাল হবে, নির্ঘাত ভাল হবে। জ্যান্ত জানোয়ারের ব্যবসা তোর ভাল হবে। পাঁঠা খাসী চালান দে। ওরে আমাদের দেশে পাঁঠা খাসীর অভাব কি?"

ক্ষমতাও বাস্তবিকই অদ্ভুত লোকটার। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সব কিছুই সে হাতের রেখায় পরিষ্কার দেখিতে পায় ছবির মত। কোন পরিশ্রম নাই, চিন্তা নাই, মনে মনে অঙ্ক কষা নাই—শুধু হাতের রেখাগুলির দিকে তাকাইয়া অনর্গল বলিয়া যাওয়া।

প্রথম যখন সে এ পাড়ায় আসিয়াছিল সকলেই তাহাকে সাধারণ পাগল বলিয়াই মনে করিয়াছিল। ক্রমে তাহার কথাবার্ত্তায় এবং ভাবভঙ্গীতে সকলেই মনে করিতে লাগিল লোকটা পাগল, কিন্তু সাধারণ নয়। শেষকালে তাহার ভবিষ্যদ্বাণী একটার পর একটা যখন আশ্চর্য্যরকম ফলিয়া যাইতে লাগিল তখন আর কাহারও সন্দেহ রহিল না যে লোকটা পাগলও নয়, সাধারণও নয়। সকলে তাহাকে দেখিতে লাগিল বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধার চোখে।

পাড়ার জিতু ময়রা শ্রদ্ধার আতিশয্যে তাহাকে বাবা বলিয়া ডাকিতে শুরু করিল এবং নিজের বাসায় তাহার সকল রকম সুখ-সুবিধার এমন পরিপাটি বন্দোবস্ত করিয়া দিল যে একটু অতিরঞ্জন করিয়া তাহাকে রাজার হাল বলা চলে। কিন্তু লোকটার ইহা ভাল লাগিল না। সে কহিল, "ঘর

ছেড়ে যে বেরিয়েছে, ঘর তার ভাল লাগবে কেন রে জিতু? আমি তোর বাইরের রকে, বা ফুটপাতেই ভাল থাকব।" থাকিলও তাই। রুগ্ন শীর্ণ দেহ, প্রাণশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু রাতের ঠাণ্ডা বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাকে সর্দ্দি পর্য্যন্ত দিতে পারিল না। প্রচণ্ড হিম তাহার ক্ষীণ দেহের দুই পাশ দিয়া চলিয়া যায়, দেহে আশ্রয় পায় না।

কি তার নাম, কি তাহার ইতিহাস, কেহ জানে না। প্রশ্ন করিলেও এসব বিষয়ে কোন জবাবই পাওয়া যায় না। নিজের চারিদিকে একটা রহস্যের কুয়াসা রাখিয়াই যেন তাহার আনন্দ।

জীবনে তাহার যেন আর কোন আকাঙ্ক্ষাই নাই, সব যেন মিটিয়া গিয়াছে। শুধু একটি সখ তাহার উপর ভূতের মত ভর করিয়া আছে, হয়ত জীবনের শেষ পর্য্যন্ত থাকিবে—সেটি এই হাতদেখা। হাত, হাত, হাত... আরও হাত, আরও হাত চাই। দেখিয়া আশ মিটে না তার। হাতই যেন লোকটার ধ্যান-জ্ঞান; দিন-রাত হাতের জন্যই তাহার মন আকুল। হাতের এমন উন্মত্ত উপাসকও থাকিতে পারে, এই লোকটাকে দেখিবার আগে কল্পনাও করিতে পারি নাই।

"কি পবিত্র, কি মহান্ সৃষ্টি এই মানুষের হাত।" —উচ্ছ্বসিত হইয়া সে বলিতে থাকে। "হাতে হাত মেলান বন্ধুত্বের চিহ্ন। পৃথিবীতে সব চেয়ে মধুর, সব চেয়ে পবিত্র, সব চেয়ে মহান্ সম্পর্ক স্থাপিত হয় যে বিবাহবন্ধনে, তাকে বলি পাণি-গ্রহণ। কি? না, একটি হাত আর একটি হাতকে গ্রহণ করে নিচ্ছে। দৃঢ় সঙ্কল্পের প্রতীক মুষ্টিবদ্ধ হাত। এমন কি স্বয়ং বিধাতা মানুষের চরিত্র আর ভাগ্যের রেখাচিত্র আঁক্‌তে এই হাতকেই বেছে নিয়েছেন।"

লোকটার কথাগুলি ভাল লাগে। অদ্ভুত বলিয়াই অদ্ভুত ভাল লাগে। প্রশ্ন করি, "কিন্তু হাত দেখবার জন্য আপনি এত পাগল কেন বলুন ত?"

জবাব পাইলাম, "আমি হাত দেখে পাই বিধাতাকে জব্দ করার আনন্দ। সে যে কি উৎকট আনন্দ তা তুই বুঝতে পারবি নে। ভাগ্যকে আমরা বলি অদৃষ্ট, অর্থাৎ যা দেখা যায় না। বিধাতা মানুষের ভাগ্যকে গোপন করে রাখেন যবনিকার আড়ালে। আমি সেই আড়াল সরিয়ে ফেলে বিধাতাকে জব্দ করি। তাতে বিধাতার দুঃখ নেই কিন্তু। তিনি যে জব্দ হতেই চান। তার প্রমাণ হাতের ঐ রেখাগুলো। তিনি বলেন হাতের ওপর নানা বিচিত্র রেখার ভাষায় আমি সব কিছু লিখে রেখেছি; তোরা ঐ ভাষার রহস্য উদ্ধার করে পারিস্ তো সব কিছু পড়ে নে। বিধাতার সেই চ্যালেঞ্জ আমি গ্রহণ করেছি। তাই হাতের পর হাত দেখে বিধাতাকে জব্দ করার আনন্দে হাসি আমি, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে জব্দ হওয়ার আনন্দে হাসেন বিধাতা। তাই তো হাত দেখবার জন্য মনটা সর্ব্বদাই আকুল হয়ে থাকে।"

হাত দেখাইতে আসিলেন পাড়ার সরকারী খুড়া পীতাম্বরবাবু। নিজের নহে, পুত্র নীলাম্বরের। অদ্ভুত লোকটা খপ করিয়া পীতাম্বরবাবুর হাতখানা টানিয়া লইয়া দেখিয়াই নিজের হাতের পাঁচটি আঙ্গুল দেখাইয়া কহিল—"আর পাঁচ বছর।"

"তার মানে?"

"মানে আর পাঁচ বছর পরে তুই মিলিয়ে যাবি পঞ্চভূতে, আর তোর সম্পত্তি লুটে খাবে বার ভূতে।"

জবাব শুনিয়া পীতাম্বরবাবু যে খুশি হইলেন না তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়াই স্পষ্ট বুঝা গেল। রাগ করিয়া তিনি চলিয়া যাইবারই বোধ হয় উদ্যোগ করিতেছিলেন, কি মনে করিয়া বিরত হইলেন, কহিলেন, "আজ্ঞে আমার হাতটা দেখাতে ত আসি নি. বুড়োহাবড়া মানুষ, দুদিন বাদে পটল তুলব, আমার আবার হাত দেখান কি? এসেছি আমার ছেলের হাতটা দেখাতে। ...এদিকে আয় নীলু। ...ওর বিয়ে ঠিক করেছি এই অঘ্রানেই কিনা।"

"বাঃ বাঃ! ভাল ভাল! বেশ বেশ!" লোকটা অকৃত্রিম আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল, "পাণিগ্রহণ! ওরে একটু আগেই বলছিলুম না তোকে পাণিগ্রহণের কথা? একটি হাত গ্রহণ করে

নিচ্ছে আর একটি হাতকে। বাঃ! হাত ত তাহলে দেখতেই হয়। এদিকে আয় দেখি বাবা। বিধাতাপুরুষকে একবার জব্দ করা যাক।"

নীলাম্বর কাছে আসিয়া হাত বাড়াইয়া দিল, আকুল আগ্রহে লোকটা নীলাম্বরে হাতটা এমন ভাবে চাপিয়া ধরিল যেন নীলু তাহার হাত ছিনাইয়া লইয়া পালাইয়া যাইবার চেষ্টায় আছে।

প্রশ্ন করিল, "কোন্ মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক কর্‌লি?" এমন ভাবে, যেন নীলাম্বরের সঙ্গে যত মেয়ের বিবাহের সামান্যতম সম্ভাবনাও আছে তাহারা কেহই তাহার অজানা নয়।

পীতাম্বরবাবু কহিলেন, "আমার বাল্যবন্ধু তিনকড়ির ছোট মেয়ে ডলির সঙ্গে। দু'বন্ধু আমরা থাকি পাশাপাশি। নীলু আর ডলি দুজনে ছেলেবেলা থেকেই দুজনের খেলার সাথী। তাই ঠিক করেছি দুজনে আজীবন খেলার সাথীই থাকুক। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।"

পীতাম্বরবাবু আনন্দের হাসি হাসিলেন বটে, কিন্তু ভবিষ্যৎদ্রষ্টা লোকটির মুখে হাসি দেখা গেল না।

পীতাম্বরবাবু কহিলেন, "তাই ভাবলুম ওর হাতটা একবার আপনাকে দেখিয়েই নিয়ে যাই, আপনি কি বলেন।"

গম্ভীরভাবে নীলাম্বরের হাতটা নামাইয়া সে কহিল, "তোর ছেলের হাতটি তো যা দেখবার দেখে নিলুম। ঐ মেয়েটির হাত না দেখে তো শেষ কথা বলতে পারবো না। মেয়ের বাপকে বলিস মেয়েকে যেন নিয়ে আসে আমার কাছে হাত দেখাতে।"

মেয়ের বাপ তিনকড়িবাবু মেয়ে ডলিকে লইয়া আসিলেন হাত দেখাইতে। বাপকে দূরে সরাইয়া দিয়া লোকটির ডলির হাত দেখিয়া ডলিকে কি বলিল ডলিই জানে।

বিদায় লইবার আগে তিনকড়িবাবু কাছে যাইতেই খপ্ করিয়া তাঁহার হাতটি টানিয়া লইয়া দেখিয়া লোকটি কহিল, আরও সাত বছর তোর থাকতে হবে। শোক পেতে হবে একটা। মানুষের শোক, টাকার নয়। পাঁচ বছর আগে যে তালুকটা তোর হাতছাড়া হয়ে গেছে সেটা আর আড়াই বছরের ভেতর তোর হাতে ফিরে আসবে। আস্‌তেই হবে।"

এক ফাঁকে হাতটা টানিয়া সরাইয়া লইয়া তিনকড়িবাবু কহিলেন, "তাহলে এ বিয়ে আপনি কেমন মনে করেন? ছেলের হাত দেখেছেন, মেয়ের হাতও দেখলেন।"

জবাব আসিল, "এ বিয়ে হবে। নিশ্চয় হবে। হওয়াই তো উচিত। নিঃসংশয়ে বিয়ে দে।"

বিবাহ হইয়া গেল। আবাল্য খেলার সাথী নীলু ও ডলি আজীবন খেলার সাথী হইল।

এতদিন সর্দ্দি পর্য্যন্ত যাহাকে ধরিতে পারে নাই, এইবার তাহাকে জ্বরে ধরিল। জিতু ময়রা এবার আর কোন মানা মানিল না; তাহাকে বাসার ভিতরে লইয়া চিকিৎসা ও শুশ্রূষার এমন সুবন্দোবস্ত করিয়া দিল যে লোকটা আরামে হাঁফাইয়া উঠিল। অসুস্থ হইয়া তাহার হাত দেখিবার জন্য অস্থিরতা যেন আরও বাড়িয়া উঠিল।

কহিল, "ভেবেছিস অসুখ আমায় কাবু করবে? ভুল, ভুল। অসুখে আমার আরও চোখ খুলে যায়, মুখ খুলে যায়। আমি আরও বেপরোয়া হয়ে উঠি।"

মুখ যে তাহার বাস্তবিকই খুলিয়া যায়, বেপরোয়া যে বাস্তবিকই সে হইয়া উঠে, তাহার প্রমাণ শীঘ্রই পাওয়া গেল।

হাত দেখাইতে আসিল নিতাই মণ্ডল। জানিয়া গেল সাত দিনের মধ্যে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত। ধীরেন বসু জানিয়া গেল শীঘ্রই তাহার গুরুতর আঘাত পাইবার সম্ভাবনা। শক্তিবাবু জানিয়া গেলেন তাঁহার শীঘ্রই কিঞ্চিৎ অর্থহানি ঘটবে। অতনু সেন জানিয়া গেল তাহার নব বিবাহিতা পত্নীর ইহজীবন আর দুই মাসের মধ্যেই শেষ হইবে। এই অপ্রিয় ভবিষ্যৎ জানিয়া সকলেই ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া গেল।

পাঁচ দিনের মধ্যেই নিতাই মণ্ডল গলায় মাছের কাঁটা আটকাইয়া মারা পড়িল। ধীরেন বসু

চৌবাচ্চার ধারে আছাড় খাইয়া পা ভাঙ্গিয়া শয্যাশায়ী হইল। শক্তিবাবুর অন্যতম শ্যালকরত্ন তাঁহার হাজার তিনেক টাকা লইয়া নিরুদ্দেশযাত্রা করিল, কবে ফিরিবে ভগবান জানেন। এই তিনটি অপ্রিয় ভবিষ্যদ্বাণীর সাফল্যে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া অতনু পত্নী-বিয়োগের বেদনা পত্নী-বিয়োগের পূর্ব্ব হইতেই ভোগ করিতে লাগিল।

ইহার পর হইতেই হাত দেখাইবার ব্যাপারে কাহারও আগ্রহ রহিল না; সকলেরই মনে আতঙ্ক জাগিল হাত দেখাইতে গেলেই লোকটা অত্যন্ত অপ্রিয় ভবিষ্যদ্বাণী করিবে এবং তাহা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া যাইবে। অথবা হয়ত দুর্ঘটনা ঘটাইবার লোকটার কোন রকম অলৌকিক ক্ষমতা আছে; উহার কাছে হাত দেখাইতে যাওয়া মানেই নিজেকে উহার সেই অবাঞ্ছনীয় ক্ষমতার আওতায় ফেলা। তাছাড়া অপ্রিয় যাহা ঘটিবার তাহা তো ঘটিবেই, অনর্থক পূর্ব্ব হইতেই তাহা জানিয়া দুশ্চিন্তার যন্ত্রণা ভোগ করা কেন?

লোকটি বোধ হয় বুঝিতে পারিল কি কারণে কেহ তাহার কাছে আর হাত দেখাইতে আসে না। কহিল "দেখলি তো অপ্রিয় সত্যকে লোক কি রকম ভয় পায়? ওরে মূর্খ, চোখ বুজে থাকলেই কি অপ্রিয় সত্য ধোঁয়া হয়ে উড়ে যায়? অপ্রিয় ভবিষ্যৎকে জেনে তার জন্য নিজের মনকে তৈরি করে নেওয়াই তো ভালো। মূর্খ, মূর্খ, যত সব মূর্খের দল। এক কাজ করতে পারিস? ওদের বলে দে অপ্রিয় ভবিষ্যতের কথা আর আমি বলব না, বলব শুধু প্রিয় অতীত, প্রিয় বর্ত্তমান আর প্রিয় ভবিষ্যতের কথা।"

তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম যে তাহাতেও কোন সুফল ফলিবে না। এ ভাবে হাত দেখাইয়া কেহ তৃপ্তি পাইবে না। প্রত্যেকেরই মনে খটকা থাকিবে ভবিষ্যতের অনেক কিছু অপ্রিয় কথাই বলার ছিল কিন্তু না বলা রহিয়া গেল। অপ্রিয় ভবিষ্যৎ জানার চেয়ে এভাবে অপ্রিয় ভবিষ্যৎ না জানার যন্ত্রণা কিছু কম নয়।

শারীরিক অসুস্থতার চেয়ে মানসিক অশান্তি তাহাকে বেশী যন্ত্রণা দিতে লাগিল। হাত দেখিবার জন্য সে ব্যাকুল, অথচ হাত দেখাইতে আর কেহ তাহার কাছে আসে না।

আমি প্রায়ই তাহার কাছে যাইতাম একটা প্রবল আকর্ষণে। অস্বাভাবিক এবং অসাধারণ চরিত্রের প্রতি চিরদিনই আমি আকর্ষণ অনুভব করি, কারণ ইহারাই আমার কাহিনী রচনার খোরাক যোগায়। ইহাদের চিন্তাধারা, ইহাদের দৃষ্টিকোণ, ইহাদের আত্মপ্রকাশের ভঙ্গী—সব কিছুই পর্য্যবেক্ষণে আমি আনন্দ পাই এবং লাভবান হই।

সে বলে, "দেখি তবে তোর হাতটাই দেখি। কিন্তু তুই সাহিত্যিকের জীবন বেছে নিয়েছিস, এদেশে তোর ভবিষ্যৎ জীবন তো খুব আরামের হবার কথা নয়। অপ্রিয় সত্যকে আর যেই ভয় করুক, তোর তো ভয় করা চলবে না। তুই পাবি অনেক দুঃখ, অনেক নিন্দা, অনেক বাধা। তোকে ভুগতে হবে অভাবের যন্ত্রণা। তাচ্ছিল্য, অনাদর, এমন কি ঘৃণাও হয়ত তোর জুটবে বরাতে। হয়ত জীবনে তোর ধিক্কার আসবে, তোর সত্যিকারের পথটাকেই হয়ত ভুল পথ বলে তোর মনে হবে। কিন্তু সাবধান! দুঃখ দেখে ভয় পেয়ে দুঃখ এড়াবার সহজ পথ বেছে নেওয়া তোর জন্যে নয়! তোর হাতে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, অনেক দুঃখ অনেক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তোকে যেতে হবে। কিন্তু তুই দিয়ে যেতে পারবি—সেই দিয়ে যাওয়াটাই তো সবচেয়ে বড় গৌরব। ওরে, দেওয়াটাই বড়, পাওয়াটা কিছু নয়।"

কিছুক্ষণ থামিয়া আবার বলে, "দেখ্, আমি যখন আর থাকব না তখন আমার কথাগুলো তুই মনে রাখিস। যা তোকে বলে যাচ্ছি এ আমার মুখের হাল্কা কথা নয়, অন্তরের কথা, উপলব্ধির কথা। তুই শিল্পী। তাই বিশেষ করে একথা তোকে বলে যাচ্ছি। এ কথা কখনো ভাবিস নে যে, যে-সমাজ তোকে পুরস্কার দিলে না তাকে তুই প্রতিশোধ দিয়ে যাবি তাকেও কিছু না দিয়ে। সত্যিকারের শিল্পী সমাজের উপর প্রতিশোধ নেবে নিজের শ্রেষ্ঠ দান দিয়ে সমাজকে ঋণী করে। এ কথাটা সর্ব্বদা মনে রাখিস।"

লোকটা একটু সুস্থ হইয়া উঠিতেছে এই সময় পাড়ায় একটি করুণ ঘটনা ঘটিল। পীতাম্বরবাবুর পুত্র নীলাম্বরের মৃত্যু হইল একদিনের জ্বরে। ডলি মেয়েটা এই কচি বয়সে, বিবাহ হইতে-না-হইতেই বিধবা হওয়ায় পিতা তিনকড়িবাবু সস্ত্রীক কাঁদিয়া ভাসাইলেন। কি হাত দেখিয়াছিল লোকটা? ছেলে ও মেয়ে দুজনেরই হাত দেখিয়া সে জোর গলায়ই বলিয়াছিল 'নিঃসংশয়ে বিয়ে দে।'—ধাপ্পাবাজ, বুজরুক কোথাকার! এতদিন তাহার আন্দাজী ঢিলগুলি তাহার অসাধারণ ভাগ্যবলেই ঠিক ঠিক লক্ষ্যভেদ করিয়া আসিতেছিল, এইবারে তাহার স্বরূপ ধরা পড়িল। হাত দেখাটা কিছু নয়, ফাঁকি, ফাঁকি, সব ফাঁকি। কিন্তু আর কেহ বুঝুক আর নাই বুঝুক আমি বুঝিলাম কিছুই ফাঁকি নয়। ডলির দিকে তাকাইয়া আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইল। আবাল্য খেলার সাথীকে স্বামীরূপে পাইয়াই হারাইয়া সে শোকে আত্মহারা হইল না, সে যেন পূর্ব্ব হইতেই ইহা জানিয়া ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়া ছিল।

যাহাই হউক, হাত আর কেহ লোকটাকে দেখাইতে আসিল না। কাহারও ভয়, কাহারও অবিশ্বাস। হাত-দেখা যাহার জীবনে একমাত্র আকর্ষণ, হাত না দেখিয়া চুপচাপ থাকা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়।

একদিন ভোরে দেখা গেল লোকটা উধাও হইয়া গিয়াছে, সঙ্গে জিতু ময়রার দেওয়া চাদরটি পর্য্যন্ত লইয়া যায় নাই। হয়ত নূতন কোনো পাড়ায় হাত দেখিবার পসার জমাইবার জন্য সে গিয়াছে। কে জানে?

কিন্তু জানিতে বেশী দেরী হইল না। শীঘ্রই জানা গেল মিলিটারী লরীর তলায় পড়িয়া একটি লোক বীভৎসভাবে মারা পড়িয়াছে এবং দেখা গেল সে এই লোকটিই। এতদিন অসংখ্য লোকের অসংখ্য হাত সে দেখিয়া বেড়াইয়াছে, দেখে নাই শুধু নিজের হাতটি। হয়ত এখনও সে অনন্ত শূন্যে নূতন হাতের খোঁজে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

৪৫ বর্ষ, আষাঢ় ১৩৫২



প্রথম শিশু

বিমল মিত্র

শ্রীবিলাসের মনে হইল, তাঁবুর বাহিরে কে যেন বড় টানিয়া টানিয়া বলিতেছে—ওগো, দুয়োরটা একটু খোল না—শুনচ্—খোল না একবার—খুলে দেও না—ওগো—

বিছানা ছাড়িয়া শ্রীবিলাস লাফাইয়া উঠিল। স্ত্রীলোকের গলা মনে হইতেছে—অনেকটা মাধুরীর গলার আওয়াজ।

মোমবাতি জ্বালাইয়া সর্ব্বাঙ্গে আলোয়ান জড়াইয়া শ্রীবিলাস তাঁবুর দরজা খুলিল।

শীতের রাত্রি, মাঠময় কুয়াশা পড়িয়াছে। চারিদিকে অন্ধকার, চোখ মুছিতে মুছিতে শ্রীবিলাস বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল।

কেউ কোথাও নেই, তবে কি চলিয়া গেল না-কি! শ্রীবিলাস ডাকিল—কে, কে? ডাক্‌ছিলে? কে তুমি?

ও-পাশের তাঁবুতে যাহারা ঘুমাইতেছিল, তাহাদের একটানা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ আসিতেছে। বোঝা যায় কেহই জাগিয়া নাই। শ্রীবিলাস চুপ করিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল।

যে-গাছের তলায় তাঁবু খাটান হইয়াছি, সেই গাছের পাতাগুলি সর্ সর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বাতাস লাগিয়া শ্রীবিলাসের শীত করিতে লাগিল। তবে হয়ত তাহাকে দেখিয়া সে লজ্জা পাইতেছে। শ্রীবিলাস আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু কোথাও কাহারও চিহ্নটুকুও নাই যে!

এবার শ্রীবিলাস বাহিরে আসিল।

দিনের বেলাকার সেই রুক্ষ মাঠটা রাত্রে যেন অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। সেই মাঠের উপর নিদ্রিত পৃথিবী শীতে কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া আছে। দূরে যেখানে চলনের বিল—আজ এখন মনে হয় সেখানে যেন জল নাই। সাদা থান পরিয়া ভূমিলক্ষ্মী যেন বিধবাবেশিনী! চারিদিকে কোথাও কেহ নাই যে।

ওধারের তাঁবুতে দলের লোকেরা আছে।

শ্রীবিলাস এধার-ওধার চারিদিক খুঁজিতে লাগিল। সে স্পষ্ট শুনিয়াছে কে যেন তাহাকে দরজা খুলিয়া দিতে অনুরোধ করিতেছে! ভুল তো হইবার কথা নয়।

ওধারে তাঁবুর কাছে গিয়া শ্রীবিলাস ডাকিল—নিধিরাজ, নিধিরাজ, ও নিধু—শুনলি—নিধুরে একবার ওঠ্ মাণিক—

নিধু সত্যই উঠিল। এতরাত্রে তাহাকে দিয়া যে বাবুর কি প্রয়োজন থাকিতে পারে তাহা নিধুকে বলিয়া দিতে হয় না। নিধিরাজ উঠিয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া তামাক সাজিতে বসিল।

তাঁবুর কাছাকাছি যন্ত্রপাতি পড়িয়া আছে। —গ্রামে সরকারী টিউব-ওয়েল বসিবে তাহারই সরঞ্জাম। সেইখানে লম্প জ্বালাইয়া নিধিরাজ টিকে ধরাইতে লাগিল।

খানিক পরে শ্রীবিলাস বলিল,—তুই কিছু শুনেছিস্ না কি রে নিধু?

নিধিরাজ শুনিয়াছে। বলিল,—শুনেছি বইকি! —রাত্তিরে তো?

শ্রীবিলাস আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এ ব্যাপার সকলেই শুনিয়াছে! বলিল,—তুই শুনেছিস? —ঠিক তোর বউ ঠাকরুণের মত গলা নয়?—ঠিক একেবারে—নয়?...

নিধিরাজ তাচ্ছিল্য ভরে বলিল—আজ্ঞে কিসে আর কিসে—এরা বেটাছেলে মেয়েলোক সেজেছে—সেকি আর তেমন হয়, তবে গান গাইছিল খুব ভাল, বুঝলেন, লখীন্দর মারা গেলে পর বেউলোর কান্না যদি শুনতেন—আপনি গেছলেন না কি?

এতক্ষণে শ্রীবিলাস বুঝিতে পারিল নিধিরাজ ও-পাড়ার ভাসানের গানের কথা বলিতেছে।

তামাক দিয়া নিধিরাজ চলিয়া যাইতেছিল—

শ্রীবিলাস ডাকিল—যাসনে শোন্—বলি—

নিধিরাজ পায়ের কাছে বসিল। শ্রীবিলাস বলিল,—তোকে একটা কাজ করতে হবে —বুঝলি, কলকাতায় যেতে পারবি—আজই সকালে—?

নিধিরাজ ঘাড় নাড়িল—সে পারিবে।

শ্রীবিলাস বলিল,—তা হ'লে আজই চলে যা—বুঝলি—বাড়িতে পুরুষ কেউ নেই ত—পিসিমা আর তোর বউঠাকরুণ—তুই যা—হ্যাঁ সেই ভাল—তুই যা—

আসিবার সময় শ্রীবিলাস মাধুরীর সঙ্গে একরকম প্রায় রাগ করিয়াই চলিয়া আসিয়াছে। এই টিউব-ওয়েলের কাজটা লইয়া পর্যন্ত মাধুরীর সঙ্গে তাহার কেমন দূরত্ব আসিয়া গিয়াছে। আজ এ-গ্রামে, কাল সে-দেশে, পরশু ওখানে—এমনি করিয়া শ্রীবিলাসের সঙ্গে মাধুরীর যেন আর পূর্ব্বেকার সে সম্বন্ধ নাই। মাধুরী দিন দিন কৃশ হইয়া যাইতেছে—এ-সব দেখিয়াও শ্রীবিলাস কোনও উপায় করিতে পারে নাই।

আজ রাত্রের ওই অদ্ভুত শব্দটা শুনিবার পর হইতে প্রাণটা তাহার বেদনায় টন্ টন্ করিয়া উঠিয়াছে। তাহার নিঃসঙ্গ জীবনে সে এতটুকু সুখ দিতে পারে নাই।

আসিবার দিন শেষ দৃশ্যটা শ্রীবিলাসের মনে আছে।

শিয়ালদহ হইতে ভোর ছয়টায় গাড়ী ছাড়ে; ভোর থাকিতে থাকিতে পিসীমা উঠিয়া রাঁধাবাড়া শেষ করিয়াছে। বন্ধ দরজার বাহির হইতে পিসীমা বলিলেন,—বৌমা, অ বৌমা—বিলাস উঠেছে? —উঠিয়ে দাও বাপু, ভোর হয়ে গেল যে—কাক-কোকিল ডাকতে লেগেছে, খুব ঘুম বাছা তোমাদের—

কিন্তু পিসীমার ডাকিবার বহু পূর্ব্বে শ্রীবিলাস আর মাধুরী উঠিয়া পড়িয়াছে। মাধুরীর সে-দিন সে কি রাগ!

শ্রীবিলাস তাহার রাগ ভাঙাইতেছিল—তুমি তো অবুঝ নও মাধুরী, যাব আর আসব, এই দেখ না সে-বারের মত সাতটা দিন দেখতে দেখতে যাবে; দশ দিন নয়—বার দিন নয়—এ কদিনের মধ্যে তোমার কিছু হবে না—

মাধুরী মুখ নীচু করিয়া বলিয়াছিল,—না গেলে কি হয় তোমার—কে খাবে তোমার এত টাকা—আমি মরে গেলে—

শ্রীবিলাস আর বলিতে দেয় নাই, দুই হাত দিয়া মাধুরীর মুখ চাপিয়া ধরিয়াছিল। কিন্তু খানিক পরেই বুঝিয়াছিল, মাধুরী কাঁদিয়া ফেলিয়াছে।

—ও মাধু, ওকি, ছি কাঁদতে আছে বুঝি, এই দেখ ফের ছেলেমানুষী—

যা হোক সকালে সে-দিন যাওয়া হয় নাই। সন্ধ্যাবেলাও সেইরকম মাধুরীকে কাঁদাইয়া শ্রীবিলাস চলিয়া আসিয়াছিল।

মাধুরীকে শেষ বারের মত আদর করিতে যাইতেই মাধুরী বলিয়াছিল—তুমি চলে যাচ্ছ, আমিও যেতে জানি। আমি চলে যেতে পারিনে ভেবেছ—দেখো—ফিরে এসে দেখো না—

হাসিতে হাসিতে সে-দিন শ্রীবিলাস চলিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু আসিয়া অবধি মনটা তাহার খারাপ হইয়া আছে। চিঠি শ্রীবিলাস লিখিয়াছিল, কিন্তু পৌঁছিয়াছে কি-না সন্দেহ। নইলে পাঁচ দিন কাটিয়া গেল—উত্তর আসিল না কেন?... গ্রামের পোষ্ট আপিসও যেমন!

—বুঝলি নিধু, আজ সকালেই তুই যা—পারবি তো? তাই ভাল—বউঠাকরুণ যা বলে শুনবি—পিসীমার কথায় রা করবি নে। তা হ'লে তাই ঠিক—বুঝলি তো?

মুখ দিয়া দগ্ধ তামাকের ধোঁয়া বাহির হইতে লাগিল। শ্রীবিলাসের বারবার মনে হইল—সেদিন ঠিক অমন করিয়া তাহার চলিয়া আসা উচিত হয় নাই।

মাধুরী যেমন অভিমানী, কি কাণ্ড করিয়া বসে কে জানে। বিশেষ করিয়া শ্রীবিলাসের মনে

হইল মাধুরীর বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থায় সেই অভূতপূর্ব্ব ঘটনাটি কখন যে ঘটিয়া বসে তাহার তো ঠিকঠিকানা নাই।

প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে; কত আশঙ্কা—কত আনন্দ—কত বেদনা জননীকে ভোগ করিতে হয় তা তো শ্রীবিলাস শুনিয়াছে। এই সময়টায় কত সাবধানে থাকিতে হয়—শিশুদেবতার আবির্ভাবের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জননীকে কত কঠোর আত্মসংযমের মধ্যে নিজেকে বাঁধিতে হয়, তাহা সে জানে! প্রতি মুহূর্ত্তে বিপদ—প্রতি পদক্ষেপে আশঙ্কা—প্রতি ক্ষণে চরমতম মুহূর্ত্তের জন্য কি ব্যাকুল প্রতীক্ষা! এই সময় মাধুরীকে ছাড়িয়া চলিয়া আসা তাহার কখনও উচিত হয় নাই।

নিধিরাজ চলিয়া যাইতেছিল।

শ্রীবিলাস আবার ডাকিল—আর একটা কথা শুনে যা, বউঠাকরুণ যা বলে শুনবি বুঝলি, দরকার হ'লে ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনতে ভুলিস্‌নে—আর দেখ, তুই-ই তো বাজার করবি—বউঠাকরুণ যা যা খেতে ভালবাসে তাই আনবি, এই ধর, শীতের সময় এখন শিম, মাখন শিম, পালং শাক—এই রকম সব। তোকে আর কি বলব, আর হ্যাঁ, মোড়ের দোকানে সেই যে উড়েটা সিঙাড়া ভাজে গরম গরম, তাই আনবি জলখাবারের জন্যে যা তা হ'লে—

নিধিরাজ যাইতেছিল।

শ্রীবিলাস আবার ডাকিল,—হ্যা দেখ, বেশী খাটাখাটুনি যেন না করে বুঝলি, তুই-ই নিজে সব করবি—আর বাড়িতে থাকবি সব সময়, যেন সমস্ত দিন আড্ডা মারতে যাস্‌নে আবার। নিধিরাজ চলিয়া যাইতেছিল।

শ্রীবিলাসের আবার আর একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। —আর একটা কথা শোন নিধে—দুটো টাকা দিচ্ছি, সাকরে গলির স্টীমার ঘাটে বেশ ভাল প্যাড়া পাওয়া যায়—ট্রেনে উঠবার আগে এই নিবি সের-দুয়েক, বেশ ভাল দেখে—তোর বউঠাকরুণ খেতে ভালবাসে কি-না—আর একটা কথা—না, না, তুই যা—সে হবে'খন।

শ্রীবিলাস বলিতে যাইতেছিল—কালীঘাটে ষষ্ঠীতলায় গিয়া যেন পূজা দিয়া আসা হয়। তা সে পিসীমা আছে, পিসীমাই সব ব্যবস্থা করিয়াছে নিশ্চয়। ওসব মেয়েমানুষেরাই জানে ভাল।

শ্রীবিলাস উঠিয়া তাঁবুর দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল।

দারুণ শীত পড়িয়াছে।

আচ্ছা, এমন হয় না স্বপ্নের মধ্যে আর একবার মাধুরী যদি আসে!

শ্রীবিলাস চোখ বুজিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু এপাশ ওপাশ ফিরিয়াও তাহার ঘুম আসিল না। যত রাজ্যের ভাবনা কি এই সময়েই আসিতে হয়!

আচ্ছা, মাধুরীর যদি একটা ছেলে হয়! ফুটফুটে গায়ের রং, মায়ের মতন গড়ন, সায়েবদের ছেলেদের মত স্বাস্থ্য। ছেলেকে সে বিলাত পাঠাইবে ব্যারিষ্টারি পড়তে, কথাটা ভাবিয়াই শ্রীবিলাস হাসিয়া উঠিল। কোথায় ছেলে ঠিক নাই, ইহারই মধ্যে এত সাধ।

কিন্তু গোল বাধিবে নাম রাখা লইয়া। পিসীমা সেকেলে মানুষ, হয়ত একটা ঠাকুর-দেবতার নাম রাখিবে—কালীচরণ, শিবদাস,—কি এইরকম কিছু। আজকাল ও-নাম আর ভাল লাগে না। 'হিরণ্ময়' নামটি বেশ। বাগবাজারের বাঁড়ুয্যেদের ছেলে নতুন আই-সি-এস পাস করিয়া আসিয়াছে। বেশ নামটি!

কিন্তু ছেলে না হইয়া তো মেয়েও হইতে পারে। শ্রীবিলাস ভাবিল, তা মেয়ে বলিয়া ফেল্‌না না-কি? আজকাল পথে ঘাটে কত মেয়েকে সে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিতে দেখিয়াছে। মেয়েকে সে লেখাপড়া শিখাইবে—এখনকার মত মেয়েদের বিবাহের জন্য অত ভাবিতেও হইবে না, তখন নিজেরাই নিজেদের বর বাছিয়া লইবে।

কিন্তু যে যাহাই বলুক, মেয়ের নাম সে রাখিবে 'উজ্জয়িনী'। 'উজ্জয়িনী' যদি মাধুরীর পছন্দ না হয় 'মৈত্রেয়ী' নামটাও ভাল।

লেপের ভিতর শ্রীবিলাসের আরও শীত করিতে লাগিল।

চারিদিকে দু-একটি পাখীর ডাক শোনা যায়। কি একটা পাখী আকাশের এপার হইতে ওপারে ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া গেল। উপরের অশ্বত্থ গাছ হইতে তাঁবুর উপর টপ-টপ করিয়া জল পড়িতেছে। তাঁবুর একটা ফুটা দিয়া আকাশের একটি কণা দেখা যাইতেছে।

এখনে মাধুরী কি করিতেছে কে বলিবে!...

পিসিমা সকাল সকাল উঠিয়া ধোয়া-মোছা শুরু করিয়া দিয়াছে। পাশের বেনেদের বাড়িতে সারাদিনের মত চীৎকার আরম্ভ হইল। তারপর?

তারপর, পূব দিকের জানালাটা দিয়া বিছানার উপর একটু রৌদ্রের আমেজ আসিয়া পড়িতেছে: ঘড়িতে ছয়টা বাজে। মাধুরী উঠিয়াছে। পিসীমা এবার চান করিতে যাইবে—তারপর?... ছোট এতটুকু একটি খোকা—হিরণ্ময়—উজ্জয়িনী—মৈত্রেয়ী...

সকাল সকাল খাইয়া লইয়াই দলের লোকেরা কাজ আরম্ভ করিয়া দেয়। তারপর সেই কাজ সন্ধ্যা অবধি চলে। প্রতি গ্রামে দুই একটি করিয়া টিউব-ওয়েল বসিতেছে—

কাজ কম নয়।...

সকালবেলাই নিধিরাজ যাইবে। এখান হইতে পূরা দশ মাইল নৌকা, তারপর স্টীমারে চড়িতে হইবে, তারপর ট্রেন!

শেষরাত্রে ঘুম আসাতে শ্রীবিলাস তখনও ঘুমাইতেছিল। রৌদ্র উঠিয়া বেলা হইয়া গিয়াছে। টিউব-ওয়েলের বোরিং চলিতেছে—গ্রামের ছেলেপিলের দল তাই দেখিতে জড় হইয়াছে। শুধু ছেলেই বা কেন, বুড়ারাও বাদ যায় নাই।

শ্রীবিলাসের তাঁবুর কাছে গিয়া নিধিরাজ ডাকিল,—বাবু, ও বাবু—

শ্রীবিলাস উঠিল—কি রে?

—আপনার চিঠি আছে একখানা।—

চিঠি! শ্রীবিলাস যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় লাফাইয়া উঠিয়াছে। শেষকালে মাধুরীর চিঠি সত্যসত্যই আসিল বলিতে হইবে। আর সে যা ঢিলা—চিঠি লিখতেই তাহার যত আলস্য। যাব্ চিঠি ত লিখিয়াছে, কিন্তু কি লিখিয়াছে কে জানে?... এতদিনে তাহা হইলে হয়ত একটি ..।

কাপড় ঠিক করিয়া শ্রীবিলাস তাঁবুর দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল।

কিন্তু চিঠি মাধুরীর নয়—আপিসের। উপরের ছাপ দেখিলেই বোঝা যায়। নিধিরাজের উপর তাহার রাগ হইল। হইবারই কথা। ভারি তো আপিসের চিঠি, সেই চিঠির জন্য তাহাকে এমনি ডাকিয়া তোলা। নিধিটার এতটুকুন বুদ্ধিও কি থাকিতে নাই?

শ্রীবিলাস ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া একটা স্বপ্ন দেখিতেছিল।... মাধুরীর স্বপ্ন। কাজ শেষ করিয়া যেন শ্রীবিলাস বাড়ি ফিরিয়া গিয়াছে। ছোট টুকটুকে একটি ছেলে কোলে করিয়া মাধুরী আসিল—দেখিতে ঠিক মাধুরীর মতন—যেমন রং, তেমনি গড়ন—

শ্রীবিলাস বলিল,—কই বড় যে রাগ ক'রে বলেছিলে চলে যাবে তুমি—তা আর যেতে হয় না—ওকি—ও আবার কে?—কার ছেলে নিয়ে এলে? কই—ও মাধুরী—দেখি—

মাধুরী হাসিয়া হাসিয়া বলিতেছিল—হ্যাঁ, অমনি অমনি ছেলের মুখ দেখতে হয় বুঝি—সোনার বালা চাই—আর আমার—

মিছামিছি শ্রীবিলাস পকেটে হাত পুরিয়া কি যেন বাহির করিতেছে এমনিভাবে বলিল—কাছে সরে এস, তবে তো দেব—কাছে—আরও কাছে—এস—

মাধুরী কাছে আসিতেছিল; শ্রীবিলাস একটি দারুণ মজা করিতে যাইবে, এমন সময় নিধিরাজের ডাকাডাকিতে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল।... নিধিরাজ যদি বোকা নয় তবে কি? আপিসের চিঠি যেমন আসিয়াছিল তেমনি পড়িয়া রহিল। শ্রীবিলাস খুলিয়াও দেখিল না।

ততক্ষণে নিধিরাজ তামাক সাজিয়া আনিয়াছে। মুখ হাত ধোয়ার আগে এটি তাহার চাই। কি যে অভ্যাস! বাবার নিকট হইতে এটি তাহার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া।

তাঁবুর উপর অশ্বত্থ গাছটির ডালে একটা কাক কি বিশ্রী কর্কশ স্বরে ডাকিতেছে। কাকের ডাক অশুভ... এখন কোথায় অনেক দূরে মাধুরী কি অবস্থায় আছে কে জানে।... শ্রীবিলাস বাহিরে আসিয়া কাকটিকে তাড়া দিয়া উড়াইয়া দিল। যত সব অমঙ্গল—অশুভ—অলক্ষণ! মাধুরী ভালয় ভালয় যদি উৎরাইয়া যায় তবেই...

এই কাকের কথাতেই শ্রীবিলাসের আর একটা কথা মনে পড়িল! মালদহতে একবার টিউব-ওয়েলের কাজ চলিতেছে। শিউচবণ তখন হেড মিস্ত্রি। কোথা হইতে কে জানে একটা কাক আসিয়া মাথার কাছে ডাকিতে শুরু করিল। কাক অমন কত ডাকে, কে খেয়াল রাখে! ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই কাকটাই কেবল ডাকিয়া ডাকিয়া যায়। —জ্বালাতন আর কি! শেষে বাঁশ কাঠি ঠেঙা দিয়া তাড়াইয়া তবে শান্তি!

তখনকার মত শান্তি হইল বটে, কিন্তু পরদিনই দেশ হইতে খবর আসিল—শিউচরণের ছোট ছেলেটি মারা গিয়াছে।

দলের লোকেরা সকাল সকাল রান্না করিয়া খাইয়া লয়। দু-একটা যা কিছু দেখিবার মত শ্রীবিলাস দেখাইয়া দিল। পাইপের মাপ লইল—তারপর আবার সেই একভাবে বোরিং চলিল।

সরকারী রাস্তা বাহিয়া সোজা উত্তর দিকে গিয়াছে খেয়াঘাটের পথ। সেইখানেই নৌকায় উঠিতে হইবে।

নিধিরাজ প্রস্তুত হইয়াছে।

হাট হইতে কচু কিনিয়া রাখিয়াছিল। মানকচু, একটা এক পয়সা—বড় বড় দেখিয়া দুইটা—আর বেগুন লইয়াছে চার সের—চমৎকার বেগুন বটে, কলিকাতার সেই সাত-বাসি বেগুন—আর এ বেগুন—বউঠাকরুণ বেগুন দেখিয়া যা খুশী হইবে—তা সে জানে। আর মূলো লইয়াছে অসংখ্য: পাইকারী দর। যদি পচিয়া যাইবার ভয়ই থাকে—বেশ ত—কাটিয়া কাটিয়া শুকাইয়া রাখিলেও চলে, অসময়ের জন্য।

একটা ছালাব ভিতর সব ক'টি জিনিষ পুরিয়া একটা বড় পুঁটলি হইয়াছে। আর আছে চার নাগরী গুড়।

বাস্ এই!

শ্রীবিলাস নৌকা পর্য্যন্ত যাইবে নিধিরাজের সঙ্গে। পোঁটলাটি কাঁধে ফেলিয়া নিধিরাজ পথে বাহির হইল।

দুগ্গা—দুগ্গা—

শ্রীবিলাসও আস্তে আস্তে বলিল, দুর্গা—দুর্গা—

এখন গিয়া যে সেখানে নিধিরাজ কি দেখিবে কে জানে! যদি ভালয় ভালয় শেষরক্ষা হয় —তবেই তো! নহিলে...

একবার শ্রীবিলাসের মনে হইল—এ তাহার অহেতুক উৎকণ্ঠা। পৃথিবীতে রোজই তো কত শিশু জন্মগ্রহণ করিতেছে—এ-ভয় করিলে সংসারে তো বাস করা চলে না। এই তো সে-দিন কলিকাতায়—তাহারই বাড়ির পাশের বাড়িতে—

স্বামী বেচারা আপিস চলিয়া গিয়াছে। হঠাৎ দুপুরবেলাই মহিলাটির বেদনা উঠিয়াছে। তারপর শ্রীবিলাস নিজে গিয়া ডাক্তার দাই ইত্যাদি দেখান সব তো করিল। শিশুও বাঁচিল। সেই শিশু এখন বছর-তিনেকের হইয়াছে।

সে-দিন শ্রীবিলাস ছিল, তাই তো! ভগবান নিশ্চয়ই আছেন। শ্রীবিলাসের স্থির বিশ্বাস হইল—ভগবান নিশ্চয়ই আছেন!

নিধিরাজ হঠাৎ চীৎকার করিয়া বলিল—দেখুন বাবু, ওই দেখুন—

—কি রে?

শ্রীবিলাস এদিক-ওদিক চাহিয়াও লক্ষ্য করিবার মত কিছুই দেখিতে পাইল না।

—দেখছেন না ঐ যে—খালি কলসী একটা দেখেছেন? যাত্রা শুভ—জানেন না খালি কলসী দেখলে যাত্রা শুভ হয় যে—

কথাটি সত্য বটে। শ্রীবিলাসও জানে। ...সারাপথ শ্রীবিলাস এদিক-ওদিক চাহিতে চাহিতে চলিতে লাগিল।

একটা শুভচিহ্ন না হয় দেখা গিয়েছে, অমঙ্গল আশঙ্কা কিছু কমিল—কিছু যদি আরও অমনি দু-একটা দেখা যায় তাহা হইলে অমঙ্গল সম্ভাবনাটা একেবারেই চলিয়া যায়।... কিন্তু এদিক-ওদিক কোথাও কিছু নাই।

শ্রীবিলাস নিধিরাজকে বুঝাইতে বুঝাইতে চলিল—বেড়াল যেন বাড়ির ত্রিসীমানায় না আসে। হুলো বেড়ালের সেই অদ্ভুত আর্ত্তনাদ ক্লান্তককণ স্বর গর্ভবতীর পক্ষে না-কি ভারি অমঙ্গলজনক। কাছাকাছি যেখানে বেড়াল দেখিবে যেন তখনি তাড়াইয়া দেওয়া হয়। আর কাক!... শিউচরণের ছোট ছেলেটার মৃত্যু হইয়াছিল কেমন করিয়া তা তো নিধিরাজ জানেই!..

খেয়াঘাটের ওধারেই শ্মশান!

শ্রীবিলাস ভাল করিয়া নজর করিয়া চাহিয়া দেখিল—কোথাও আজ একটা শবদেহও ত নাই। শবদেহও তো শুভযাত্রার লক্ষণ। মাধুরীর মঙ্গলের জন্য কি কেহ একজনও মরিল না। অথচ অন্য দিন কত মৃতদেহে শ্মশান ভরিয়া থাকে।

নিধিরাজ নৌকায় উঠিল। বলিল—গিয়েই চিঠি দেব, আপনি ভাববেন না, আর যাত্রা ত শুভ হয়েছে—ও কি মিথ্যে হয়?

নৌকা ছাড়িয়া দিল। গুড়ের নাগরী ও ছালার পোঁটলাটার পাশে দাঁড়াইয়া নিধিরাজ শ্রীবিলাসের দিকে নির্ব্বাক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বলিবার কিছুই নাই, অথচ দু-জনেই বুঝিল কত জিনিস বলা হইল না।

ক্রমে দূরে বাঁকের মুখে নৌকাটা অদৃশ্য হইয়া গেল।

ফিরিয়া আসার পথে শ্রীবিলাসের মনে হইল—ভগবানের এ বড় অবিচার। নারী সন্তানপ্রসবের সমস্ত বেদনা বহন করিবে, আর পুরুষ কেমন স্বচ্ছন্দে নির্ব্বিঘ্নে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইবে, অথচ পুরুষের দায়িত্বটা কি কিছু কম! পুরুষ যে বেদনার এতটুকু ভাগও তো লইতে পারে না। নারীর উপর যেন বিধাতার বিশেষ আক্রোশ!

নিধিরাজ চলিয়া গিয়াছে—তামাক সাজিয়া দিবার কেহ নাই!

অলস মধ্যাহ্নে তাঁবুতে বসিয়া তাহার যেন শ্বাস রোধ হইয়া আসিতেছিল। ঠিক এই সময়ে মাধুরী সেখানে কি করিতেছে ভাবিতে বেশ লাগে!

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়া সারিয়া এখন হয়ত কাঁথা সেলাই করিতে বসিয়াছে। প্রথম শিশু আসিবে—সমস্ত কাঁথা নূতন তৈরি করা দরকার। সুতার প্রত্যেকটি টানে টানে মাধুরীর হাতের চুড়িগুলি ঠুন্ ঠুন্ করিয়া বাজিতেছে—পশ্চিমমুখো বারান্দায় দ্বিপ্রহরের কড়া রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে—সামনের নারিকেল গাছটা বাতাস লাগিয়া আমূল দুলিতেছে—আকাশের গায়ে অনেক দূরে গোটা-দুয়েক চিল মন্থর গতিতে উড়িতেছে—শীতের দিন উহাদের পাখার ভরে ক্লান্ত উদাস হইয়া উঠিল—

হঠাৎ শ্রীবিলাস বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

সকালবেলা আপিসের যে চিঠিটি আসিয়াছিল সে তো পড়া হয় নাই। শ্রীবিলাস টেবিলের উপর খুঁজিল। সেখানে নাই। বিছানা, বালিসের তলা, জামার পকেট সব দেখা হইল, কোথাও নাই। সে চিঠিতে কি অর্ডার আছে কে জানে।

শ্রীবিলাস উঠিয়া আসিয়া নিজের বাক্সটা খুলিল। ইহার ভিতরেই হয়ত সে কখন ভুলিয়া

রাখিয়া দিয়া থাকিবে। কাগজপত্র প্রত্যেকটি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিল। অনেক দিনের পুরান চিঠিপত্র আবার পড়িতে লাগিল।

হঠাৎ দেখিল একটি ফোটো। এখন ময়লা হইয়া গিয়াছে।

অনেক দিন আগে—শ্রীবিলাস তখন বিয়ে করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। বয়স তখন তাহার ত্রিশের কাছাকাছি, বিবাহ করিবার বয়স তাহা নয়। কিন্তু কোথা হইতে একটা সম্বন্ধ আসিল—শ্রীবিলাস প্রথমটা 'না' 'না' করিয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মাধুরীর এই ফোটোটা দেখিয়াই কেমন যেন মনটা একটু ঝুঁকিয়াছিল। তার পরেই বিবাহ।

ফোটোটা এমন কিছু নয়। পিছনে সিন টাঙানো। মনে হয় মাধুরী যেন তালকুঞ্জের ভিতর দাঁড়াইয়া আছে; স্বভাবসরল সুন্দর মুখখানি। ঢাকাই শাড়ীটি সর্ব্বাঙ্গে বেষ্টন করা—মাথায় ঘোমটা নাই—হাতের কব্জীতে একটা ঘড়ি—পরে শ্রীবিলাস শুনিয়াছে ও ঘড়িটা মাধুরীর দাদার—ফোটো তুলিবার সময় ওটি তাহার হাতে পরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

সেই কুমারী মাধুরী এখন কত বড়টা হইয়াছে। যে ছিল এক দিন অচেনা অজানা পর, আজ সে-ই কেমন করিয়া এত আপনার হইয়া গেল! তাহার এতটুকু অসুখ করিলে যে শ্রীবিলাসের চিন্তার অবধি থাকে না। শ্রীবিলাস ভাবিয়া পায় না কেন এমন হয়।

খুঁজিতে খুঁজিতে আর একটা চিঠি বাহির হইল। মাধুরীর চিঠি!

বিলাসপুরে থাকিতে মাধুরী লিখিয়াছিল; তখন নূতন বিবাহ হইয়াছে, চিঠিটির আগাগোড়া শ্রীবিলাস পড়িল। পুরান চিঠি পড়িতে বেশ লাগে। সেদিনকার মাধুরী—আর এদিনকার মাধুরী—তফাৎ এতটুকু নাই। কত অনুযোগ করিয়া লিখিয়াছে, বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিয়াছে বলিয়া স্ত্রীর উপর শ্রীবিলাসের টান নাই—বাড়ি আসিতে না পারেন, চিঠি লিখিলে ত দোষ নাই ইত্যাদি ইত্যাদি—

চিঠি পড়িয়া শ্রীবিলাস খুব খানিকটা হাসিয়া লইল। মেয়েমানুষ হইয়া জন্মিয়াছে—চাকুরির যে কত জ্বালা তাহা ত বোঝে না।

তাঁবুর বাহিরে রৌদ্র পড়িয়া আসিয়াছে।

দলের লোকেরা সমস্বরে চীৎকার করিতে করিতে বোরিং করিতেছে। শ্রীবিলাস ঘুমাইবার চেষ্টা করিল।

কাল এমনি সময়ে নিধিরাজ সেখানে গিয়া পৌঁছিবে। পিসিমা তখন হয়ত পাশের বামুন-বাড়ি বেড়াইতে গিয়াছে। কড়ানাড়ার শব্দে মাধুরী কাঁথা সেলাই ফেলিয়া রাখিয়া উঠিবে।

—কে—কে তুমি?

—আমি—আমি বউঠাকরুণ, আমি নিধিরাজ—

তাড়াতাড়ি মাধুরী কাপড়টা ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া ঘোমটা দিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে দরজা খুলিয়া দিবে। দরজা খুলিয়াই দেখিবে নিধিরাজ পোঁটলা ঘাড়ে করিয়া একা; সঙ্গে আর কেহ নাই।

মাধুরী বলিবে—কই তুই একা এলি? আর কেউ নেই? হ্যাঁ রে নিধিরাজ, আর কেউ নেই?

তাঁবুর বাহিরে বিকাল হইয়া আসিল। শ্রীবিলাস বিছানা ছাড়িয়া উঠিল। আজ রাত্রে আসিয়া মাধুরীকে একটা চিঠি লিখিতে হইবে।

জুতা জোড়া পায়ে দিয়া শ্রীবিলাস বাহিরে আসিল।

টিউব-ওয়েল ঘিরিয়া ছেলেবুড়োর দল অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। এতদিন ধরিয়া দেখিয়া দেখিয়া তাহাদের সাধ আর মেটে না। যাহাদের বয়স বেশী তাহারা গায়ের জোরে ছোটদের তাড়াইয়া দিয়া নিজেরা সামনে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। সামনে দাঁড়াইলে দেখা যায় ভাল।

শ্রীবিলাস দু-একটা জিনিষ দেখাশোনা করিয়া পথে নামিল, ভাবিল একটা পোষ্ট আপিসটা ঘুরিয়া দেখিয়া আসিলে হয়—কোনও চিঠি আসিয়াছে কি-না।

চারিদিকে সন্ধ্যা হয়-হয়। দেখিতে দেখিতে শ্রীবিলাস তখন বারোয়ারীতলায় গিয়া পৌঁছিয়াছে।

চারিদিকে বটগাছ—মূল গাছটি আজ দশটা গাছে পরিণত হইয়াছে। কাল আরও হইবে। শ্রীবিলাস চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল—পোষ্ট আপিস, পাঠশালা এবং তাহারই দক্ষিণ দিকে মঙ্গলচণ্ডীর মন্দির। মন্দিরের দাওয়ার উপর বসিয়া কত লোক তখন গল্প করিতেছে।

নদীর ধারে আসিয়া তবে শ্রীবিলাসের যেন মাথা ঠাণ্ডা হইল।

সারাদিন তাঁবুর ভিতর বসিয়া গাড়ির কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনের সমস্ত শান্তি নষ্ট হইয়া যায়। —অনেক দূরে একটা লোক কেমন বাঁশী বাজাইতেছে। গ্রামের সীমানা ছাড়াইয়া মাঠ পার হইয়া ধানজমি, মেঠো পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। শেষে দিগন্তসীমায় গিয়া মিশিয়াছে।

মাধুরী তাহার উপর খুব রাগ করিয়াছে নিশ্চয়, রাগ করিয়া হয়ত চিঠির উত্তর দিতেছে না—নইলে শ্রীবিলাস কবে চিঠি লিখিয়াছে এখনও উত্তর আসিল না কেন? নিধিরাজ সেখানে গিয়া কি দেখিবে কে জানে।

ছোট ভাড়াটে বাড়ি। সব দিন কলের জল আসে না। তাও ও-বাড়ির কল বন্ধ করিলে এ বাড়িতে জল আসে। এই জল লইয়াই বাড়ির মেয়েদের মধ্যে দিনরাত ঝগড়া।

তারপর পাশের বাড়ির লোকেরা নিজেদের লজ্জা বাঁচাইবার জন্য দু-তলা সমান এক মস্ত পাঁচিল তুলিয়া দিয়াছে। সেই পাঁচিল দেওয়াতে ঘরের ভিতর আলো-বাতাস প্রবেশ করিতে পারে না। বিধাতার দেওয়া আলো বাতাস জল—তাও শহরে পয়সা দিয়া কিনিতে হয়।

এই আবহাওয়ার ভিতরে মাধুরীর জীবনযাপনের কথা ভাবিয়া শ্রীবিলাসের কষ্ট হইল। বিবাহ করিয়াছে বটে, কিন্তু এক দিনের জন্যও শ্রীবিলাস মাধুরীকে সুখী করিতে পারে নাই। এই রকম সারা জীবন তাহাকে টো-টো করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে। দু-দিন তাহার স্ত্রীর কাছে থাকিবারও অধিকার নাই।

এই তো সন্ধ্যা হইল, কলিকাতার সেই অপরিসর গলিতে হয়ত এখনও গ্যাস জ্বালা হয় নাই। চারি পাশের বাড়ী হইতে ধোঁয়া আসিয়া ঘরদোর একেবারে ভরিয়া যাইবে।... তারপর ঠাকুর-ঘর হইতে পিসীমা আহ্নিক সারিয়া শাঁখ বাজাইবে। সারা বাড়ি গঙ্গাজলের ছিটা দিয়া প্রদীপ দেখাইয়া নামমাত্র গৃহের কল্যাণ-কামনা করা হইবে।

পাশের বাড়ীর এক বৃদ্ধ হাঁফানি রোগী ঘড় ঘড় আওয়াজ তুলিয়া নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিবে। রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে সে আওয়াজ বাড়িবে। সেই আওয়াজ শুনিয়া রাত্রে বিছানায় একলা শুইয়া মাধুরী হয়ত ভয়ে আঁৎকাইয়া ওঠে!

রাত্রি যখন দু-টা, ঠিক সেই সময় প্রতিদিন এক মাতাল চীৎকার করিয়া সমস্ত পাড়া সচকিত করিয়া তোলে। তারপর সেই মাতাল স্বামী আর তার স্ত্রী মিলিয়া সে কি বকাবকি চীৎকার।

নিত্যই এইরূপ।

কেন যে শ্রীবিলাস বিবাহ করিয়াছিল তাহাই আশ্চর্য্য ঠেকে! শুধু কষ্ট দেওয়া বইত নয়। এই যে মাধুরী এখন অসুস্থ—সারা বাড়ির কাজ হয়ত সবই সে করিতেছে, পিসীমা বারণ করিলেও কি শুনিবে?...

জানলার পর্দাগুলি একটু কালো হইলেই তাহার কাচিয়া পরিষ্কার করা চাই। ধোপার বাড়ি দিলে পাছে নষ্ট হইয়া যায়—মশারি বালিশের ওয়াড় মাধুরী মাসে দু-বার করিয়া নিজেই কাচিবে।

তারপর ঘর ঝাঁট দেওয়া। শুধু ঝাঁট দিলেই কি শান্তি? দুইবার জল দিয়া ধুইয়া মুছিয়া ফেলা চাই রোজ!

টেবিলে চেয়ারে কোথায় ধূলা জমিয়াছে—কোন্ ঘরে কোথায় ঝুল জমিয়াছে—ভাঁড়ার ঘরে কোথায় আরশুলা জমিতেছে—সব মাধুরীর নিজের খোঁজ রাখা চাই। অথচ এই গৃহিণীপনা যে কি মূল্য দিয়া সে শিখিয়াছে তাহা কাহারও অজানা নয়।

ফুলশয্যার রাত্রে মাধুরী প্রথম কি কথা বলিয়াছিল, তাহা আজও শ্রীবিলাসের মনে আছে।

মাধুরী বলিয়াছিল—আমাকে তাড়িয়ে দেবে না?

নববধূর এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া শ্রীবিলাস সে-দিন খুব হাসিয়াছিল। হাসি আসাই স্বাভাবিক।

কিন্তু পরে শ্রীবিলাস ভাবিয়া দেখিয়াছিল—যে বাপ-মায়ের স্নেহ-ভালবাসা পায় নাই, কাকার বাড়িতে তাচ্ছিল্যের ভিতর দিয়া মানুষ হইয়াছে, তাহার মুখ দিয়া অমন কথা বাহির হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

কিন্তু শ্রীবিলাস ভাবিল, আজ তো মাধুরীর সেই কথাই ফলিতে চলিয়াছে।

শ্রীবিলাস যখন দেশ হইতে দেশান্তরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তখন কলিকাতার ছোট একটি বাড়ির সারা ঘরময় একটি শিশু ঘুর ঘুর করিয়া বেড়াইবে।

—আয় আয়—হাঁটি হাঁটি পা পা—আয় আয়—হাঁটি হাঁটি—

—ও পিসিমা—দেখে যান কি দস্যি হয়েছে খোকা—সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল—ও খোকা, তুই এত দুষ্টু হ'লি কবে থেকে?

—ওগো দেখ দেখ—খোকাকে কোটপ্যান্ট প'রে কেমন দেখাচ্ছে—খোকা আমাদের সায়েব হয়েছে—ও খোকা, তুমি সায়েব হয়েছ? ...ইংরিজী বলতে পার?

—খোকা কি দুষ্টু জান—পুতুল দিলুম খেলনা দিলুম—কিছুতেই কিছু না—শেষে আমি পাশে শুলুম তখন ঘুমোয় ছেলে—দুষ্টুর শিরোমণি—

কলিকাতার সেই অপরিসর গলির বাড়িটিতে মাধুরীকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীবিলাস অনেক স্বপ্নই গড়িয়া তুলিল।—

সন্ধ্যাবেলা ঠিক এমন সময় পিসীমা রান্নাঘর হইতে চীৎকার করিয়া বলিতেছে—ওই বুঝি গয়লানী এসেছে—অ বৌমা, দুয়োরটা খুলে দুধটা নাও তো বাছা—

গয়লানী দুধ ঢালিয়া চুপি চুপি বলিল—কি মা কেমন আছ, আজ ভাল? তা একটু সাবধানে থেক মা—অন্ধকারে চলাফেরা—ভয় করে মা—আমাদের পাড়ার একটা বউ সে-দিন বুঝলে—দেখাসাক্ষাৎ—

বলিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া বলিল—এবার তোমার ঠিক খোকা হবে মা—এবার সবাইয়ের খোকা—ও পাড়ার সেনেদের বউয়ের খোকা—তারপর ওই যে নূতন উকীল এসেছে ওদের বউয়েরও খোকা—এবার তোমার ঠিক খোকা হবে মা, এই ব'লে রাখলুম দেখো।

দুধের বালতি লইয়া গয়লানী চলিয়া যাইতেছিল—

মাধুরী ডাকিয়া বলিল—ও দিদি—একটা কথা শোন—কাউকে বলো না, আমার মাথা খাও, আমার জন্যে বাজার থেকে আমসত্ত্ব এনে দিতে হবে তোমাকে—আমি এখুনি পয়সা এনে দিচ্ছি—কিছু খেতে পারিনে—বড় অরুচি—

গয়লানী পয়সা লইয়া চলিয়া যাইতেছিল—

হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—হ্যাঁ মা, বাবুর কোনও চিঠিপত্তর পেয়েছ? —পাওনি; —আসতে লিখে দাও মা—এ-সময় কি দূরে থাকলে চলে—পেরথম পোয়াতি—

ভাবিতে ভাবিতে শ্রীবিলাস যেন সশরীরে সেই কলিকাতার বাড়ি গিয়া পৌঁছিয়াছে।

রাত্রিবেলা হঠাৎ মাধুরীর বেদনা উঠিয়াছে। ঘরের কোণে অস্পষ্ট আলোক জ্বলিতেছিল—পিসিমা উঠিয়া বলিলেন—অ বৌমা—দাই ডাকবো,—

বৌমা উত্তর দিল না।

ও-ঘরে সৌরভী শুইয়াছে, তাহাকে জাগাইয়া দিয়া পিসীমা বলিল—যা ত মা, একবার চট করে দাই মাগীকে ডেকে আনবি,—যা—যা—দেরি করিস নে—আবার ঘুমোয়—অ সৌরভী যা—

অন্ধকার ঘরের কোণে একটি প্রাণী যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে। বাড়িতে কোনও পুরুষমানুষ নেই।

মাধুরী মুখ তুলিয়া চাহিয়া অতি কষ্টে বলিল—ও পিসীমা, তাঁর কাছে একটা টেলিগ্রাম করে দিন্ না—

পিসীমা বলিলেন,—ভয় কি মা, কিছু ভয় নেই—

দাই আসিল।

—কুথা গো মা কুন্ ঘরে? লাড়ী কাটতে চার টাকা লিব মা—তা বুলে রাখছি—

পিসিমা বলিল—তবে থাক বাছা তোমাকে করতে হবে না—বামুনপিসীকে ডাকলে অমনি খালাস ক'রে যাবে—

মাধুরীর বড় বিরক্তি বোধ হইতেছিল। সে এখন যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে—আর এখনই কি-না দরদস্তুর শুরু হইল—

যাহা হউক, দাই সমস্ত সাজসরঞ্জাম লইয়া ঘরে ঢুকিল।

ঘরের এক কোণে একটি মাটির প্রদীপ টিম্ টিম্ করিয়া জ্বলিতেছে। পিসিমা দুর্ব্বার আগ্রহে চুপ করিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল।

ওদিকে শ্রীবিলাসও দেড়-শ মাইল দূরে নদীর ধারে অপেক্ষা করিতে লাগিল...

ঘরের ভিতর বাতাস যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া আছে। —আর কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই বুঝি কোথায় প্রলয় শুরু হইবে। জানালার ফাঁক দিয়া আকাশের খণ্ড চাঁদ উঁকি মারিতেছে। ষ্টোভ জ্বলিতেছে... গরম জল... পাখা... একটি মুহূর্ত্ত... তার পরেই যাহা হইবার তাহাই হইবে।

মাঝে মাঝে মাধুরী গোঙাইতেছে। ও-পাশের বাড়িতে হাঁপানি রোগীটা সেই রকম নিত্যকার মত ঘড় ঘড় আওয়াজ শুরু করিল।

হঠাৎ দাই চীৎকার করিয়া উঠিল—ওগো, বেটা ছানা হয়েছে মা, বেটা ছানা—

পিসিমা আনন্দে বলিল—অ সৌরভী—শাঁখ বাজা—শাঁখ বাজা—ছেলে হয়েছে রে—

দেড়-শ মাইল দূরে এক নির্জন নদীতীরে দাঁড়াইয়া শ্রীবিলাস স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল... হিরণ্ময় জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

রাত্রে শ্রীবিলাস চিঠি লিখিল :

—মাধুরী যেন বেশী খাটাখাটুনি না করে। কবচ পাঠান হইতেছে, ইহা যেন নিয়মিত ধারণ করা হয়। নিধিরাজকে ওখানে পাঠান হইয়াছে—সে যেন ডাক্তার দাই ইত্যাদি ডাকিয়া আনে। কোনও ভাবনার কারণ নাই। ওখানে কালীঘাটে ষষ্ঠীতলায় গিয়া যেন পূজা দিয়া আসা হয়। কিছু ভয় নাই, ভালয় ভালয় সব সম্পন্ন হইবে। মাধুরী যেন একা একা অন্ধকারে চলাফেরা না করে—শরীরের উপর সর্ব্বদা যেন নজর রাখা হয়। ডাক্তার যাহা বলে সেই মত কাজ যেন করা হয়, পয়সার উপর মায়া করিলে চলিবে না—পয়সা গেলে পয়সা আসিবে, প্রাণ আর ফিরিয়া আসে না—ইত্যাদি ইত্যাদি উপদেশপূর্ণ প্রায় চার পৃষ্ঠা চিঠি—

চিঠি লেখা যখন শেষ হইল, রাত্রি তখন এগারটা বাজিয়াছে। বাহিরে শীতার্ত্ত রাত্রি। অন্ধকার বুকে লইয়া কুয়াশা যেন জমাট বাঁধিয়া আছে। নিধিরাজ থাকিলে এখন তামাক সাজিয়া দিত; নল টানিতে টানিতে নিদ্রার আকর্ষণ বেশ লাগে। শ্রীবিলাস বাক্স হইতে চুরুট বাহির করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইল।...

তাহার মনে হইল—কালকের মত আজও যেন কে তাহার তাঁবুর কাছে আসিবে। আসিয়া দরজা খুলিয়া দিতে বলিবে, হয়ত বা সে মাধুরীই!

শ্রীবিলাস চোখ মেলিয়া চুরুট টানিতে লাগিল। চুরুটের ধোঁয়ায় মন তাহার উড়িয়া চলিল অনেক দূরে—কলিকাতার অপরিসর একটি গলির ছোট্ট ঘরের এক কোণে।

আর তিন দিনের মধ্যেই এখানকার কাজ তাহার শেষ হইয়া যাইবে। তারপর শ্রীবিলাস বাড়ী যাইবে।

ছোট আঁতুর-ঘর। তাহারই ভিতর বসিয়া রুগ্না মাধুরী খোকাকে লইয়া বসিয়া আছে। শ্রীবিলাস গিয়া চুপি চুপি বলিবে—কই, ও মাধুরী—দেখি খোকা দেখি—

মাধুরী খোকা দেখাইবে। তুলতুলে নরম দেহ; চোখ দুটি নিমীলিত। —কুলার উপর শোয়াইয়া রাখিয়াছে।

—ওগো, খোকা কেমন দেখতে শিখেছে জান, চোখ মিটি-মিটি ক'রে চায়—আর রাতের বেলায় দু-চোখ যদি এক করতে পারি—কেবল কাঁদ্‌বে—বড় হলে খুব দুষ্টু হবে—বুঝলে—তুমি খুব জব্দ—এখন ঘুমুচ্ছে নইলে—ও খোকা, ওই দেখ জেগেছে—

রাত্রে খোকা খুব কাঁদিতেছে—

—ও-ও-ও, না-না-না—কে মেরেছে—মা রে মা, কি কান্নাই কাঁদতে শিখেছিস্ তুই—সৌরভী, ও সৌরভী—দেখেছ ঘুম দেখেছ, চীৎকারে সাড়া পাড়া জেগে গেল, আর উনি একটু আলোটা জ্বেলে দেবেন তার—ও সৌরভী—

সকালবেলা আটটা বাজিলে উঠানের এক কোণে এক ফালি রোদ আসে। সেইখানে খোকাকে লইয়া মাধুরী বসিয়াছে। শীতকাল; থর থর করিয়া কাঁপিতেছে—খোকার গায়ের চারিদিকে ভাল করিয়া কাপড় ঢাকা দেওয়া।

বেলা বাড়িল; রৌদ্র উঠিয়া সারা উঠানখানি ভরিয়া গেল। খোকাকে দুই পায়ের উপর চিৎ করিয়া মাধুরী তেল মাখাইতেছে। খোকা সারা বাড়ি ফাটাইয়া চীৎকার করিতেছে।

কান্না শুনিয়াই শ্রীবিলাস ঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়াছে। এক মাসও বয়স হয় নাই—ইহারই মধ্যে গলা দেখ না!

মাধুরী বলিতেছে—ওরে আর কাঁদিস্ নে—ও খোকা—গলা যে চিরে গেল—যেন ছেলেকে কত মেরেছি—ও ধন—ও মাণিক—কে মেরেছে রে—

খোকা বড় হইবে, হাঁটিতে শিখিবে—কথা কহিবে—দুষ্টামি করিবে, জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত তাহার নূতন নূতন আবিষ্কার।

—ওগো দেখ দেখ, খোকা আমার নাম ধ'রে ডাকছে, কে শেখালে ওকে বল তো, বুঝেছি, তুমি নিশ্চয় তুমি, নিশ্চয়—

—ওগো কি ভাগ্যি পড়ে যায়নি—ছাতের আল্‌সে থেকে ঝুঁকে দেখছে—আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কাঁপছে—না, ওকে এখন থেকে শাসন করতে হবে, পাড়ার তো এত ছেলে রয়েছে—এমন দুষ্টু কেউ না—ও খোকা, তুই আর কর্‌বি বল?

খোকাকে মারিতে গিয়া মাধুরী গাল ভরিয়া তাহাকে চুমু খাইয়া ফেলিল।

ছোট লম্বা বারান্দায় একটা বেতের দোলনা টাঙানো হইয়াছে—মাধুরী দোল দিতে দিতে গাহিতেছে—

খোকা আমাদের সোনা,
স্যাক্‌রা ডেকে মোহর কেটে গড়িয়ে দেব দানা
তোমরা কেউ করো না মানা—

—ওমা তুমি বুঝি ড্যাব ড্যাবে চোখ মেলে জেগে আছ—না বাপু, তোমাকে নিয়ে থাকলে তো আর আমার—ও সৌরভী, জুজুবুড়ীকে ডেকে নিয়ে আয় তো, নিয়ে আয় ডেকে—আচ্ছা, না না ডাকবে না, তবে ঘুমো, ঘুম পাড়ানী মাসী পিসী ঘুম দিয়ে যা—

একদিন খোকা আরও বড় হইবে। বাড়ির সদর দরজা খোলা পাইলেই রাস্তায় চলিয়া যাইবে।

গয়লানী দুধ দিতে আসিয়াছে।

—ও দিদি, একে নিয়ে যাও তো তোমাদের বাড়ী—নিয়ে গিয়ে ঘরে বন্ধ ক'রে রেখে দিও—যাবি ও খোকা, তোর মাসীর সঙ্গে যাবি—কি দুষ্টু হয়েছে দিদি বুঝলে, এত দুষ্টুমি যে ওকে কে শেখালে—

তারপর গয়লানী চলিয়া যাইবে।

মাধুরী বলিবে—ও দিদি দরজাটা যাবার সময় পা দিয়ে ভেজিয়ে দিও, দুয়োর খোলা পেয়েছে কি অমনি রাস্তায় ছুটে চলে যাবে।

প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি শ্রীবিলাস ভাবিতে লাগিল। এই তো জীবন—এমনি করিয়াই তো মানুষ বড় হয়। ভাবিতে ভাবিতে শ্রীবিলাস ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

ঘুম তখন গাঢ় হইয়াছে—সকালবেলা টেলিগ্রাম আসিল।

ছোট টেলিগ্রাম, সব কথা খুঁটিয়া লেখা যায় না। তবু শ্রীবিলাস যেটুকু অর্থ বুঝিল তাহা তর্জ্জমা করিলে এই দাঁড়ায়—খোকা হইয়াছে, মাধুরীর অবস্থা বিপজ্জনক, শীঘ্র চলিয়া আইস।

শ্রীবিলাসের পায়ের তলায় তখন পৃথিবীতে যেন ভূমিকম্প হইতেছে—

নদীর দুই তীর জুড়িয়া ক্ষেত...

একদিককার পাড় ভাঙিতে শুরু হইয়াছে—রাখালছিটার বেড়ার ধারে একটা গরু চরিতেছে—ঘেরা ঘাটে কাহাদের বউ স্নান করিতে নামিল—রাঙা টুকটুকে বউটি—এক কৃষাণ ছাতি মাথায় এক পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এক ঝাঁক শামুক-ভাঙা শিমূল গাছে ভরা—জলের উপর একটা পানকৌড়ি হঠাৎ ডুব দিল, তীরের উপর কুঁচবনের ঝাড়—তারও ওপাশে একটা শাঁড়াগাছ একেবারে জলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে—গাছভর্ত্তি চড়াই পাখীর দল কিচকিচ করিতেছে—এইবার এক খেয়াঘাট, উপর দিয়া পুল, তারপর দুই তীরে পোড়ো জমি, জনহীন নদীতীর—

মাঘের শেষ।

নিরাভরণ গাছগুলি নির্লজ্জের মত ঠায় দাঁড়াইয়া, তীরের উপরে অনেকদূর হইতে কে যেন টানিয়া টানিয়া গান গায়—চরের উপর ঘূর্ণী হাওয়ার সাথে বালু উড়িতেছে—জলের উপর কাহার ছাড়িয়া দেওয়া একটা সোলার নৌকা ভাসিয়া যায়। একটা সরু কাটির উপর একটি ছোট্ট পাখী চুপ করিয়া বসিয়া আছে। একটা বাজ-পড়া তালগাছ—মাঝিদের কুঁড়ে—তারপরে বেড়া-ঘেরা বাগান, সজিনা গাছ, আগাছা, ঝোপ-জঙ্গল—তারপর আবার পাড় ভাঙিতে শুরু হইয়াছে—

শ্রীবিলাসের চোখের সম্মুখে চলচ্চিত্রের মত লাগিতেছে।

নৌকার ছইয়ের ভিতর বসিয়া শ্রীবিলাস জানলায় মুখ দিয়া আছে—অলস—নির্জ্জীব—ক্লান্ত মধ্যাহ্ন, ধূসর পাংশুল মাটি—জরাজীর্ণ তরু-শাখা—পৃথিবীর আনন্দ যেন নিঃশেষে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে।

—বুড়ো বয়েসে বিয়ে—তার আবার টান থাকে না-কি—আমি ম'লে তুমি বাঁচবে—কেমন?

—কেবল তামার আর তামাক—কি যে নেশা—বুড়ো লোকের মত, এত তামাকও খেতে পার তুমি—

—যদি খোকা হয়, কি নাম রাখবে বল তো—খুব ভাল দেখে রেখো কিন্তু—ঠাকুর দেবতার নাম না হয়—

—ওমা—কি কর, ছি, ঐ কে দেখে ফেলবে—সর, সর, দেখছ না, কাজ করছি এখন—তোমার কি?

—ইস্ মিছে কথা বইকি। —আমি বুঝি জানিনে—আমাকে লুকিয়ে কাল থিয়েটার দেখতে যাওয়া হয়েছিল।

হুইশল্ দিয়া স্টীমার ছাড়িয়া দিল।

ডেকের উপর জনারণ্য। যেখানে মেশিন গর্জ্জাইতেছে ওখানে দারুণ গরম। শ্রীবিলাস চুপ করিয়া বাক্সটার উপর বসিল, নদীর এপার দেখা যায় না। জল কাটিতে কাটিতে স্টীমার চলিল।

ওপাশে কে এক ভদ্রলোক স্ত্রী লইয়া চলিয়াছে, সঙ্গে একটি ছোট ছেলে।

কত হাসিগল্প দুঁ-জনে করিতেছে। নিজেদের চারিপাশে যে এতগুলা অপরিচিত লোক রহিয়াছে, আনন্দে তাহারা সে-কথা ভুলিয়া গিয়াছে। ছেলেটি তাহাদেরই কাছাকাছি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—

শ্রীবিলাসের মনে হইল—মাধুরী কখনও মরিবে না—নিশ্চয় সারিয়া উঠিবে। আচ্ছা, এমনও তো হইতে পারে দুষ্টামি করিয়া মিছামিছি তাহাকে শুধু একটু মনঃকষ্ট দিবার জন্যই মাধুরী এই টেলিগ্রাম করিয়াছে। পাড়ার কেহ লিখিয়া দিয়াছে হয়ত। ...হইতেও পারে।

আর একবারের কথা শ্রীবিলাসের মনে আছে :

সম্বলপুরে থাকিতে হঠাৎ চিঠি গিয়াছিল—মাধুরী ভীষণ পীড়িত—শীঘ্র চলিয়া আইস। ভাবনায় তো শ্রীবিলাসের ঘুম হইল না—খাওয়া হইল না। কিন্তু বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দেখিল মাধুরী দিব্যি হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে—শুধু মজা করিবার জন্যই ঐ চিঠি পাঠাইয়াছিল। এবারও তো তেমনি কিছু হইতে পারে—

—এই—এই—এই—দুদু—

শ্রীবিলাস হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া দেখে—সেই শিশুটি টলিতে টলিতে তাহার সামনে আসিযাছে—

—এই এই—দুদু—

আধ আধ কথা শ্রীবিলাসের বড় ভাল লাগিল। দুই হাত বাড়াইয়া হাসিয়া বলিল,—এস এস—ও খোকা—জুজু নেই—নেই—

খোকা আসিতেছিল। কিন্তু পিছন হইতে সেই ভদ্রলোক 'ওরে দস্যি ছেলে' বলিয়া হঠাৎ ছোঁ মারিয়া লইয়া গেলেন। তারপর স্বস্থানে লইয়া গিয়া আর ছাড়িলেন না।

অন্ধকার নীহারিকামণ্ডলীর ভিতর দিয়া এক কণা আলো আসিতেছে... শ্রীবিলাস চোখ মেলিয়া রহিল... সাতরঙা রশ্মির ভিতর আলোর শিশুরা নাচিতেছে... হাস্যচঞ্চল চটুলচপল শিশুর দল তাহার দিকে আসিতে লাগিল—তাহাদের চলার ছন্দে জ্যোৎস্না ছিটকাইয়া পড়ে—হাসির আবেগে বাতাস মাতিয়া উঠে... শ্রীবিলাস তাহাদের হাতছানি দিয়া ডাকিতে লাগিল—হিরণ্ময়ী—উজ্জয়িনী—মৈত্রেয়ী...

ট্রেন ছাড়িয়া দিয়াছে।

চাকার ঘর্ঘর শব্দে শ্রীবিলাস অস্থির হইয়া নির্জ্জীবের মত কামরার এক কোণে পড়িয়া রহিল। সারা পৃথিবী ব্যাপিয়া যেন ভীষণ কোলাহল, কলহ, হাহাকার, আর্ত্তনাদ চলিয়াছে।

স্পষ্ট প্রত্যক্ষ অনুভূতির মত তাহার মনে হইল হয়ত সত্য সত্যই মাধুরী মরিবে না। নিশ্চয় সারিয়া উঠিবে! প্রতি পলে জগৎ জুড়িয়া কত শিশু জন্মগ্রহণ করিতেছে, কয়জন জননী মরিতেছে। মরিবে না—শুধু তাহার সহিত মজা করিবার জন্য ইহা একটা ছল মাত্র। শ্রীবিলাস তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া হয়ত তাহার অভিমান হইয়াছে।

অনুরাগ কলহ লজ্জা অভিমান... মাধুরীর সহিত প্রতিদিনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির কথা আজ তাহার মনে পড়িল। একটি দিনের কথা শ্রীবিলাসের আজও মনে পড়ে—এক দিন ঝড়ের মত দু-হাত পিছনে রাখিয়া মাধুরী ঘরে ঢুকিল। বলিল—শীগ্‌গীর বল কোন্ হাতটা নেবে, ডান হাত, বাঁ-কোন্‌টা, দেখতে পাবে না, বল ঝপ ক'রে—

শ্রীবিলাস কিছু বুঝিতে পারে নাই। হাতে করিয়া কিছু আনিয়াছে নিশ্চয়ই। কি হইতে পারে? তাহার হারান মনিব্যাগ—সোনার বোতাম? ভাবিয়া ভাবিয়াও কুলকিনারা করিতে পারিল না—শেষে মাধুরীর দক্ষিণ হাতটা দেখাইয়া দিল।

ভুল হইয়াছে।

মাধুরী হাসিয়া জবাব দিল—পারলে না—আচ্ছা, আর একবার সময় দিলুম—এবার বল, কোন হাত?

এবার শ্রীবিলাস ঠিক উত্তর দিল—মাধুরীর বাম হাতটি দেখাইয়া দিল। ...মাধুরী হাসিয়া আনীত চিঠিখানা শ্রীবিলাসকে দিল। এই চিঠির জন্য শ্রীবিলাস কয় দিন অপেক্ষা করিতেছিল। দরকারী চিঠি—সে-চিঠি পাওয়ার আনন্দে শ্রীবিলাস সেদিন মাধুরীকে কি পুরস্কার দিয়াছিল সে কথা শ্রীবিলাস কোনও দিন ভুলিবে না।

সকালবেলার রুক্ষ রৌদ্রে গলিটা শুষ্ক বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

মোড়টা ঘুরিয়াই শ্রীবিলাস বাড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল—ঠিক এমন সময় ঐ বাড়িটির একটি

ঘরের ভিতর কি হইতেছে, কে জানে। সমস্ত গলিটা যেমন ছিল তেমনি আছে। পৃথিবীর কোন্ ঘরে একটা শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে কাহার কি আসিল গেল।

সামনের জানালাটা খোলা রহিয়াছে, ভিতরে কিছুই দেখা যায় না।

কেহ তো কই আর্ত্তনাদ করিতেছে না, তবে হয়ত মাধুরী এখনও বাঁচিয়া আছে।

এতটুকু পথ; শ্রীবিলাসের পা যেন আর পারিতেছে না। বাড়ির কাছে আসিয়া শ্রীবিলাস কান পাতিল; কোথাও কোনও ঘরে একটি নবজাত শিশু কাঁদিতেছে না তো।

শ্রীবিলাসের কাছে এই অদ্ভুত নীরবতা যেন বিস্ময়কর মনে হইল। সে যে আসিতেছে—তাহার জন্য কি কেহ অপেক্ষা করিয়া নাই? জানালা খুলিয়া কেহ কি তাহার পথের উপর চোখ মেলিয়া বসিয়া নাই?

শ্রীবিলাস সোজা বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

কেহ কোথাও নাই। ঠিক এই সময় বাড়িতে তো চোর ঢুকিয়া যথাসর্ব্বস্ব চুরি করিয়া লইয়া যাইতে পারে। চুরি করিবার মত অবশ্য তেমন কিছু নাই, কিন্তু তবু শ্রীবিলাসের কাছে বাড়ির এই বিশৃঙ্খলতা ভাল লাগিল না। কোথায় সে আসিয়াছে বলিয়া এতক্ষণ বাড়িতে স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়িবে—তা নয়, সব চুপ। সবাই যেন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিয়া প্রহর গণিতেছে।

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া শ্রীবিলাস দেখিল—সেখানেও কেহ নাই।

শ্রীবিলাস সোজা তাহার উপরের ঘরে চলিয়া আসিল। সেখানে পিসীমা বসিয়া আছে। মেঝের উপর বিছানায় মাধুরী—মাধুরী শুইয়া আছে, ঘুমাইতেছে—

রোগশীর্ণ ম্লান মুখখানি—পাণ্ডুর দুটি চোখ—চোখের চারিদিকে গোল হইয়া কালির দাগ পড়িয়াছে।

পিসীমা বলিল,—কে বিলাস এলি? যাক্, বৌমা এই তোর জন্যে ভেবে ভেবে এখন একটু ঘুমিয়েছে, নিধিরাজ আবার ডাক্তারের বাড়ি গেছে।

শ্রীবিলাসের মনে হইল মাধুরীকে ডাকিয়া দুটি কথা বলে—একটু ক্ষমা চায়।

পিসীমা বলিল,—এখন জাগাস নে যেন ওকে—টেলিগ্রাম পেয়েছিলি তো? ওই কেবল বলছে, কই এখনও এল না—এখনও এল না—তুই এলি বাঁচলুম—

তারপর বলিল,—হ্যাঁ, বাবা বিলাস, তুই একবার এই পায়েই ডাক্তারের বাড়ি যা দিকিনি—গিয়ে একবার ডেকে নিয়ে আয়—বৌমাকে দেখে যাক—কাল সারা রাত মোটে ঘুমোয় নি।

শ্রীবিলাস দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল—এই তো জীবন। হয়ত মাধুরী ভাল হইয়া যাইবে—অনেক দিন ভুগিয়া ভুগিয়া ঔষধে পথ্যে বহুদিন ধরিয়া শয্যাশায়ী থাকিয়া শেষে এক দিন উঠিয়া বসিবে। এই তো জীবন। ...এই আশা-আকাঙ্ক্ষা আগ্রহ-উৎকণ্ঠা দিনের পর দিন—এই লইয়া মানুষ জন্মগ্রহণ করিল—আবার মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্তটি পর্য্যন্ত এমনি চলিবে। বিপদ আসিবে, উৎকণ্ঠা বাড়িবে, আবার ভাল হইবে—শান্তি আসিবে কিংবা আসিবে না। এই পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহার কি উৎকণ্ঠাই না ছিল। মাধুরীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া শ্রীবিলাস অনেক কথাই ভাবিতে লাগিল।

পিসীমা আসিল খোকাকে কোলে লইয়া।

—এই দেখ বিলাস—দেখ কেমন রাজপুত্তুরের মত ছেলে—দেখছিস্—

শ্রীবিলাসের হাসি আসিল। হাসি আসিল এই ভাবিয়া, যেন রাজপুত্রের মত দেখিতে না হইলে ছেলেকে সে ভালবাসিত না!

৩৩ বর্ষ, চৈত্র ১৩৪০